

শ্রীৰাজমালা ।

(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত ।)

দ্বিতীয় লহর ।

সভীক ও সচিত্র ।

সেনাপতি রণচতুঙ্গ নারায়ণ কথিত ।



শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক

সম্পাদিত ।

“প্রজা স্বর্গে স্থগী রাজা তদুঃখে যশচ দুঃখিত ।

স কীর্তিযুক্তো লোকেহস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥”

বিষ্ণু সংহিতা ।



রাজধানী আগরতলা—ত্রিপুরা রাজ্য ।

‘রাজমালা’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ ।

রাজধানী আগরতলা,
রাজমালা যন্ত্রে—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক মুদ্রিত।
ত্রিপুরা রাজ্য।



শ্রী শ্রীচন্দ্রমা দেব ।

নিবেদন ।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার কৃপায় রাজমালার দ্বিতীয় লহর প্রকাশিত হইল । ইহার সম্পাদন কার্যে প্রথম লহরের প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও যোগ্যতার অভাববশতঃ নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া অনিবার্য । এই অক্ষমতার নিমিত্ত সুধী সমাজে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ।

রাজমালার প্রথম লহর ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল । তৎপর কিঞ্চিৎমান দেড়শত বৎসরের মধ্যে মহারাজ ধনুমানিক্য ও বিজয়মানিক্য প্রভৃতি যশস্বী এবং খাতনামা রাজকুলবর্গ ত্রিপুর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন । তাঁহারা কেবল রাজনীতি-কুশল, শৌর্য-শালী এবং ধর্ম-বীর ছিলেন, এমন নহে—সাহিত্যের পুষ্টিবিধানকল্পেও বিস্তর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু রাজমালার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । ধর্ম্মানুকোয় পরবর্তী ক্রমান্বয়ে নয় জন ভূপতি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই মনে হইতেছে । ইহাদের পরবর্তী মহারাজ অমরমানিক্য পুনর্ব্বার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন । তাঁহার অল্পজ্ঞায়, রাজমালার দ্বিতীয় লহর গ্রথিত হইয়াছে । পূর্ব্ব-পুরুষের আরক্কার কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানদ্বারা মহারাজ অমর সত্য সত্যই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । তিনি ধর্ম্মানুকোয় প্রবৃত্তে রচিত অংশের পরবর্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পথ প্রদর্শক না হইলে, অগ্ণাণ লহরগুলি পরপরভাবে রচিত হইবার আশা ছিল বলিয়া মনে হয় না । গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় জানা যাইবে, ১৫৭৭ হইতে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অংশ সার্ক ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে । ইহা একাধারে সাহিত্য এবং ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য ।

প্রথম লহরের সম্পাদন কার্য্যে অধিক পরিমাণে শাস্ত্র গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অপরিহার্য্য । কারণ, রাজমালার প্রথমাংশ ত্রিপুর ইতিহাসের তথা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের পক্ষে পৌরাণিক যুগ, ঐতিহাসিক যুগ যাহাকে বলা হয়, তৎসহ ইহার সম্বন্ধ বড় বেশী নাই । সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয় । দ্বিতীয় লহরের সময় হইতে মুসলমান-সংশ্রবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তের সহিত ত্রিপুর-ইতিহাসের নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । রাজমালার সম্পাদন কার্য্যে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত ইহার সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অধিক দেখা যাইতেছে । এই কারণে, সম্পাদকের দায়িত্ব উত্তরোত্তর এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, অনেক স্থলে মত-বাদের জটিল-জাল ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় । এই লহরের সম্পাদন কার্য্যে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ-সমূহের ইতিহাসের প্রতি এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মতের উপর লক্ষ্য রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই ; কিন্তু মূল গ্রন্থের অনুরোধে, কোন কোন ঐতিহ্য বিবরণ আংশিক আলোচনা করিতে হইয়াছে, পরবর্তী লহরসমূহে তৎসমস্ত ক্রমশঃ পূর্ণত্ব লাভ করিবে বলিয়া আশা করি । তবে, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব নিবন্ধন এই গুরুতর কার্য্যে ভ্রম-প্রমাদ সজ্জ্বলিত হওয়া বিচিত্র নহে । বিশেষতঃ মত বিরোধ-স্থলে যে মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল । বোধ হয় ইতিহাস চর্চা-নিরত কোন ব্যক্তিই এরূপ মতবিরোধের

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা করিতে পারেন না। এ স্থলে এইমাত্র নিবেদন করা যাইতেছে যে, মত-ভেদস্থলে যেটি যুক্তিযুক্ত মত বগিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রথম লহরের সম্পাদনোপলক্ষে কোন কোন ঐতিহাসিকের মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। পূর্ববর্তী মতবাদিগণের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আমাকে অনুযোগ করিতেছেন। এই অনুযোগের ভিত্তি কোথায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাহারা ত্রিপুরার-ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎমাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বর্তমানক্ষেত্রে আমার পথ প্রদর্শক, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমি সম্মানের ভাবই পোষণ করিয়া আসিতেছি। কাহাকেও গালি দেওয়া কিম্বা অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য নহে—তাহা করিবার প্রয়োজনও নাই। অনবধানতাবশতঃ তদ্রূপ কোন কার্য্য করিয়া থাকিলে, প্রথম লহরেই সেই অসতর্কতাজনিত ত্রুটির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ স্থলেও পুনর্বার বিনীতভাবে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিতেছি। কিন্তু কাহারও মতের প্রতিবাদ করাকেই যদি ‘গালিবর্ষণ’ ধরিয়া লওয়া হয়, তবে আমার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে। যাহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কর্তব্যানুরোধে এমন ব্যক্তির উক্তিও খণ্ডনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে—প্রয়োজনস্থলে অতঃপরও তাহা করিতে বাধা হইব। এই ক্ষেত্রে আমাব মতই যুক্তিযুক্ত বা সুসঙ্গত বলিয়া নির্ধিবাদে গৃহীত হইবে, এমন দুরাশা জন্মের পোষণ করি না; উপস্থাপিত যুক্তিগুলির ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু কোন বিচারক প্রতিবাদ মাত্রকেই যদি ‘গালিবর্ষণ’ মনে করেন, তবে তাঁহার হাত হইতে নিস্তার লাভের উপায় নাই। এই কার্য্যে যেন কর্তব্যভ্রষ্ট কিম্বা অসংযত পথে ভ্রাম্যমান না হই, ভগবান সদনে সর্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

রাজমালার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি বিশেষ সতর্কতার সহিত মিলাইয়া পাঠাঙ্কন করা হইয়াছে; এবং পাদ টীকায় পাঠান্তরের উল্লেখ করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রাজরত্নাকর, কুম্ভমালা, শেণীমালা, চম্পকবিজয়, ত্রিপুরবংশাবলী এবং গাজিনাগা প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ঘটিত হস্তলিখিত পুথিগুলি যথাসাধ্য আলোচনাদ্বারা প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তদ্বিন্ন অন্য যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা চিহ্নের পশ্চাত্তানে সংযোজিত হইল। ঐ সকল গ্রন্থের প্রাণেতা ও প্রকাশকবর্গের নিকট চির-ঋণী থাকিব। এই আলোচনায় কঠোর পরিশ্রম এবং বিস্তর সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। এবারও মহারাজকুমার শ্রীলক্ষ্মীযুত রণবীরকিশোর দেববর্ষণ বাহাদুর হইতে যথেষ্ট গ্রন্থ-সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার এই উপকার কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।

এই কার্য্যে যে সকল সহায় ব্যক্তির আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে মহামাত্তবর মহারাজকুমার শ্রীলক্ষ্মীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ষণ বাহাদুরের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। রাজমালার কার্য্যভার শাসন-পরিষদের হস্তে থাকা কালে এই কার্য্যের প্রতি তাঁহার যে সদয় দৃষ্টি এবং উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। স্থানীয় পূজাপাদ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে ত্রিপুরেশ্বরের দ্বারপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, এবং উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কুম্ভকুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধাম্পদ মহারাজকুমার শ্রীলক্ষ্মীযুত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ষণ বাহাদুর, শ্রদ্ধেয় সূহৃদ্ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বিএ, ডি-লিট্ এবং

দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্ ; এম্-আর-এ-সি (লণ্ডন), বৃন্দারণ্যাশ্রমী শাস্ত্রদর্শী পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীমশ্রীমৎ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী মহোদয় প্রথম লহরের স্থায় এই লহরের পাণ্ডুলিপি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত আলোচনা পূর্বক আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতে ত্রিপুরার রাজসরকারের সহিত দীনেশ বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে। তিনি তৎপূর্ব হইতেই এই অঞ্চলটিকে বন্ধুর মধ্যে টানিয়া লইয়া স্বীয় অসীম ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দুর্লভ কার্যে যথোচিত সাহায্য দানে এবার তাঁহার অক্ষয় সুহৃদকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার এই উদারতা এবং স্নেহের কথা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। ঢাকা মিউজিয়ামের স্নযোগ্য কিউরেটর শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহাশয় অল্পকালের আলাপের মধ্যে এবং পত্রদ্বারা রাজমালা সম্পাদন কার্যের সহায়ক যে সকল মূল্যবান বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই, মহাশয়ের সহিত আলোচনায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। এবং শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ, মহাশয় হইতে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বহু মূল্যবান বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্কলিত ত্রিপুর-ইতিবৃত্ত সম্বলিত গ্রন্থ নিচয় এবং শ্রদ্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ, আমার কার্যের বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। স্নেহভাজন শ্রীমান্ দীনদয়াল দেববর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত 'দোয়াপাথের বিবরণ' পাঠিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের আগ্রা সেক্রেটারী প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসু বি-এ, এবং আমার সহকারী স্নেহাম্পদ শ্রীমান্ মাত্লেনাথ দাস মহাশয়দ্বয় আমার কার্যের বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের সৌজন্মের নিমিত্ত চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি হইতে নানাধিক পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি, এ স্থলে তৎসমস্তের নামোল্লেখ করিতে না পারায় গুরুতর ক্রটি রহিয়া গেল।

রাজমালায় যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা বর্তমানকালে সাধার অতীত বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, অনেকের অধস্তন বংশগণ পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়ায়, তাঁহাদের পরিচয় বর্তমান জন-সমাজ অবগত নহে। অনেকে আবার আপনাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই সকল কারণে প্রাচীন কালের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। স্থানের বিবরণ সম্বন্ধীয় অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। অনেক স্থানের নাম পরিবর্তিত হওয়ায় এবং প্রাচীন নামগুলি বর্তমান জনসমাজ ভুলিয়া যাওয়ায়, তৎসমস্তের অবস্থান নির্ণয় করিবার সন্যোগ ঘটিতেছে না। অনুসন্ধানদ্বারা যে সামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রন্থের পশ্চাত্তাগে সন্নিবেশিত হইল ; কিন্তু তদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না।

শাসন-পরিষদ কর্তৃক রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার কালে রাজমালা সংক্রান্ত কার্য্য মহামাত্তবর মহারাজকুমার শ্রীমশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে থাকিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসন-পরিষদ উঠিয়া যাইবার পরে নবীন ভূপতি—পঞ্চ-শ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্য স্বকীয় তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সামান্য আনন্দ বা অল্প আশার কথা নহে। শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুরের

প্রাইভেট সেক্রেটারী মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত রাণা বোধজং বাহাদুর, এবং এসিষ্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, এফ্-ই-এস্. এম্-আর-এ-এস্. মহাশয় এ তদ্বিষয়ক কার্য পরিচালনের বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন।

গ্রন্থের এই অংশ স্থানীয় 'রাজমালা যন্ত্রে'-মুদ্রিত হইল। ইহাকে মুদ্রাকর প্রমাদ শূন্য করিবার পক্ষে বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু নানা কারণে এ বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে নাই। এই ত্রুটির নিমিত্ত বিশেষ দুঃখিত আছি। দুইটি বিতর্কিত ভুলের কথা এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত। গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠার ২৮শ পংক্তিতে "১৪৩৮" অঙ্কস্থলে "১৪৪৩" এবং ২৯০ পৃষ্ঠার ১৪শ পংক্তিতে "চতুর্ভূজা" স্থলে "অষ্টভূজা" হইবে। এই ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যিক। রাজমালা যন্ত্রের শ্রিষ্ঠার শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বারা প্রফ সংশোধন কার্যে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি; এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

শ্রীভগবানের অসীম কৃপা এবং পঞ্চ-শ্রীযুক্ত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের সদয় দৃষ্টি লাভে, রাজমালার অবশিষ্টাংশ সম্পাদন ও প্রচারের কার্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আগরতলা—'রাজমালা' কার্যালয়,
দোল-পূর্ণিমা—১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন।





রাজমালার প্রচার প্রয়াসী
স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

প্রমাণ-পঞ্জী ।

(সে সকল গ্রন্থাদি হইতে দ্বিতীয় লঙ্কের সম্পাদন কার্যে প্রমাণ বা উপাদান
গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা) ।

সংস্কৃত গ্রন্থাদি ।

অগ্নিপুৰাণ ।	পত্র কোমুদী ।
অথর্ক বেদ ।	প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব (রঘুনন্দন) ।
উনকোটা তীর্থ মাহাত্ম্য (হস্তলিখিত) ।	বসন্তরাজ শাকুন ।
ঋগ্বেদ সংহিতা ।	বায়ু পুৰাণ ।
কথা মরিংসার ।	বারাহী তন্ত্র ।
কবিকল্পগতা ।	বিপ্র কল্পলতিকা ।
কল্প তরু ।	বিবাদ দর্পণ ।
কামিকা পুরাণ ।	বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী ।
কালীবিলাস তন্ত্র ।	বিষ্ণু ধর্মোত্তর ।
কাশী খণ্ড ।	বৃহৎ সংহিতা ।
কুর্শ্মপুরাণ ।	বৃহদ্রশ্ম পুরাণ ।
গরুড় পুৰাণ ।	বৃহন্নারদীয় পুরাণ ।
গার্গ্য সংহিতা ।	বৃহন্নীল তন্ত্র ।
ঘটককারিকা ।	বৃহস্পতি সংহিতা ।
চামুণ্ডা তন্ত্র ।	ব্রহ্ম পুরাণ ।
জৈমিনি ভারত ।	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।
জ্যোতিস্তত্ত্ব ।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।
তন্ত্র বিভূতি ।	ভবিষ্য পুরাণ ।
তন্ত্রসার ।	মৎস্য পুরাণ ।
ত্রিখিতত্ত্ব ।	মহাভারত (মূল) ।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক ।	মেদিনী কোষ ।
দশকুমার চরিত ।	যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।
দানসাগর গ্রন্থ ।	যুক্তিকল্প তরু ।
দিগ্বিজয় প্রকাশ ।	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ।
দুর্গোৎসব তত্ত্ব ।	যোগিনী তন্ত্র ।
দেবী প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব ।	যোগিনী হৃদয় ।
দেবী পুরাণ ।	রঘুবংশ ।
দেবী ভাগবত ।	রাজনির্ঘণ্ট ।
নন্দিপুৰাণ ।	রাজরত্নাকর ।
পরাশর সংহিতা ।	রুদ্রসামল ।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র ।

শব্দকল্পদ্রুম ।

শুক্ৰনীতি ।

শুদ্ধি তত্ত্ব ।

শ্রীমদ্ভাগবত ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ।

শ্বেতাশ্বতর ।

সংস্কৃত রাজমালা

সায়নভাষ্য ।

স্কন্দ পুরাণ ।

হরিবংশ ।

বাঙ্গালা গ্রন্থাদি ।

অষ্টমত প্রকাশ ।

আইন-ই-তীরহুত (বিশ্বকোষ ধৃত) ।

আসাম বুরুঞ্জী ।

উনকোটা তীর্থ (প্যারীমোহন দেববর্মান) ।

কামরূপ বুরুঞ্জী ।

কৃষ্ণকর্ণামৃত (যতনন্দন দাস) ।

কৃষ্ণমালা (হস্তলিখিত) ।

কৈলাস বাবুর রাজমালা ।

গাজিনামা (হস্তলিখিত) ।

গৌরলেখমালা ।

গোড়ে ব্রাহ্মণ ।

চণ্ডীকাব্য (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম) ।

চণ্ডীকাব্য (মাধবাচার্য্য) ।

চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য (হরকিশোর অধিকারী) ।

চট্টগ্রামের ইতিহাস (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী) ।

চম্পকবিজয় (হস্তলিখিত) ।

চৈতন্য চরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামী) ।

চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস) ।

চৈতন্য মঙ্গল (লোচন দাস) ।

ঢাকার ইতিহাস (যতীন্দ্রমোহন রায়) ।

তরপের ইতিহাস ।

তোয়ারিখে বাঙ্গালা (অনুবাদ) ।

ত্রিপুর বংশাবলী (হস্তলিখিত) ।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস (শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী) ।

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট (১১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা) ।

দুর্গামঙ্গল (মাধবাচার্য্য) ।

ধর্মরাজের গীত (কবি রূপরাম) ।

নব্যভারত (কার্তিক, ১৩০৪) ।

পদ্মাবতী (আওয়াল কবি) ।

পাদশাহনামা (বিশ্বকোষধৃত) ।

পৃথিবীর ইতিহাস (দুর্গাদাস লাহিড়ী) ।

প্রবাসী (কার্তিক, ১৩২১) ।

প্রাচীন রাজমালা (হস্তলিখিত) ।

ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায়) ।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন) ।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ।

বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখাগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ।

বিশ্বকোষ (নগেন্দ্রনাথ বসু) ।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত (ধনঞ্জয় ঠাকুর)—হস্তলিখিত ।

মনসামঙ্গল (দ্বিজ বংশীবদন) ।

ময়নামতীর গান (ভবানী দাস) ।

মহাভারত (কাশীরাম দাস) ।

মহাভারত (ছুটিখান) ।

মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনী ।

মহারাজোয়াং গ্রন্থ (চট্টগ্রামের ইতিহাস ধৃত) ।

মাদল-পঞ্জী (বিশ্বকোষধৃত) ।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্দ্র মিত্র) ।

রাজমালা—প্রথম লহর ।

রাজাবলী (হস্তলিখিত) ।

রাজাবাবুর রাজমালা (হস্তলিখিত) ।

রাজোয়াং (চট্টগ্রামের ইতিহাস ধৃত)

রামায়ণ (কৃত্তিবাস) ।

রিয়াজুস-সলাতিন (অনুবাদ) ।	শ্রেণীমালা (হস্তলিখিত) ।
শিলালিপি সংগ্রহ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ) ।	সাহিত্য (শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২১) ।
শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ) ।	সীতারাম (অক্ষয়কুমার মৈত্র) ।
শ্রীহট্টের ইতিহাস (অচ্যুতচরণ চৌধুরী) ।	সেক শুভোদয় (হস্তলিখিত) ।

ইংরেজী গ্রন্থাদি ।

- Akbarnama (by Beveridge).
 Analysis of the Rajmala (J. A. S. B.—Vol. XIX).
 Ayin-i-Akbari (Translation by Francis Gladwin).
 Beal's Buddhist Record—Vol. II.
 Bengal Past and Present—Oct. 1907.
 Bengal under Licutenant Governors.
 Buchanon Hamilton's Hindusthan.
 Dacca Review—May, 1914 and Oct., 1922.
 Forward—April 10, 1927.
 History of Assam (by E. A. Gait).
 History of Tripura (by E. F. Sandys).
 History of Mediæval Hindu India—Vol. II.
 History of the World—Sir Walter Raleigh.
 Ibn Batuta (Translation).
 Journal of Asiatic Society of Bengal—Part I, 1878, March, 1914,
 Vol. XII, XLIII.
 Journal of The Royal Asiatic Society—January, 1910.
 Letter No. 276, from Asstt. Pol. Agent, 11th June, 1888.
 Letter from Maharaja Beer Chandra Manikya—3rd Sep., 1888.
 Letter from Commissioner of the Chittagong.
 (No. 687—2nd Oct., 1888).
 Muir's Sanskrit Texts.
 North East Frontier of Bengal.
 Pal King of Bengal (by R. D. Banerjee).
 Pioneers in India—P. 163.
 Regulation—XVII of 1829.
 Rolph Filch's Travells.
 Science of Language—Max Muller.
 Settlement Report of Chakla Roshnabad
 (by J. G. Cunming, I. C. S.).
 Statistical Account of Bengal—Vol. VI.
 Stewart's History of Bengal.
 Tavernier's Travels (by J. Phillips).
 Von Neor's Akbar.
 Wright's Marco Polo.
 Yule's Marco Polo—Vol. II.

গণসমসাম্যে কৃষ্ণকিন্দী ॥ হৃৎকেন্দ্রমক্ষনং কবিত্ত্বপাত ॥ একত্রনিষ্কৃত্তিম্যাম কাঙ্ক্ষাক্রম ॥ ছিন্নবৎসর বাস্য (অগৌরব
 নবিশেষ ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥
 হ্রস্বকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥ বাস্যকেন্দ্রিম্যাম হ্রস্বকেন্দ্র ॥

পূর্বভাষ ।

রাজমালার প্রথম লহর সম্পাদন কালে যে পাঁচখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় লহরের কার্যেও সেই সকল পুথিই অবলম্বিত হইয়াছে । এই পুথির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একখানা পাণ্ডুলিপি আগরতলাস্থ উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে ছিল ; কতিপয় বৎসর পূর্বে গৃহদাহ উপলক্ষে তাহা ভস্মসাৎ হইয়াছে । তৎসমসাময়িক আর একখানা পুথি রাজ-গ্রন্থভাণ্ডার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে । উক্ত উভয় গ্রন্থ আলোচনার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটয়া থাকিলেও তৎকালে রাজমালা সম্পাদনের কার্যে ব্যাপ্ত ছিলাম না । এখন যে সকল পুথি অবলম্বনে কার্য করা হইতেছে, তৎসমস্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়েরই প্রতিলিপি । তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থখানা ১২৫৬ ত্রিপুরাদ্বে উজীর ভবনে রক্ষিত গ্রন্থ হইতে নকল করা হইয়াছে । এই গ্রন্থ স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের নিজ তত্ত্বাবধানে ছিল ; তাঁহার গোলোক প্রাপ্তির পর, গ্রন্থখানা তদীয় সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র-চন্দ্র দেববর্ষণ বাহাদুরের হস্তগত হয় । রাজমালার সম্পাদন কার্যোপলক্ষে তিনি তাহা রাজ-ভাণ্ডারে অর্পণ দ্বারা অসীম ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । এই গ্রন্থের প্রারম্ভ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি প্রথম লহরের পূর্বভাষে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এ স্থলে শেষ পৃষ্ঠার আলোক-চিত্র প্রদান করা হইল । এই পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে লিখিত আছে ;—

“শ্রীযুক্তদুর্গামণি উজিরস্থ পুস্তিকেয়ং ॥১।

সন ১২৫৬ ত্রিঃ তাং ৩০ আষাড় ।”

স্বর্গীয় উজীর দুর্গামণি ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যসেবী ছিলেন । রাজমালার শেষ দুইটি লহর তাঁহারই রচিত । কিন্তু তিনি একটা কার্যের দ্বারা গ্রন্থের গাভীর্য্য কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছেন । রাজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্তচালনা করায়, ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সমসাময়িক ভাবাপন্ন হইয়াছে । এই সংশোধন দ্বারা প্রাচীন ভাবের ব্যত্যয় না হইয়া থাকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটয়াছে । এরূপ কার্যের দ্বারা যে প্রাচীন গ্রন্থের মৌলিকতা নষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই ।

প্রাচীন ভাষা সম্বলিত একখানা পাণ্ডুলিপি রাজ-গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীন রাজমালার পাণ্ডুলিপি । কিন্তু তাহা নিতান্তই আধুনিক প্রতিলিপি । অতীব দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, ইহারও প্রাচীন পাণ্ডুলিপিখানা গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে । এই কারণে হস্তগত আধুনিক পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর

করা যাইতে পারে না। এজন্যই পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উক্ত পাণ্ডুলিপি পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের গৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক নকল হইলেও পুথিখানা উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, বর্তমান কালে ইহাই রাজমালার প্রাচীনত্বের একমাত্র নিদর্শন। স্মরণীয় ঘটিলে তাহা প্রচারের চেষ্টা করা হইবে।

যে পাঁচখানা পুথি লইয়া বর্তমান সময়ে কার্য্য করা হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপির বর্ণবিদ্যাস একখানারও বর্ণশুদ্ধি নাই। নকলকারিগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা কিম্বা সম্বন্ধীয় কথা। অভিজ্ঞতানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবিদ্যাস লিপি করিয়াছেন। একের সহিত অণ্ডের বর্ণ প্রয়োগের কোনরূপ সংশ্রব নাই। একরূপ ক্ষেত্রে সম্পাদকের পক্ষে কোন পুথির প্রণালী অবলম্বনীয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ এই সকল নকলকারীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই বর্ণবিদ্যাস সম্বন্ধে মূল পুথির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় অশুদ্ধ বর্ণবিদ্যাস মুদ্রিত করিয়া পাঠকবর্গের অযথা কষ্টোৎপাদন করিবার সার্থকতা নাই। স্মরণীয় গ্রন্থের ভাষা এবং পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধিকাংশ স্থলেই বর্ণবিদ্যাসের উপর হস্তক্ষেপ করা হইল। এবং যে সকল পাঠের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে, পাদটীকায় তাহার পাঠান্তর প্রদান করা হইল। প্রথম লহরও এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়াছে এবং অতঃপরও তাহাই করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্ভব না হইলেও পূর্বেবক্ত কারণে এ বিষয়ে গতান্তর দেখিতেছি না।

রাজমালার মূলভূত বিষয়—যযাতি নন্দন দ্রুহ্য এবং তাঁহার বংশধরগণের আর্ধ্যা নিবাস সম্বন্ধীয় বিবরণ। দ্রুহ্য পিতাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের আলোচনা। সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান নগর হইতে, সুন্দরবনের নিম্নভাগস্থ সগরদ্বীপে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিপুর ইতিহাসের ইহাই সার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শন পক্ষে প্রথম লহরের পূর্বভাষে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আর্ধ্যগণের আদি বাস-ভূমি ভারতবর্ষ কি না, এই তর্কেরই আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হইতেছে না, একরূপ স্থলে আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন কিম্বা মীমাংসার চেষ্টা করিতে যাইয়া ফললাভের আশা নিতান্তই বিরল। এতদ্বিষয়ক মতামত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই অনুকূল মত-বাদী পাশ্চাত্য মনীষীবর্গের কথা মনে পড়ে; তন্মধ্যে আবার পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা 'সার ওয়াল্টার র্যাগলে'এর নাম সর্বপ্রথমে হৃদয়ে উদ্ভিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়ন দ্বারা বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হইয়াছে—ভারতবর্ষই মনুষ্যের আদি বাসস্থান। * কাউন্ট জোরনস্-জারোনা বলিয়াছেন—আর্ধ্যাবর্ত্তই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এবং হিন্দু সভ্যতার

আদি স্থান ; এখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতালোক বিকীর্ণ হইয়াছে । তাঁহার
বাক্যের কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“It is there (India) we must seek not only for the cradle of the
Brahmin religion, but for the cradle of the high civilization of the
Hindus, which gradually extended itself in the West to Ethiopia to
Egypt, to Phoenicia ; in the East, to Siam, to China and to Japan, in
the South, to Ceylon, to Java and to Sumatra ; in the North, to Persia,
to Caldæa and to Colchis, whence it came to Greece and to Rome and
at length to the remote abode of the Hyperboreans,”

Count Bjornstjerna, Theogony of the Hindus.

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার * কর্জন সাহেব, সার উইলিয়ম জোন্স,
মুইর, † উইলসন, অধ্যাপক বোপ, ‡ সার উইলিয়ম হাণ্টার, প্রফেসর হীরেন, সুবিন্দু
শ্লেজেল প্রভৃতি বহুসংখ্যক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী নানাভাবে ভারতের আদিমতা
এবং প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন ।

এতদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ বাদীর সংখ্যাও বিস্তর আছে । তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষ
বলেন—আর্য্যগণ মধ্য এশিয়ার কোনও প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন ।
আর এক পক্ষের মতে—কাম্পীয়ান সাগরের উপকূলবর্তী কোনও প্রদেশ আর্য্য-
গণের আদিম বাসভূমি । অপর এক পক্ষ বলিতেছেন—আর্য্যগণ উত্তর মেরু
হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছেন । কিন্তু কোন পক্ষই আর্য্য জাতির আদিম
বাসস্থানের নাম নির্দেশ, কিম্বা আপন আপন মতের পরিপোষক প্রকৃষ্ট প্রমাণ
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই । ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহে যে সকল নদ-নদী এবং
জনপদের নাম পাওয়া যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা পূর্বেবাক্তরূপ মত
প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহারা সূক্তগুলির যেরূপ অর্থ করেন, তাহা প্রাচীন
বেদবেত্তাগণের মত-বিরুদ্ধ । এ স্থলে একটা ঋকের উল্লেখ করা যাইতেছে ।
ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ৩০শ সূক্তের ৯ম ঋকে লিখিত আছে ;—

“অনু প্রভৃশ্চোকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং ।

যং তে পূর্কং পিতা হুবে ॥ ১।৩০।৯॥”

* Science of Language—Max Muller.

† “They could not have entered from the west, because it is clear
that the people who lived in that direction were descended from these
very Arians of India.....nor could the Arians had entered India from
the north or north-west, because we have no proof from history or Philo-
sophy that there existed any civilised nation with a language and
religion resembling theirs which could have issued from either of those
quarters at that early period and have created Indo-Arian civilization.”

Muir’s Sanskrit Texts.

‡ “Sanskrit is more perfect and copious than the Greek and Latin
and more exquisite and eloquent than either,”

Prof. Bopp, Edinburgh Review.

আধুনিক পণ্ডিত সমাজের গতে এই সূক্তের ‘প্রভৃশ্বোকসো’ বাক্যের দ্বারা আর্য্যগণের বাসভূমিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সায়নাচার্য্য এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন—‘স্বর্গ ভূমি’।

আর একটী সুপ্রচলিত ঋকের কথাও উল্লেখযোগ্য ; ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্তের ১৮শ ঋকে পাওয়া যায় ;—

“ত্রিণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা
অদাভাঃ। অতো ধর্ম্মানি ধারয়ন্ ॥”

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই “ত্রিণিপদা বিচক্রমে” বাক্যের অর্থ করেন—
“আর্য্যগণ ভারতে আগমন কালে পণ্ডি মধ্যে বিষ্ণুর আশ্রয়ে তিন স্থানে অবস্থান বা বিশ্রাম করিয়াছিলেন।” বেদের নিরুক্তকারগণ অর্থ করিয়াছেন অন্তরূপ। শাক-পুনি, উর্নভ, প্রভৃতি বেদদর্শী মনীষিগণ ‘ত্রিণিপদা’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা “পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গলোকে” বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সূর্য্যের উদয়কালে পূর্বদিকে, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্তকালে পশ্চিমদিকে বিষ্ণুর তিন পদ—“ত্রিণিপদা-বিচক্রমে” বাক্যদ্বারা এই অর্থ বুঝায়।

এতদুভয় অর্থের পার্থক্য বড় বেশী। আরও কোন কোন ঋকের ব্যাখ্যায় এত বৈষম্য ঘটিয়াছে যে, সেই সকলের পরস্পর আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিলেও অতুক্তি হইবে না। এনস্থিধ পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা মূলেই, আর্য্যগণ ভারতের বাহির হইতে এ দেশে আসিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। বেদদর্শী মহাপুরুষ ব্যতীত এই বিরোধের সমাধান করা অণ্ণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমাদের ঞ্চায় অক্ষম ব্যক্তি এই “ত্রিণিপদা বিচক্রমে” বিতর্কের ত্রি-সীমায় পাদবিক্ষেপ করিবারও অধিকারী নহে। তবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম হইতে ১০ম মণ্ডল পর্য্যন্ত অংশে এবং অন্যান্য মণ্ডলে যে সকল নদ-নদী এবং জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কোনটী ভারতবর্ষে এবং কোনটী কাবুল দেশে অবস্থিত। অস্তিত্ব বিলোপ কিম্বা নাম পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমান কালে অনেক নদ-নদীর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বেদের কোন সূক্তেই আর্য্যগণের আদিবাসের স্থান নিঃসংশয়ে নির্ণয়োপযোগী বাক্য পাওয়া যায় না। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া আর্য্যগণকে ভারতের বাহিরে ফেলিতে চাহেন কেন ? বিশেষতঃ যেই বেদ-বাক্য অবলম্বনে তাঁহারা আর্য্য জাতিকে ভারতের ঔপনিবেশিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সেই অপৌরুষেয় বেদ ভারতের বহির্ভূত কোন্ দেশের সম্পত্তি, তাহাইবা বলেন না কেন ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা যেরূপই হউক—আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী, কিম্বা উপনিবেশী যাহাই সিদ্ধান্ত হউক, চন্দ্রবংশীয় ভূপতিরূন্দের প্রতিষ্ঠানের রাজপাট আদিম বা পরবর্ত্তীকালের প্রতিষ্ঠিত হউক—সম্রাট যযাতি যে সেই স্থান হইতেই পুত্রদিগকে

নানাদিগেদশে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, পুরাণোক্ত এই বিবরণ অস্বীকার করিবার কোনও হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না।

পুরাণ সমূহ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজ এককাল উপেক্ষা করিতে ছিলেন, গবেষণার ফলে সেই উপেক্ষার ভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে পুরাণের অস্তিত্ব থাকা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। স্মার উইলিয়ম হার্টারও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচিত ভারত-ইতিহাসের পরবর্ত্তী সংস্করণে সেই মতের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী (১৯১৪ খৃঃ) সংস্করণে ভিন্সেন্ট স্মিথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুরাণ সমূহ খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইতেছিল। এই বাক্য দ্বারা পুরাণের বয়স খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উঠিয়াছে; এবং পূর্ব ধারণা অপেক্ষা পুরাণের প্রাচীনত্ব প্রায় দেড় সহস্র বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচনার ফলে উত্তরোত্তর পুরাণ সমূহ আরও প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এরূপ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। স্মিথ সাহেবের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

“I may add that Purans in some shape were already authoritative in fourth Century B. C. The author of the Arthasastra ranks the Atharva-veda and Itihasha as the Fourth and Fifth Vedas (BK. I. Ch. 3.) and directs the King to spend his afternoons in the study of Itihasha which is defined as comprising six factors, namely, (1) Purana, (2) Itivritta (history), (3) Akhhyayika (tales), (4) Udaharona (illustrative stories), (5) Dharmasastra, and (6) Arthasastra (BK. I. Ch. 5).”

আর এক পক্ষের মতে ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের যে সকল অবস্থিতি স্থান পুরাণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের শেষ সংস্থান। সংস্কর্ত্তাগণের মে বিষয়ে ধারণার অভাব হেতু শেষ সংস্থানকেই আদি সংস্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, জাতিদিগকে ভারতের আদিম অধিবাসী বলা হইয়াছে। দেশীয় স্তম্ভবর্গের মধ্যেও এই মতের পক্ষপাতী পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বলে উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিদ মাননীয় C. V. Vaidya, M. A., L. L. B., মহাশয়ের বাক্য উত্থাপিত হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন,—

“The last positions of the Solar and Lunar races, Viz, Ayodhya and Prayaga, were taken to be their first positions by these last editors of the Puranas, because they had no idea whatever of the real course of History Viz, that the Aryans spread from north-west to the south-east and south.” History of the Mediæval Hindu India—P. 279.

ম্যাক্সমুলার, ত্রিকাল-দর্শী বেদবেত্তা ঋষিদিগকে বিশাল পৃথিবীর ভৌগোলিক তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ স্থলে পুরাণ সংস্কর্ত্তাগণের ধারণার প্রতি কটাক্ষ করা বিচিত্র কথা নহে। পার্জিটার সাহেব,

এলাহাবাদকে চন্দ্রবংশীয়গণের প্রথম রাজপাট বলিয়া নির্দেশ করায়, তিনি পুরাণের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব মহাশয় তাহা গ্রহণের অযোগ্য মনে করিয়াছেন। * পুরাণের এই উক্তি মানিতে হইলে বেদের সহিত বিরোধ ঘটে, ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু কোথায় অসামঞ্জস্য ঘটে, অনুমান ছাড়া প্রমাণের দ্বারা তাহা কেহ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জানি না। বেদের যেরূপ অর্থমূলে আর্য্যগণের আদি অবস্থান নির্দেশ করা হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণের সংস্কর্তাগণের উপর দোষারোপ করিবার কালে, পুরাণের প্রকৃত বাক্য কি ছিল, এবং সংস্কর্তাগণ তাহার কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা প্রমাণদ্বারা দেখাইয়া দিলে বোধ হয় সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিত। তাহা প্রদর্শিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, পুরাণ সংস্কর্তাগণকে যতই অনভিজ্ঞ বলা হউক না কেন, তাঁহারা জ্ঞানে না হইলেও অস্তুতঃ বয়সে বর্তমান কালের পণ্ডিত সমাজের জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বর্তমান কালের শাস্ত্র সে কালে শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ দুই চারি জনের মুঠের ভিতর ছিল না, অস্তুতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে তাহার আলোচনা করিতেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রের বিকৃতি ঘটাইতে যাওয়া পাপ কার্য্য বলিয়া তৎসময়ে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় প্রকৃষ্ট যুক্তি প্রমাণ ব্যতীত পুরাণকে বিকৃত বলিয়া উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। সচরাচরই দেখা যাইতেছে, যাঁহারা পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, প্রয়োজন স্থলে তাঁহারাও পুরাণের বচন আঙড়াইয়া স্বীয় মত দৃঢ় করিতে সচেষ্ট। এতদ্বারা স্পর্শই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারা কথায় যাহাই বলেন না কেন, কার্য্যকালে পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া পারেন না। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ উপেক্ষার বস্তু নহে। নীতি-শাস্ত্রবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত পুরাণকে চতুর্থবেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এবং ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস নামে খ্যাত।

নির্বাসিত দ্রুহ্য প্রথম কোথায় উপনিবেশিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক সমস্যার বিষয়। ত্রিপুর ইতিহাসের মতে দ্রুহ্য সুন্দরবনের সন্নিহিত সগরদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সগরদ্বীপস্থিত দণ্ডি-গণের সহিত ঘনিষ্ঠতা, ত্রিপুরেশ্বরের স্থাপিত 'ত্রিপুরাসুন্দরী' বিগ্রহ, এবং সগরদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা এ বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। † ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত 'ত্রিপুরাসুন্দরী' মূর্তি অতীত তথায় বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছেন। সুন্দরবনের শ্যাম উপর্যুপরি উত্থান-পতনশীল ভূ-ভাগে সুদূর অতীতের এতগুলি নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা

* History of Mediaeval Hindu India—Vol. II, PP. 259—260.

† রাজমালা—প্রথম লহর, পূর্বভাষ দ্রষ্টব্য।



করিয়া, কেহ বলিতেছেন—দ্রুহ্য সম্ভানগণ বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাক্যের অর্থোক্তিকতা প্রথম লহরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার কাহারও মতে আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দ্রুহ্য-বংশীয়গণ উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। এই উক্তি সত্য হইলেও তাহা যে এই বংশের দ্বিতীয় উপনিবেশ, তাহাও প্রথম লহরের পূর্বভাষে দর্শাইতে যথোচিত চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসমস্ত পুনরালোচনা করিতে যাইয়া কথা বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু দ্রুহ্য, এবং তৎসংশ-জাত ত্রিপুরেশ্বরগণের সুন্দরবনে আধিপত্য লাভের আরও গুটি দুই আনুসঙ্গিক প্রমাণের বিষয় এস্থলে আলোচনা করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, মহাশয়, তাঁহার “যশোহর-খুলনার ইতিহাস” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

“১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশন হয়। উহাতে খুলনার রেণী সাহেবের মধ্যম পুত্র (H. J. Rainey) সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, রেভারেন্ড লঙ্ (Rev. J. Long) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন প্যারিস সহরে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অনুসন্ধান-পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত তাঁহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্ভুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা তখন হইতে ২০০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ নোগল রাজত্বের মধ্য যুগে প্রস্তুত। ঐ মানচিত্রে সুন্দরবন সমুদ্রের দেশ ও তাহাতে পাঁচটা নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যারোস্ (De Barros) প্রণীত এসিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন ম্যাপ এবং ড্যান্ডেন্ ক্রকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা যায় যে, সুন্দরবনের সমুদ্র-কূলে প্যাকা কুলি (Pacaculi), কুইপিটা ভাজ (Cuipitavaz), নলদী (Naldy), ডাপারা (Dapara), এবং টিপারিয়া (Tiparia) নামক পাঁচটা প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। * যদিও ব্লকম্যান সাহেব এই সকল ম্যাপে কিছুই প্রতিপন্ন করে না বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তবুও আমরা তাঁহার পছন্দসূচক করিতে সন্মত নহি। যাহারা মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কোন স্থানের নামের প্রকৃত উচ্চারণ ভুল করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কাল্পনিক কতকগুলি স্থান বসাইয়া দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না।”

যশোহর-খুলনার ইতিহাস—৮ম পরিঃ, ৮৩ পৃঃ।

সতীশ বাবু অন্তত বলিয়াছেন ;—

“টিপারিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়।”

যশোহর-খুলনার ইতিহাস—৮ম পরিঃ, ৮৬ পৃঃ।

* পর্ভুগীজগণের মানচিত্র এবং সুন্দরবনে সমুদ্রের উপকূলস্থিত পাঁচটা বন্দরের বিবরণ লং সাহেব অন্ততও বলিয়াছেন, তাহা এই ;—

“I saw in the Bibliotheque Royale at Paris a Portuguese map of Bengal, drawn three centuries ago, which gave the name of five Cities to the East of Sagar Island on the borders of the Sea, the ruins in the Sundarbunds confirm the truth of the description.”

J. A. S. B.—Vol. XIX.

সতীশ বাবুর এই উক্তি আমরা সর্বদাতোভাবে সমর্থন করি। ত্রিপুরেশ্বরের সূর্যবংশীয়গণের সূন্দরবন অঞ্চলে যখন আধিপত্য ছিল, তখন সেই প্রদেশে “ত্রিপুরা” নামক বন্দর স্থাপিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, এই নামের দ্বারা সূন্দরবনে ত্রিপুরার প্রাধান্য স্থাপনের অকাটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১৯২৭ খৃঃ ১০ই এপ্রিল তারিখের ‘Forward’ পত্রিকায় হুগলীর প্রাচীন বিবরণ আলোচনা উপলক্ষে যে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

“The high and broad embankment with shady trees on either side from Tribeni to Mahanad used now for cart traffic known as Jamai Jangal is another place of considerable interest. It is said to have been constructed by the Raja of Mahanad for the convenience of his son-in-law, the son of Tripura Raja of Tribeni.

Another legendary tale is attached to this embankment. It is said that the Raja got annoyed with his son-in-law and one day in a sudden gust of anger went so far as to behead him. However the councillors intervened and it was settled that the son-in-law would be allowed to go to Tribeni on horse-back and after a few minutes would be followed by the Raja with his swords unsheathed and if he succeeded in overtaking the Prince, he would instantly be killed, the young Princess would not allow her husband to go alone. She also mounted on the same horse with him. The horse started. It was a bid for life. It proceeded at full gallop for about 3 miles when it fainted and fell on the ground. The distant sound of the hoofs of Raja's horse became more and more distinct. He would overtake them in no time. Not a moment could be lost. It was a question of life and death. They ran fast for their lives, but the Princess unaccustomed to run became exhausted. The husband could not desert her at this crisis. In their distress they implored the Almighty Father to save them. Their earnest solicitations to Heaven did not go in vain. White foams of water were seen at a distance, on and on it approached and lo and behold! It rushed forth in tremendous violence and broke the embankment at their back. The Damodar was in floods. It had risen high and flooded the countryside. The Raja had to go back disappointed. By the mercy of Heaven, the princely couple was saved. The portion of the embankment swept away by the floods is still visible. It lies in village Akna and is known since then as “Chinna” or broken Akna as referred to in the Government Catalogue just mentioned.”

Paper on the researches into the antiquities of Hoogly District by Manindra Deb Rai read before the Hoogly District Historical Association reported in “Forward” April 10, 1927.

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই ;—ত্রিবেণীর * ত্রিপুর রাজপুত্র হুগলীর মহানদের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জামাতার যাতায়াতের নিমিত্ত রাজা এক রাস্তা

* এই ‘ত্রিবেণী’ শব্দ দ্বারা ত্রিবেণীর স্থিতি স্বঃঃঃঃঃ অর্থে উদ্দিষ্ট হয়। (স্বঃঃঃঃঃ)

বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার নাম “জামাই জাদাল”। এই প্রশস্ত বহু অতীত বিদ্যমান রহিয়াছে।

একদা রাজা কোন কারণে জামাতার প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশে কৃতসংকল্প হন। পারিষদবর্গের অনুরোধে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল যে, জামাতাকে আপন ভবনে যাইবার নিমিত্ত একটা অশ্ব প্রদান করা হইবে। জামাতা সেই অশ্বারোহণে শ্মশুরালয় হইতে বহির্গত হইবার পর, রাজা অশ্ব লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এবং পথিমধ্যে ধৃত হইলে তাঁহাকে বধ করিবেন।

রাজ-জামাতা শ্মশুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন, রাজ-কুমারীও সেই অশ্ব পৃষ্ঠেই পতির সহগামিনী হইলেন। আরোহী আত্ম-জীবন রক্ষার নিমিত্ত অশ্বকে পূর্ণবেগে চালনা করায়, কিয়দূর অগ্রসর হইবার পরেই অশ্বটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন উপায়ান্তর অভাবে উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা অধিক সময় দৌড়াইতে সমর্থ হইলেন না; অল্পকালের মধ্যেই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এই আসন্ন বিপদ কালে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত রাজকুমার পলায়ন করিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই পশ্চাদনুসরণকারী রাজার অশ্ব পদধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তখন উভয়েই বুঝিলেন, ভবলীলা শেষ হইবার অধিক বিলম্ব নাই। নিরুপায় নব-দম্পতি ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের পাদপদ্মে অন্তিম প্রার্থনা জানাইলেন।

এই সময় অকস্মাৎ দামোদরের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বন্যার ভীষণ বেগে তাঁহাদের পশ্চাৎভাগস্থ পথ ধ্বসিয়া গেল, রাজার গতিরুদ্ধ হইল। এই ঘটনা হইতেই উক্ত ভগ্ন স্থানের নাম “ছিন্ন আকনা” হইয়াছে।

দামোদরের বন্যায় এখনও সময় সময় তৎতীরবাসীদিগকে বিপন্ন হইতে দেখা যায়, তথাপি এই আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট বন্যাকাহিনী অনেকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলেও উপাখ্যানের সনত্র অংশকে উপেক্ষণীয় মনে করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। ইহা একটা প্রবাদ বাক্য। সকল প্রবাদ বাক্য বা কিম্বদন্তীর মূলেই অল্পাধিক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। কিম্বদন্তী হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ হইয়া থাকে। * প্রাচীন কালে, বিশেষ বিশেষ ঘটনার

* কিম্বদন্তীকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চতুর্বিধ উপাদান হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে;—(১) কিম্বদন্তী, (২) বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিক প্রদত্ত প্রসঙ্গ, (৩) প্রাচীন স্থাপত্যাদি হইতে সংগৃহীত বিবরণ, (৪) ঐতিহাসিক তথ্য পূর্ণ প্রাচীন সাহিত্য। এই চতুর্বিধ উপাদানের মধ্যে কিম্বদন্তী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিস্কেণ্ট্ স্মিথ্ বলিয়াছেন;—

“The sources of, or original authorities for the early history of India may be arranged in four classes. The first of these is tradition, chiefly as recorded in native literature,”

স্মৃতিরক্ষাকল্পে তদবলম্বনে আখ্যায়িকা, গীতি, গাথা, কিম্বা পাঁচালী রচনা করিবার পদ্ধতি ছিল। তৎসমস্তের মধ্যে যে সকল অলৌকিক এবং কাল্পনিক কথা জড়িত আছে তাহা বাদ দিয়া ঐতিহাসিক সত্য গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের দেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে সর্বদাই দেখা যাইবে, অনেক অদ্ভুত উপাখ্যানের সহিত প্রকৃত ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। চাঁদ কবি এবং চারণ বা ভট্টগণের রচিত গাথা হইতে রাজপুত্রনার ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে, একথা কাহারও অবিদিত নহে। কেবল আমাদের দেশের নহে—অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অবস্থাও তদ্রূপ। রোমের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অদ্ভুত আখ্যায়িকার অভাব নাই, ইউরোপের ইতিহাসে অনেক অলৌকিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু এই কারণে তৎসমস্ত উপেক্ষিত হয় নাই; তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাশিত হইতেছে। সুতরাং উদ্ধৃত উপাখ্যানটী কিয়ৎপরিমাণে কল্পনা বিজড়িত বলিয়া মনে করিলেও অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ ইহার সহিত ইতিহাসের স্পষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই আখ্যায়িকা আলোচনায় পাওয়া যায় ;—

(১) ত্রিপুর রাজপুত্র ত্রিবেণীতে ছিলেন, এবং তিনি ছগলীর মহানদের রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেন।

(২) রাজ-জামাতার গমনাগমনের নিমিত্ত রাজা যে রাস্তা বাঁধাইয়াছিলেন, তাহার নাম “জামাই জাঙ্গাল”; সেই রাস্তা অত্যাধি বিদ্যমান আছে।

(৩) ত্রিপুর রাজকুমার শশুরালয় হইতে অশ্বারোহণে পলায়ন করিয়াছিলেন।

প্রথম কথার সহিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত মিলাইলে দেখা যাইবে, দ্রুত পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সুন্দরবনে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল “ত্রিবেগ।” * ত্রিবেগ এবং ত্রিবেণী একার্থ বোধক এবং অভিন্ন বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। বিশেষতঃ সুন্দরবনের সন্নিহিত ছগলী জেলায় অত্যাধি

* “তথোবাচ প্রসন্নাস্ত কপিলস্তং নৃপাঙ্জম্ ।
মদ্বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়মেনো গমিষ্যতি ॥
যযাতেঃ শাপতো মুক্তিলপ্তস্তে তব বংশজাঃ ।
এতদ্বচো নিশম্যাসৌ হৃষ্টচিত্তস্তৌহভবৎ ॥
স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্ ।
প্রভাববানভূত্তত্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ ॥
স দোর্দণ্ড প্রতাপেন বহুদেশান্ বশেনয়ন্ ।
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ প্রজা আত্ম প্রজাইব ॥
যদ বদধিকৃতং রাজ্যং ত্রিবেগপতিনা নৃপ ।
তত্ত্বং সর্বং তদারভ্য ত্রিবেগ খ্যাতিমাগতম্ ॥”

রাজব্রহ্মকর—৬ষ্ঠ সর্গ, ১৯-২৩ শ্লোক ।

ত্রিবেণী নামক গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। পূর্বে এই স্থান একটা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহা গঙ্গাতীরে, ২২°৫৮'১০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬'৪০" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত বিযুক্ত হওয়ায়, স্থানের নাম 'ত্রিবেণী' হইয়াছে। প্রয়াগে উক্ত নদীত্রয় সংযোজিত হওয়ায় তাহাকে 'যুক্তবেণী' বলা হয়, এই স্থানে নদীত্রয় বিভিন্ন পথ অবলম্বন করায়, ইহা 'মুক্তবেণী' নামে অভিহিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে পাওয়া যায় ;—

“প্রদ্বাননগরাদ্ ঘানো সরস্বত্যাস্তথোত্তরে ।
তদক্ষিণ প্রয়াগস্ত গঙ্গাত্রা যমুনা গতা ।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে ॥”

মর্ম্ম ;—“প্রদ্বান নগরের (পাণ্ডুর) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তরে, দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা চলিয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।”

“দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখ্যা দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত।”

মর্ম্ম ;—উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ প্রয়াগ, সপ্ত গ্রামের নিকট দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, এই স্থান কেবল 'ত্রিবেণী' নামে অভিহিত নহে ;— পরন্তু তীর্থ-গৌরবে ইহাকে 'দক্ষিণ প্রয়াগ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায়ও এই স্থানের তীর্থজনিত সম্মান পরিলক্ষিত হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলিয়াছেন ;—

“বাম দিকে হালি সহর দক্ষিণে ত্রিবেণী ।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান ।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজ দেয় দান ॥
গর্ভে বসি শিব পূজা করে কোন জন ।
রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ ॥
শ্রদ্ধ করে কোন জন জলের সনীপে ।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে ॥”

কবিকঙ্কণ.চণ্ডী ।

কবিকঙ্কণ এই ত্রিবেণীকে “তীর্থের চূড়ামণি” বলিয়াছেন। বর্তমান কালেও এই স্থানের তীর্থজনিত সম্মান যথেষ্ট আছে, বারুণী ও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসে, এবং বহু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। সূর্য্য

এবং চন্দ্র গ্রহণ কালে এই ক্ষেত্রে স্নানদানাদি করা বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া এখনও লোকে বিশ্বাস করে।

ত্রিবেণীর তীর্থ-গৌরব অপেক্ষা সমৃদ্ধি গৌরবও কম ছিল না। এখানে একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালের ধনপতি সদাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বণিকগণ এই স্থান হইতে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করিতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া যায় ;—

“ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।

আশ্রম করিয়া তপি স্নান করে ধনপতি

তরী পুরে নানা ধন বি নি ॥”

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

ত্রিবেণী বন্দর গ্রীকদিগের পরিচিত ছিল। প্লিনির লেখায় পাওয়া যায়, দক্ষিণে গোদাবরী মোহনা হইতে পাটনা যাত্রা জাহাজ সমূহ ত্রিবেণী হইয়া বাইত। টলেমীও ত্রিবেণীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এখানে মৃত্তিকা খনন কালে নৌকার ভগ্নাংশ, মাস্তুল এবং অট্টালিকার চিত্রাদি এখনও পাওয়া যায়, এ সমস্ত ত্রিবেণীর অতীত সমৃদ্ধির ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

বিদ্যা বিভবেও ত্রিবেণী কোন প্রদেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। প্রাচীন কালে নদীয়া রাজ্যে চারিটা বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল—নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী। এককালে ত্রিবেণীতে ত্রিশটি সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক, দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের জন্মভূমি ও বাসস্থান বলিয়া বর্তমান কালে ত্রিবেণী গ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই ত্রিবেণীর তুলনায় সুবর্ণগ্রামের কিম্বা আসামের ত্রিবেণী উল্লেখযোগ্যই নহে। ‘ত্রিবেণী’ হইতেই যদি ত্রিবেগ রাজ্যের নামোৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে এই ত্রিবেণীকে লক্ষ্য করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

উক্ত আখ্যায়িকা-বর্ণিত ত্রিপুর রাজকুমার কোন্ রাজার পুত্র এবং কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে ‘ত্রিবেণীর ত্রিপুর রাজকুমার’ শব্দদ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে কালে সুন্দরবন ও ত্রিপুরা উভয় রাজ্য ত্রিপুরেশ্বরগণের করতলস্থ ছিল, ইহা তৎকালের ঘটনা।

দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় বুঝা যায়, “জামাই জামালের” অস্তিত্ব অতীত বিদ্যমান থাকায় আখ্যায়িকার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষতঃ ছগলীর মহানদ হইতে ত্রিবেণী বা ত্রিবেগ পর্য্যন্ত জামাতার গমনাগমনের নিমিত্ত রাস্তা নির্মিত হওয়ায় উক্ত উভয় স্থান অদূরবর্তী ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। তৎকালে বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামের ত্রিবেগে, কিম্বা সুদূর পূর্ব প্রান্তস্থিত নওগাঁ জেলার নিকটবর্তী কপিলা নদীর তীরস্থিত ত্রিবেগে ত্রিপুরার রাজপাট

প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, “জামাই-জামাল” নিশ্চয় করা অসম্ভব হইত। এতদ্বারাও সুন্দরবনের ত্রিবেগে রাজধানী থাকাই সম্ভবপর এবং সম্ভব নির্ধারণ বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় বিষয়টী ত্রিপুর ইতিহাসের অধিকতর অশুকুল। ত্রিপুরার রাজপুত্রকে হুগলীর মহানদ হইতে স্বীয় আবাসভূমি ত্রিবেগীতে বাইবার নিমিত্ত অশ্ব প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, উক্ত উভয় স্থানের মধ্যে অশ্বারোহণে যাতায়াতের সুগম পথ ছিল। পূর্বেবক্ত “জামাই জামাল” দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। তৎকালে ত্রিপুরার রাজধানী যদি সূর্যগ্রামে কিম্বা আসামে থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জামাতাকে সাত সমুদ্র ভের নদী পার হইয়া পলায়ন করিবার নিমিত্ত অশ্ব প্রদান করা হইত না; একপস্থলে জল-বানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব হইত। এতদ্বারাও তৎকালে ত্রিপুরার রাজধানী সুন্দরবনে থাকাই প্রমাণিত হইতেছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যযাতি নন্দন দ্রুহ্যর মগরদ্বীপে ওঃঃ সুন্দরবনে আধিপত্য বিস্তারকালে রাজ্যের ‘ত্রিবেগ’ নামকরণ হইয়াছিল—‘ত্রিপুরা’ নাম ছিল না। উক্ত আখ্যায়িকায় ‘ত্রিবেগের ত্রিপুর রাজপুত্র’ বাক্য পাওয়া যাইতেছে। তৎসময় যদি সুন্দরবনেই রাজধানী থাকিত, তবে ‘ত্রিপুর রাজপুত্র’ বলা হইল কেন? এবং এই ‘ত্রিপুর’ শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কি?

এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রাপ্ত হইলে দেখা যাইবে, সুন্দরবনস্থিত ত্রিবেগে দ্রুহ্যবংশীয়গণের আধিপত্য থাকাকালেই ত্রিপুরার সাহিত্য-তাহাদের সংশ্রব ঘটিয়াছিল। ত্রিবেগপাতি প্রতর্দন করাত দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি মহারাজ মিত্রারি পরাশুর পাঁচজন রাজা সুন্দরবন ও ত্রিপুরা, উভয় প্রদেশ শাসন করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহারা কখনও সুন্দরবনে এবং কখনও ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী রাজপাটে অবস্থান করিতেন। করাত-বিজয়ী প্রতর্দনের পৌত্র কলিন্দ কর্তৃক সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত ‘ত্রিপুরা সুন্দরী’ বিগ্রহ ইহার জাঙ্ঘল্যমান প্রমাণ। রাজমালা প্রথম লহরের পূর্বভাষে এ বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। দ্রুহ্যবংশীয়গণ ত্রিপুরা ও সুন্দরবন উভয় প্রদেশে প্রভাবান্বিত থাকাকালে আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল, সম্যক অবস্থা আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং এই কারণেই ‘ত্রিপুর রাজপুত্র’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বংশ বিবরণ ।

প্রাচীন বংশবল্লী আলোচনা করা এক দুর্লভ ব্যাপার । পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ভারতীয় রাজশ্রবণের পূর্ণ বংশ-লতা পাওয়া যায় না । প্রাচীন বংশবল্লী সংগ্রহ করিবার বিবিধ অস্ত্রায় । বংশের মধ্যে ঝাঁহারা বিমল কীর্তিশালী, ধর্মপরায়ণ এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতকামী ছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহাদেরই নাম এবং কীর্তি-গাথা পাওয়া যায় ; সাধারণ ব্যক্তিবর্গের প্রতি শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই । ঝাঁহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানভ্রম্ভ হইয়াছেন, তাঁহারা কীর্তিমাণ্ডিত হইলেও পৌরাণিক গ্রন্থে সকলের নাম গৃহীত হয় নাই । আবার এমন এক সময় গিয়াছে, যে কালে আদর্শ চরিত্র-কাহিনী কাল পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখা হইত । তৎকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম তাঁহাদের কীর্তি-কলাপ দ্বারা স্মরণীয় হইত, বংশের অকৃতী সম্ভানদিগকে অল্পকালের মধ্যেই লোকে ভুলিয়া যাইত । এই সকল কারণে অনেক স্থলে বংশাবল্লীর ক্রম-ভঙ্গ হইয়াছে ; বর্তমানকালে আর তাহা উদ্ধার সাধনের উপায় নাই । সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগের যে সকল বিবরণ শাস্ত্রকারগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা চিরদিনের তরে বিস্মৃতির কুক্ষিগত হইয়াছে ।

আমাদের উদ্দিষ্ট চন্দ্রবংশের বিবরণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, এখানেও পুরাণ গ্রন্থসমূহের পরম্পর বৈষম্য রহিয়াছে । মহাভারতে ইলার পুত্র পুরুরবা হইতে পর্যায়ক্রমে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রের সহিত ইলা বা পুরুরবার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে কোন কথা পাওয়া যায় না । হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনার ত্রস্তার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের আত্মজ বৃধ, এবং বৃধের ভনয় পুরুরবা ইত্যাদি নামসহ ধারাবাহিকভাবে বংশবল্লী পাওয়া যায় । পুরুরবা হইতে যম্যতি পর্য্যন্ত বংশ-ধারার মধ্যে কোন কোন পুরাণে নামের পার্থক্য ঘটিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে । এবম্বিধ অনৈক্যের হেতু নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । তবে, লিপিকার শ্রমাদ যে ইহার একটা কারণ, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না । এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে—গান্ধারের পুত্রের নাম কোন গ্রন্থে ‘ধর্ম্য’ এবং কোন গ্রন্থে ‘ঘর্ম্ম’ লিখা হইয়াছে । ধর্ম্ম বা ঘর্ম্মের পুত্রের নাম কেহ বলেন ‘ধৃত’ কেহ বলেন ‘বৃত’ । এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকগণ ‘ধ’ বর্ণকে ‘ঘ’ অথবা ‘ঘ’ বর্ণকে ‘ধ’ লিখিয়া এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন । একরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে । কেবল নামের বৈকল্য ঘটিয়াছে এমন নহে, কোন কোন স্থলে পুরুষ সংখ্যারও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বে একবার দেওয়া হইয়াছে, এ স্থলে আর একটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে । কোন কোন পুরাণের মতে ক্রত্ব্যর পুত্র বক্র, বক্রর আত্মজ সেতু । আবার কোন কোন পুরাণে ক্রত্ব্যর পুত্র সেতু লিখিত হইয়াছে, বক্রর নামোল্লেখ নাই । এবম্বিধ পার্থক্যও

অনেক আছে। বিশেষতঃ দ্রুতহার অধস্তন ৮ম স্থানীয় প্রচেতার নাম পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনায় পাওয়া যায়। প্রচেতার পুত্রসংখ্যা একশত ছিল, তাঁহাদের নাম বা বংশ বিবরণ কোন গ্রন্থেই নাই। সূর্য্যবংশের অবস্থাও চন্দ্রবংশেরই অনুরূপ। এই সকল কারণে শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন বংশধারা বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার করা দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন বংশবল্লী স্মৃতির উপর নির্ভর করিত, পূর্বেবাস্তুরূপ বৈষম্য লক্ষিত হইবার ইহাও অন্যতর কারণ। যাহা হউক, এবশ্বিধ সামান্য অনৈক্যের দরুণ স্মরণাতীত কাল হইতে রক্ষিত প্রাচীন বংশ-পত্রিকা সমূহ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না; সুবিজ্ঞ পার্জিটের সাহেব ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলী সম্বন্ধে গভীর গবেষণাদ্বারা ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন।*

পুরাণের সাহায্য ব্যতীত সুদূর অতীতের বংশলতা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইলেও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বিবরণ দুঃপ্রাপ্য নহে। বংশলতা সংগ্রহের প্রাচীন সূত্র। আমাদের দেশের চিরাচরিত একটি প্রাচীন প্রথা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। পূর্বপুরুষদিগের মহিমা কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী সংরক্ষণ পক্ষে ভারতবাসিগণ চির অভ্যস্ত। কুলাচার্য্য ও ভট্টগণের রচিত কুল-পঞ্জিকায়, কবি এবং চারণদিগের গানে ও গাথায়, বিখ্যাত কুলসমূহের বিবরণ কালপরিম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও দেখা গিয়াছে, প্রতিদিন সায়াহ্নে বালকদিগকে পূর্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী শুনান এবং ধারাবাহিক-ভাবে তাঁহাদের নাম কণ্ঠস্থ করান প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য মধো পরিগণিত ছিল। মুখে মুখে বংশ-পর্য্যায় রক্ষার পক্ষে এই প্রথা বিশেষ সহায়ক ছিল।

ত্রিপুর রাজ-বংশাবলী আলোচনা করাই এ স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে ত্রিপুর রাজ-বংশাবলী বিষয়ক কথা। এই পরিবারের বংশ বিবরণ রক্ষার ভার, চতুর্দশ দেবতার পূজক দণ্ডি-সমাজের হস্তে ছিল, পরে সভাসদ পণ্ডিতগণের উপর সেই ভার অর্পিত হয়। দণ্ডিগণ পুরুষ-সুক্রমে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজশব্দের বিবরণ রক্ষা করিতেন; এই কারণেই চম্পাইর মুখ নিঃসৃত বিবরণ লইয়া রাজমালা রচিত হইয়াছে। পূর্ব হইতে একরূপ সুব্যবস্থা থাকায়, রাজপরিবারের বংশ-পত্রিকা নির্ভরযোগ্য মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক অংশ অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া, তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

সে কালের লোক দীর্ঘজীবী ছিল, অনেকে সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কথা শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় পাওয়া যায়। একরূপ সুদীর্ঘ প্রাচীনকালের বংশকাহিনী। জীবনলাভের যৌক্তিকতা দর্শাইবার পক্ষে প্রথম লহরে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তখন সম্ভান উৎপাদনও বর্তমানকালের ন্যায় অল্প বয়সে হইত না; পুরুষের বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকাই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কন্যাগণের বাল্যবিবাহও সকল সময় প্রচলিত ছিল না। এবশ্বিধ

* Journal of the Royal Asiatic Society — January, 1910.

নারী কারণে পুরাকালের সুদীর্ঘ সময়ের তুলনায় অনেক বংশের পুরুষসংখ্যা কম লক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্ববর্তী ত্রিপুর রাজবংশের অবস্থাও তদ্রূপ। আবার পূর্বেবক্ত কারণে অনেক বংশের পুরুষসংখ্যা বাদ পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক। মাননীয় F. F. Pargiter, M-A, মহোদয় “Ancient Indian Genealogies and Chronology” শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান এবং এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। * এরূপ স্থলে ত্রিপুর রাজবংশের পৌরাণিককালের বংশ-পত্রিকার শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ধারণ পক্ষে দৃঢ়তার সহিত মত প্রদান করা অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

পৌরাণিক যুগের পরবর্তী প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের বংশ-পত্রিকা ক্রমাগত সযত্নে রক্ষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কালপ্রভাবে তাহা ত্রিপুর-বংশাবলী সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে। ত্রিপুর বংশাবলী সম্বন্ধীয় মত।

কৈলাস বাবুর মত—বৌদ্ধ-বিদেবী ব্রাহ্মণগণের কৃপায় এই বংশ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা কর্নেল ডেল্টন্ সাহেবের রচিত, বঙ্গদেশের ‘ডিসক্রিবিটিভ্ এমনলজি’ গ্রন্থোক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি। এতদ্বারা পৌরাণিক যুগের সহিত এই বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন হইতেছে। এই মতের অর্থোক্তিকতার বিষয় প্রথম লহরেই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। †

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মতও তৎকালে আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মতের অন্ত নাই। এ স্থলে তাহার কিয়দংশ প্রদান করা যাইতেছে;—

“রাজমালায় ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুদ্ধিরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কিন্তু ইহার নামোল্লেখ নাই, তবে রাজসুয় যুদ্ধকালে ভীমকর্তৃক পূর্বাঙ্গ জয়কালে সাত জন কিরাত নৃপতির পরাজয় বিবরণ আছে, আর ঘোষবাত্রার পর কর্ণকর্তৃক পূর্বাঙ্গ জয়কালে ত্রিপুরা রাজ্যের জয় বিবরণ লিখিত আছে। ভারত-যুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধ হয় ত্রিপুরাধিপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজসুয় যুদ্ধকালে উপস্থিত রাজসুয়বর্গের মধ্যেও তাঁহার নাম দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিলোচন ও যুদ্ধিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। ত্রিলোচনের বংশাবলী রাজমালায় বাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজা বীরচন্দ্রনাথক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পর্য্যন্ত ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০০ বৎসর হয়। এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাব্দী গণনায় অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর হইয়া প্রতি শতাব্দীতে যে এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০০ বৎসরে সেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়া যায়। এই ৩৬ বৎসর ও ১০৯ পুরুষে যে ৩৬০০ বৎসর হইয়াছে তাহা একুনে ৩৬৩৬ বৎসর হইতেছে।

* Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,—January, 1910.

† রাজমালা—প্রথম লহর, ৩১/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং রাজমালার বংশাবলী অনুসারে ত্রিলোচন, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র হইতে ৩৬৩৬ বৎসর পূর্ক বর্তমান ছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরা রাজের পূর্কবর্তী মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অতি শিশু। এখন যদি যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথমে বর্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্দ্র হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পূর্ক বর্তমান ছিলেন বলিতে হইবে। কারণ, ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ বৎসর গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনে ১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে।”

বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা।

বহু অক্ষপাত করিয়া, সূক্ষ্ম হিসাবানুসারে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের মধ্যে ১৩৩৩ বৎসর অন্তর নির্ণয় করিবার পরক্ষণেই বলা হইয়াছে ;—

“মহাভারতের বনপর্কে যখন ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে হইবে যে, ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্কবর্তী না হউন তাঁহার সমসাময়িক বটে। সভাপর্কে, ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্তমান থাকিলেও তখনও রাজ্যের নাম পরিবর্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ, রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন ছাড়াইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বন প্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষ অবস্থায় বোধযাত্রা বটে। তৎপরে কর্ণকর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, সুতরাং ভীমকর্তৃক কিরাত রাজ্য জয়। দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণকর্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। * * * “ক্রহা হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন” এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে, ষষাতির তৃতীয় পুত্র ক্রহ্যর অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর ষষাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৩৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্তমান, [মহাভারত আদিপর্কের সম্ভব পর্কান্তর্গত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ণ কর্তৃক শেষ বিস্তৃত বংশ তালিকা দেখ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪।৫ পুরুষের অন্তর (১৫০।১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্তব্য নহে। অতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারত মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সঙ্গত।”

বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠা।

ইহার পরে আবার বলা হইয়াছে ;—

“এ স্থলে বলা উচিত, ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।”

এখন প্রশ্ন—ইহার কোন্ কথা গ্রহণীয় ? নগেন্দ্রবাবু তাঁহার শেষ উক্ত

বিশ্বকোষে বিবৃত উক্তিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকা গণ্য, ঐতিহাসিক মর্যাদা বিবরণের আলোচনা।

প্রদান করিতে অসম্মত। সুতরাং তাঁহার হিসাবে ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, প্রকারান্তরে তাহাই তিনি সঙ্গত নির্দেশ মনে করেন। তিনি হিসাব ধরিবার কালে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের স্থায় প্রখ্যাতনামা রাজার নামোল্লেখ করিয়াও তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে গ্রহণ করিবার কি হেতু আছে বুঝা গেল না। যাহা হউক, এই হিসাবে যে তিনি মূলেই বিষম ভুল করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার

হিসাবে ত্রিলোচন হইতে ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে ১০৯ পুরুষ অন্তর ধরা হইয়াছে ; এতৎসহ সংযোজিত রাজ-বংশবলী আলোচনায় জানা যাইবে, কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্তন ১৩৫ স্থানীয় । সুতরাং এখানে পুরুষ সংখ্যায় ভুল অঙ্ক ধরা হইয়াছে । আবার, মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পরলোক গমনের যে সময় (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) ধরিয়া, যুদ্ধিষ্ঠির ও কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে ৪৯৬৯ বৎসর অন্তর নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাও ভ্রম-সঙ্কুল । মহারাজ ঈশানচন্দ্র ১২৭২ ত্রিপুরাক্ষের (১২৬৯ বঙ্গাব্দ) ১৭ই শ্রাবণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় গোলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । নগেন্দ্রবাবু এ বিষয় প্রমাদপূর্ণ হিসাব অবলম্বন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে ।

ভারত-সম্রাট যুদ্ধিষ্ঠির এবং ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন যে সমসাময়িক, এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না । ইহারা উভয়েই কলির প্রারম্ভকালের রাজা, ইহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে । * এখন (১৩৩৭ ত্রিপুরাক্ষ বা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে) কলির ৫০২৮ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে । সুতরাং মহারাজ ত্রিলোচনকে যুদ্ধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নির্ণয় করিতে হইলে বর্তমান সময়ে তাঁহার প্রাচীনত্ব ৫০২৮ বৎসর ধরা আবশ্যিক । ত্রিপুর বংশাবলীর পুরুষ সংখ্যার সহিত এই প্রাচীনত্বের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যুদ্ধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের সমসাময়িকতার কথা অসম্ভব বা কাল্পনিক নহে । ত্রিপুর-সিংহাসনের বর্তমান অধিষ্ঠাতা পঞ্চশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুর, মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্তন ১৩৮ স্থানীয় । † সাধারণতঃ বংশ-পর্ব্যায়ের হিসাবে তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণ্য করিয়া, সেই অনুপাতে প্রতি পুরুষে গড়ে ৩৩ বৎসর ধরা হয় । ত্রিলোচনের প্রাচীনত্ব ৫০২৮ বৎসরের সহিত রাজবংশীয় ১৩৮ পুরুষের গড়পরতা হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে, প্রতি পুরুষে (৫০২৮ ÷ ১৩৮ = ৩৬.৪) ছত্রিশ বৎসরেরও কিছু অধিক সময় নির্দ্ধারিত হয় । * কোন কোন স্থলে এই বংশে পুরুষ পরম্পরা-ক্রম ভঙ্গ করিয়া, রাজার ভ্রাতা কিম্বা নিকট সম্পর্কীত অন্য ব্যক্তিও রাজত্ব করিয়াছেন, প্রতি পুরুষের বয়স ৩৩ বৎসর স্থলে ৩৬ বৎসর দাঁড়াইবার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় । এরূপ অবস্থায়—“ত্রিলোচন ও যুদ্ধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না” এই মন্তব্য গ্রাহ্য হইতে পারে কি ?

মহাভারতে একমাত্র ঘোষণাত্মক বর্ণনায় ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, প্রাচ্যবিদ্যাৰ্ণব মহাশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । রাজসূয় যজ্ঞে কিরাত

* রাজমালা প্রথম লহরে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে (১৬১—১৭০ পৃষ্ঠা সঙ্গ্রহ) ।

† পশ্চাৎভাগে সন্নিবিষ্ট বংশ-পত্রিকা আলোচনায় জানা যাইবে, শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব হইতে মহারাজ ত্রিলোচন ৪৭ ও বর্তমান মহারাজ ১৮৪ স্থানীয় । সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে ১৩৮ পুরুষ অন্তর সাব্যস্ত হইতেছে ।

নরপতিগণের মধ্যে ত্রিপুরেশ্বর ছিলেন, এবং ভারত যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, ইহাও তিনি অনুমান করেন। মহাভারত নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে পূর্বেবক্তৃক তিন ব্যাপারেই ত্রিপুরেশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধ হইবে। এ বিষয় প্রথম লঙ্কায় আলোচিত হইয়া থাকিলেও এ স্থলে মহাভারতের শ্লোকগুলি পুনর্ব্বার প্রদান করা যাইতেছে। ঘোষণাত্ৰা উপলক্ষে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজয় সম্বন্ধে মহাভারতে পাওয়া যায় ;—

“বৎসভূমিং বিনির্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবতীম্ ।
মোহনং পতনং চৈব ত্রিপুরীং কোশলাং তথা ॥”

মহাভারত—কর্ণপর্ব, ২৫৩ অঃ, ১০ শ্লোক ।

ভারত-যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর, তদানীন্তর ভারত-সম্রাট দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভীষ্মকর্তৃক রচিত বৃহৎ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে ;—

“দ্রোণাদনন্তরং যত্তো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্ ।
মগধৈশ্চ কনিষ্কৈশ্চ পিশাটৈশ্চ বিশাম্পতে ॥
প্রাগ্জ্যোতিষাদনূপঃ কৌশল্যোহথ বৃহৎসলঃ ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥”

ভীষ্মপর্ব—৮৭ অঃ, ৮-৯ শ্লোক ।

রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বরের উপস্থিতি বিবরণ ত্রিপুরায় প্রখ্যাত প্রবাদ বাক্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এই সময় সম্রাট যুদ্ধিষ্ঠির ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সম্রাটের অনুজ্ঞামতে তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের সম্পাদিত সনন্দ ইত্যাদিতে “রাজধানী হস্তিনাপুর” লিপি করিয়া থাকেন, এই সকল প্রবাদ বাক্য অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কেবল প্রবাদ বাক্য নহে—ত্রিপুরার ইতিহাসেও তাহাই পাওয়া যায়। সংস্কৃত রাজমালায়, মহারাজ ত্রিপুরের বিবরণে উক্ত হইয়াছে ;—

“যুদ্ধিষ্ঠিরস্ত যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জিতঃ ।
রাজসূয়ে স গতবান যুদ্ধিষ্ঠির সমাদৃতঃ ॥”

ত্রিলোচনের হস্তিনা গমনের কথাও রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনায় ‘ত্রিপুরা’ নাম থাকিতে পারে না ; কারণ, তৎকালে রাজ্যের নাম ছিল ‘কিরাত’ বা ‘ত্রিবেগ’। ইহার কিয়ৎকাল পরে ‘ত্রিপুরা’ নাম হইয়াছে। ঘোষণাত্ৰার পূর্বেই যে রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল, মহাভারত, রাজমালা এবং রাজরত্নাকর আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। তৎকালে রাজপাট ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কপিলি নদীর সন্নিহিত স্থানে। মহাভারতের রাজসূয়যজ্ঞ বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;—

“যে পরার্কে হিমবতঃ সূর্য্যোদয় গিরৌনৃপাঃ ।
কার্ষ্যে চ সমুদ্রাস্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ মে ॥

ফলমুগাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্য বাসনঃ ।

ক্রুর শব্দাঃ ক্রুরকৃতস্তাংচ পশ্যামাহং প্রভো ॥” ইত্যাদি ।

মতাপর্ক—৫২ অঃ, ৮-৯ শ্লোক ।

এ স্থলে ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্তী সমস্ত রাজ্যবর্গের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । অতএব উক্ত নদের উপকূলবর্তী ত্রিবেগপতিও (ত্রিপুরেশ্বর) ইহার অন্তর্নির্দিষ্ট হইয়াছেন, এ কথা অতি সহজবোধ্য । বিশেষতঃ ত্রিপুরাধিপতির অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতিদ্বারাও তাঁহার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে । যে স্থানে ত্রিপুরেশ্বর উপস্থিত নাই, সেই স্থানে তাঁহার অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না ।

ত্রিপুর-বংশাবলী প্রসিদ্ধ দোষ-দুর্ঘট বলিয়াও কেহ কেহ ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন

নাই । কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

ত্রিপুর-বংশাবলীর

প্রতি আরোপিত

দোষ ও তাহার খণ্ডন।

“মহারাজ রামগঙ্গামণিকোর কৃত (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের) বংশাবলীতে

ক্রুর পুত্র ত্রিপুর লিখিত হইয়াছে । চক্রধ্বজ ঠাকুর বনামে বীরচন্দ্র যুবরাজ,

১৮৬৩ ইং ৯নং এবং রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মান বনামে মহারাজা বীরচন্দ্রমণিক্য বাহাদুর

১৮৭৪ ইং ৩৫নং দেওয়ানী মোকদ্দমায়, বিবাদী মহারাজ বাহাদুর স্ববংশের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী

উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও ‘ত্রিপুর পেছরে ক্রুর’ লিখিত রহিয়াছে ; কিন্তু জলতরঙ্গের

কৃপায় রাজবংশের যে অভিনব বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রুর ও ত্রিপূরের মধ্যে

কতগুলি কাল্পনিক নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে । একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস কল্পনা-জালে

জড়িত, তাহার উপর আবার এরূপ ঘৃণিত কার্য নিতান্তই বিস্ময়জনক ।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২ ভাঃ, ২ অঃ, ১৫ পৃঃ ।

মোকদ্দমায় যে সকল বংশ-পত্রিকা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য আপন আপন স্বত্ব স্থাপন করা । ত্রিপুর হইতে বংশধারা দর্শাইলেই সেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে । তৎপূর্ববর্তীগণের নামাবলী প্রদান করা নিস্প্রয়োজন বলিয়াই ঐ সকল বংশলতায় তাহা সংযোজিত হয় নাই । তবে, ত্রিপুর রাজ-পরিবার যে ক্রুরবংশীয়, তাহা দর্শাইবার নিমিত্তই ত্রিপূরের নামের পূর্বে ক্রুর নামটী সন্নিবেশিত হইয়াছে । এতদ্বারা “ক্রুর পুত্র ত্রিপুর” বলা হইয়াছে, এরূপ ধারণা করিবার কোন কারণ নাই । ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান আবশ্যিক । কৈলাস বাবুর রাজমালার যে পৃষ্ঠায় পূর্বেদ্বারা বাক্যাবলী মুদ্রিত হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠার পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত রাজমালা হইতে তিনিই উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

“যবাতি রাজার পুত্র ক্রুর নাম যার ।

তান বংশে নৈত্য রাজা চন্দ্রবংশ সার ॥

তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে ।”

রাজমালায় এইরূপ ভাবাপন্ন উক্তি আরও পাওয়া যায়, তাহার একটী এই ;—

“ক্রুরবংশে নৈত্য রাজা কিরাতনগর ।

অনেক সহস্র বর্ষ হইল অমর ॥

ষট্‌কাল পরে তার পুত্র উপজিল ।
ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল ॥”

প্রথম লহর—দৈত্য খণ্ড ।

এই সকল বাক্যদ্বারা পরিষ্কার জানা যাইতেছে, দ্রুহ্যর বংশে দৈত্যরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিপুর তাঁহার পুত্র । সুতরাং ত্রিপুর যে দ্রুহ্যর পুত্র নহেন এবং দ্রুহ্য ও ত্রিপূরের মধ্যে যে আরও বংশধর ছিলেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় কি ? কৈলাস বাবু এই সকল বাক্য জানিয়া এবং নিজে উদ্ধৃত করিয়াও কেন যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা বুঝা দুষ্কর । আমরা দেখিতেছি, পূর্বেবাল্লরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বংশ বর্ণন করা ত্রিপূরের প্রাচীন প্রথা । পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে রচিত সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“দ্রুহ্যরাজ সুতোজাঃ ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ ।

তমোগুণ সমাযুক্ত সর্ক দৈবাত গর্কিঃ ॥”

এ স্থলে ত্রিপুরকে দ্রুহ্যর সূত বলা হইয়াছে । এই ‘সূত’ শব্দের দ্বারা পুত্র না বুঝাইয়া বংশধর বুঝান হইয়াছে । মোকর্দ্দমায় উপস্থিত করা পূর্বেবাল্ল বংশ-পত্রিকা ইহারই অনুস্মৃতিতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয় । রাজরত্নাকরে বর্ণিত বংশানুক্রম এবং আমাদের পূর্বে কথিত সময়ের সহিত পুরুষ সংখ্যার হার আলোচনা করিলে বংশপত্রের প্রতি কোন ক্রমেই ‘প্রক্ষিপ্ত’ দোষারোপ করা যাইতে পারে না ।

আর একটা বিষয়ও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য । মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার বিরুদ্ধে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী একটি সামাজিক দল গঠিত হইয়াছিল । সেই দলের প্রকাশিত “সাময়িক সমালোচনা” নামক পুস্তিকার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে ;—

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্বে রাজা মুচুং, মাচুং, খাহাম, দানকুরু দা, কালাত্র দা প্রভৃতি ত্রিপুরার রাজগণের নাম গুলিতেও পার্কীর লিখা মনে হয় ।”

যাঁহারা সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন এবং উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া, রাজ-পরিবারকে গ্লানি-লিপ্ত করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে । রাজমালা প্রথম লহরের পূর্বেভাবে দেখান হইয়াছে, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে তদ্দেশে হালাম জাতির প্রাধান্য ছিল ; এই কারণে ত্রিপুর-দরবারে হালাম ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ স্থানীয় রীতি নীতি সর্কত্রই সমাজ বা বংশবিশেষের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । এই প্রভাব অধিবাসীবৃন্দের নাম এবং উপাধির উপরও সংক্রামিত হয় । ত্রিপুর-বংশাবলী নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহার প্রথম ও শেষভাগে (রাজবংশ সুন্দরবনে বঙ্গের সংশ্রবে থাকাকালে এবং কিরাতদেশে আগমনের পর, বঙ্গদেশের সহিত পুনঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সময় হইতে) সকলেরই অর্গ্য-সমাজ-সম্মত নাম পাওয়া যায় । মধ্যভাগে (বঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকাকালে) অর্গ্য নামের সহিত এক একটি পার্শ্বভাষা-জাত উপনাম সংযোজিত

ছইয়াছিল; যথা—হরিহর—(মুঢং ফা), চন্দ্রশেখর—(মাইচোঙ্গ ফা) ইত্যাদি। ইহা স্থানীয় প্রভাবজনিত ফল। * ইহাতে দোষের কি আছে? বরং এতদ্বারা বংশ-পত্রিকার অকৃত্রিমতাই প্রমাণিত হইতেছে। বংশাবলীর মৌলিকতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে, তাহাতে উল্লিখিত পার্বত্য নামগুলির গন্ধও পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

ত্রিপুর রাজ-বংশের অতীত যেমন গৌরবাঘিত, তেমনি উজ্জ্বলতর ছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজকুলের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা বর্তমান কালে অসম্ভব হইয়াছে, কিন্তু ত্রিপুর ইতিহাসের ধারা কোন কালেই বিচ্ছিন্ন কিম্বা অত্মপি বিনষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ মহাভারতের সময় হইতে একই বংশের হস্তে অক্ষুণ্ণ ভাবে রাজ্যের আধিপত্য থাকিবার নিদর্শন স্থলে একমাত্র ত্রিপুরার নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে; এরূপ প্রাচীন রাজবংশ দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মহর্ষি কপিল স্বয়ং শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যে বংশকে ধন্য করিয়াছেন—সগরদ্বীপস্থ দণ্ডি-সমাজ যে বংশের পৌরোহিত্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—প্রাচীন কাল হইতে সেই সকল মহাপুরুষের দ্বারা এবং পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যে বংশের বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেই বংশের বংশ-পত্রিকার উপর কটাক্ষ করা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কার্য বলা যাইতে পারে না। অতীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইয়া, আমরা ভবিষ্যৎকে দিন দিন উচ্ছ্বসন এবং হেয় করিয়া তুলিতেছি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইলে, ভবিষ্যতের গঠন কার্য কিছুতই সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না।

এ বিষয় লইয়া আর কথা বাড়াইব না। ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের নামের ধারাবাহিক এক তালিকা প্রথম লহরে প্রদান করা হইয়াছে। এবার তাঁহাদের শাখা প্রশাখার বিবরণসহ একটী পূর্ণ বংশ-পত্রিকা দেওয়া গেল। রাজমালায় সন্নিবেশিত নামাবলী, প্রাচীনকাল হইতে রক্ষিত বংশ-পত্রিকা, স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রচারিত শ্রীমন্তাগবত, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সংগৃহীত রাজমালা, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত শ্রীহট্টের ইতিহাস ও বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত বংশাবলী, রাজসরকার সংস্কৃত মোকদ্দমা সমূহে উপস্থিত করা বংশলতা বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে; এবং স্বয়ং অনুসন্ধান দ্বারা বিবরণ সংগ্রহপূর্বক বংশ-পত্রিকা পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত পক্ষে যত্নের ক্রটি ঘটে নাই। এই কার্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার এবং সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ববর্তী রাজ্যবর্গের শাখা প্রশাখার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। বর্তমানকালে তাহার উদ্ধারসাধন নিতাস্তুই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও পূর্ণ বা নিভুল হইয়াছে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে না।

* রাজমালা—প্রথম লহর, ২১/০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুর-বংশাবলী ।

(নামের বামপার্শ্বের অঙ্ক রাজগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক)

১। চন্দ্র ।	১৭
২। বৃধ ।	১৮। পারিষদ ।
৩। পুরুরবা । *	১৯। অরিজিৎ ।
৪। আয়ু ।	২০। সুজিৎ (অসুজিৎ) ।
৫। নহষ ।	২১। পুরুরবা (২য়) ।
৬। ষষাতি ।	২২। বিবর্ণ ।
৭। ক্রত্ব্য । †	২৩। পুরু সেন ।
৮। বক্র ।	২৪। মেঘ বর্ণ ।
৯। সেতু ।	২৫। বিকর্ণ ।
১০। আনন্ত (আরক বা আরদ্বান) ।	২৬। বসুমান ।
১১। গাক্কার ।	২৭। কীর্ত্তি ।
১২। ধর্ম্ম (ঘর্ম্ম) ।	২৮। কনীয়ান ।
১৩। ধৃত (যৃত) ।	২৯। প্রতিশ্রবা ।
১৪। দুর্শ্বদ ।	৩০। প্রতিষ্ঠ ।
১৫। প্রাচেতা ।	৩১। শক্রজিৎ (শক্রজিৎ) ।
১৬। পরাচি (শত ধর্ম্ম) ।	৩২। প্রতর্দন । ‡
* ১৭। পরাবসু ।	৩৩। প্রমথ ।

* ইনি পিতা কর্তৃক প্রয়াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থান বর্তমান কালে 'ঝুনী' নামে পরিচিত।

† ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও নির্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরদ্বীপস্থিত কপিলাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন।

‡ ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে কাছাড়ে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন। ইহার প্রযত্নেই কিরাটদিগকে জয় করিয়া বর্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

৩৩	৪৮
৩৪। কলিন্দ।	৪৯। তয়দাক্ষিণ (তৈদাক্ষিণ)।
৩৫। ক্রম (ক্রথ)।	৫০। সুদাক্ষিণ।
৩৬। মিত্রারি।	৫১। তরদাক্ষিণ।
৩৭। বারিবর্হ।	৫২। ধর্ম্যতরু (ধর্ম্যতর)।
৩৮। কাম্মুক।	৫৩। ধর্ম্যপাল।
৩৯। কলিজ (কালাজ)।	৫৪। সমর্ম্মা (সুধর্ম্ম)।
৪০। ভীষণ।	৫৫। তরবজ।
৪১। ভাম্মুগিত্র।	৫৬। দেবাজ।
৪২। চিত্রসেন (অঘ চিত্রসেন)।	৫৭। নরাজিত।
৪৩। চিত্ররথ।	৫৮। ধর্ম্মাজদ।
৪৪। চিনায়ুধ।	৫৯। রুদ্ভাজদ।
৪৫। দৈতা।	৬০। সোমাজদ (সোনাঙ্গদ)।
৪৬। ত্রিপুর।*	৬১। নৌযুগরায় (নৌগযোগ)।

৪৬
৪৭। ত্রিলোচন।†

দৃকপতি বা বীরসেন (কাছাড়ের রাজা)। ৪৮। দাক্ষিণ। দক্ষ। দ্রুমায়ু। দ্রবীণ। দৃষ্টলো। ভৃগু।

৪৭

দুর্ধর। দ্রুহ। দুস্মায়ু। দৈবিরি। দম্পা

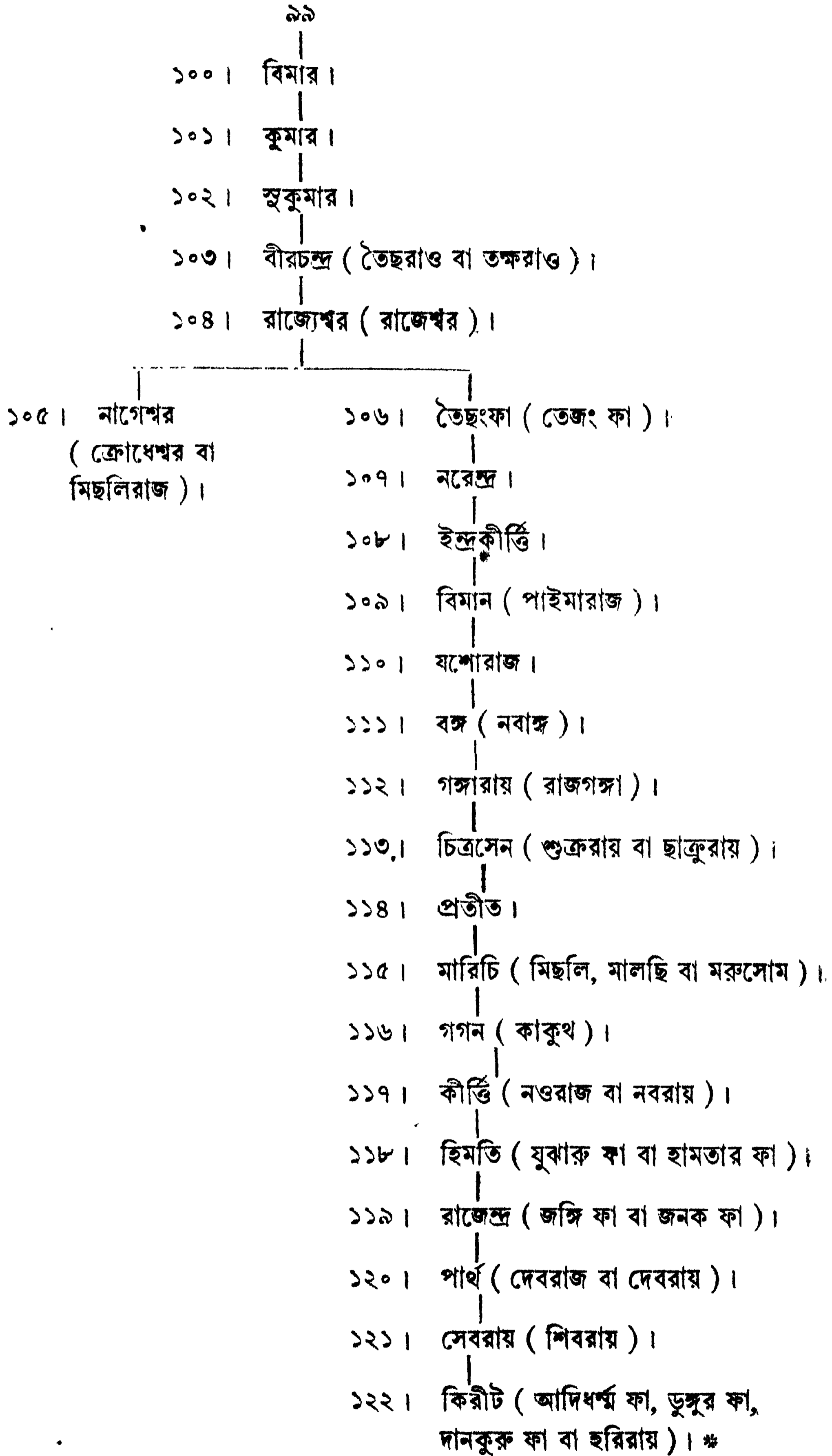
* ইহার সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সূদৃঢ় হইয়াছে ; এবং ইনিই রাজ্যের 'ত্রিপুরা' নামের প্রবর্তক।

† ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃকপতি কাছাড়ে মাতামহের রাজ্যলাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন।

৬১	৭৮
৬২। তরজুঙ্গ।	৭৯। ত্রিপলি (তরফগাই)।
৬৩। রাজধর্ম্মা (তররাজ)।	৮০। সুগম্ভ।
৬৪। হামরাজ।	৮১। রূপাবম্ভ (শ্রেষ্ঠ)।
৬৫। বীররাজ।	৮২। তরহোম (তরহাম)।
৬৬। শ্রীরাজ।	৮৩। হরিরাজ (খা হাম)।
৬৭। শ্রীমান (শ্রীমম্ভ)।	৮৪। কাশীরাজ (কতর ফা)।
৬৮। লক্ষ্মীতরু।	৮৫। মাধব (কালাতর ফা)।
৬৯। রূপবান্ (তরলক্ষ্মী)।	৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা)।
৭০। লক্ষ্মীবান্ (মাইলক্ষ্মী)।	৮৭। গজেশ্বর।
৭১। নাগেশ্বর।	৮৮। বীররাজ (২য়)।
৭২। যোগেশ্বর।	৮৯। নাগেশ্বর (নাগপতি)।
৭৩। নীলধ্বজ (ঈশ্বর ফা)।*	৯০। শিখিরাজ (শিফরাজ)।
৭৪। বসুরাজ (রঙ্গখাই)।	৯১। দেবরাজ।
৭৫। ধনরাজ ফা।	৯২। ধূসরাজ (দুরাশা বা ধরাজেশ্বর)
৭৬। হরিহর (মুচং ফা)।†	৯৩। বারকীর্ত্তি (বীররাজ বা বিরাজ)
৭৭। চন্দ্রশেখর (মাইচোঙ্গ ফা)।	৯৪। সাগর ফা।
৭৮। চন্দ্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ)।	৯৫। মলয়চন্দ্র।
৯৬। সূর্যনারায়ণ (সূর্যরায়)।	
৯৭। ইন্দ্রকীর্ত্তি (আচঙ্গ ফগাই বা উত্তঙ্গ ফণী)।	৯৮। বীরসিংহ (চরাচর)।
	৯৯। সুরেন্দ্র (হাচুং ফা বা আচং ফা)।

* ইহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

† এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেক হালাম ভাষাজাত এক একটা নাম গ্রহণ করিতেন। বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির প্রভু ছিল ; রাজবংশের হালাম ভাষার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবার ইহাই কারণ।



১২২

১২৩। .রামচন্দ্র (খরুং ফা বা কুরুঙ্গু ফা)।

১২৪। নৃসিংহ
(ছেংফণাই বা সিংহ ফণী)।

১২৫। ললিত রায়।

১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা)।

১২৭। কমল রায়।

১২৮। কৃষ্ণদাস।

১২৯। যশোরাজ (যশ ফা)।

১৩০। উদ্ধব (মোচং ফা)।

১৩১। সাধু রায়।

১৩২। প্রতাপ রায়।

১৩৩। বিষ্ণুপ্রসাদ।

১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর)।

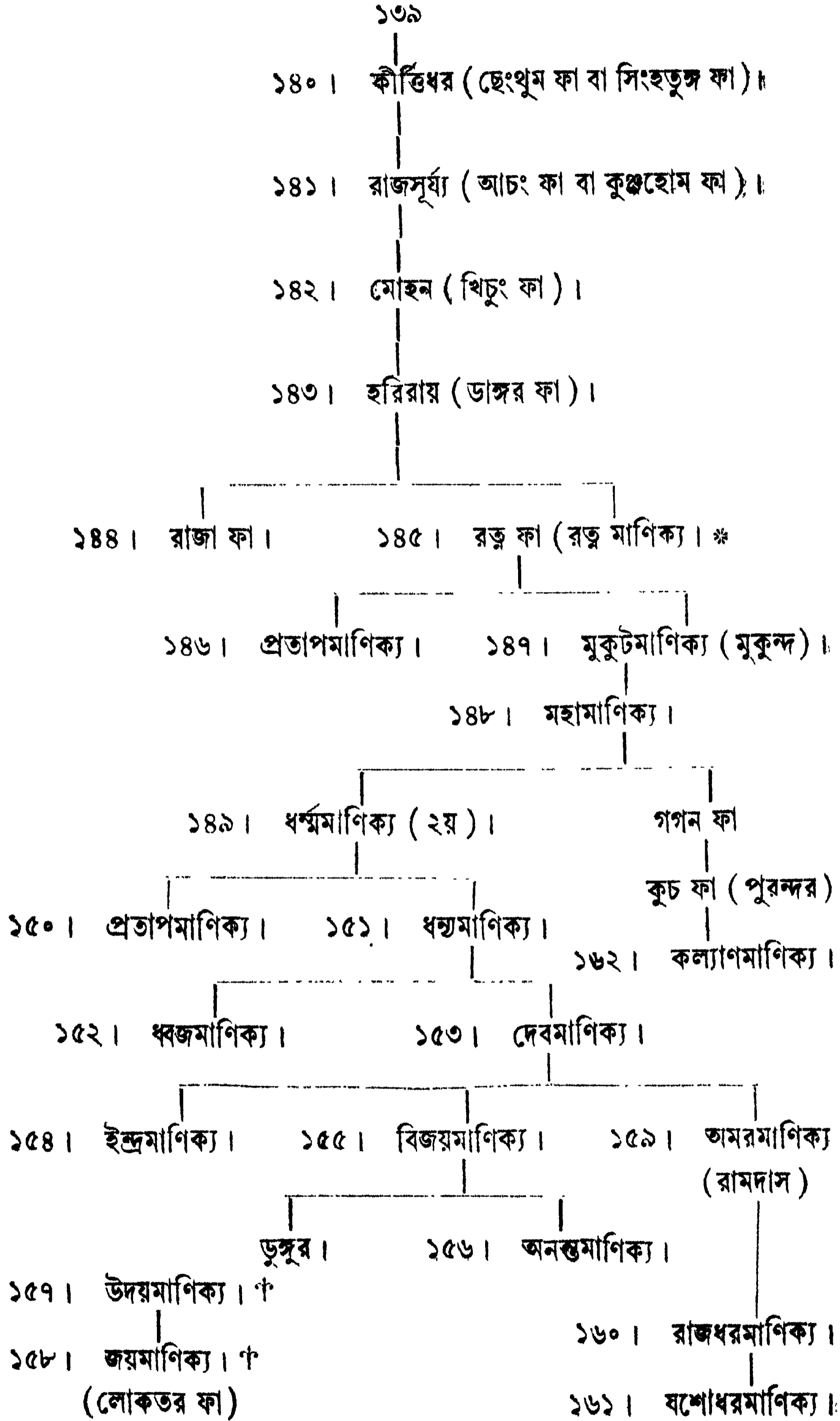
১৩৫। বীরবাহু।

১৩৬। সত্ৰাট।

১৩৭। চম্পকেশ্বর (চাম্পা)।

১৩৮। মেঘরাজ (মেঘ)।

১৩৯। ধর্মধর (ছেংকাছাগ)।



* এই সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ (মাণিক্য) উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহার পরবর্তী কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির 'ফা' উপাধি পাওয়া যায়।

† ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজা ভিন্ন বংশীয়।

মুদ্রাদির সাহায্যে রাজত্ব কালের আলোচনা ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত রাজগণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থভাগে
ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব- বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে (১৭৪—১৮৪ পৃষ্ঠা) । এই লহরের
কালের আলোচনা । প্রারম্ভে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের নাম পাওয়া যাইবে । ১৩৫৩
হইতে ১৩৮৪ শক পর্য্যন্ত ইঁহার শাসনকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে
রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থের উক্তি ও তাম্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যে প্রমাণ প্রয়োগের
চেষ্টার ক্রটি হয় নাই । কিন্তু তাঁহার সময়ের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়,
তৎ সাহায্যে প্রমাণ উপস্থিত করিবার সুবিধা ঘটিল না ।

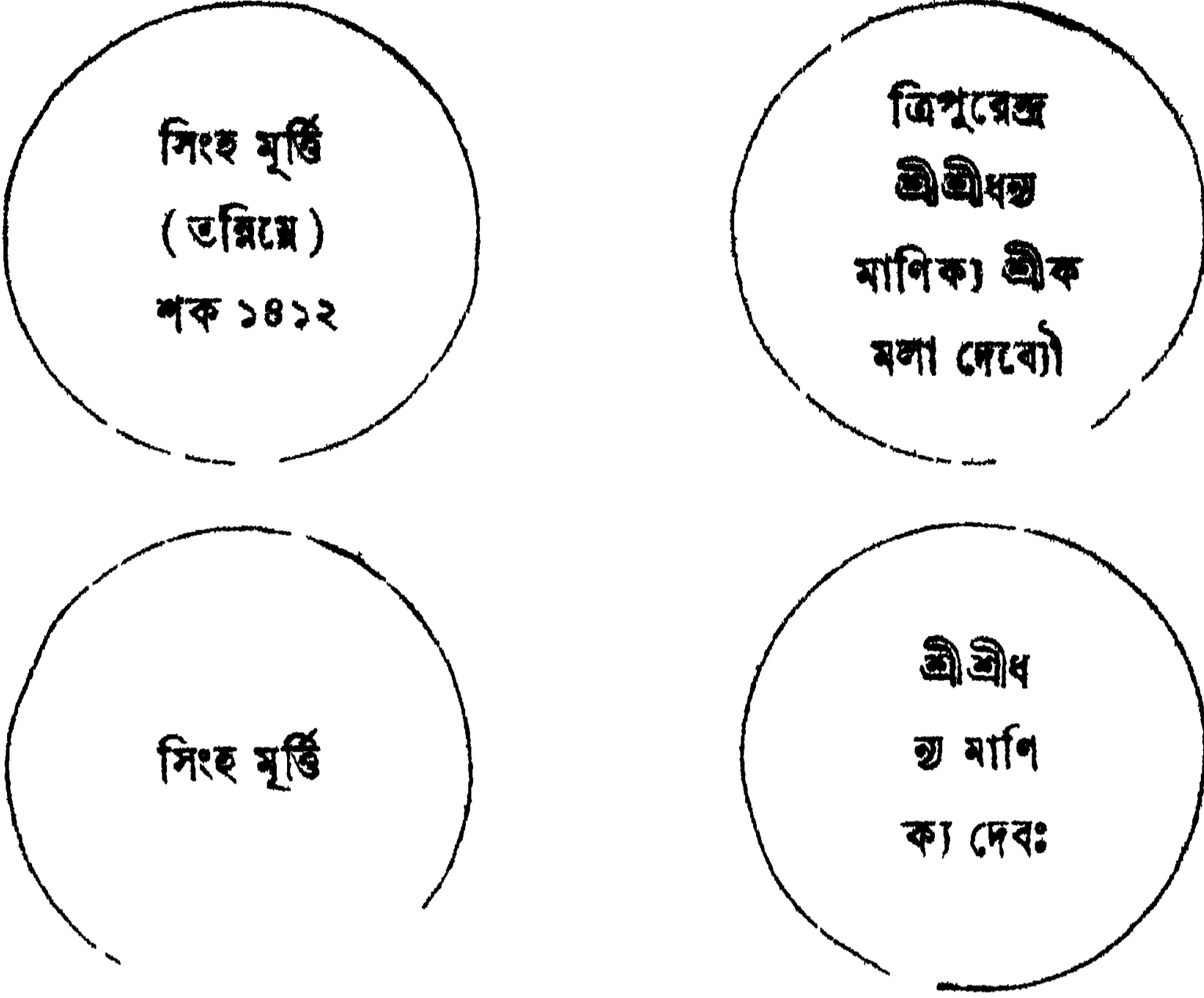
ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র, প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই ;
প্রতাপমাণিক্যের সুতরাং তাঁহার শাসন সময়ের প্রমাণোপযোগী মুদ্রার নিদর্শন
রাজত্বকাল সম্বন্ধীয় পাইবার আশা নাই ।
কথা ।

ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ
ধর্ম্মমাণিক্যের হয় অপ্রচুর নহে । তিনি ১৩৮৫ শক হইতে ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত
শাসনকাল । রাজত্ব করিয়াছেন । তাঁহার শাসনকালের একুশটি রৌপ্য মুদ্রা
পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সতরটি ১৪১২ শকের, একটি ১৪১৯ শকের, একটি
১৪২৮ শকের, এবং দুইটি অক্ষয় বিহীন । ইঁহার প্রথম রাজ্যাঙ্কের (রাজ্যাভিষেক
কালের) সময়জ্ঞাপক নির্ভরযোগ্য মুদ্রা অত্যাধিক আবিষ্কৃত হয় নাই । তাহা না
পাইলেও হস্তগত মুদ্রাগুলি যে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত প্রমাণের পরিপোষক, তাহা সহজেই
প্রতীয়মান হইবে । শকাঙ্ক যুক্ত মুদ্রার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি (১৪১২ শকের
মুদ্রিত) এবং শকাঙ্কবিহীন একটি মুদ্রার প্রতিকৃতি এস্থলে প্রদান করা হইল ।
শেষোল্ল মুদ্রাটি প্রথমোল্ল মুদ্রার পূর্ব্ব কি পরবর্ত্তী কালের মুদ্রিত, শকাঙ্কের অভাবে
তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা দেখা যায় না । তবে, একটি কারণে শকাঙ্কবিহীন মুদ্রাই
অধিক প্রাচীন (রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রিত) বলিয়া মনে হয় । ত্রিপুরার মুদ্রায়
রাজার নামের সহিত পট্ট-মহিষীর নাম উৎকীর্ণ হওয়া চিরন্তন কৌলিক প্রথা ।
এমন কি, যে সকল ত্রিপুরেশ্বরের একাধিক মহিষী ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন
নামের সহিত প্রত্যেক মহিষীর নামযুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন ।
আলোচ্যস্থলে দেখা যাইতেছে, '১৪১২ শক' আঙ্কিত মুদ্রায় মহারাজীর নাম সংযুক্ত
হইয়াছে, কিন্তু শকাঙ্কবিহীন মুদ্রায় একমাত্র রাজার নাম পাওয়া যায় । রাজমালা
আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ধর্ম্ম রাজত্ব প্রাপ্তির পরে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন । * সুতরাং রাজ্যাভিষেক কালে অবিবাহিত ছিলেন বলিয়াই তৎ সময়ের

* "এ বলিয়া মন্ত্রী সবে স্নান করাইল ।

সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল ॥

মুদ্রায় মহারাণীর নাম মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা বাইতেছে। এই কারণে উক্ত মুদ্রাকেই প্রথম মুদ্রিত বলিয়া নির্ধারণ করা সঙ্গত মনে হয়। উক্ত উভয়বিধ মুদ্রায় যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল।



ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস, ত্রিপুরেশ্বরগণ রাজ্যাভিষেক সময়ে ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধীয় একবার মাত্র মুদ্রা প্রস্তুত করেন, ঐ সময়ে মুদ্রার যে ছাঁচ (Die) সাধারণ কথা। প্রস্তুত হয়, সমগ্র রাজত্ব কাল তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ধারণামূলে তাঁহারা যখন যে মুদ্রা প্রাপ্ত হন, তাহাতে অঙ্কিত শকাব্দই রাজার রাজ্যারম্ভের কাল বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ ধারণা। ইতিপূর্বে দেখা গেল, ধনুমাণিক্যের শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছাঁচে মুদ্রিত চারি প্রকারের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরগণ কোনও নূতন প্রদেশ স্বয়ং জয় করিলে, তীর্থ দর্শন করিলে, কিম্বা স্মরণীয় কোনও কার্য করিলে, তদ্বিবরণ উল্লেখ নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে কালে মুদ্রা প্রস্তুত করাকে “জরপ মারা”, “মোহর মারা” ইত্যাদি বলা হইত। ধনুমাণিক্য, পূর্বেবাস্ত চতুর্বিধ মুদ্রার অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেই ঘটনার

লোকে ধনু বলিয়া তখনে কহিলেক ।
 শ্রীধনুমাণিক্য রাজা হৈল অভিষেক ॥
 বড় সেনাপতি দিল আপনার কত্যা ।
 মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধনু ॥”

রাজমালা—২য় লহর, ৮ পৃষ্ঠা ।

এতদ্বারা জানা বাইতেছে, মহারাণী ধনু সিংহাসন লাভের পরে এবং ১৪১২ শকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্বে কোনও এক সময় মহারাণী কমলা মহাদেবীকে পট্ট-মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।



মহারাজ ধর্মপালিকোর ১৪১২ শকের মুদ্রা।



মহারাজ ধর্মপালিকোর শকবিহীন মুদ্রা

স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ মোহর প্রচলন করিয়াছিলেন। * এই মোহর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। প্রথম লহর সম্পাদন কালে মহারাজ রত্নমাণিক্যের ১২৮৮ শকে উৎকীর্ণ দুইটি মাত্র মুদ্রার সংবাদ অবগত ছিলাম। তৎপর তাঁহার শাসন কালের আরও ২০টি মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১২৮৬ শকের, ১২৮৮ শকের ও ১২৮৯ শকের নিশ্চিত মুদ্রা আছে। বিজয়মাণিক্য সুবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘাট) বিজয়ের, পদ্মানদীতে স্নানের ও লক্ষ্যা-স্নানের স্মৃতি রক্ষার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সুতরাং ত্রিপুরার মুদ্রা পাইলেই তাহাকে রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহা করিতে গেলে রাজগণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিধম ভ্রম উৎপাদিত হইবে।

ধ্বজমাণিক্যের পরবর্তী ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের মুদ্রা

ধ্বজমাণিক্য, দেব-
মাণিক্য ও ইন্দ্র-
মাণিক্যের বিবরণ।

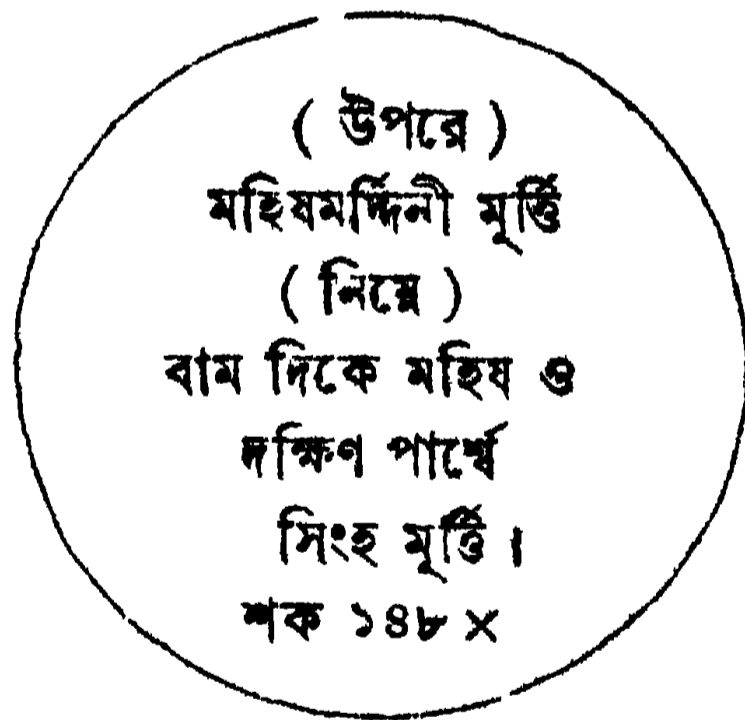
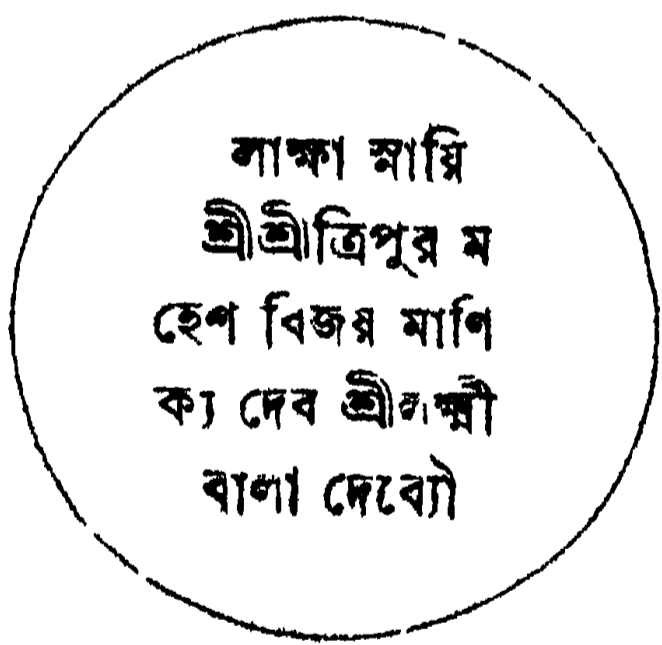
অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থভাগে আলোচিত বিবরণের অতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ শকে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক

বিজয়মাণিক্যের
শাসনকাল।

কালের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, ইনি সুবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘাট) জয় ও ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া

এবং লক্ষ্যা ও পদ্মা নদীতে অবগাহনান্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৪৮০ ও ১৪৮১ শকের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত মুদ্রাটির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল। এই মুদ্রা লক্ষ্যা নদীতে স্নানোপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল।



শকাঙ্ক — ১৪৮ x স্থলে x চিহ্নটি শূণ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপুরায় অঙ্কপাতের এই প্রথা বহু প্রাচীন। দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী ০ শূণ্য স্থলে ফাঁক রাখা হইত এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শূণ্য থাকিলে তৎ পরিবর্তে x চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

- তার পরে শ্রীধ্বজমাণিক্য নৃপবর।
- চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর ॥
- চৌদ্দশ পঁয়ত্রিশ শকে সমর জিনিল।
- চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥

রাজমালা—২য় লহর, ২২ পৃষ্ঠা।

এতদ্বিষয়ক বিবরণ গ্রন্থভাগে (৯৮—৯৯ পৃষ্ঠা) বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে ।
প্রাচীন কালে '৮' অঙ্কের পরিবর্তে 'x' চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, কিন্তু
'০' জ্ঞাপক ও '৮' অঙ্ক জ্ঞাপক চিহ্ন ঘরের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে ।

উপরোক্ত মুদ্রার সাহায্যে জানা যাইতেছে, বিজয়মাণিক্য ১৪৮০ শকে
বঙ্গাভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন । এই অভিযানোপলক্ষে লক্ষ্যায় স্নান করিয়া
মুদ্রা প্রস্তুতের কথা রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে । *

বিজয়মাণিক্যের পরবর্তী অনন্তমাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের মুদ্রা
বিজয়মাণিক্যের পাওয়া যায় নাই । এই কারণে গ্রন্থভাগে বিবৃত বিবরণ ব্যতীত
পরবর্তী রাজগণ । ইহাদের শাসনকাল সম্বন্ধীয় নির্ভরযোগ্য অন্য বিবরণ সংগ্রহ
করিবার সুবিধা ঘটিল না ।

স্বাভিন্য রক্ষার উদ্ভব ।

রাজ্য রক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিজয়ার্থ ত্রিপুরেশ্বরগণ সর্বদা যত্নবান ছিলেন ।
স্বাধীনতা রক্ষা ও এক রাজার সময়ে রাজ্যের কোন অংশ হস্তচ্যুত হইলে, পরবর্তী
রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা । ভূপতিগণ সেই ক্ষতি উদ্ধারের নিমিত্ত বারম্বার আগ্রাণ চেষ্টা
করিয়াছেন, এবং কৃতকার্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চেষ্টার বিরাম ঘটে নাই । রাজপুত্র,
রাজভ্রাতা প্রভৃতি বীরেন্দ্রবর্গ রাজা এবং রাজ্যের কল্যাণার্থ অকাতরে জীবন
বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন । কোন কোন রাজ মহিষীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা
হইয়া রাজ্যের স্বার্থ ও কুলমর্যাদা রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে । তাঁহাদের এই অদম্য
উদ্ভব এবং স্বাভিন্য রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রশংসনীয় ।

সিংহাসনাক্রম পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিদূরীত করিয়া, অসঙ্গত উপায়ে
রাজ্য লাভের প্রয়াসী রত্ন ফা, মুসলমান-শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়
সিংহাসন অধিকার পূর্বক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কু-দৃষ্টান্তের
বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার বিষময় ফলে ত্রিপুরাকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত
হইতে হইয়াছে । উত্তরপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই রত্ন ফা এর প্রদর্শিত পথ
অনুসরণ দ্বারা রাজ্যের শক্তি এবং মান-মর্যাদার লাঘব ঘটাইয়াছেন, রাজ্যময়
অশান্তি-উপদ্রব ঘটাইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের বিস্তার ক্ষতি করিয়াছেন । রত্ন ফা মুসলমান
শক্তির কৃপায় অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিংহাসন লাভ করিলেন, মুসলমান
সম্রাট কিম্বা শাসনকর্তাকে বহুমূল্য হস্তী এবং সুদুল্লভ ভেক-মণি উপঢৌকন প্রদান

* ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ মারিল ।

ধ্বজ ঘাট বিজয়ী বলি মহরে লিখিল ॥

তীর্থ রাজ স্নান পরে লক্ষ্যায় গমন ।

লক্ষ্যায় স্নান করি জরপ মারিল রাজন ॥ ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় লহর, বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৫ পৃষ্ঠা ।

দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া, 'মাণিক্য' উপাধিলাভে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন, কিন্তু অন্যায় স্বার্থের বশবর্তী হইয়া, পূর্বপুরুষগণের কঠোরজিত অমূল্য স্বাধীনতা-মণিকে কত ম্লান করা হইল, তাহা তিনি বুঝিলেন না। এই ঘটনা হইতেই ত্রিপুরার অবস্থা বিপর্যয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ইহার পরেও ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাত সহ করিয়া, স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। রাজমালা প্রথম রাজ্যের সীমা পরিবর্তন বিষয়ক বিবরণ। লাহরের কালে রাজ্যের যে সীমা নির্ধারিত ছিল, রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে বারম্বার তাহার পরিবর্তন ঘটয়াছে। কোন কোন প্রদেশ পুনঃ পুনঃ ত্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু কোন সময়েই হত-ভূভাগ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ক্রটি ঘটে নাই। মহারাজ ধন্যমাণিক্য, মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসারি, বরদাখাত ও খণ্ডল প্রভৃতি ভূ-ভাগ এবং শ্রীহট্টের হত অংশ পুনর্বার অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লুসাই প্রভৃতি কুকি প্রদেশ, টেট্টগ্রাম এবং রসাজে (আরাকান) ত্রিপুরার আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। দেবমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য বিজয় দ্বারা রাজ্যের নবোদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বিজয়-মাণিক্য গঙ্গাভীর পর্যন্ত অধিকার করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। খাসিয়া, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম এবং ভূষণা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইছামতী ও পদ্মা নদীর তীরে এবং অন্যান্য নানা স্থানে তাঁহার সেনানিবাস স্থাপিত হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময় রাজ্যের সীমা কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, সঙ্গীয় মানচিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই আধিপত্য অধিক সময় স্থায়ী হয় নাই, পাঠান জাতির অভ্যুত্থানের সময় হইতে উত্তরোত্তর অনেক প্রদেশ ত্রিপুরার কুক্ষিচ্যুত হইয়াছে।

মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুর শক্তির যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে, তন্মধ্যে ধন্যমাণিক্য ও গোড়েশ্বর হোসেন শাহ। গোড়েশ্বর হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে দুইবার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া হোসেন শাহ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি রিয়াং জাতীয় রায়কাচাগ ও রায়কছম নাগক সহোদর দ্বয়ের বাহুবলই তৎকালে ত্রিপুরার প্রধান সম্বল এবং সুদৃঢ় শক্তি মধ্যে পরিগণিত ছিল। রায়কাচাগ এরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা ভ্রমে 'চয়চাগমাণিক্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি হোসেন শাহের পরাজিত সেনাপতি হইতে একটা তোপ ও একটা ধাতু নির্মিত পতাকা বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোপটা লম্বায় ৯'-২" ইঞ্চি। ইহার অগ্রভাগের বেড় ২'-৮" ইঞ্চি এবং গোড়ার বেড় ২'-১০" ইঞ্চি। মুখের ব্যাস ১১" ইঞ্চি। গুলি নির্গমনের রক্তের ব্যাস ৩" ইঞ্চি। তোপটা সুদীর্ঘকাল উদয়পুরে প্রাচীন গারদের সন্নিহিত জঙ্গলে পতিতাবস্থায় ছিল, স্বর্গীয় মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের সময় তাহা আগরতলায় নীত হয়। বর্তমান সময় ইহা উজ্জয়ন্ত-প্রাসাদের সম্মুখে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই তোপের গোড়া হইতে ৪৯ ইঞ্চি উপরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র এক খণ্ড পিত্তলের পাতে পারস্য ভাষায় কতকগুলি বাক্য লিখিত ছিল, এখন তাহার কয়েকটি অক্ষর মাত্র দৃষ্ট হয়, অধিকাংশ লেখা ক্ষয় হইয়া অপাঠ্য এবং কতক সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়াছে। সুতরাং কি লেখা ছিল উদ্ধার করা অসাধ্য হইয়াছে।

বিজিত পতাকাটি পিত্তল নির্মিত এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর সংস্থাপিত। ইহার দুই পার্শ্বে কতিপয় ঘুঙ্গুর আছে। এবং ইহাতে আরবী ভাষায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি খোদিত আছে।

উপরের চূড়ায় লিখিত—“লাইলাহা ইলাল্লা হো মহম্মদের রসুল্লাল্লা।

দক্ষিণদিকের ডানায় লিখিত—“ইয়া আলি, ইয়া আলি, ইয়া আলি।

বামদিকের ডানায়—“আল্লা ইয়া ফাত্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো।

বক্ষস্থলে লিখিত—“লাইলাহা ইলাল্লা।

ইহার নিম্ন ভাগে সনের অঙ্ক আছে, কেহ কেহ এরূপ বলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহ ভাবে পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই। এবিষয় পুনরালোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই পতাকা সেনাপতি রায়কাচাগ্, ধন্যমাণিক্য সমক্ষে উপস্থিত করায় মহারাজ হৃষ্টচিত্তে আদেশ করিলেন—“পতাকাটি তোমার বিজিত, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। বিজয় গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ ইহা পুরুষামুক্রমে ধারণ করিও।” তদবধি কাল পরম্পরা রিয়াং জাতীয় রায় (প্রধান সরদার) গণ অন্যান্য রাজদত্ত চিহ্নের সহিত ইহা ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রিয়াং ভাষায় এই পতাকাকে “তাউফিংক্রাং” (ময়ূরের ডানা) বলা হয়। বস্তুটি কিয়ৎপরিমাণে ময়ূরের আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

হোসেন শাহের তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণের কথা রাজমালায় সন্নিবিষ্ট হয়
হোসেন শাহের তৃতীয় আক্রমণ।
নাই। এই আক্রমণে রাজ্যের কিয়দংশ মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা এরূপ বুঝা যায়। নিম্নে একটা প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুবিজ্ঞ কানিংহাম সাহেব সুবর্ণগ্রামের মসজিদ গাত্রস্থ আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ
সুবর্ণগ্রামের শিলালিপি।
একখণ্ড শিলালিপির উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে খোদিত বাক্য আলোচনার জানা যায়, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের শাসন কালে উক্ত মসজিদের নির্মাতা, মুয়াজ্জমাবাদের উজীর খওয়াসু থা ত্রিপুরার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই লিপির ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থভাগে (১২৮ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন অংশ বাদ পড়ায়, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় পুনঃ প্রদত্ত হইল।

“This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the Kingdom of Solomen, Alauddunya waddin Abbul Muzaffor Husain Shah. May God perpetuate his Kingdom and rule, and elevate his condition and dignity, and render, in every minute his proof Victorious, by the great and noble Khan, Khawas Khan, Governor of the land of Tiparah and Vazir of the District in Muazzamabad,—may God preserve him in both worlds. Dated 2nd. Rabi 11.919 (7th June 1513).”

On a new King of Bengal—J. A. S. B—Vol. XII, 1872 Pt. I,
P P. 333—34.

মর্শ্ব ;—এই মসজিদটি তদানীন্তন সুলতান সুলেমান রাজত্বের উত্তরাধিকারী আলাউদ্দুনীয় ওয়াদ্দীন আবুল মুজফর হোসেন শাহের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার রাজত্ব ও শাসন চিরস্থায়ী করুন ; এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ধিত হউক। ত্রিপুরা ভূমির শাসন কর্তা, মুয়াজ্জমাবাদের উজীর, শক্তিমান মহানুভব খওয়াস্ খানের সহায়তায় সর্বদা জয়যুক্ত হউক, এবং ভগবান তাঁহাকে ইহলোক ও পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ২রা রবি, ৯১৯ (৭ই জুন, ১৫১৩)।

উক্ত অনুবাদ আংশিক বলিয়া বোধ হয় ; সম্ভবতঃ সম্যক লিপির অনুবাদ প্রদান করা হয় নাই। উক্ত শিলালিপি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছাভূষণ মহাশয় উক্ত লিপির মূলাংশ (আরবী) কতক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেবাক্ত ইংরেজী অংশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার উক্ত অংশে মসজিদ নির্মাণের, খোদাতাল্লার প্রতি ইমান রক্ষার, পরলোকে বিশ্বাস স্থাপনের, নমাজ পড়িবার এবং জায়কাৎ দেওয়ার ফলের বিষয় উল্লেখ আছে। যে মসজিদের গাত্রে উক্ত লিপি ছিল, তদ্বিবরণ কিম্বা উক্ত মসজিদ নির্মাতার কথা উক্ত লিপিতে নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তৎ সংগৃহীত রাজমালায়, * শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসে, † এবং স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ময়মনসিংহের ইতিহাসে ‡ এই শিলালিপির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই অমূল্য বাবুর সংগৃহীত অংশ নাই, এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও এই অংশ গৃহীত হয় নাই। অমূল্য বাবু ইহা কোথায় পাইয়াছেন, বলেন নাই। তাঁহার সংগ্রহও অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, খওয়াস খাঁ মুয়াজ্জমাবাদের উজীর ছিলেন। “মুয়াজ্জমাবাদ” নামদ্বারা স্থানের পরিচয় করা বর্তমান কালে দুঃসাধ্য। প্রাচ্য তত্ত্ববিদ ব্রকম্যান সাহেব মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন—

“The union of Tiparah (Tripurah) and Muazzamabad confirms my

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫০ পৃঃ।

† বাঙ্গালার ইতিহাস—৯ম পরিঃ, ২৫১ পৃঃ।

‡ ময়মনসিংহের ইতিহাস—৪র্থ অধ্যায়, ৪১ পৃঃ।

মুয়াজ্জমাবাদের
অবস্থান বিষয়ক
বিবরণ।

conjecture that Muazzamabad belong to sonargaon.” * ইহার এক বৎসর পরে তিনি অন্য এক প্রবন্ধে বর্তমান পূর্ব ময়মনসিংহকে “মুয়াজ্জমাবাদ” বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে মুয়াজ্জমাবাদ সুবর্ণগ্রামের নামান্তর। † এককালে সুবর্ণগ্রামের শাসনাধীন ভূ-ভাগ উক্ত নামে অভিহিত হইত, অবস্থা আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

পূর্বেবক্ত শিলালিপিতে খওয়াস খাঁ কে “ত্রিপুরার শাসনকর্তা” বলিয়া উল্লেখ
 খওয়াস খাঁ ও
 ত্রিপুরা।
 করায়, ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন শাহের শাসনাধীন হইবার
 আভাস পাওয়া যায়। সমগ্র অবস্থা আলোচনায় ইহাও বুঝা
 যায় যে, বিজিত ভূ-ভাগের পরিমাণ অতি নগণ্য ছিল; এবং তাহা অধিক কাল
 মুসলমানগণ হস্তগত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। এই সামান্য ঘটনাকে শিলাখণ্ডে
 উৎকীর্ণ এবং মসজিদ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিজয়-স্মৃতি রক্ষার চেষ্টাকে অস্বাভাবিক
 আড়ম্বর বলিয়া মনে হয়। ধন্য মাণিক্যের হস্তে হোসেন শাহ বারম্বার যেরূপ
 অপমানিত হইয়াছেন, তাহার তুলনায়, এই বিজয় কাহিনী শিলা-শাসনে উৎকীর্ণ করা,
 শ্রীকর নন্দীর গায় চাটুকায়ের কার্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না।
 গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় সম্যক অবস্থা প্রকাশ পাইবে।

ত্রিপুরার শৌর্য ও স্বাধীনতার অবস্থা কেবল ত্রিপুর ইতিহাসেই নিবন্ধ নহে।
 ত্রিপুরার শৌর্য
 বিষয়ে ইংরেজগণের
 মন্তব্য।
 মুসলমান রাজ পুরুষ ও ঐতিহাসিক, ইংরেজ রাজ দূত, বিদেশীয়
 পরিব্রাজক এবং সাময়িক পত্র সম্পাদক প্রভৃতির লেখনী নিঃসৃত
 বিবরণ হইতেও অল্পাধিক পরিমাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।
 মুসলমানগণের সংগৃহীত বিবরণ ছাড়িয়া, এক মাত্র ইংরেজ লেখকগণের প্রদত্ত
 বিবরণই এস্থলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাহাই সর্বাধিক পরবর্তী কালের
 কথা। তাঁহাদের মতের কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

রালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) সাম্রাজ্যী এলিজাবেথের সময় রাজদূতরূপে
 চীন-সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি পথ-ক্রমে বঙ্গদেশে
 আগমন করেন; ইহা ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই সময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের
 অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, Sir Harry Johnston তাহা নিম্নোক্ত
 ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—

“In the delta of the Ganges, on the verge of the Tipperah District,
 he found the people not yet subdued by the Mughal Emperors.”

Pioneers in India—P. 163.

এই বাক্যে জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য তৎকালে গঙ্গার বদ্বীপ পর্য্যন্ত
 বিস্তৃত ছিল। এবং প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিয়ত আক্রমণ

* On a new King of Bengal (J. A. S. B—1872).

† কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫০ পৃঃ।

শ্রুতিহত করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রালফ্ ফিচের কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পরে (১৬৫২ খৃঃ অব্দে) পিটার হেলিন (Peter Heyleyn) এই রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার বাক্য এই ;—

“Here is also the kingdom of Tippura, naturally fenced with hills and mountains and by that means hitherto defended against the Mongul Tartars, their bad neighbours, with whom they have continual quarrels.”

Bengal past and present (Oct. 1907) India Intra and Extra Gangem—PP. 51-51.

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য, প্রকৃতি গঠিত পর্বত-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া দুর্দান্ত প্রতিবেশী মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে ; কিন্তু তাঁহাদের সহিত এই রাজ্যকে সর্বদাই আহবে লিপ্ত থাকিতে হয়। যে রাজ্য সুবিস্তীর্ণ পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিযোগী ছিল, সেই রাজ্যের বল-বিক্রমের কথা অতি সহজ বোধ্য। ১৮৭০ খৃঃ ৪ঠা মে আরিখের ‘Pioneer’ পত্রিকায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, কৈলাস বাবুর রাজমালা হইতে তাহার মর্ম্ম এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শাসন হইতে উন্মুক্ততা যদি রাজত্ববর্গকে মুখ প্রদান করে এবং মনকক্ষাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনের কারণ হয়, তাহা হইলে পর্বত ত্রিপুরার রাজা নিশ্চরই ভারতবর্ষীয় নৃপতি মণ্ডলী মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ও সর্ব প্রধান। যিনি তিন সহস্র বর্গ মাইল রাজ্যের অধিপতি, * যাহার আদেশই জীবন মরণের একমাত্র ব্যবস্থা, যিনি কাহাকেও কর দেন না, যিনি স্বেচ্ছানুরূপ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা কর নির্ধারণ করিতে সক্ষম, যিনি ব্রিটিশ কর্মচারীর অনুশাসনের অধীন নহেন, যাহার রাজ্য বিদেশীগণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিম্বা যাহার কার্যকলাপ সংবাদ পত্রদ্বারা সমালোচিত হয় না, এবং প্রকার গর্বিবত স্বাধীনতার উপর একমাত্র এই নরপতিই দণ্ডায়মান বটেন।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ১৭শ অঃ, ২৩৯-২৪০ পৃঃ।

মেকেন্জি সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন। † ইহা মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের শাসন কালের কথা। এতদ্বারা ত্রিপুরার আধুনিক স্বাধীনতা গৌরবের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি কারণে এবং কি অবস্থায় পতিত হইয়া এই পরাক্রমশালী গৌরব-মণ্ডিত রাজ্য দিন দিন হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, পরবর্ত্তী লহর সমূহে তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

* এ স্থলে রাজ্যের বিস্তৃতি কম লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্যের বর্ত্তমান কালের সঙ্কুচিত পরিমাণ ফলও চারি সহস্র বর্গ মাইলের কিছু বেশী। রাঃ সঃ।

† North-East Frontier of Bengal—P. 561.

ত্রিপুরা কোন কালেই কোন প্রবল শক্তির নিকট অবনত মস্তকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, ইহা ত্রিপুরার অল্পান গৌরব ; এবিষয়ও ইংরেজের বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইবে । এ স্থলে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা যাইতেছে ;—

“The British Government has no treaty with Tipperah.”

Treaties Engagements and sunnuds.

Edition 1862, Vol. I, P. 77.

ত্রিপুরার এবম্বিধ উন্নতির যুগে সৈনিক বলও সুদৃঢ় ছিল । আবুলফজল সৈনিক বল সম্বন্ধীয় ত্রিপুরার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী দেখিয়াছিলেন । * আলোচনা । ‘রিয়াজউস-সালাতিন্’ প্রণেতাও তাহাই বলিয়াছেন । রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য নূতন সৈনিক দল গঠন কালে তাহার অধীনে বার কোটি পদাতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । † এই সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া মনে হয় । প্রাচীন কালে সৈন্য সংখ্যা গণনার নানাবিধ নিয়ম ছিল, ‘অক্ষৌহিনী’ ইত্যাদি সংখ্যা তাহারই একতর । কোষ-কার অমর ও ভরত প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এই সংখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

“একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা
পত্তাঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্কৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোক্তবৎ ।
সেনামুখং গুল্ম গণৌ বাহিনী পৃতনা চমুঃ ।
অনীকিনী দশানীকিঞ্জাক্ষৌহিন্যাথ সম্পাদি ।”

অক্ষৌহিনী সংখ্যার বিশ্লেষণ নিম্নোক্ত ভাবে করা হইয়াছে ;—

“অক্ষৌহিন্যামিত্রাধিকৈঃ সপ্ত তাস্তাষ্টতিঃ শটৈঃ ।
সংযুক্তানি সহস্রাণি গজানামেক বিংশতিঃ ॥
এবমেব রথানাস্তু সংখ্যানং কীর্ত্তিঃ বুদ্ধৈঃ ।
পঞ্চযষ্টি সহস্রাণি ষট্শতানি দশৈব তু ॥”

অমরকোষ প্রণেতা প্রভৃতির পূর্বেবক্ত মতানুসরণদ্বারা সৈন্য সংখ্যা নির্ধারণের যে প্রণালী উপলব্ধ হয়, নিম্নে তাহা প্রদান করা যাইতেছে ।

বিভাগের নাম ।	পদাতি সংখ্যা ।	অশ্ব সংখ্যা ।	হস্তী সংখ্যা ।	রথ সংখ্যা ।	মোট ।	মন্তব্য ।
পত্তি	৫	৩	১	১	১০	—
সেনামুখ	১৫	৯	৩	৩	৩০	ইহা পত্তির তিন গুণ ।
গুল্ম	৪৫	২৭	৯	৯	৯০	ইহা সেনামুখের তিনগুণ ।
গণ	১৩৫	৮১	২৭	২৭	২৭০	ইহা গুল্মের তিনগুণ ।
বাহিনী	৪০৫	২৪৩	৮১	৮১	৮১০	ইহা গণের তিনগুণ ।
পৃতনা	১,২১৫	৭২৯	২৪৩	২৪৩	২,৪৩০	ইহা বাহিনীর তিনগুণ ।
চমু	৩,৬৪৫	২,১৮৭	৭২৯	৭২৯	৭,২৯০	ইহা পৃতনার তিন গুণ ।
অনীকিনী	১০,৯৩৫	৬,৫৬১	২,১৮৭	২,১৮৭	২১,৮৭০	ইহা চমুর তিন গুণ ।
অক্ষৌহিনী	১,০৯,৩৫০	৬৫,৬১০	২১,৮৭০	২১,৮৭০	২,১৮,৭০০	ইহা অনীকিনীর দশ গুণ ।

* আইন-হ-আকবরী ।

† রাজমালা—২য় লহর, ১২ পৃষ্ঠা ।

ইহা সৈন্য সংখ্যা নির্ধারণের একটি প্রণালী। প্রাচীনকালে আরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনে এই কার্য সাধিত হইবার আভাস পাওয়া যায়। সহস্র, কোটি প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে সৈন্যগণনার প্রথা থাকিবার বিষয়ও প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় পাওয়া যায়। * সেই প্রণালী অবলম্বনে মহারাজ ধন্যনাগিক্যের বার কোটি পদাতি সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছিল, কিম্বা ইহা অতিরঞ্জিত বাক্য, জানিবার উপায় নাই। ইহাকে কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিলেও ইহার ভিতরে যে ত্রিপুরার সৈন্য-সংখ্যাধিক্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রকৃৎপক্ষে সে কালে ত্রিপুরা রাজ্যের সামরিকবল যে সুদৃঢ় ছিল, রাজমালা আলোচনায় তাৎক্ষণিক বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তৎকালে রাজ্যের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, জাতিনির্বিশেষে সকল পুরুষকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত, এবং রাজ্য রক্ষার্থ সকলেই অস্ত্রনিয়োগ করিতে বাধ্য ছিল। তদানীন্তন বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ডে প্রজার সংখ্যা অধিক থাকায়, সামরিক বিভাগ পুষ্ট করিবার বিশেষ স্বেচছা ঘটয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালে ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার প্রমাণ রাজমালা আলোচনায় পাওয়া যায়।

প্রচলিত রাজতন্ত্রের অনেক কীর্তি কাহিনী রাজমালার সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এখন তাহার অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। অনেক কীর্তি চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে ; দেবায়ত্তনাদি অনেক কীর্তি স্তম্ভ স্তম্ভাদি বিদ্যমান থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরগণের বিমল বংশ বৈষ্ণবা করিয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের স্থাপত্যের নাম নির্দেশ করিবার সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিগ্রহ দেবোত্তর সম্প্রদায়ের কীর্তি বিশেষর হস্তগত হইয়াছে ; এরূপ অবস্থাপন্ন অনেক কীর্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাতার নাম লোকে দিস্মৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে মহারাজ ধন্য-মাণিক্য কল্পিত নৌগড় পরগণার সংস্থাপিত শিব-বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দেবায়ত্তন ত্রিপুরা রাজ্যস্থ বঙ্গনগর হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে আনুমানিক এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই দেবায়ত্তন সম্বন্ধে ত্রিপুরার ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় হইতে প্রথম সংবাদ

* নিম্নোক্ত বাক্য সমূহ দ্বারা লক্ষ, কোটি প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে সৈন্যগণনার প্রথা বিদ্যমান থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ;—

(১) “এক লক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে।

তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে ॥”

রাজমালা—১ম লহর, ৫৮ পৃষ্ঠা।

(২) “মরে কোটি দশ পয়দর ষবহি।

নাচত এক কবন্ধ রণ তবহি ॥”

তুলসী দাসের রামায়ণ—লক্ষা কাণ্ড।

(৩) “নাগানামযুতং তুরঙ্গনিবুতং সর্দ্ধং রথানাং শতং পত্নীনাং দশ কোটিয়ো নিপতিতা একঃ কবন্ধো রণে।”

(ইতি প্রাচীনাঃ)। শব্দ কল্পদ্রুম—২৭১ পৃষ্ঠা।

পাওয়া যায়। তাহা দর্শন এবং তৎসম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধান জন্য আমার সহকারী শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস গিয়াছিলেন। শিব মন্দিরটি নদিরানাদ গ্রামে অবস্থিত। ইহার অবস্থা অতি জীর্ণ, বিরাট বটবৃক্ষ এবং অন্যান্য অগাছ-ভাঙ্গাশু ভগ্নদেহ লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরিসর ১৫ × ১৫ ফুট, ভিতরে ৬ × ৬ ফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালের বেধ ৪½ ফুট। মন্দিরটির উচ্চতা ২৪ ফুট হইবে। উপরের গম্বুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার গাত্রে শিলালিপি নাই; পূর্বে ছিঁদ কি না কেহ বলিতে পারে না। মন্দিরের পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র একটি দ্বার, তাহার কিয়দংশ বট বৃক্ষে ঢাকিয়াছে।

মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্বাহার্থ মন্দিরের সংলগ্ন চতুষ্পার্শ্বে ৭২ দ্রোণ ভূমি দেবতার ছিদ্র, তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এখন কুনিলা কালেক্টরীর রেভিষ্ট্রীভুক্ত অল্প পরিমাণ ভূমি স্থিরতর রহিয়াছে মাত্র।

কৃষ্ণপুর নিবাসী পঃশ্যাম শর্মা নেবাইত সূত্রে এই দেবালয়ের ও দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাহার বংশধর না থাকায় স্বীয় গুরুদেবকে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। বাশাহর জেলার অন্তর্গত আউড়িয়া নিবাসী গুরু বংশীয় শ্রীমুক্ত কালীকুমার কাব্যার্থ মহাশয় এই দেবালয়ের বর্তমান স্বত্বাধিকারী। কৃষ্ণপুরের জয়কুমার চক্রবর্তী বেতন লইয়া দেবতার সেবা পূজার কার্য্য করিতেছেন।

গঙ্গামণ্ডল ও নৌহগড় সম্বন্ধে জানিবার অনেক কথা আছে, পূর্ববর্তী নতুন তাহা আলোচনার চেষ্টা করা হইবে। উক্ত বিগ্রহ যে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ৬চন্দ্রনাথের স্থায় প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্তৃক শ্রীশ্রীস্বাস্থ্য নাথের মন্দির, এবং মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক ৬চন্দ্রনাথ বিগ্রহের মন্দির নির্মিত হইবার কথা বর্তমান কালেও অনেকের জানা আছে; কিন্তু ৬অন্নপূর্ণা ও বড়বানলের মন্দির ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক নির্মিত হইবার কথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা যে ধন্যমাণিক্যের আত্মজ মহারাজ দেবমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। এই মন্দির, স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বহাদুরের অগ্র-নহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবী কর্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। উদয়পুর সহরের বক্ষে অবস্থিত অনেক প্রাচীন মন্দিরের পরিচয় উদ্ধার করা বর্তমান কালে অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রাচীন কীর্তির সম্যক বিবরণ সকলনের আশা নাই। তবে, এ বিষয়ে সাধ্যানুরূপ চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না, অতঃপরও সেই চেষ্টায় বিরত থাকিব না, ফলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন।

নিঃ.

বীরেন্দ্রকিশোর

মহাদেবী কর্তৃক

প্রাচীন মন্দিরের পরিচয়.

কারণে প্রাচীন কীর্তির সম্যক

সাধ্যানুরূপ চেফটার ক্রটি হইতেছে.

কলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর ২.



মহাবাজ ধনুমাণিক্যের শিবমন্দির.

লৌহ গড়।

সূচীপত্র ।

—**—

মঙ্গলাচরণ	১
প্রস্তাবনা	১

গ্রন্থারম্ভ ।

ধর্ম্মানিক্যের সন্ন্যাস-ব্রত	১—৪
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ধর্ম্মানিক্য খণ্ড ।

ধর্ম্মানিক্যের রাজ্যাভিষেক ৪, ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাগর খনন ৫, তাম্রশাসন ৫, রাজমানা রচনা ৬	৪—৬
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

প্রতাপমানিক্য খণ্ড ।

প্রতাপমানিক্যের রাজ্যাভিষেক ও হত্যা ৬, রাজ্যে অশান্তি ৬, ধর্ম্মানিক্যকে রাজা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব ৭, ধর্ম্মানিক্যের সন্ধান ৭, পুরোহিত গৃহ হইতে ধর্ম্মানিক্যকে আনয়ন ৭	৬—৮
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ধন্যমানিক্য খণ্ড ।

ধন্যমানিক্যের রাজ্যাভিষেক ৮, মহারানী কমলা ৯, হিতাকাজ্ঞী পুরোহিত ১০, সেনাপতি বধ ১২, নূতন সৈন্যদল গঠন ১২, বঙ্গাভিযান ১৩, খণ্ডলের লোকগণের বাবহার ১৩, খণ্ডল পরগণা লুণ্ঠন ১৫, ধর্ম্মসাগর খনন ১৬, কাঠিছোঁয়া সম্প্রদায় ১৬, সুরার প্রভাব ১৭, শ্বেত হস্তী ও থানাংচি বিজয় ১৭, দুর্গ আক্রমণের কৌশল ১৯, কিরাত দেশ জয় ২০, রাজ-ভেট ২১, চট্টগ্রাম বিজয় ২২, হোসেন শাহের পরাজয় ২৪, রসাজ বিজয় ২৪, হোসেন শাহের পুনরাক্রমণ ২৫, দেবদ্বারে খোদিত মূর্তি ২৬, গোমতী নদীতে বাঁধ ২৭, মাছছা বা দেবতামুড়া ২৭, নদীর বাঁধ ভঙ্গ ও গৌড়-সৈন্যের বিপদ ২৮, নরবলির সংখ্যা নির্ধারণ ২৯, সাহিত্যের পুষ্টি বিধান ২৯, ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ ২৯, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন ৩০, চতুর্দশ দেবতার মন্দির ৩১, সুবর্ণ খনি ৩২, ধন্যমানিক্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ৩২, রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি ৩৩, মহারানীর সহমরণ ৩৩	৮—৩৩
---	-----	-----	-----	-----	-----	------

দেবমানিক্য খণ্ড ।

ভুলুয়া বিজয় ৩৩, ফলমতী তীর্থ দর্শন ও চট্টগ্রামে থানা সংস্থাপন ৩৩, রাজার তান্ত্রিক সাধনা ৩৪, সেনাপতি বধ ৩৫, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক রাজহত্যা ও মহারানীর সহমরণ ৩৬	৩৩—৩৬
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ইন্দ্রমানিক্য খণ্ড ।

ইন্দ্রমানিক্যের রাজ্যাভিষেক ৩৭, মহারাজকুমার বিজয়ের অবরোধ ৩৭, লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রের অত্যাচার ৩৭, সেনাপতিগণ কর্তৃক বিজয় লক্ষ্মীনারায়ণ ও সমাধি ইন্দ্রমানিক্য নিহত ৩৮	৩৭—৩৮
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

বিজয়মাণিক্যের অভিষেক ৩৯, মহারাণী পুণ্যবতীর দানশীলতা ৩৯, সেনাপতি
দৈত্যনারায়ণের স্থাপিত জগন্নাথ বিগ্রহ ৩৯, দৈত্যনারায়ণের প্রাধাত্য ৪০, রাজাকর্তৃক
দৈত্যনারায়ণ নিহত ৪২, মহারাণীর আদেশে মাধবের বিনাশ সাধন ৪২, মহারাণীর বনবাস
দণ্ড ৪৩, বিজয়মাণিক্যের উত্তর প্রদেশে বিজয় ৪৩, জয়ন্তীয়া রাজ্যে হাড়ি সৈন্তের
আভ্যন ৪৪, হেড়েশ্বরের মধ্যবর্তী ৪৫, পাঠান সৈন্ত বিদ্রোহ ৪৫, বিদ্রোহী সৈন্তের
দণ্ড ৪৬, গোড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রাম যুদ্ধ ৪৭, ত্রিপুর সেনাপতি হত ৪৮, ত্রিপুর সেনানি
কর্তৃক গোড়ের প্রধান সেনাপতি ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ ৪৯, গোড়ের সৈন্তাধ্যক্ষকে চতুর্দশ
দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান ৫১, গোড়েশ্বরের সহিত পত্র ব্যবহার ৫২, গোড়েশ্বরের প্রেরিত
দূতের অবস্থা ৫৩, বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভ্যন ৫৪, শ্রীশ্রী অভ্যন ৫৭, চৌম্বালি প্রদেশে
মৃগয়া ৫৮, খাড়াইত সৈন্ত ৫৮, বিজয়মাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ ৬০, রাজ্য মধ্যে শিল্পী
সংস্থাপন ৬০, রাজ পুত্রগণের ব্যবহার ৬২, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ ৬২, রাজকুমার অনন্তের
সহিত গোপীপ্রসাদের কন্যার বিবাহ ৬২, বিজয়মাণিক্যের মৃত্যু ৬৪, রাজমহিষীগণের
হরণ ৬৪ ৩৯—৬৪

অনন্তমাণিক্য খণ্ড ।

অনন্তমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তি ৬৫, গোপীপ্রসাদের প্রাধাত্য ৬৫, অন্তর গোপীপ্রসাদ
কর্তৃক অনন্তমাণিক্য নিহত ৬৬ ৬৫—৬৬

উদয়মাণিক্য খণ্ড ।

গোপীপ্রসাদের উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ ও সিংহাসন অবিকার ৬৭, রাজমহিষী কর্তৃক
পিতাকে ভৎসনা ৬৭, রাজধানীর উদয়পুর নামকরণ ৬৮, উদয়মাণিক্যের বিগ্রহ স্থাপন ও
জলাশয় খনন ৬৮, উদয়মাণিক্যের ব্যভিচার ৬৮, গোড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৬৯, ত্রিপুর
সেনাপতির পরাজয় ৭০, পাঠান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় ৭১, উদয়মাণিক্যের মৃত্যু ৭২ ৬৭—৭২

জয়মাণিক্য খণ্ড ।

জয়মাণিক্যের অভিষেক ৭২, রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণের প্রাধাত্য ৭৩, অন্নর দেবকে
বধ করিবার নিমিত্ত রণাগণের চেষ্টা ৭৪, ঈশ্বর দ্বারা রণাগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ায় অন্নর
দেবের জীবন রক্ষা ৭৪, অন্নর দেব কর্তৃক রণাগণ নিহত ৭৬, অন্নর দেবের পুত্র কর্তৃক
জয়মাণিক্য নিহত ৭৭, অন্নর দেবের জন্ম বিবরণ ৭৭ ৭২—৭৮

মধ্য-মণি (টীকা) ।

—O**O—

রাজমালা দ্বিতীয় লহর ও তাহার রচয়িতা ।

রাজমালা প্রথম লহর ৮১, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের রচয়িতা ৮১, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের
প্রাচীনত্ব ও অন্নরমাণিক্যের শাসনকাল ৮৩, রাজমালার ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা ৮৫, রাজমালার
রচয়িতা ত্রিপুরা জেলার লোক ৮৫, রাজমালার ঐতিহাসিক মূল্য ৮৫ ৮১—৮৬

পারিবারিক কথা ।

বৈবাহিক বিবরণ ৮৬, রাজগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা ৮৬, বহু বিবাহ ৮৮, রাজ-
গণের শিক্ষা ও সাহিত্যের পোষকতা বিষয়ক বিবরণ ৮৯, মল্লবিদ্যার চর্চা ৯০, স্ত্রী শিক্ষা ৯০,
নৃত্যগীত বিষয়ক চর্চা ৯০, সাহিত্য সেবা ৯০, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিবিধান ৯০,
পারিবারিক বিশেষ নিয়ম ৯১, মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম ৯১, সহমরণ প্রথা ৯১,
রাজমহিষীর বনবাস দণ্ড ৯১, গুপ্ত কথা বুঝাইবার ইচ্ছিত ৯১ ৮৬—৯১

ধর্মমত ।

ধর্ম্মানুশাসন ৯১, রাজকুমারের সম্মাসাশ্রম গ্রহণ ৯২, জলাশয় খনন ও ভূমিদান ৯২,
ধর্ম্মানুক্যের তাম্র-শাসন ৯২, কুন্ডিলানগরীস্থিত ধর্ম্মসাগরের প্রাচীনত্ব ৯৪, দেবতা
প্রতিষ্ঠা ৯৪, ভুবনেশ্বরী বিগ্রহের অবস্থা ৯৫, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির ৯৫, মন্দির গাত্রস্থ
শিলালিপি সমূহ ৯৬, বলিভীম নারায়ণ ৯৮, অক্ষপাতের প্রাচীন প্রণালী ৯৮, মন্দিরের প্রথম
সংস্কারক রণাগণ নারায়ণ ৯৯, দ্বিতীয়বারের সংস্কার বিবরণ ১০০, তৃতীয়বারের সংস্কার
বিবরণ ১০০, মহারাণী সুমিত্রা মহাদেবী কর্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০০, মহারাজ রাধাকিশোর-
মানিকা কর্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০১, মন্দিরের প্রাচীনত্ব ১০১, ভৈরবের মন্দির ১০১,
ধর্ম্মানুক্যের অগ্রাণ্ড কীর্তি ১০১, মহারাণী কমলা মহাদেবীর কীর্তি ১০১, দেবমানুক্যের
ধর্ম্ম বিশ্বাস ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১০১, মহারাজ বিজয়মানুক্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পঞ্চদ্রোণা ১০২,
বিজয়মানুক্যের তাম্র-শাসন ১০২, উদয়মানুক্যের ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান ১০২, ধর্ম্মমতের
সারতত্ত্ব ১০৩, বলিদানের প্রথা ১০৩, নরবলি ১০৪, বলির নিদ্রিত মনুষ্য সংগ্রহ ও মৈছিলি
সম্প্রদায় ১০৪, শক্র বলি ১০৫, নরবলির সংখ্যা নির্ধারণ ১০৫, ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস ১০৬,
রাজানুশাসনে ধর্ম্মের পুষ্টিবিধান ১০৬ ৯১—১০৬

তীর্থস্থানের বিবরণ ।

ত্রিপুরা রাজ্যের তীর্থস্থান ১০৬, উনকোটা তীর্থ ১০৭, উনকোটা তীর্থের পথ ১০৭,
উনকোটা তীর্থের প্রাচীনত্ব ১০৭, কপিল মুনির বিবরণ ১০৮, কপিলাশ্রম ১০৮, মহর্ষি
মহু ১০৯, বরবক্র ও মহু নদীর মাহাত্ম্য ১১০, উনকোটা তীর্থ মাহাত্ম্য ১১০, উনকোটা তীর্থ
দর্শন ১১১, উনকোটা তীর্থে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সমূহ ১১১, উনকোটাধর শিব বিগ্রহ ১১২,
প্রাচীন মন্দিরের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন ১১২, ছান্দুলনগরের অবস্থান নির্ণয় ১১৩, বিগ্রহ সমূহের
প্রাচীনত্ব ১১৪, উনকোটা তীর্থের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা ১১৪, ডম্বর বা ডুমুরীতীর্থ ১১৫,
ডম্বর তীর্থের অবস্থান নির্ণয় ১১৫, ডম্বর তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১১৫ ... ১০৬—১১৬

সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ ।

সামরিক বল ১১৬, বিজয়মানুক্যের বঙ্গাভিযান ১১৬, উদয়মানুক্যের শাসনকালের
সৈনিক বল ১১৮, সৈনিক বিভাগের কর্মচারিগণের বিবরণ ১১৮, জয়স্বীয়া অভিযানে
হাড়ি সৈন্য ১১৯, সেনানায়ক ১১৯, সেনানায়ক নির্বাচন প্রণালী ১১৯, সেনাপতিগণের
উপাধি ১২০, পার্শ্বত্যা প্রদেশে সৈন্য রক্ষার প্রণালী ১২০, বিনন্দিয়া সৈন্য ও নাজির
উপাধি ১২০, নারায়ণ উপাধি ১২১, খাড়াইত উপাধি ১২২, সৈনিক বিভাগের গৌরবসূচক
উপাধি ১২২, যুদ্ধাজ্ঞ ১২৩, যুদ্ধাস্ত্রের প্রকার ভেদ ১২৩, যুদ্ধযান ১২৪, অভিযান ও

সমর ১২৪, ধন্তমানিক্যের বঙ্গ বিজয় ১২৫, খণ্ডনবাসিগণের ব্যবহার ১২৫, থানাংচি বিজয় ও
 খেত হস্তা লাভ ১২৫, চট্টগ্রাম অভিযান ও বিজয় ১২৬, হোসেনশাহের ত্রিপুরা আক্রমণ ১২৬,
 ধন্তমানিক্যের আরাফান বিজয় ১২৬, হোসেনশাহের পুনরাক্রমণ ১২৭, বিনাযুদ্ধে পাঠানবাহিনীর
 পরাজয় ১২৭, হোসেনশাহের তৃতীয় আক্রমণ ও জয় লাভ ১২৮, শ্রীকর নন্দীর তোষামোদ-
 প্রিয়তা ১২৮, দেবমানিক্যের ভুলুনা ও চট্টগ্রাম বিজয় ১২৯, বিজয়মানিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়
 বিবরণ ১২৯, সুলতান সুলেমান কররাণির চট্টগ্রাম আক্রমণ ও পরাজয় ১২৯, বিজয়মানিক্যের
 বঙ্গাভিযান ১৩০, মঘ জাতির সহিত সংঘর্ষ ১৩১, অনন্তমানিক্যের হত্যা বিবরণ ১৩২,
 উদয়মানিক্য ও দায়ুদশাহ ১৩২, উদয়মানিক্যের পরাজয় ১৩৩, রাজার যুদ্ধে গমন ১৩৪,
 রাজগণের শৌর্য্য ১৩৪, রণকৌশল ১৩৫, থানাংচি দুর্গ জয় ১৩৫, হোসেনশাহের পরাজয়
 বিবরণ ১৩৫, হোসেনশাহের দ্বিতীয়বার পরাজয় ১৩৮, রণক্ষেত্রে ধৃত সেনাপতিগণের
 অবস্থা ১৩৭, পুংস্কার ও দণ্ড ১৩৭, পুংস্কার ১৩৭, দণ্ড ১৩৮, সেনাপতিগণের আধিপত্য ও
 উচ্ছৃঙ্খলতা ১৩৮, সৈনিক বল ও শাসনভার এক হস্তে অর্পণের কুফল ১৩৮, সেনাপতিগণের
 প্রভাব ১৩৮, সেনাপতিগণের প্রাধাত্য হেতু ধন্তমানিক্যের অবস্থা ১৩৯, সেনাপতিগণের
 উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ১৪০, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক বিপ্লবের ব্যবহার ও পরিণাম ১৪১, সেনাপতি
 দৈত্যনারায়ণের দুর্ব্যবহার ও তাহার পরিণাম ১৪১, সেনাপতিগণের শাসন ক্ষমতা রহিত ও
 উজীর পদের সৃষ্টি ১৪২, সেনাপতি গোপীপ্রসাদের পূর্বাবস্থা ১৪২, গোপীপ্রসাদের
 প্রাধাত্য ১৪২, গোপীপ্রসাদের বিশ্বাসবাতকতা ১৪২, রণগণের প্রাধাত্য ও পরিণাম ১৪৩,
 সৈনিক বিভাগে উচ্ছৃঙ্খলতা ১৪৩, সেনাপতি বধ ১৪৩, দুর্গ ও সেনানিবাস ১৪৪, দুর্গ
 সমূহের নাম ১৪৪, নববিজিত প্রদেশের শাসনপ্রণালী ১৪৫, সৈনিক বিভাগের ভোজ ১৪৫,
 মহারানী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, ধন্তমানিক্যের প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, কাঠিছোঁয়া
 সম্প্রদায় ১৪৬, হসন ভোজন ১৪৬, 'হসন ভোজন' বাক্যের অর্থ ১৪৭, হসন ভোজন প্রথার
 রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ১৪৮, হসন ভোজনে হালাম সরদারের প্রাধাত্য ১৪৯, উপঢৌকন
 প্রদান প্রথা ১৪৯ ১১৬—১৪৯

রাজ্যের অবস্থা ।

রাজধানী ১৪৯, রাজধানীর অবস্থান ১৪৯, রাজ্য বিস্তার ১৫০, মহারাজ ধন্তমানিক্যের
 কার্য ১৫০, মহারাজ দেবমানিক্যের কার্য ১৫০, মহারাজ বিজয়মানিক্যের কার্য ১৫০,
 বিজয়মানিক্যের বঙ্গাভিযান ১৫১, উদয়মানিক্যের শাসনকাল ১৫১ ... ১৪৯—১৫২

প্রাকৃতিক উপদ্রব ।

ভূমিকম্প ও ভূভিঙ্গ ১৫১, মহামারী ১৫২, বসন্ত রোগের প্রাবল্যের কারণ ১৫২
 ১৫১—১৫২

শিল্প ।

শিল্প কার্য ও শিল্পকার ১৫৩, বিবিধ শিল্প ১৫৩, বয়ন শিল্প ১৫৩, রিয়া বা
 কাঁচলি ১৫৩ ১৫৩—১৫৪

রাজ্যের বিশেষত্ব ।

খনিজ পদার্থ ১৫৫, বস্ত্র ষোটকের বিবরণ ১৫৬, বোড়া উৎপন্নের কথা ১৫৬, বস্ত্র
 হস্তীর বিবরণ ১৫৬ ১৫৫—১৫৬

শাসন তন্ত্র ।

সেনাপতিগণের ব্যবহার ১৫৬, খাঁ উপাধিধারী সেনাপতিগণ ১৫৬, শাসন প্রণালী ১৫৭, শাসন প্রণালী পরিবর্তনের চেষ্টা ১৫৭, লঙ্কর পদের প্রবর্তনা ১৫৭, চিটার প্রণালী ১৫৮, প্রাণদণ্ডের নিয়ম ১৫৮ ১৫৬—১৫৮

দরবারের বিশেষ নিয়ম ।

দরবারে পালনীয় পদ্ধতি ১৫৯, কূটনীতি ১৫৯, বিজয়মাণিক্যের অবলম্বিত নীতি ১৬০, জয়ন্তিয়া রাজের অন্যথা ব্যবহার ১৬০, হাড়ি সৈন্যের জয়ন্তিয়া অভিবান ১৬০, পরাজিত জয়ন্তিয়া রাজ কে ? ১৬১, জয়ন্তিয়া রাজার প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা ১৬২, বিজয়মাণিক্যের রাজনীতিক কৌশল ১৬২, রাজদত্ত শাসন ১৬২, কুকি জাতির রাজভক্তি ১৬৩, রাজকর ১৬৪, মুদ্রা ১৬৪, সনাজ তত্ত্ব ১৬৫, সুরার প্রভাব ১৬৫, পান দ্বারা আনয়ন ও সম্মান প্রদর্শনের প্রথা ১৬৮, মহিলা মাহাত্মা ১৬৯, রাজনিস্বীর প্রার্থ্যা ১৭০, স্ত্রী শিক্ষার দর্শন ১৭০
১৫৯—১৭০

ইঙ্গিত ও দাঙ্কেতিক চিহ্ন ।

ইঙ্গিত ১৭০, কনবা ১৭১, ফুবাই ১৭২, ওরাখলং ১৭২, ফুবাই ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ১৭৩ ১৭০—১৭৪

রাজগণের কাল নির্ণয় ।

ধর্মমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৪, প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৭৬, ধর্মমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৬, ধ্বজমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৮, দেবমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৮, ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৯, বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮০, মহারাজ বিজয় সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ১৮০, বিবিধ মতের মীমাংসা ১৮১, অমৃতমাণিক্যের শাসনকাল ১৮১, উদয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮২, জয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮৩, শাসনকালের তালিকা ১৮৪, রাজগণের কাল নির্দেশক প্রাচীন তালিকা ১৮৪ ১৭৪—১৮৪

তান্ত্র-শাসনের তথ্যানুদধান ।

তান্ত্র-শাসনের বিবরণ ১৮৫, তান্ত্র-শাসন প্রবর্তনের কাল নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য ১৮৫, শ্রীরামচন্দ্রের তান্ত্র শাসন ১৮৫, তান্ত্র-শাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত ১৮৭, শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ১৮৮, ভূমি দাতাগণের ধর্মভীরুতার দর্শন ১৮৯, ধর্মমাণিক্যের তান্ত্র-শাসন ১৮৯, লক্ষ্মণ সেনের তান্ত্র-শাসন ১৮৯, শ্রীমদবর্মার তান্ত্র শাসন ১৮৯, তান্ত্র শাসন প্রদানের প্রথা আধুনিক নহে ১৮৯, ধর্মের সহিত শৌর্যের মর্মমায়া রক্ষা ১৯০, রাজা দেবখড়্গের তান্ত্র-শাসন ১৯০, কেশব সেনের তান্ত্র-শাসন ১৯০, দানোদর দেবের তান্ত্র-শাসন ১৯১, ঈশান দেবের তান্ত্র-শাসন ১৯১, বিজয়মাণিক্যের তান্ত্র-শাসন ১৯১, তান্ত্র-শাসনে অঙ্কিত শৌর্য্যভাবের কথা ১৯১, তান্ত্র-শাসনে অঙ্কিত বাক্যদ্বারা রুচির পরিচয় ১৯১, তান্ত্র-শাসনে অবথা বাক্য ১৯৩, সমাজের অবস্থা বিপর্যয়ের কথা ১৯৩ ১৮৫—১৯৪

সৈন্যাদ্যক্ষের উপাধি ।

সৈন্যাদ্যক্ষের 'সেনা' উপাধি ১৯৪, সেনাপতি উপাধি ১৯৫, দশ জন সেনাপতি নিয়োগের প্রথা ১৯৬, সরদার উপাধি ১৯৭, হাজারী উপাধি ১৯৮, বড়ুয়া উপাধি ১৯৮, নারায়ণ

উপাধি ১৯৮, চতুর্দশ দেবতার পূজক নারায়ণ ২০০, খাড়াইত উপাধি ২০০, খাড়াইত উপাধির
প্রাচীনত্ব: ২০১, নাজির উপাধি ২০২ ১৯৪—২০২

সতী-দাহ ।

ত্রিপুরায় সতী-দাহের প্রচলন ২০৩, সতী-দাহ প্রথার প্রাচীনত্ব ২০৩, সতী-দাহ সম্বন্ধে
শাস্ত্রীয় মত ২০৪, সহমরণ বিধি ২০৫, সতীর আন্তরিক দৃঢ়তা ২০৬, ভারতবর্ষে সহমরণ
প্রথার বিস্তৃতি ২০৬, ভারতের বাহিরে সহমরণ প্রথা ২০৭, ব্রহ্মচর্যাব্রত ২০৭, সহমরণ প্রথার
বাতিচার ২০৭, ইংরেজ শাসনকালে সহমরণ প্রথা ২০৮, সহমরণ প্রথা ও লর্ড উইলিয়াম
বেটিক ২০৮, সহমরণ প্রথা ও ত্রিপুরা রাজা ২০৮. সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
পত্র ২১০, সহমরণ সম্বন্ধে ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের রেগুলেশন ২১৩, ত্রিপুরায় সতী-দাহ রহিতের
আদেশ সম্বন্ধিত রোবকারী ২১৪ ২০৩—২১৪

হস্তী-বিজ্ঞান ।

বহুহস্তী সম্বন্ধীয় বিবরণ ২১৫, হস্তীর জাতি বিভাগ ২১৯, ঊর্ধ্বদিগ্গজ ২২০, উত্তম
হস্তী ২২২, দুষ্ট হস্তী ২২৪, হস্তীর পরমায়ু ২২৮ ২১৫—২২৯

প্রচলিত কিম্বদন্তী ।

দৌচাপাণর বা দোরাপাথর ২২৯, শ্বেত হস্তীর কথা ২২৯, শ্বেত হস্তীর জন্ম কথা ২৩০
... .. ২২৯—২৩৮
রাজা রামগতির আখ্যান ২৩৮—২৪২
বিষলতার উৎপত্তি ২৪২—২৪৬
প্রাচীন সংস্কার—ডাইনের কথা ২৪৬—২৪৮
খোজার বিবরণ ২৪৮—২৪৯
রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... ২৫০—২৬৬
রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত স্থান ইত্যাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ২৬৭—৩১৮

চিত্র-সূচী ।

১। ...	মুখপত্র।	২। কমলাসাগর (কস্বা) ...	৯
২। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিকা ...	১০।	ধন্তমাণিক্যের প্রাসাদ ...	১২
৩। রাজমালা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি	১০।	ত্রিপুরার কুকি সৈন্য ...	১৮
৪। সুন্দরবনস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী ও অম্বু লিঙ্গের মন্দির	১৩।	শিশু সন্তানসহ কুকি দম্পতি	১৯
৫। মহারাজ ধন্তমাণিক্যের মুদ্রা : ১৬১।	১৩।	কুকি-প্রদত্ত রাজভেটের বস্ত্র	২১
৬। হোসেন শাহের তোপ ও পতাকা ২১০	১৪।	হৈতন খাঁএর খোদিত মূর্তি	২৬
৭। ধন্তমাণিক্যের শিব মন্দির ২১১।	১৫।	দেবতা মুড়ায় খোদিত মূর্তি	২৭
৮। ধর্মসাগর (কুমিল্লা) ...	১৬।	৮স্বরসুনাথের মন্দির ...	৩১
	১৭।	ধন্তমাণিক্যের নির্মিত মঠ সমূহ	৩২
	১৮।	অন্নপূর্ণা ও বাড়বানলের মন্দির	৩৪

১৯।	দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির	৩৯	৩০।	উনকোটাধর শিব	...	১১২
২০।	হীরা গোপীনাথের মন্দির	৬০	৩১।	ডম্বর জল প্রপাত (উর্দ্ধস্তর)		১১৫
২১।	উদয়মণিক্যের প্রাসাদ ..	৬৮	৩২।	ঐ প্রপাত (মধ্য ও নিম্ন স্তর)		১১৬
২২।	অস্থায়ী সেনানিবাসের আদর্শ (শিবির)	৭০	৩৩-৩৪।	বিজয়মণিক্যের নৌ বিতান		১১৭
২৩।	“ছোট মা” বিগ্রহ ...	৯৫	৩৫।	বসন্ত বয়ন রতা কুঁকি রমণী		১৫৩
২৪।	৩ত্রিপুরা স্কন্দরীর মন্দির	৯৬	৩৬।	রিয়া ও রিয়া পবিহিতা রমণীবৃন্দ		১৫৪
২৫ ২৬।	ঐ মন্দিরের শিলালিপি	৯৭-৯৮	৩৭।	বিজয়মণিক্যের প্রদত্ত শাসন (হস্তী ও ব্যাঘ্র) ...		১৬২
২৭।	৩লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ ...	১০৩	৩৮।	কদ্বা (সাক্ষেতিক চিত্র)		১৭১
২৮।	উনকোটা তীর্থ ...	১০৭	৩৯।	ফুরাই ও ওয়াগ্‌লাং		১৭২
২৯।	উনকোটা তীর্থমুখ ...	১১০	৪০।	রাজগণের কাল জ্ঞাপক তালিকা		১৮৪

মানচিত্র ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের সমসাময়িক ত্রিপুর রাজ্যের মানচিত্র ১/০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।

এই লহর সংশ্লিষ্ট চিত্র সংগ্রহ বিষয়ে, চিত্রকলাবিদ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবদর্শন মহাশয়, এবং ৩চন্দ্রনাথ তীর্থের সেবায়ত ও সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তজ্জন্তু তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ।

ॐ गरुडैत्र्य नमः ।

श्रीराजमाला ।

—:०:—

(द्वितीय लहर ।)

मङ्गलाचरण ।

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।
आदावस्तु च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥

प्रस्तावना ।

अमरमाणिक्य (१) छिल धर्म महाराज ।
सिंहासने बसिलेक मन्त्रीर समाज ॥
सेइ त सभाते छिल बृद्ध सेनापति ।
रण चतुर नारायण छिल तार ख्याति ॥
अमरमाणिक्य राजा ताके जिज्ञासिल ।
महामाणिक्येर परे यत राजा हैल ॥ (२)
श्रेणीक्रमे कह तूमि से सब कथन ।
वे मते शासिल राज्य प्रजार पालन ॥

ग्रन्थारम्भ ।

महामाणिक्य नृपति पुण्यतर नर ।
तौहार तनय छिल पङ्क सहोदर ॥

(१) अमरमाणिक्य—त्रिपुराधिपति । ईनि महाराज जयमाणिक्येर पुत्र ; चम्प हईते अधस्तन १५८ ओ त्रिपुर हईते ११० स्थानीय । ईहार आदेशे राजमालार द्वितीय लहर रचित हईयाछिल ।

(२) राजमाला प्रथम लहरे महामाणिक्येर शासनकाल पर्यन्तेर विवरण लिपिबद्ध हईयाछे ।
एई लहरे तत्परवर्ती राजगणेर विवरण पाओया बाईवे ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম নাম সন্ন্যাসী হইয়া ।
কর্মপাশে নানা তীর্থে গেলেক চলিয়া ।
নানা তীর্থ ভ্রমিয়া সে পুণ্য উপার্জন ।
বারাণসী ক্ষেত্রে পুনি আসিয়া রহিল ।
এক দিন নিদ্রায়ুক্ত বৃক্ষ মূলে শুইল ।
সর্পে পট (১) ধরিয়া যে মস্তকে রহিল

(১) পট—ফণা ।

যাহার মস্তকোপরি সর্পে ফণা বিস্তার করে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে রাজা হইবে, হিন্দুগণের
এই বিশ্বাস । এতৎসম্বন্ধে রাজমালার সনালোচক রেভারেণ্ড লণ্ড সাহেব বলিয়াছেন,—

"Bharma Marik the 104th Raja travelled as a Fakir through various
countries; when at Benares his future exaltation was signified by a snake
coiled round his body with his head reared over his person. This is
regarded by the Hindus a presignification of future sovereignty; they
trace the practice from the period when Bhagaban or Krishna slept in
the Ksairoda Samudra on the back of the snake Ananta who covered
him with his expanded hood."

J. A. S. B.—Vol. XIX.

সর্পবর্তিত নানা কথা প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে অনেক পাওয়া যায় । এ স্থলে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত
প্রদান করা যাইতেছে ;—

(১) "যখন বিষ্ণুর সপ্তম বর্ষ বয়সে এক দিবস ক্রিয়াস্তে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষ ছায়াতে শয়ন করিয়া
আছেন, সূর্যের উত্তাপে ঘন হইয়াছে, অথ অথ বালক সকল ব্যবধান ছিল । ইতাবকালে যেক
প্রাচীন সপ আশীয়া মস্তকোপরী ফণা ধরিয়া রৌদ্র নিবারণ করিয়াছিল । যখন বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ
হইল তখন ঐ সর্প বনেতে গমন কারণ । বিষ্ণু গ্রীহেতে আশীয়া মাতাকে বিস্তার নিবেদন
করিলেন ।"

রাজাবলী,—দেব খণ্ড, ৭ম অঃ ।

ইহা বেহারের ইতিবৃত্ত—হস্ত লিখিত গ্রন্থ । ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই । উক্ত অংশে
বর্ণবিত্তাস ও শব্দ অবিকল রাখা হইল ।

(২) সমসেরগাজির সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"আর দিন গাজিবর মএদানে যাইয়া :

* * * * * রূপ মরাক (বৃক্ষ) দেখিয়া ॥

ছায়াতে (ছায়াতে) চাদর অন্ধ (অন্ধ) ডালিয়া তখন ।

অন্ধক উপরে ডালি ডাকিয়া (ঢাকিয়া) বদন ॥

বৃক্ষের শিকরপরে কর মুণ্ড দিয়া ।

পাইয়া মিতল বাইউ রহিল স্মৃতিয়া ॥

হেনকালে আইথে (আইথে) নিদ্রা আচরিত লাগে ।

পশু পক্ষি নাই তাহে দুপ্রহর ভাগে ॥

* * * * *

তাতে বিধি পরসনে বসন উপরে ।

ভূজঙ্গে সংগমে দুই জরাজরি করে ॥" ইত্যাদি ।

গাজিনানা পুথি ।

কৌতুক নামেতে এক কনৌজিয়া (১) দ্বিজ ।
 সস্ত্রীক হইয়া রহে বারাণসে নিজ ॥
 সর্পে পট ধরিয়াছে সন্ন্যাসীর মাথে ।
 ব্যোস্ততে (২) জাগায় দ্বিজ সন্ন্যাসীকে পথে ॥
 জিজ্ঞাসিল বিপ্রে তাকে কোন দেশী লোক ।
 এখানে থাকিয়া কেনে পাও এত দুঃখ ॥
 সন্ন্যাসীয়ে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর । (৩)
 অগ্নি কোণে রাজ্য আনা হয় নহু দূর ॥
 ব্রাহ্মণে বলেন তুমি নিকৃষ্ট না হয় ।
 দেশে চল রাজ্য পাবা বলিল নিশ্চয় ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা ঈষৎ হাসিল ।
 আপনে বাইবা সঙ্গে বিপ্রকে বলিল ॥
 কৌতুক ব্রাহ্মণ বলে বাব আমি সঙ্গে ।
 রাঙ্গামাটী (৪) বঞ্চিব যে ত্রিপুরাতে রঙ্গে ॥
 সত্য করে ব্রাহ্মণে রাজা যে সত্য কৈল ।
 বিশেষ্বর পূজা করি বাসাতে আসিল ॥

সেই কালে দেশী লোক গেলেক তথাতে
 রাজা করিবার হেতু ধর্ম্মকে আনিতে ॥
 বারাণস স্থানে লোক ঢলিল (৫) যখন ।
 কৌতুক ব্রাহ্মণে পাইয়া আনিল তখন ॥
 রাজপুত্র হইয়াছে সন্ন্যাসী স্বরূপ ।
 দেখিয়া দেশের লোক মনেতে বিরূপ ॥
 নমস্কার করি কহে যতেক প্রসঙ্গ ।
 রাজা হইবারে চল না ছাড়িব সঙ্গ ॥
 তোমা পিতা মহামাণিক্য শীতলা (৬) হইয়া ।
 বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চ স্ত্রুত রাখিয়া ॥

(১) কনৌজিয়া—কান্ধকুন্ড দেশীয় ।

(২) ব্যোস্ততে—ব্যস্ত হইয়া ।

(৩) ত্রিপুরাবাসী বিধায় নিজকে 'জাতিতে ত্রিপুর' বলিয়াছেন, যেমন বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী, উড়িষ্যাবাসীগণ উড়িয়া ইত্যাদি ।

(৪) রাঙ্গামাটী—ত্রিপুরার পূর্ব রাজধানী উদয়পুরের প্রাচীন নাম ।

(৫) ঢলিল—অনুসন্ধান করিল ।

(৬) শীতলা—বসন্ত রোগ ।

তোমা চারি ভাই আছে রণের মাঝার । } (১)
 সেনাপতি নাহি দিছে রাজা করিবার ॥
 দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হতে চায় ।
 না মানে কাহারে কেহ মনে ভয় পায় ॥
 পাত্র মিত্র সকলে তোমাকে আকাজিয়া ।
 আমা সব পাঠাইছে এই নিবেদিয়া ॥
 শীঘ্র চল রাজা হৈবা রাজা শূন্য দেশ ।
 বিলম্ব না কর এই কহিল বিশেষ ॥
 তাহা শুনি রাজশ্রুত কহিলেক রঙ্গে । (২)
 কোতুকাদি অষ্ট বিপ্র লইলেক সঙ্গে ॥
 কত দিনে আসিলেক দেশ সম্বিহিতে ।
 সৈন্য সেনাপতি আসে আগু বাড়ি নিতে ॥
 পঞ্চ ভ্রাতৃ মিলিয়া করিল আলিঙ্গন ।
 রাজপদ ধূলি লৈল সেনাপতিগণ ॥

ধর্ম্মাণিক্য খণ্ড ।

শুভক্ষণে শুভদিনে করিলেক রাজা ।
 সিংহাসনে বসাইল মিলি সব প্রজা ॥
 প্রথম বয়স কালে বহু ধর্ম্ম কৈল ।
 সেই কারণে ধর্ম্মাণিক্য নাম হৈল ॥
 কালা খাঁ গগন খাঁ আর খাঁ ছামধুম ।
 অমাত্য হইল তারা শত্রু কালধুম ॥ (৩)
 তের শত আশী শকে ত্রীধর্ম্মাণিক্য ।
 নৃপতির নীতি ধর্ম্ম বলিতে অশক্য ॥ (৪)
 চিরকাল রাজ্য পালিলেক মহারাজা ।
 শত্রু নাহি ছিল তার বকিলেক প্রজা ॥

(১) তোমার চারি ভ্রাতা রাজ্য লাগসার বুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন, কিন্তু সেনাপতিগণ তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে দিতেছেন না ।

(২) পরিত্যক্ত — "হেন শুনি রাজশ্রুত চলিলেক রঙ্গে ।"

(৩) শত্রু কালধুম — শত্রুর পক্ষে ইহারা বন এবং উপদ্রবের আকর ধুমকেতু স্বরূপ ছিলেন ।

(৪) অশক্য — অসাধ্য ।



ଅହମ୍ମଦାବାଦ — ବୁଲିଯିବା ।

পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শান্তাইল । (১)
 ভূমি দান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল ॥
 ধর্মসাগর (২) নামেতে জলাশয় দিয়া ।
 তার চারি পারে সব দ্বিজ বসাইয়া ॥
 মহা বিষ্ণুবেতে (৩) দিল ভূমি উৎসর্গিয়া ।
 কোতুকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চিয়া ॥
 কোতুকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমি দান ।
 তাম্র পত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ ॥

অথ শ্লোক ।

চন্দ্র বংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সূধীঃ ।
 শ্রীশ্রীমদ্র্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভবঃ ॥

তথার পয়ার ।

চন্দ্র, বংশেতে মহামাণিক্য নৃপবর ।
 তান পুত্র শ্রীধর্মমাণিক্য শশধর ॥

শ্লোকঃ ।

শাকে শূক্ৰাষ্ট বিশ্বাক্ষে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ ।
 ত্রয়োদশাং সিতেপক্ষে মেঘে, সূর্যাস্ত সংক্রমে ॥

তথার পয়ার ।

তের শত আশী শকে সোমবার দিনে ।
 শুরু পক্ষ ত্রয়োদশী মেঘ সংক্রমণে ॥

(১) শান্তাইল—শান্ত করিল ।

(২) কুমিল্লা সহরের বক্ষঃস্থলে, সুনীল ও স্বচ্ছ-বারিবিশিষ্ট যে বিশাল সরোবর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কোস্তভ মণির গ্রায় শোভা পাইতেছে, তাহাই মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সমুজ্জল কীর্তি 'ধর্মসাগর' । ইহার পূর্বতীরে কুমিল্লার জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

কৈলারগড়ে (কস্বায়) আর একটা ধর্মসাগর আছে, তাহাও এই মহাপুরুষের কীর্তি ।

(৩) মহাবিষ্ণু—সূর্য মীন রাশি হইতে যে সময় মেঘ রাশিতে সংক্রান্ত হয়, সেই সংক্রান্তিকে মহাবিষ্ণু বা মেঘ সংক্রান্তি বলে । এই সময় দিবারাত্রি সমান বলিয়া ইহার নাম মহাবিষ্ণু । ইহার অপর নাম চৈত্র সংক্রান্তি । এই সংক্রমণ দিন অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য । এই দিনে শক্ত (ষবের ছাতু) ও বারিপূর্ণ ঘট দান করিলে পরমাগতি লাভ হয় ; যথা :—

“এষ ধর্ম ঘটোদত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাশ্বকঃ ।
 অস্ত প্রদানাং সফলা মম সন্ত মনোরথাঃ ॥
 বৈশাখে ঘো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজম্ননে ।
 দদাতি সুররাজেন্দ্র ! স যাতি পরমং গতিম্ ॥”
 (তিথিতত্ত্ব ।)

এই দিন পিতৃলোকের উদ্দেশে জলপূর্ণ ঘট এবং ছত্র ও পাত্ৰাদি দান বিশেষ পুণ্যজনক ।

তাম্র পত্রে লিখি দিল এ সব বচন ।
 অমা বংশ মারি যেনা হয় ত রাজন ॥
 তাহার দাসের দাস হইবেক আমি ।
 অমা কীর্ত্তি ব্রহ্ম বৃদ্ধি না লজ্জিও তুমি * ॥
 এই মতে মহারাজা ত্রীধর্ম্মনাগিক্য ।
 মথেন্ত করিল দান কহিতে অশক্য ॥
 পূর্ব্ব রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে ।
 পয়ার গাঁথিল সব সকলে বৃত্তিতে (১) ॥
 স্ত-ভাষাতে (২) ধর্ম্মরাজে (৩) রাজমালা কৈল ।
 রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল ॥
 বত্রিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ ছিল ।
 সুনন্দুর বাক্যে রাজা প্রতাপকে পামিল ॥
 শীতলা হইয়া রাজা স্বর্গ আরোহণ ।
 ত্রীধন্য প্রতাপ হুই তাহার নন্দন ॥

প্রতাপমাগিক্য খণ্ড ।

প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে ।
 অধাশ্বিনক দেখি তাকে লোকে আরে পরে ॥
 মহা বলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে ।
 সেনাপতি সবে চক্রে রাত্রিতে বধিছে ॥
 ছলক্ষ্মল ভয় বহু রাঙ্গানাতী হৈল ।
 পুরোহিত গুপ্তভাবে ধন্যকে রাখিল ॥
 পরস্পর রাজা হৈতে চাহে সেনাপতি ।
 না মানে কাহারে কেহ প্রাণ ভয় অতি ॥
 শ্রেষ্ঠ বড় সেনাপতি মনেতে ভাবিয়া ।
 বিবেচনা করিলেক স্থিরতা হইয়া ॥

* সনন্দের বিবরণ পরবর্ত্তী টীকার দ্রষ্টব্য ।

(১) ইহা রাজমালা প্রথম লহর ।

(২) রাজমালা ত্রিপুর ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছিল । এ স্থলে বঙ্গ ভাষাকে 'স্ত-ভাষা' বলা হইয়াছে ।

(৩) ধর্ম্মরাজ—ধর্ম্মমাগিক্য ।

ধন্য নামে আছে এক নৃপতি নন্দন ।
 ভাহাকে করিব রাজা করি শুভক্ষণ ॥
 এহা ভাবি গেল ভারা ধাত্রী আছে যথা ।
 জিজ্ঞাসিল ধন্য তুমি রাখিয়াছ কোথা ॥
 রাজা করিবার তরে চাহি যে ভাহারে ।
 শুভ দিনে রাজা করি দেও আমি তারে ॥
 এ কথা শুনিয়া ধাত্রী হরিল বিনাদ ।
 নারিবার চাহে বুঝি না জানি প্রমাদ ॥
 ধাত্রী বলে জানি ধন্য গেছে কোন স্থান ।
 তুমি সত্য কৈলে আমি বিচারি সন্ধান ॥ (১)
 সত্য করি সেনাপতি শালগ্রাম ছুইল ।
 পুরোহিত ঘরে ছিল সঙ্কটে বলিল ॥

পরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি ।
 পুরোহিত গৃহে গেল হস্তী অশ্বে চড়ি ॥
 মাচান্নের (২) নীচে হৈতে ধন্যক আমিছে ।
 ভয়বুক্ত মধুর বাক্য বালক বলিছে ॥
 একাদশ বর্ষ হৈছে ধন্যের বয়স ।
 বালক মারিয়া নহে রাখিও কুব্ধ ॥
 পুরোহিত ঘরে আমি সেবক হইয়া ।
 এক মুষ্টি অন্ন খাই উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া ॥ (৩)
 পুরোহিতে বলে সত্য করাইছি আমি ।
 মনে ভয় না করিবা রাজা হবা তুমি ॥

(১) পাঠান্তর—“আমি ত না জানি ধন্য গেলেন কোথাই ।
 তুমি সত্য কর আমি বিচারিয়া চাই ॥”

(২) মাচান্ন—বংশনক্ষ । সেনাপতিগণের আগমনে ভীত হইয়া কুমার ধন্য, প্রাণ রক্ষার
 নিমিত্ত বংশ-নক্ষের নীচে লুক্কায়িতভাবে ছিলেন ।

(৩) পাঠান্তর—“পুরোহিত ঘরে আমি সেবক হইয়া ।
 এক মুষ্টি অন্ন খাইমু উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া ॥”

প্রাণভয়ে ভীত রাজকুমার সেনাপতিগণের রূপা বাভের নিমিত্ত প্রবন্ধি দৈত্য জ্ঞাপন
 করিয়াছিলেন ।

ভার্গবে(১) আনিয়া বেন বলি রাজা করে । (২)
 পুরোহিতে ধন্য দিল সবার গোচরে ॥
 ধন্যেরে দেখিয়া তবে যত সেনাপতি ।
 বিনয় পূর্বক সবে করিল প্রণতি ॥
 অধার্মিক দেখি তোমার ভ্রাতৃকে মারিল ।
 রাজা করিবারে তোমায় নিবার আসিল ॥
 তোমার পিতার ধর্ম্ম স্মরিয়া আপনে ।
 পালহ সকল প্রজা বার বেই স্থানে ॥ (৩)

ধন্যমাণিক্য খণ্ড ।

এ বলিয়া মন্ত্রাসবে স্নান করাইল ।
 সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল ॥
 লোকে ধন্য বলিয়া তখনে কহিলেক ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য খ্যাতি হৈল অভিযেক ॥
 বড় সেনাপতি (৪) দিল আপনার কন্ডা ।
 মহারানী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্য ॥
 বঙ্গভাষা গীত রাজা তাতে না বৃথিল ।
 প্রেত চতুর্দশী গান বর্ণিয়া শুনিল ॥ (৫)

(১) ভার্গব—ভৃগুমন্দন, গুক্রাচার্য্য ।

(২) শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দৈত্যরাজ বলি, দেবতাগণের সন্তিত যুদ্ধে পাজয় এবং ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । স্বীয় গুরু গুক্রাচার্য্যের রূপায় তিনি পুনর্কাল জীবিত হইয়া, তাঁহারই অনুগ্রহে স্বর্গরাজ্য জয় এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া ইন্দ্রের সম্পদ লাভে সন্মত হইয়াছিলেন ।

সেনাপতিগণের হস্তে মৃত্যু আন্বিত ধন্যমাণিক্য পুরোহিতের প্রবলে রাজ্যলাভ করায়, ভার্গবের রূপায় মৃত বলিরাজ পুনর্জীবিত হইয়া রাত্বে প্রাণ্ডির সন্তিত তুলনা করা হইয়াছে ।

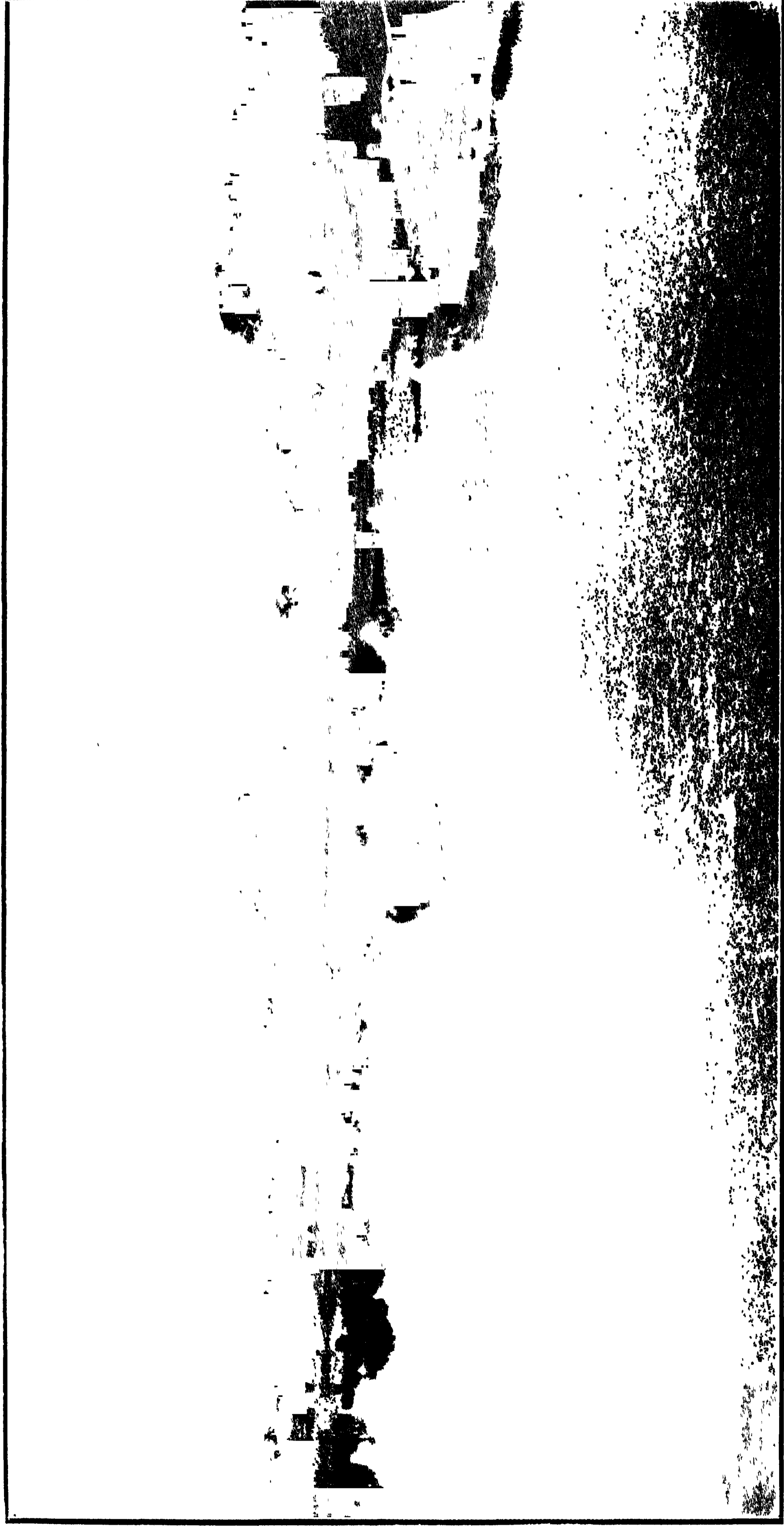
(৩) যে ব্যক্তি দরবারে বেক্রপ স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা তেমনার পিতৃ নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে স্থির হইয়া রাখিয়া প্রজার পালন কর ।

(৪) বড় সেনাপতি—দৈত্য নারায়ণ । ইনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন । ধন্যমাণিক্যের মহিলা ইহার কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম কমলা মহাদেবী ।

(৫) পাঠান্তর—“বঙ্গভাষায় তৈত্রিঃ কথা না বৃথিল ।

প্রেত চতুর্দশীর নাট স্তম্ভায়ায় শুনিল ॥”

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে ভূত চতুর্দশী বা যম চতুর্দশী বলে । এই তিথিতে ভূতের উপদ্রব নিবারণকল্পে নানাবিধ কার্য্য করা হয় । স্বন্দপুবাণ—বিষ্ণু খণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে প্রেত চতুর্দশীই উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা কাঙ্ক্ষিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী ।



কমলাসাগর—(কসবা) ।

রাম কবি সৃজিলেক সেই ত নৃপতি । (১)
 শ্রীধনু মাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি ॥
 নানা স্থানে কমলা যে দীর্ঘিকা দিয়াছে । (২)
 পুণ্য হেতু পুষ্কনীতে তৃণ না জন্মিছে ॥
 দেব গুরু দ্বিজে ভক্তি স্চরিত্রা অতি ।
 বিদুর কমলা হেন, শিবের পার্শ্বভী ॥
 অনেক করিল ধর্ম্ম গুণ মহারাজ ।
 বিস্তারি কহিলে পুনঃ হইবেক ব্যাজ ॥
 শ্রীধনু মাণিক্য রাজা হৈয়া নরপতি ।
 বৎসরেক হেন মতে পানিলেক ক্ষিতি ॥
 সেনাপতি সকলের অনুমতি বিনে ।
 কিছু কর্ম্ম নৃপতি না করে কোন দিনে ॥
 এই মতে রাজ কার্য্য চলিল তখন ।
 পুরোহিতে নৃপতিরে মন্ত্রণা রচন ॥
 দশ সেনাপতি স্থানে সৈন্য বহুতর ।
 রাজ সৈন্য মধ্যে আমি বিপ্র একেশ্বর ॥ (৩)
 সহস্রেক সৈন্য পঞ্চ সহস্র পাইছে । (৪)
 সেনাপতি সবে সৈন্য বাঁটিয়া লইছে ॥

বঙ্গভাষায় প্রেত চতুর্দশী গান প্রচলিত ছিল বলিয়া রাজমালার কথায় বুঝা যায়। মহারাজ এই গীত বৃত্তিতে না পারায় স্তভাষায় পুনর্বার বচনা করাইয়াছিলেন। এই ‘স্তভাষা’ শব্দদ্বারা সংস্কৃত ভাসাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

(১) পাঠান্তর—“রাম কবি সৃজিলেক সেই নৃপতি গীত ।
 শ্রীধনু মাণিক্য রাজার হইলেক প্রীতি ॥”

এই বাক্যদ্বারা জানা যায়, উপরিউক্ত প্রেত চতুর্দশীর গীত রাম কবির রচিত। এই কবির পরিচয় বা তাঁহার রচিত গান বর্তমানকালে পাইবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রেত ভয় নিবারক রামায়ণ হইবে।

(২) কস্বার সন্নিহিত ‘কমলাসাগর’ দীঘি মহারানী কমলা দেবীর সমুজ্জল কীর্তি। এই দীর্ঘিকার জল এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা পান করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়, সাধারণ লোকের ইহাই বিশ্বাস। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ‘কমলাসাগর’ ষ্টেশন এই সরোবরের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত, এবং উক্ত সরোবরের নামানুসারে ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উদয়পুরে আর একটা ‘কমলাসাগর’ আছে।

(৩) পাঠান্তর—“দশ সেনাপতি ঘরে হসম বিস্তর ।
 রাজ সৈন্য আমি মাত্র হইছি একেশ্বর ॥”

প্রাচীনকালে ত্রিপুররাজ্যে সৈন্যকে ‘হসম’ বলা হইত। বর্তমানকালেও এই রাজ্যে হসম ভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্বিবরণ এই লহরের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৪) পাঠান্তর—“কেহ সহস্র কেহ পঞ্চ সহস্র পাইছে ।”

ত্রিলোচন রাজাবধি এমত হইছে ।
 সেনাপতি সকলে রাজাকে বধিয়াছে ॥
 আপনা হইতে রাজা মারে সৃষ্টি করে ।
 এহা ভাবি চিন্ত আমার সদা থাকে ডরে ॥
 সৈন্য সেনা কাড়ি লৈলে নিৰ্ব্বলী হইব ।
 রাজা বলবন্ত হেন তবে ভয় পাইব ॥
 অসম্মতে সৈন্য সব ভুনি কাড়ি নিতে ।
 না জানি কি করে তারা আমার সহিতে ॥
 কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ ।
 নখে ছেদি বৃক্ষ কেন কুঠার লাগাই ॥ (১)
 মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয় ।
 বিকৃতি আকার হেরি লজ্জা যে জন্ময় ॥
 অস্ত্র দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে ।
 তবে তাকে উপহাস্য না করে সকলে ॥ (২)
 অতি শিষ্ট না হইব নাতি ক্রোধ মতি ।
 এই মতে বুঝাইছে শুক্র বৃহস্পতি * ॥
 রাজসিক ভাব যদি রাজার না হয় ।
 অতি শিষ্ট হৈলে রাজা জীবন সংশয় ॥
 কহিল তোমাতে যুক্তি আমি পুরোহিত ।
 আমা কথা মতে চল পাইবা বিহিত ॥
 মল্ল-বিদ্যা শিথিয়া থাকিবা অন্তঃপুরে ।
 রাজার ব্যাম বলি কব প্রজা সকলেরে ॥

(১) নখে ছেদনযোগ্য বৃক্ষে কুঠার লাগান নিশ্চয়োজন ।

(২) মহা ব্যাধি কিম্বা অধিকাঙ্গ হইলে তাহা ছেদন করা যেমন নিন্দনীয় নহে, তদ্রূপ
 অত্যাচারী সেনাপতিদিগকে বধ করাও নিন্দাজনক কার্য্য নয় ।

* “ন রাজ্ঞা মূহুনা ভাব্যং মূর্ছাং পরিভূয়তে ॥
 ন ভাব্যং দারুণে নাতি তীক্ষ্ণাচ্ছিজতে জনঃ ।
 কালে মূর্ছোভবতি কালে ভবতি দারুণঃ ॥”

মৎস্য়পুরাণ,—২২০ অঃ, ২২-২৩ শ্লোক ।

মর্শ ;—রাজা অতিশয় মূহু হইবেন না ; কারণ, মূহু ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত হয় । বিস্তৃত
 অতি উগ্র প্রকৃতিও হইবে না ; কারণ, তীর রাজা হইতে সকলেই উদ্ভিগ হইয়া থাকে । রাজা
 কালে মূহু ও কালে উগ্র হইবেন ।

∴ এই নীতিবাক্য শুক্রনীতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায় ।

ভাল যুক্তি বলিয়াছ রাজায় বলিয়াছে ।
 এ হতে অধিক যুক্তি আর নাহি আছে ॥
 ধন জন দিয়া কার্য্য সেনাপতি করে ।
 তিন মাসাবধি রাজা রোগাশ্রিত ঘরে ॥
 রাজার হইয়াছে রোগ জানে সর্বলোকে ।
 রাণী পিতা সেনাপতি রাজদ্বারে থাকে ॥
 রাজ কর্ম্ম করে যে সতর সেনাপতি ।
 মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করে ঘরে নরপতি ॥
 রাণী সঙ্গে দেখা রাজার নাহি কদাচিত ।
 রাণী পিতা শুনিলেক এসব চরিত ॥
 সেনাপতি কন্যা স্থানে জিজ্ঞাসা করিছে ।
 জামাতা নৃপতির কিবা ব্যাম জন্মিয়াছে ॥
 কন্যা বলে আমি তাকে না দেখি বিস্তর ।
 অন্ধকারে থাকে রাজা শরীর বৃহত্তর ॥
 সেনাপতি বুঝিলেক জল জন্ম রোগ । (১)
 এহাতে নৃপের বুঝি হবে দুঃখ ভোগ ॥
 নৃপতি দেখিতে চাহে সেনাপতিগণ ।
 পুরোহিত শুনিয়া বলে হৈল বিলক্ষণ ॥
 বড় দুঃখ পায় রাজা কহে পুরোহিত ।
 কালি দেখাইব রাজা চলিহ সহিত ॥

রাজার নিকটে কহে পুরোহিত তখন ।
 পুরোহিত নৃপতি মন্ত্রণা সেইক্ষণ ॥
 ত্রিশ চল্লিশ জন সেনা তখনি আনিয়া ।
 গুপ্ত কথা শিখাইল গোপন করিয়া ॥
 পুরোহিত করে যাকে ইঙ্গিত আকার ।
 খড়গ দিয়া মস্তক কাটিবা শীঘ্র তার ॥
 এমত সঙ্কানে দ্বারে রাখে বীর জন ।
 নিশাকালে করে রাজা এসব রচন ॥

(১) রাজার শরীর হৃষ্টপুষ্টি হইয়াছে শুনিয়া সেনাপতি মনে করিলেন, রাজা পাণু-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ।

নৃপতি দেখিতে চলে দশ সেনাপতি ।
 পুরোহিতে লৈয়া গেল অতি শীঘ্রগতি ॥
 পুষ্ট হৈছে নরপতি মল্ল বিগ্না ক্রমে ।
 দেখি সেনাপতিগণে রাজাকে প্রণমে ॥
 প্রীতি কথা কহি রাজা বিদায় করে পুনি । (১)
 প্রণমিয়া সেনাপতি বিদায় তখনি ॥
 হাঁসিত করিল দ্বিজে নমস্কার কালে ।
 খড়্গাতে মস্তক কাটে সেনাপতি (২) ছলে ॥
 সেনাপতি দেহ সব করিল অন্তর ।
 পুত্র পৌত্র মারিয়া লুটিল সেনা ঘর ॥
 সেনাপতিগণ ঘরে বীর শূন্য হৈল ।
 নৃপতি নবীন সৈন্য বিবেচি (৩) রাখিল ॥
 গোড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার ।
 বার কোটী পদাতি নৃপ করয়ে প্রচার ॥
 সরদার করিলেক অর্দ্ধ সৈন্য দিয়া ।
 হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া ॥
 বার কোটী সেনা হৈল অনুক্রম মতে ।
 অশেষ রাজার সৈন্য হইল তাহাতে ॥
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা তদনধি সেনা ।
 বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ॥
 নূতন করিল রাজা সব সেনাপতি ।
 রাজ আঞ্জা অনুসারে কার্যে করে গতি ॥ (৪)
 এই মতে সেনা লোক করিল স্থাপন ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পুণ্যের ভাজন ॥
 কালান্তরে মহারাজা মনে বিবেচিল ।
 বঙ্গদেশ জিনি লৈতে মনেতে চিন্তিল ॥

(১) পুনি—পুনর্বার ।

(২) সেনাপতি—সেনাপতির ।

(৩) বিবেচি—বিবেচনা করিয়া ।

(৪) সেনাপতিগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া, রাজ আঞ্জানুসারে কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ।



মেহারকুল পাটীকারা গঙ্গামণ্ডল গ্রাম ।
 বগামারি আদি করি বহুবিধ নাম ॥
 বেঙ্গুরা যে কৈলা আদি ভানুগাছ দেশ ।
 বিষগজুড়ী লঙ্গলা লয় জিনিয়া বিশেষ ॥
 গৌড়াধিপতি রাজ্য বরদাখাত আদি ।
 রাজ্যে কাড়িয়া লৈল হইয়া বিরোধি ॥ (১)
 বরদাখাতে জমিদার প্রতাপ মহামতি ।
 গৌড়ে না মিলিয়া রাজা সঙ্গে করে প্রীতি ॥
 এইরূপে বঙ্গ দেশ আমল সকল ।
 না মিলে খণ্ডল রাজ্য হইয়া সবল ॥
 খণ্ডলে নৃপতি সৈন্য বসাইল থানা ।
 লক্ষর (২) করিয়া রাখে রাজ এক সেনা ॥
 আমল (৩) করিয়া খণ্ডল সসৈন্যে বসিল ।
 খণ্ডিয়া লোকে তাতে লক্ষর ধরিল ॥
 লক্ষর ধরিয়া তারা নিলেক গৌড়েতে ।
 যুক্তি করি দিল নিয়া গৌড়ের অগ্রেতে ॥
 হস্তা দিয়া মারিতে গৌড়েশ্বরে আক্রম দিল ।
 হস্ত পদে জিজির (৪) লক্ষর লৈয়া গেল ॥
 লক্ষরে বুঝিল তাকে মারিবে নিশ্চয় ।
 এক সেনা হস্ত হৈতে খড়্গ কাড়ি লয় ॥
 মারিল বিংশতি জন বিক্রম করিয়া ।
 নাহতে টুয়াইল (৫) গজ অক্ষুশ মারিয়া ॥
 নাকে মুখে মারিলেক পঞ্চ তলোয়ার ।
 ভঙ্গ দিল সেই গজ ছাড়িয়া চাঁৎকার ॥
 অন্য মহাগজ আনি পুনঃ টুয়াইল ।
 বিক্রমে মারিল কোব্ দন্তেতে লাগিল ॥

(১) এই সকল স্থানের বিবরণ এই লহরের টাকায় প্রদান করা হইয়াছে ।

(২) লক্ষর—শাসনকর্তা । এই পদ মুসলমানের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল ।

(৩) আমল—দখল ।

(৪) জিজির—শৃঙ্খল ।

(৫) টুয়াইল - নোখাইল ।

ধন্য ধন্য বলি তাকে কহে সর্বলোকে ।
 এমত বিক্রম লোক পর্বতেতে থাকে ॥
 আর চোটে মারিছিল খড়্গা যে ভাঙ্গিল ।
 সেই ত কারণে গজে তাহাকে বধিল ॥
 এ কথা শুনিয়া কহে গোড়ের ঈশ্বর ।
 ফিরাইয়া না আনিলা আমার গোচর ॥ (১)
 আপনার কর্ম্ম দোষে এমতে মরিল ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা এ সব শুনিল ॥
 অগ্নি হেন ক্রোধে জ্বলে রাজা মহাবল ।
 রায়কাচাগ সেনাপতি পাঠায় খণ্ডল ॥
 কটক (২) দেখিয়া তারা ভয়াতুর হৈল ।
 বিষ কুস্ত পয়ো মুখ মতে মিলি ছিল ॥ (৩)
 দ্বাদশ বসিক (৪) সে যে খণ্ডল জমিদার ।
 আনিল রাজার পাশে মান্য ব্যবহার ॥ (৫)
 প্রধান বসিক সঙ্গে মিত্রতা রাজার ।
 আর বসিক মিত্রতা যে সেনা সমথার ॥
 আর দিন রাজা বলে বসিকের ঠাই ।
 আপনা হাজিরা দেহ দেখিতে যে চাই ॥
 গোপনেতে শিখাইল ত্রিপুর সৈন্যে ।
 এক সেনা এক বসিক থাকিবা অন্তরে ॥
 যে সময় আমি বলি সবে মিত্র কর ।
 যার সেই ভাগে পড়ে কাটিবা সত্তর ॥

(১) আমার নিকট ফিরাইয়া আনিলা না কেন ?

(২) কটক—সৈন্য ।

(৩) বিষপূর্ণ কুস্ত পয়ো মুখে মিলি মিলি রক্ত চ লিয়া তাহাকে মৃত কুস্ত প্রতিপন্ন ব বিবার প্রয়াসের
 ছায়, অনেক শত্রু হত্যার বিদ্রোহ নহি নিষ্ঠ বাক্যের আধরণে ঢাকিয়া, সম্মুখে মিত্রের ছায় ব্যবহার
 করে, এবং পরোক্ষ শত্রু সাধনে প্রবৃত্ত হয় । নীতি শাস্ত্রে এই শ্রেণীর লোক ‘বিষকুস্ত
 পয়োমুখম্’ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে, যথা ; —

“পরোক্ষ কার্যাত্তারং প্রত্যক্ষ প্রিয়বান্দি ।

বর্জয়ত্তদপং মিত্রং বিষকুস্তং পয়োমুখম্ ॥”

(৪) বসিক—ভূম্যধিকারী, শাসনকর্তা । মুসলমান শাসনকালে খণ্ড খণ্ড ভূভাগে এক এক
 জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত, উক্ত বিভক্ত ভূভাগকে ‘সিক’ এবং তাহার শাসনকর্তাকে
 ‘বসিক’ বা ‘সিকদার’ বলা হইত । ‘দক্ষিণ সিক’ ও ‘ছত্র সিক’ ইত্যাদি ভূখণ্ডের নাম
 এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে ।

(৫) মান্য ব্যবহার—ভেট ।

আমিহ কাটিব তার প্রধান বসিক ।
 আত্মে (১) বসাইব তাকে মান্বে মিত্রাধিক ॥
 এ সব মন্ত্রণা শুনি রাজ সৈন্যগণে ।
 স্তম্ভজা করিয়া আইল রাজার সদনে ॥
 বসিক সকল আইল হাজিরা দিবারে ।
 দুই সহস্র পদাতি আসিল ধনুশরে ॥
 বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসন পরে ।
 বসিক সকল বৈসে তারা পাট ঘরে ॥ (২)
 পংক্তি করিয়া সবে লিখায় হাজিরা ।
 কাহেন্তে গণিয়া বসিক লিখয়ে মুজরা ॥
 এক এক সেনা আগে এক এক বসিক ।
 পংক্তি পাছে রৈল গিয়া হইয়া রসিক ॥
 রাজ আজ্ঞা অনুসারে দাঁড়াইল গিয়া ।
 ইসারাতে কহে সেলাম বাঘ বাজাইয়া ॥
 সেলাম করিতে শির নত যেই কাল ।
 সেই কালে সেনা বসিক কাটে খড়্গে ভাল ॥
 প্রধান বসিক ঘাতে নৃপতিয়ে আগে ।
 সেনায় কাটিল বসিক যার যেই ভাগে ॥
 এই রূপে কাটিয়া যে খণ্ডলের প্রজা ।
 সসৈন্যে খণ্ডলে গেল সেই মহারাজা ॥
 বৃক্ষ পত্র পৈরাইয়া (৩) খণ্ডল লুটিল ।
 এই রূপে খণ্ডল দেশ আপনা হইল ॥ (৪)
 পুনর্ব্বার দেশে আসি ধর্ম্ম আরম্ভিল ।
 ধর্ম্ম মঠ ধনু সাগর (৫) প্রতিষ্ঠাদি কৈল ॥

(১) আত্মে—অগ্রে ।

(২) তারা পাট ঘর—দরবার গৃহ । নক্ষত্রসদৃশ পারিষদবর্গের দ্বারা দরবারে উপবেশনের পাট (আসন) স্তম্ভোত্তিত বলিয়া, আসনের নাম 'তারা পাট' এবং দরবার গৃহের নাম 'তারা পাট ঘর' হইয়াছে ।

(৩) পৈরাইয়া—পরিধান করাইয়া ।

(৪) খণ্ডল অঞ্চলে রাজা রামগতির এক গল্প প্রচলিত আছে । পরবর্ত্তী টীকায় এই গল্প সন্নিবিষ্ট হইবে ।

(৫) ধনুসাগর ;—এই সুবিশাল সরোবর ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে অত্ৰাপি বিদ্যমান থাকিয়া মহারাজ ধনুমানিক্যের কীর্ত্তি নোষণা করিতেছে । এই বিশালবাপী

দুই বর্ষে কাটিছিল সে ধন্য সাগর ।
 করিল অনেক দান সেই নৃপবর ॥
 ভূম্যাদি ষোড়শ দান (১) করিল বিস্তর ।
 বিবাহ করায় রাজা ব্রাহ্মণ কৌণ্ডর ॥
 দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নৃপবর ।
 আর খাওয়াইল সৈন্য সেনা বহুতর ॥
 সাগরের চারি পারে বৈসায় নানা জাতি ।
 রন্ধন ভোজন তথা যার সেই পংক্তি ॥
 সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চতে বসিল ।
 কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল ॥ (২)
 সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে হুখে ।
 সরদার গণিবারে গেলেন সমুখে ॥
 সেনা অন্ন যষ্টি (৩) লৈয়া স্পর্শিয়া গণিল ।
 খাইতে ছুইল যাকে কাঠি ছোয়া হৈল ॥
 না ছুইতে আগু পিছে খাইল উত্তম ।
 যার মুখে অন্ন ছিল সেই ত অধম ॥
 রাজ ঘরে দিছে সিধা (৪) ত্যজিতে না পারে ।
 ছোয়া অন্ন গিলিলেক মারিবেক ডরে ॥
 এই মতে কাঠি ছোয়া নাম কত সেনা । (৫)
 শ্রীধন্য মাণিক্যাবধি হইল গণনা ॥

‘ফুলকুমারী’ মৌজায় অবস্থিত । ইহার দৈর্ঘ্য ১,০০০ হাজার গজ, প্রস্থ ২৭০ গজ, গর্ভস্থ ভূমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ ন্যূন নয় দ্রোণ । এই সরোবর সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ; —

“ধন্য সাগর উদয়পুরে করিল খনন ॥”

(১) ষোড়শ দান ;—শ্রাদ্ধাদিকালে অথবা পুণ্য কামনায় ষোল প্রকার দ্রব্য দান করা বাবস্থেয় । (১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ, (৬) তন্ন, (৭) ভাঙ্গুল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মালা, (১১) ফল, (১২) শয্যা, (১৩) পাছকা, (১৪) ধেনু, (১৫) হিরণ্য, (১৬) রজত, এই ষোলবিধ দ্রব্য দান করাকে ষোড়শ দান বলে ।

(শুদ্ধি তত্ত্ব) ।

(২) পাঠান্তর—“এনত সময়ে রাজা মঞ্চত বসিয়া ।

লক্ষ্মণ সরদারকে বোলে দেখহ গণিয়া ॥”

(৩) অন্নযষ্টি—ভাতের কাঠি ।

(৪) সিধা—ভেট । চাউল, ডাল ইত্যাদি আহাৰ্য্য বস্তু একত্রিত করিয়া দিলে তাহাকে সিধা বলে ।

(৫) কাঠিছোঁয়া নব্বন্ধীয় বিবরণ এই লহরের টীকায় প্রদান করা হইয়াছে ।

সাগরের খনন দেখিতে মহারাণী ।
 সৈন্তের রমণী সঙ্গে রাত্রিতে আপনি ॥
 জ্যোৎস্না কাল কোন রাত্র নারীগণ সঙ্গে ।
 মদ্য মাংস খাওয়াইয়া চাহে বহু সঙ্গে ॥
 এই মতে আনন্দেতে বঞ্চিল তখনি ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা কমলা মহারাণী ॥

ডাঙ্গর ফা রাজার কালে থানাংছিতে থানা ।
 থানাংছি না মিলিলেক রাজাতে আপনা ॥ (১)
 থানাংছিতে এক হস্তী ধবল আছিল ।
 হেড়ম্ব (২) রাজায়ে তাকে চাহিয়া পাঠাইল ॥
 হেড়ম্বের দূতে আসি থানাংছিতে বলে ।
 ত্রিপুর সেবক তুমি আমার যে হৈলে ॥
 তাহা শুনি রুষ্ঠ হৈল থানাংছি নৃপতি ।
 ত্রিপুর তোমাতে নাহি দিব এই হাতী ॥ (৩)
 সেবক নহে আমি ত্রিপুর রাজার ।
 শুক হস্তী নাহি দিব যুদ্ধ কর সার ॥
 শুনিয়া হেড়ম্ব পতি আসিলেক রোষে ।
 সৈন্তেতে বেষ্টিত কৈল থানাংছি চারি পাশে ॥
 সেই কালে ত্রিপুর দূত কহে থানাংছিতে ।
 ত্রিপূরে না দিয়া হস্তী দেহ হেড়ম্বেতে ॥
 এত শুনি বলিলেক থানাংছি নৃপতি ।
 আনাকে জিনিয়া তোরা নেহ এই হাতী ॥
 মহা পর্ষভেতে থানা এক তার দ্বার ।
 মহা বত্রে হেড়ম্ব না পারে পশিবার ॥
 ছয় মাস চেঁটা করি হেড়ম্ব চাহিল ।
 তথাপিহ থানাংছি হেড়ম্ব না ভজিল ॥
 সেই সে কারণে কুকি রাজাতে না মিলে ।
 সে পথে আসিতে কুকি থানাংছি লুটে বলে ॥

(১) থানাংছিতে (কুকি প্রদেশে) ডাঙ্গর ফায়ের সময় সৈন্তের থানা ছিল, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেই প্রদেশের কুকিগণ বিদ্রোহী হইয়া ত্রিপুরেশ্বরের সহিত মিলনে অসম্মত হইয়াছিল ।

(২) হেড়ম্ব—কাছাড় রাজ্য । (৩) এই হাতী ত্রিপুরেশ্বরকে অথবা তোমাকে দিব না ।

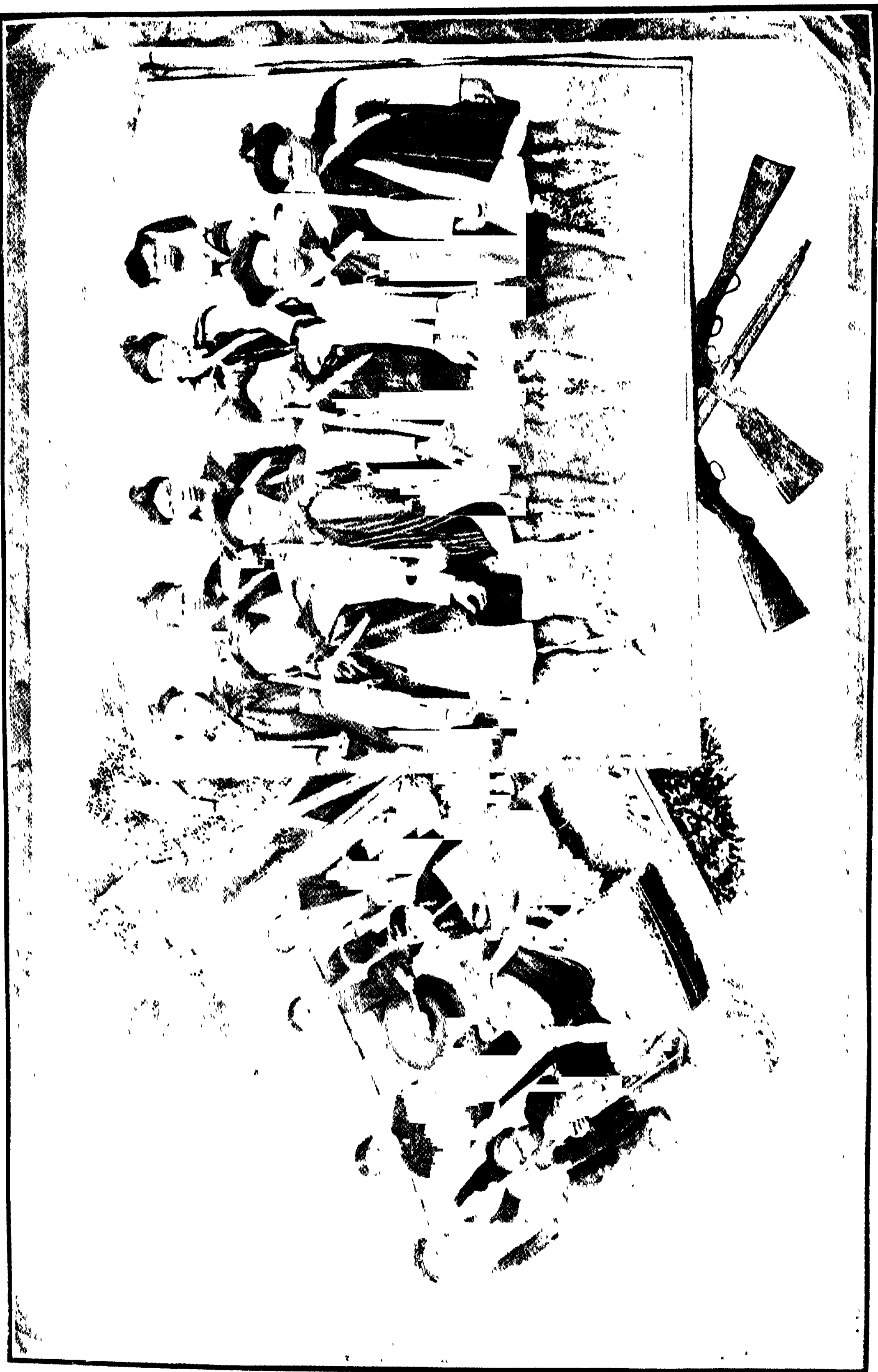
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা এ বার্তা শুনিয়া ।
 রায়কাচাগ সেনাপতি যুদ্ধে পাঠাইয়া ॥
 ত্রিপুর সহস্র সৈন্য দিল তার সঙ্গে ।
 রায়কাচাগ সেনাপতি চলে যুদ্ধে রঙ্গে ॥
 শুভক্ষণে সৈন্য সেনা করিল গমন ।
 কত দিনে থানাংছি পাইল সৈন্যগণ ॥
 রাজদূতে চাহে থানাংছি মিলাইতে ।
 না মিলিল সেই রাজা প্রণয় করিতে ॥
 অষ্ট মাস যুদ্ধা সব গড় (১) বেড়ি রহে ।
 তথাপি থানাংছি গড় লজ্জিবার নহে ॥
 চারি দিকে গড় সব পাষণ পর্বতে ।
 লজ্জিবার কার শক্তি নহিল তাহাতে ॥
 বিশ ত্রিশ জন গড়দ্বারে বসি থাকে ।
 মদ্য মাংস খায় তারা অস্ত্রধারী ফাকে ॥
 গড়ের উপরে সৈন্য মদে মত্ত হৈয়া ।
 ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়া ॥
 রায়কাচাগ সেনাপতি তাতে ক্রুদ্ধ হৈল ।
 আপনা সৈন্যের প্রতি বহুল ভৎসিল ॥
 কাপুরুষ হও তোরা চরখা হস্তে লবা । (২)
 রাজার সাক্ষাতে যাইয়া কি উত্তর দিবা ॥
 এ বলিয়া সেনাপতি ঘর চাল ফোড়ে ।
 বৃষ্টি জল পড়ুক ঘরের ভিতরে ॥
 জলেতে ভিজিলে সৈন্য নিদ্রা না আসিবে ।
 তবে সে রাজার কৰ্ম বুঝিয়া করিবে ॥
 এই যুক্তি সেনাপতি করিল সলিকা (৩) ।
 দৈবগতি তথা এক পাইল গোধিকা (৪) ॥
 অষ্ট হস্ত দীর্ঘ গোধা পার্শ্বে তিন হাত ।
 গোধার কমরে (৫) বান্ধে দীর্ঘ বেত্র তাত ॥

(১) গড়—দুর্গ ।

(২) ত্রিপুর রাজ্যে অকৰ্মণ্য সৈন্যগণের দণ্ডস্বরূপ চরখা প্রদান করা হইত । এতদ্বিধরণ পরবর্তী
টীকায় দ্রষ্টব্য । (৩) সলিকা—সন্ধান । (৪) গোধিকা—গো সাপ । (৫) কমর—কটাদেশ ।

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.





শিশু সন্ধান সহ কৃকি-দম্পতি

ছাড়িয়া দিলেক গোহিল গড়ের উপর ।
 যত দূর যায় গোধা বোড়ে বেত্রান্তর ॥
 এই মতে চড়ে গোধা গড়ের উপর ।
 টানিয়া চাছিল সৈন্য হৈল দৃঢ়তর ॥
 গড়ে ছিল যত লোক মদ্য মাংসে ভোনা ।
 না লৈল চৌদিগে বাৰ্তা করি অবহেলা ॥
 রাত্রি বোগে যুদ্ধা শবে বেতে ধরি তায় ।
 খড়্গ চৰ্ম্ম হাতে করি কোঠ (১) পরে যায় ॥
 গড়ে চড়িতে সেনা ঢালে শব্দ হৈল ।
 গবয়ে (২) ঘসিছে গো ও থানাংছি বুঝিল ॥
 রাত্রি শেষ হয় তাতে দুই দণ্ড আছে ।
 রাজ সৈন্য কোঠে গেল কোতুকেতে নাচে ॥
 পুরুষ সকল যত প্রাণীকে বধিল । (৩)
 থানাংছির গড়াপরে রক্ত নদী হৈল ॥
 নারী সব লুটিয়া লইল সর্বজন ।
 দৈবগতি মাসেকের (৪) বালক রক্ষণ ॥
 যার মাতা তখনেতে (৫) স্বামী এক করে ।
 কন্যা বলিয়া তাকে পালিল সত্বরে ॥ (৬)
 এই মতে আমল হৈল থানাংছির থানা ।
 রাজনীতি থানাদার থাকে এক জনা ॥
 দুর্গোৎসব হয় তথা নৃপ নাম করি ।
 তদবধি থানার নাম ত্রিপুরার পুরী ॥

(১) কোঠ—ভূর্গ । (২) গবয়—গরাল, গো ও মহিষের লক্ষণবিশিষ্ট বস্তু জন্তু ।

(৩) গড়ে যত পুরুষ ছিল তাহাদের সকলকেই বধ করিল ।

(৪) মাসেকের—এক মাস বয়স্কদের ।

(৫) তখনেতে—সেই সময়, তৎকালে ।

(৬) পাঠান্তর—“যার মাতা সেইক্ষণে স্বামী এক কৈল ।

কন্যাটা লইয়া তারে পালিতে রাখিল ॥”

ত্রিপুরবাহিনী কর্তৃক থানাংচি ভূর্গ জয় হইবার পর, বিজিত সৈন্যের পুরুষমাত্রকেই বধ করিয়াছিল, দৈবগতি এক মাস বয়স্ক বালকগণ রক্ষা পায় । স্ত্রী লোকদিগকে ত্রিপুর সৈন্যগণ লুণ্ঠন করিয়া লইল । যে সকল রমণী সেইকালে ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, সেই রমণীগণের কন্যাদিগকে প্রতিপালনার্থ রাখা হইয়াছিল ।

রায়কাচাগ সেনাপতি নৃপেতে লিখিল ।
 যেমতে থানাংছি থানা আমল হইল ॥
 তাহা শুনি মহারাজা বড় তুষ্ট হৈল ।
 তদবধি সেনাপতি পুত্র মাণ্ড ছিল ॥
 যত যত ভাল দ্রব্য যুদ্ধে পাইয়াছিল ।
 রাজার সাক্ষাতে সব তাহা পাঠাইল ॥
 ইনাম (১) পাঠাইল নৃপে অনেক বসন ।
 পরে রায়কাচাগ গেল কিরাত ভুবন (২) ॥
 পূর্ব দিগেতে আণ্ডে কুকি মিলাইল ।
 দক্ষিণেতে ছিল কুকি জিনিয়া আনিল ॥
 সাম্বুল প্রধান স্থানে আপনে রহিয়া ।
 ছাইগার ছাইবেম দেশে দূত পাঠাইয়া ॥
 ছাকাচেব খামাচেব রাঙ্গরঙ্গ আদি ।
 ছাকা রাঙ্গল খামা রাঙ্গল পূর্ব কূলাবধি ॥
 গুনৈছা খচ্ছুং মাছিল আর কুকি জাতি ।
 ভেটিল সকল আসি পূর্বপর রীতি ॥
 সেনাপতি কহিলেক পূর্বপর কথা ।
 ত্রিপুরার প্রজা তোরা পূর্বাধি গাথা ॥
 অধর্ম করিলা তোরা লজ্জি নিজ ধর্ম ।
 সে কারণ ক্ষয় তোরা বুঝিয়াছি মর্ম ॥
 নৃপেতে দিলেক ভেট পূজিব চৌদদেবা ।
 সেই পুণ্যে তোমা সব দীর্ঘজীবী হবা ॥
 এহা যদি সেনাপতি তাহাকে কহিল ।
 দেবতা সাক্ষাতে তারা সত্য নির্বন্ধিল (৩) ॥
 রাজাতে না দিয়া ভেট আণ্ডে না খাইব ।
 যদি ইহা নাহি করি তবে নষ্ট হৈব ॥
 শিবালয় স্থান স্বেরাইখুঙ্গ (৪) নাম ।
 উৎসব করিল তথা যথা অনুপম ॥

(১) ইনাম—বক্শিস, পুরস্কার ।

(২) কিরাত ভুবন—লুমাই পর্বত ও তৎসম্বন্ধিত কুকি প্রদেশ

(৩) সত্য নির্বন্ধিল—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল ।

(৪) স্থান সমূহের বিবরণ পরবর্তী টীকায় দ্রষ্টব্য ।



কিরাতের প্রদত্ত রাজভেটের বস্তু।

- (১) গবয় (গয়াল), (২) গজদস্ত, (৩) ঘোংবাণ, (৪) কুকিয়া ছাগ, (৫) শক্তিঅস্ত্র ও খড়গ।

এই মতে সেনাপতি সত্য করাইয়া ।
 রাজার সাক্ষাতে কুকি দিল পাঠাইয়া ॥
 গজ দন্ত গবয় ছাগ (১) কাংশ্র বাঘ ঘোঙ্গ (২) ।
 রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বস্ত্র বিশাল স্ত্র রঙ্গ (৩) ॥
 কাংশ্র খালি পিকদানী তাশ্রের কঙ্কণ ।
 উবাকেরু (৪) জলপাত্র দেবদারু বন ॥
 কিরাতিয়া খড়্গ শক্তি পিত্তল কাংশ্র ঝারি ।
 রাজ ভেট্ পাঠাইল পূর্ব অনুসারি (৫) ॥
 নানাবিধ বস্ত্র যত নানা রঙ্গ ঘোড়া ।
 সহস্র সহস্র কুকি আসিল দিগম্বর (৬) ॥
 ইত্যাদি করিয়া দ্রব্য লইয়া বিস্তর ।
 গিলিল আসিয়া কুকি রাজার গোচর ॥
 ভেট্ দেখি নরপতি হরিষ অন্তর ।
 সেনাপতির মন্দ কহে রাজার গোচর ॥
 দুই বৎসর হয় তথা সেনাপতি যায় ।
 আসিবার ইচ্ছা নাহি রাজা হৈতে চায় ॥
 বড়ুয়া সবের কন্যা মনোরম যত ।
 সম্ভোগ করয়ে সে যে নানাবিধ মত ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা হাসিল তৎপর ।
 তাকে কেনে মন্দ বল রায়কাচাগ পুত্রবর ॥
 ফরমান (৭) লিখিল রায়কাচাগ আসিতে ।
 রাজধানী সেনাপতি আনিতে ত্বরিতে ॥
 সাম্বুল থানাতে লঙ্কর রাখি একজন ।
 বহুতর ভেট্ লৈয়া আসিল তখন ॥

- (১) ছাগ—কুকিগণের পালিত একজাতীয় ছাগ, ইহা তিব্বত দেশীয় ছাগের অনুরূপ ।
 (২) ঘোঙ্গ—কাংশ্র ধাতু দ্বারা নির্মিত কঁাসর বাঘ বিশেষ । ইহার শব্দ গস্তীর এবং দূরগামী কুকিগণ যুদ্ধকালে ও উৎসবাদি উপলক্ষে ইহা বাজাইয়া থাকে ।
 (৩) স্ত্র রঙ্গ—সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট ।
 (৪) উবাকেরু—জলপান করিবার পাত্র বিশেষ ।
 (৫) পূর্ব অনুসারি—পূর্ব নিয়মানুসারে ।
 (৬) দিগম্বর—উলঙ্গ ।
 (৭) ফরমান—রাজআজ্ঞা ।

সিংহাসনে বসিয়াছে ত্রিপুর রাজন ।
 সেই কালে সেনাপতি করিল ভেটন ॥
 স্বর্ণ রজত আদি বস্ত্রের আধিক্য ।
 দেখি বড় তুষ্ট হৈল শ্রীধন্য মাণিক্য ॥
 রায়কাচাগ সেনাপতি নৃপেতে বলিল ।
 আমার বিপক্ষে মন্দ সাক্ষাতে (১) বলিল ॥
 কুগন্ধা পত্নীতে কেন এত শ্রদ্ধা কর ।
 সুগন্ধা নারীকে কেন প্রাণেতে সংহার (২) ॥
 হাসিয়া নৃপতি তাকে বহু মাণ্য কৈল ।
 বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়া গৃহে পাঠাইল ॥
 বহুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম ।
 রায়কাচাগ রায় কছম যুদ্ধেতে উত্তম ॥

তার পরে শ্রীধন্য মাণিক্য নৃপবর ।
 চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর ॥
 চৌদ্দ শ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল ।
 চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল (৩) ॥
 গোড়ের যতক সৈন্য চট্টলেতে ছিল ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য তাকে দূর করি দিল ॥

হোসন সা গোড়েশ্বর এ বার্তা শুনিয়া ।
 বহুল কটক পাঠায় গোড় মল্লিক দিয়া ॥
 বার বাঙ্গালা (৪) সৈন্য গোড় মল্লিক সঙ্গে ।
 আর বহু সৈন্য দিল যত আছে বঙ্গে ॥
 বহুতর নৌকা সঙ্গে গোমতী (৫) উজাইয়া ।
 হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা সঙ্গে সাজাইয়া ॥
 মেহারকুল (৬) গড়ে আসি প্রথমে যুঝিল ।
 সেই কোঠে যুদ্ধে তাতে মোগল লইল ॥

- (১) সাক্ষাতে—রাজার সদনে ।
 (২) রায়কাচাগ নিজকে সুগন্ধা এবং অভিযোগকারী প্রজাবন্দকে কুগন্ধা বলিয়াছেন ।
 (৩) পূর্বকালে দেশ জয় করিয়া বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিয়ম ছিল
 এস্থলে স্বর্ণ মুদ্রাকে মোহর বলা হইয়াছে ।
 (৪) বার বাঙ্গালা—দ্বাদশ ভৌমিক কর্তৃক শাসিত বঙ্গের বার বিভাগ ।
 (৫) গোমতী—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর, এই নদীর তীরে অবস্থিত ।
 (৬) মেহারকুল—কুমিল্লা নগরী ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহ ।

ত্রিপুর সৈন্যে চণ্ডিগড় (১) পরে থানা করে ।
 গোড়াই মল্লিক সেই গড় লৈতে নারে ॥
 খোজা ছিল এক জন মন্ত্রণা পরিপাটী ।
 গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভাটী ॥
 নদীকূলে বৈসে ত্রিপুর রাজাগাট রাজ ।
 নদী বান্ধি ডুবাইয়া গারিব সমাজ (২) ॥
 এই যুক্তি করিয়া মেনাকে আত্মা দিল ।
 সোণামুড়া ভাটী দিয়া গোমতী বান্ধিল ॥
 তিন দিন রাখিলেক বান্ধিয়া গোমতী ।
 পর দিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী ॥
 পাঠান সকল জনে চাবুক মারয় ।
 রহ রহ বলি গালি দেয় এ বিয়য় ॥
 ক্রোধে মত্ত হৈয়া যত পাঠান বর্ষয় ।
 না মানে নদীয়ে বাক্য কম্পে থর থর ॥
 শ্রীধর মাণিক্য রাজা গুরতে কহয় ।
 অভিচার (৩) কর্ম কর শত্রু হউক ক্ষয় ॥
 অভিচার কর্মারম্ভ করে দ্বিজবরে ।
 সুন্দর মণ্ডপ কৈল তথায় চরে ॥
 প্রথম বয়স কৃষ্ণ বর্ণের চণ্ডাল ।
 বুণ্ডের উপরে দিল চান্দোয়াদি ভাল ॥

(১) চণ্ডিগড়—এই স্থান সোণামুড়ার পূর্বদিকস্থ মেলাধব ও কাঁকড়াবনের মধ্যবর্তী । এই স্থানে ত্রিপুর রাজার একটা দুর্গ ছিল ।

(২) সমাজ—দল । এখানে পাঠান সৈন্যদলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

(৩) অভিচার—হিংসাকর্ম । অথর্ববেদে মাবণ, উচ্চাটনাদি অভিচার কর্মের বিধান আছে । তন্মধ্যে ছয় প্রকার অভিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়,—(১) মাবণ, (২) মোহন, (৩) স্তম্ভন, (৪) বিদ্বেষণ, (৫) উচ্চাটন ও (৬) বশীকরণ ।

(১) মাবণ—দৈব ক্রিয়াদি দ্বারা কাহারও প্রাণ নষ্ট করা ।

(২) মোহন—কাহারও মনকে ভুলান ।

(৩) স্তম্ভন—মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা অস্ত্র, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি নষ্ট করা ।

(৪) বিদ্বেষণ—মন্ত্রাদি ঐশ্বর্য দ্বারা দুইজনের পরস্পর প্রণয় ভঙ্গ বরিয়া, উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মান ।

(৫) উচ্চাটন—মন অস্থির করিয়া দেওয়া । অর্থাৎ মন্ত্র বা ঔষধিষ্মা উন্মাদ করা

(৬) বশীকরণ—স্বর্গী লোক প্রভৃতিকে বশীভূত করা ।

ইহার প্রত্যেক কার্যের মন্ত্রাদি, কার্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বিবিধ বিবরণ তন্মধ্যে লিখিত আছে ।

সপ্ত দিন সপ্ত রাত্র মগুপে রহিল ।
 যজ্ঞ শেষে চণ্ডালের মস্তক কাটিল ॥
 রায় বার (১) সঙ্গে দিল সে মুগু লুকাইয়া ।
 গোড়াই মল্লিকের সৈন্যে (২) মুগু গাড়ে (৩) নিয়া ॥
 আচম্বিত (৪) রাত্র কালে মহা শব্দ হৈল ।
 ত্রিপুর সৈন্য আইসে বলি গোড় ভঙ্গ দিল ॥
 ভয় পাইয়া গোড় সৈন্য দূরেতে রহিল ।
 কাপুরুষ বলিয়া সবে ডাকিয়া কহিল ॥
 হোসন সাহা মল্লিককে ভৎসিল বিস্তর ।
 লজ্জা ভয় পাইয়া মল্লিক হইল কাতর ॥

গোড়াই মল্লিক ভঙ্গ দিল যুদ্ধ হৈতে ।
 শ্রীধন্য মাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে ॥
 চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গোড় সেনা ।
 রসাস্ত্র মর্দন (৫) নারায়ণকে বসাইল থানা ॥
 রাস্ত্র ছত্রসিক রাজা আগল করিল ।
 রসাস্ত্র জিনিয়া কিল্লা পুষ্কর্ণী খনিল ॥
 নিজ রসাস্ত্র লৈতে নারে সেনাপতি ।
 রসাস্ত্র মর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি ॥
 রায়কাচাগ রায়কছম দুই সেনাপতি ।
 ক্রোধ হৈয়া নৃপতিয়ে পাঠায় শীঘ্রগতি ॥

চৌদ্দ শ সাত্ত্রিশ শকে চাটিগ্রাম জিনে ।
 শুনিয়া হোসন সাহা মহাক্রোধ মনে ॥
 যুদ্ধেতে আসাম কোচ মারিয়া লইল ।
 ত্রিপুরার সৈন্যে আশা অপমান দিল ॥
 মনেতে চিন্তিয়া সৈন্য পাঠায়ে বিস্তর ।
 হৈতন খাঁ করা খাঁ দুই পাঠায় সত্বর ॥
 রাঙ্গামাটি জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল ।
 হোসন সাহা আশ্বাসিয়া বহু সৈন্য দিল ॥
 রাঙ্গামাটি দেশেতে ত্রিপুর সৈন্য রয় ।
 মারিয়া আনহ তাকে শীঘ্র করি জয় ॥

(১) রায়বার—দূত । (২) সৈন্যে—সৈন্য মধ্যে, শিবিরে । (৩) গাড়ে—প্রোথিত করে ।
 (৪) আচম্বিত—অবস্মিত, হঠাৎ । (৫) রসাস্ত্র মর্দন—রসাস্ত্র (আরাকান) বিজয়ী সৈন্যধ্যক্ষের উপাধি ।

এক শত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটক ।
 লক্ষৈক পদাতি চলে ধানুকী কটক ॥
 দ্বাদশ বাঙ্গালা চলে হৈতন খাঁ সহিতে ।
 বিদায় করিল গোড়ে শিরশ্রাণ মাথে ॥
 চলিল হৈতন খাঁ মহা কম্পমান ।
 কত দিনে উত্তরিল রাজ্য সম্বিধান ॥
 সরাইল পথে আইসে যুদ্ধ সৈন্য লৈয়া ।
 কৈলাগড় হৈয়া আইসে বিশালগড় দিয়া ॥
 জামির খাঁ গড়ে প্রাতে চড়িল পাঠান ।
 ত্রিপুরার অল্প সৈন্য তার ছিল জ্ঞান ॥
 খড়্গা রায় আদি করি অনেক ত্রিপুর ।
 সেই গড়ে বহু যুদ্ধ করিল প্রচুর ॥
 লইলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান ।
 ছঘরিয়ার গড়ে গেল রাজা বিঘমান ॥
 গগন খাঁ নামেতে রাজার সেনাপতি ।
 তার সনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাতাহাতি ॥
 পরস্পর মহারণ তাতে বহু হৈল ।
 হেন মতে দুই সৈন্যে ঘোর যুদ্ধ কৈল ॥
 তিন প্রহর যুঝিলেক গগন খাঁর সনে ।
 ভঙ্গ দিল গগন খাঁ জিনিলেক হৈতনে ॥
 যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটি আইসে ।
 সেই পথে হৈতন খাঁ চলিল বিশেষে ॥
 গঙ্গানগর হৈতে রাজা ডোম ঘাটি পথে ।
 রহিলেক হৈতন খাঁ গড় করি তাথে ॥
 দুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীঘী ।
 না খায় গোমতীর জল বিষ দিব লাগি ॥
 তদবধি সেই দীঘী ডোক নাম তার ।
 পরে দেবমাণিক্য তাকে করিছে বিস্তার ॥ (১)

(১) পাঠান্তর—“দুই প্রহরে খনিলেক এক মহা দীঘি ।
 না খায় নদীর জল বিষ দিছে লাগি ॥

পরে রাজা রহে গিয়া ছন গাঙ্গ উপর ।
 আর যত সেনাগণ রহে থরে থর ॥
 ছন গাঙ্গ তৈকাতান দেবদ্বার নাম ।
 তার কত বাঁক উজান মাছি ছড়া ধাম ॥
 হৈতন খাঁ সনে ছিল যত শিল্পকর ।
 নির্মাইছে গড় পরে দেব বহু তর ॥
 গড় দেখিবার তরে চলিল ভূপতি ।
 উচ্চ স্থানে থাকি গড় দেখিল নৃপতি ॥
 ভাটি বাঁকে (১) গোড় সৈন্তে বাঙ্কিয়াছে গড় ।
 তাহার উজানে গড় ত্রিপুরার তৎপর ॥
 বাসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়া তলে ।
 ডাইন (২) সব ডাকি আনি রাজা তাকে বলে ॥
 আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক ।
 এখন না খাও কেন হৈতন খাঁ সম্মুখ ॥ (৩)
 নৃপতির বাক্য শুনি বলাগমা যুবতী ।
 নমস্কার করি কহে শুভ হে ভূপতি ॥

গেই ত তুড়ুক দীঘি দেশেতে প্রচার ।

শ্রীদেব মাণিক্য তারে করিল বিস্তার ॥”

পর্ষতে একপ্রকার লতা জন্মে তাহার রস অত্যন্ত বিষাক্ত । সেই লতা খেঁতলাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিলে নদীর জল বিষাক্ত হয় । পার্শ্বভ্য প্রজাগণ বর্তমান কালেও এই প্রণালী অবলম্বনে মৎস্য মাগিয়া থাকে । এই লতা ফেলিয়া নদীর জল বিষাক্ত করায়, মুসলমানগণ নদীর জল পান করে নাই, জল পানের নিমিত্ত নুতন পুকুরিণী খনন করিয়াছিল । মুসলমানের খনিত বসিয়া জলাশয়ের নাম ‘তুড়ুক দাঘি’ হইয়াছে । নকলকারীর ক্রটি বশতঃ ‘তুড়ুক দীঘী’ স্থলে ‘ডোক দীঘী’ লিখিত হইয়াছে । পরবর্তী কালে দেব মাণিক্য কর্তৃক এই সরোবরের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল । বিধ লতার উৎপত্তি বিষয়ে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে লিখিত আখ্যানিকা পরবর্তী টীকায় প্রদত্ত হইল ।

(১) ভাটিবাক—নদীর নিম্নভাগস্থ বক্র স্থান ।

(২) ডাইন—ডাকিনী । পার্শ্বভ্য জাতির বিশ্বাস, কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক দৈবশক্তি দ্বারা লোকের হেঁটানিষ্ট সাধন করিতে পারে এবং ইহারা অকারণে বা সানাত্ত কারণে লোকদিগকে মন্ত্র বলে বধ করে । ইহারা স্থানীয় ভাষায় ‘ডাইন’ নামে অভিহিত । লোকে ইহাদিগকে ভয় করে এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসমূলে সুরোগ পাইলে তাহাদিগকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না ।

(৩) গোমরা আমার প্রজাদিগকে ভক্ষণ কর, এখন হৈতন খাঁ সম্মুখে আছে, তাহাকে খাও না কেন ?



পৰ্বত গাত্ৰস্থ প্ৰকৃৱে পোদিত দেবদেবী মূৰ্ত্তি



দেবতা মূর্তি—(মাছি ছা) ।
পৰ্বত-গাত্রে খোদিত দেবদেবীৰ মূৰ্ত্তি সমূহ ।
পৰবৰ্ত্তী ঠিকায় (৩১০ পৃষ্ঠায়) এই স্থানেৰ বিবৰণ পাওয়া যাইবে ।

মঙ্গল বার রাত্রে আমি স্তম্ভিব গোমতী ।
 সপ্ত দিন জল স্তম্ভ রাখিব সম্প্রতি ॥
 বলাগমার বাক্যে রাজার তুষ্ট হৈল মন ।
 বলাগমাকে রাজ প্রসাদ দিল সেই ক্ষণ ॥
 মঙ্গল বার রাত্রিতে সমজ্জ হইল ।
 দুই কুলা বাহুঘূলে বাস্কি উড়া দিল ॥ (১)
 দুই শত হাত উচ্চে উড়িল গগন ।
 উড়িয়া নদীর মধ্যে হইল পতন ॥
 উজানে চালায় শ্রোত চর পড়ে ভাটি ।
 আমন্দিত গোড় সৈন্য রহে পরিপাটী ॥
 হোসন সাহের ভাগ্যে নদী দিল চর ।
 চরেতে রহিল সৈন্য করি বাসা ঘর ॥
 আর দেখে নদী তীরে পাষণ প্রতিমা ।
 হিন্দু সবে পূজা করে জানিয়া মহিমা ॥
 সেই স্থানে নাম ছিল মাচিছা বিখ্যাত ।
 পুনর্জন্ম নহে বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত ॥ (২)
 এই মত নানালাপ সৈন্য মধ্যে হৈল ।
 নানা ভোগে গোড় সৈন্যে বহু নিদ্রা গেল ॥
 ভেরুয়া (৩) কাটিয়া সৈন্যে সাজায় বিস্তর ।
 তিন তিন পুতলা রাখে ভেরুয়া উপর ॥
 দুই দুই বুন্দা (৪) দিল পুতলার হাতে ।
 সহস্র সহস্র বুন্দা পুতলা সহিতে ॥ (৫)
 নিশাকালে বলাগমায় উঠে জল হতে ।
 কল কল শব্দ করে গোমতীর শ্রোতে ॥
 সহস্র সহস্র ভেরুয়া চলিল ভাটিত ।
 সহস্র সহস্র বুন্দা তাতে প্রছলিত ॥

(১) উড়া দিল—উড়ীয়ায় হইল ।

(২) এই দেবস্থান দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ত্রিপুরাগণ এইরূপ বলিয়া থাকে ।

(৩) ভেরুয়া—ভেলা ।

(৪) বুন্দা—অগ্নির বোলা, উকা, মশাল ।

(৫) প্রত্যেক ভেলার তিনটি পুতল এবং প্রত্যেক পুতলের হস্তে দুইটি প্রছলিত মশাল দেওয়া হইয়াছিল ।

গোড় সৈন্য নদী চরে স্বেথে নিদ্রা যায় ।
 হেন কালে নদী শ্রোতে সকল ডুবায় ॥
 হস্তী ঘোড়া নৌকা যত ভাসাইল বেগে ।
 মনুষ্য নির্বল হয়ে কি করিব রাগে ॥
 প্রজ্বলিত বৃন্দা সব পুতলার হাতে ।
 নদী তীরে ত্রিপুর সৈন্য পথে ঘিরে তাতে ॥
 গোড়ের সৈন্যের পাছে ছিল এক বন ।
 সেই বনে অগ্নি দিল ত্রিপুরার গণ ॥
 মহাশব্দ করি অগ্নি উঠিল তখন ।
 অন্য পথে ত্রিপুর সেনা করে নিরীক্ষণ ॥
 নদীর শ্রোতে সর্ব সৈন্য প্রলয় করিল ।
 ভয় পাইয়া গোড় সৈন্য সবে ভঙ্গ দিল ॥
 হৈতন খাঁয় করা খাঁয় সহিতে না পারে ।
 ভঙ্গ দিল সৈন্য সঙ্গে ঘোড়ার উপরে ॥
 কাটিতে কাটিতে যায় ত্রিপুরার সেনা ।
 সেই রাত্রে ভাগাইল (১) চারি পাঁচ থানা ॥
 বহু অশ্ব গজ তার পাইল তথায় ।
 তাহা ছাড়ি হৈতন খাঁয় ভঙ্গ দিয়া যায় ॥
 ছকড়িয়ার ঘাটে গিয়া সত্য করি কৈল ।
 এত সৈন্য সঙ্গে আমি জিনিতে না পাইল ॥
 এহার অধিক সৈন্য যাহার যে হয় ।
 সে পুনি আসুক এথা পরম নির্ভয় ॥
 তা হতে অল্প সৈন্য না আসুক এথা ।
 শপথ করিল আমি এই সত্য কথা ॥
 যে সব পাঠান হয় সেই যোদ্ধা সব ।
 অল্প সৈন্যে বেবা আসে সে সব গর্দভ ॥
 এ বলিয়া হৈতন খাঁ গোড়ে চলি গেল ।
 গোড়েশ্বরে তার প্রতি নিষ্ঠুর বলিল ॥
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা যুদ্ধে জয় পাইয়া ।
 চতুর্দশ দেব পূজে বিধি বলি দিয়া ॥

(১) ভাগাইল—ভাড়াইল ।

পূর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত ।
 সহস্রে সহস্রে বঙ্গ (১) বর্ষে কাটা যাইত ॥
 শ্রীধন্য মাগিক্যে মানা তাহাকে করিল ।
 তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥
 তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশ দেবে ।
 কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥
 দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয় ।
 গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময় ॥ (২)
 ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা ।
 তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥

শ্রীধন্য মাগিক্য রাজা কমলার পতি ।
 উৎকল খণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি ॥
 জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরনিধি আর ।
 পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার ॥ (৩)
 ত্রিহৃত দেশ হইতে নৃত্য গীত আনি ।
 রাজ্যেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমণি ॥
 ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায় ।
 ছাগ অন্তে (৪) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায় ॥
 এই মতে অতি সুখে আছেন নৃপতি ।
 প্রজা সব মহাসুখে বঞ্চিলেক ক্ষিতি ॥

শ্রীধন্য মাগিক্য রাজা ধর্ম্যে চিত্ত দিল ।
 প্রতিমা ভুবনেশ্বরী স্বর্ণে নির্মাইল ॥ (৫)
 এক মণ স্বর্ণের প্রতিমা নির্মাইয়া ।
 জীবন্যাস করাইল সাধক আনিয়া ॥
 প্রতিমা নাসায় তুলা লাগাইয়া রাখে ।
 শ্বাসে তুলা উড়ি যায় পূজা কালে দেখে ॥

(১) বঙ্গ—বঙ্গদেশী লোক, বাঙ্গালী ।

(২) গঙ্গা পূজার সময় গোমতী নদীতে বলি প্রদান করা হইত । বর্তমান কালে, রাজধানী আগরতলার পাদবাহিনী হাওড়া নদীতে গঙ্গা পূজা হয় ।

(৩) এই সকল গ্রন্থ বর্তমান সময়ে পাওয়া যায় না ।

(৪) অন্ত—অন্ন, আঁতুড়ি । ইহার দ্বারা বাণ্ড ষন্ত্রের তার (তাত) প্রস্তুত করা হয় ।

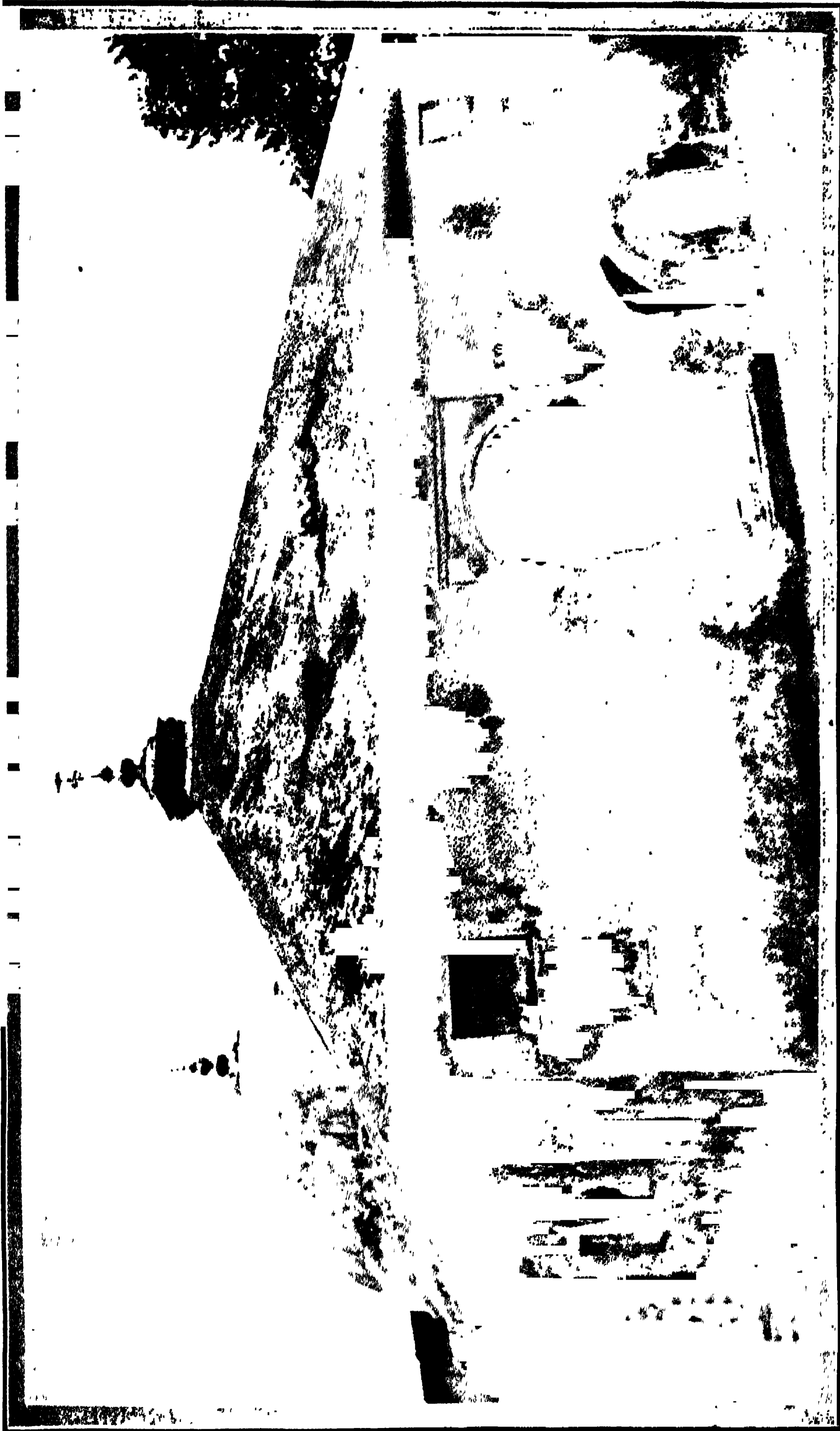
(৫) এই প্রতিমা বর্তমান কালে নাই ।

রাজার পুত্রেহ মূর্ত্তি দেখিতে না পারে ।
 গুপ্ত করি রাখিলেক পূজার মন্দিরে ॥
 পরে বিষ্ণু মঠ এক নৃপে নির্মাণিল ।
 সাত্বিক হইয়া রাজা উৎসর্গিয়া দিল ॥
 আর এক মঠ নিতে আরম্ভ করিল ।
 বাস্তু পূজা সফল বিষ্ণু শ্রীতে কৈল ॥
 ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে ।
 এই মঠে আমি স্থাপ রাজা মহা সন্তে ॥ (১)
 চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট ।
 প্রস্তুরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥
 তথা হৈতে আমি আমি এই মঠে পূজ ।
 পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ ॥ (২)
 স্বপ্ন দেখি নরপতি দ্বিজেন্তে কাহিল ।
 ব্রাহ্মণ সকলে মিলি সাধু বাদ কৈল ॥
 রসাতল মর্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টনে ।
 স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে ॥
 উৎসব মঙ্গল বাণ্ডে রাজ্যেতে আনিল ।
 সহর গমনে রাজা নমস্কার কৈল ॥
 কত দিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল ।
 পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল ॥
 জন্ম সফল রাজার কালিকা স্থাপিয়া ।
 নানা বলিদান করে নর আদি দিয়া ॥ (৩)
 নানাবিধ উপহার দিলেন পূজার ।
 মৎস্য মাংস প্রভৃতি বতক প্রকার ॥
 মঠ মধ্যে পাথরে লিখিল এই শ্লোক ।
 পয়ারে লিখিল শ্লোক বুঝিবারে লোক ॥

(১) ইহা পীঠ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির । এই মন্দিরের বিবরণ এই লহরের পরবর্তী টীকায় দ্রষ্টব্য ।

(২) ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তির বিবরণ প্রথম লহরের টীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

(৩) বলি সহকারী শাস্ত্রীয় বিধান এই লহরের পরবর্তী টীকায় পাওয়া যাইবে ।



ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্য মাণিক্য কর্তৃক নিৰ্মিত

শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভূনাথের মন্দির।

৬ চন্দ্রনাথ তাঁর্থ।

অথ শ্লোক ।

মায়া মুরারে রিয়নশ্বিকা ষা ।
 মুঞ্চত্যা মুষ্যা নিকটং ন কুত্র ॥
 প্রোস্তু ভবাশ্চা ঋব মাস কেশবঃ ।
 শ্রীধনু মানিক্য বিনিশ্চিত্তি স্তিয়ম্ ॥ (১)

শ্লোকের পয়ার ।

হরির মায়াতে মল্লিকার প্রকাশ ।
 তেন মায়া বেষ্টিত থাকে মানবের পাশ ॥
 এই তত্ত্ব সত্য জান কেশব তাহাতে ।
 শ্রীধনু মানিক্য কৃত নিশ্চিত ইহাতে ॥
 শ্রীধনু মানিক্য রাজা আর মঠ দিল ।
 রত্নপুরে চতুর্দশ দেবতা স্থাপিল ॥
 সেই মঠে পূজা কৈল শ্রীধনু মানিক্য ।
 ফলমতীশ্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য ॥
 ফলমতীশ্বর তীর্থে জরব মারিয়া ।
 চাটিগ্রাম আমল করে মোহর নির্মাইয়া ॥
 হেনকালে শুনে রাজা কুকির সমাচার ।
 কুকিনী সবে সঙ্গ শিবের ব্যবহার ॥
 আর তত্ত্ব মহারাজা শুনিল তখন ।
 কুকি রাজ্যে স্ববর্ণের হয়েত উৎপন্ন ॥
 রাজার জামাতা হোপাকলাউ নাম তার ।
 কুকিতে পাঠায় শিব লিঙ্গ আনিবার ॥
 কত দিনে উত্তরিল কিরাত ভবন ।
 শিব লিঙ্গ যত্নে সে যে ধরিল তখন ॥
 পান বাটা মধ্যে লিঙ্গ কাপড়ে জড়িল ।
 মোহর করিয়া বাটা সত্বরে পাঠাইল ॥
 শিব লিঙ্গ লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাতে ।
 বাটা হৈতে নিকলিছে (২) শিব লিঙ্গ পথে ॥
 মনু নদী সীমানা তক বাটাতে আছিল ।
 মনু নদী পার হৈতে ফিরি তথা গেল ॥

(১) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির বিবরণ পরবর্তী টীকায় দ্রষ্টব্য ।

(২) নিকলিছে—বাহির হইছে ।

এ কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত অন্তরে ।
 মনে বিবেচিয়া রাজা বলিল তাহারে ॥
 ত্রক্ষা ধরিতে নারে যে পদারবিন্দ ।
 তাহাকে ধরিতে চাহি আমি মতি মন্দ ॥
 জামাতা হোপাকলাউ মনে গর্ষ তার ।
 খাংচান্স (১) চড়িয়া যায় সোণা আনিবার ॥
 কিরাত সকলে মিলি যুক্তি করে সার ।
 সোণা পাইলে থানা এথা থাকিব রাজার ॥
 মন্ত্রণাতে জামাতাকে মদ্য পান দিল ।
 মদ্যেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল ॥
 নৃপতি শুনিয়া তাতে জামাতা মরণ ।
 আনিয়া সে সব কুকি করিল দগুন ॥

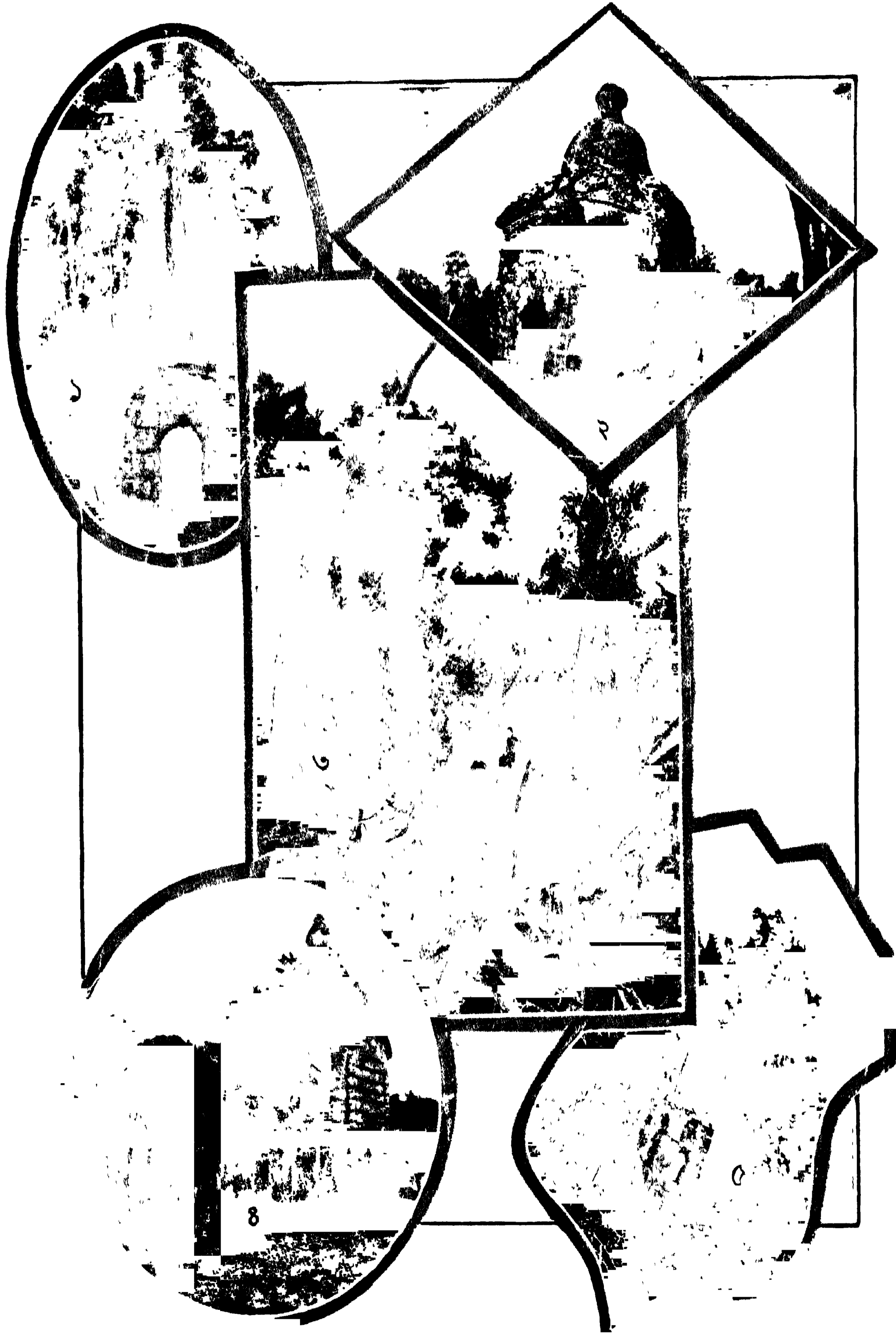
শ্রীধন্য মাণিক্য চারি মঠ দিল ক্রমে ।
 কারিকর গণে ইনাম (২) পাইলেক শ্রমে ॥
 কারিকর স্থানে পরে নৃপতি জিজ্ঞাসে ।
 তা হৈতে অধিক শিক্ষা জানহ বিশেষে ॥
 রাজার বচন শুনি বলে কারিকরে ।
 তা হৈতে অধিক জানি মঠ বানাইবারে ॥
 তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হৈল রাজা মহাজন ।
 বার বার কহ তোরা এমত কথন ॥
 যত গুণ আছে তোমা দেখাইতে বলিলা ।
 এখানে রাখিলা শিক্ষা আমাকে বঞ্চিলা ॥
 আমা কথা হেলা কৈলে জানিল নিশ্চিত ।
 আজ্ঞা করে কাট নিয়া নদীর তীরেতে ॥
 নিজার্জিত কর্মে তার এমত ঘটিল ।
 রাজ আজ্ঞায় কাটে তাকে কেহ না বলিল ॥ (৩)
 নানা বাণ্ড সব যন্ত্র বহু রঙ্গ তাতে ।
 বহুল কবিতা গান রচিল সে মতে (৪) ॥

(১) খাংচান্স—তাজাম, দোলাবিশেষ ।

(২) ইনাম—পুরস্কার ।

(৩) রাজ-আজ্ঞায় বধ করা হইল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত কেহ অহুরোধ করিল না ।

(৪) এই সকল কবিতা সংগ্রহের উপায় নাই ।



মহারাজ ধনুমাণিক্যের নির্মিত মঠ সমূহ।

- (১) বিষ্ণুমন্দির, (২) পুরাতন দৌঘীর তীরবর্তী মন্দির, (৩) লোকপালানী (ঝুলন) মন্দির,
(৪) বর্তমান হরি মন্দির, (৫) ভগ্ন মন্দির।

কত কাল সুখে নৃপে রাজত্ব করিল ।
 দৈবগতি মহারাজার বসন্ত হইল ॥
 এই রূপে মহারাজার স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল ।
 মহাদেবী কমলা যে সহগামী গেল ॥
 তার পরে যেবা হৈল শুন নৃপমণি ।
 মন্বন্তর (১) ফিরে যেন হেন রাজধানী ॥
 অমর মাণিক্য স্থানে কহে রণ চতুর ।
 তোমা বংশাবলী শুন বড়ি নিষ্ঠুর ॥

দেবমাণিক্য খণ্ড ।

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা কাল বশ পরে ।
 তান পুত্র দেবমাণিক্য অভ্যন্তরে (২) ॥
 দেবমাণিক্য মহারাজা অতি শুভাজন ।
 তুলুয়া আনল করি সমুদ্র গমন ॥
 ফলমতি তীর্থে স্নান করে মহামতি ।
 মোহর গারিল তথা দান ধর্ম যতি ॥
 দুরাশা বলিয়া সেই স্থানের নাম বলে ।
 স্নান তর্পণ তথাতে নৃপতি করিলে ॥
 এ তীর্থ করিয়া রাজা ফিরিল তখন ।
 চাটিগ্রামে থানা রাখি রাজ্যে আগমন ॥

(১) মন্বন্তর—প্ৰত্যেক মনুর শাসনকাল । এক এক মন্বন্তরে দেবমানের ৭১ যুগ । শাস্ত্রে আছে, প্রতিকল্পে স্বায়ম্বুদ, স্বারোচিষ, উত্তন, তানস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি—এই চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হইয়া থাকেন । বর্তমানের বৈবস্বত মনুর আমল চলিতেছে । প্রতি মন্বন্তর অতীতে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে । মনুমাণিক্যের ন্যায় সর্ক গুণালঙ্কৃত রাজার পরলোক গমনের পয়, ত্রিপুর রাজধানীর মন্বন্তর পরিবর্তনের অবস্থা ঘটিয়াছিল ।

(২) পাঠান্তর—“হরিনান স্মরণে নৃপতি স্বর্গ হৈল ।

তান পুত্র শ্রীদেবমাণিক্য রাজা হৈল ॥”

লক্ষ্মী নারায়ণ নাম মিথিলা নিবাসী ।
জানেন্তু অনেক তন্ত্র যে মত সন্ন্যাসী ॥
তার স্থানে দীক্ষিত মহাবিদ্যা (১) ক্রমে ।
পুরশ্চরণ (২) করে নৃপে দিব্য-ভাব (৩) ভ্রমে ॥

(১) মহাবিদ্যা—মহাবিদ্যার সংখ্যা দশ, যথা ;—

“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধিবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাঙ্গিকা ।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”
চামুণ্ডা তন্ত্র ।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাঙ্গিকা এই দশ মহাবিদ্যা । ইহাদিগকে সিদ্ধিবিদ্যাও বলে ।

তন্ত্রসারের মতে কালী, নীলা, মহাভূগা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বাসলী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী এই সকল দেবী মহাবিদ্যা, যথা,—

“অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে ।
দোষজালৈর সংস্পৃষ্টা স্তাঃ সৰ্ব্বাহি ফলৈঃ সহ ॥
কালী নীলা মহাভূগা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা ।
বাগ্‌বাদিনীচান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফল প্রদাঃ ॥”
তন্ত্রসার ।

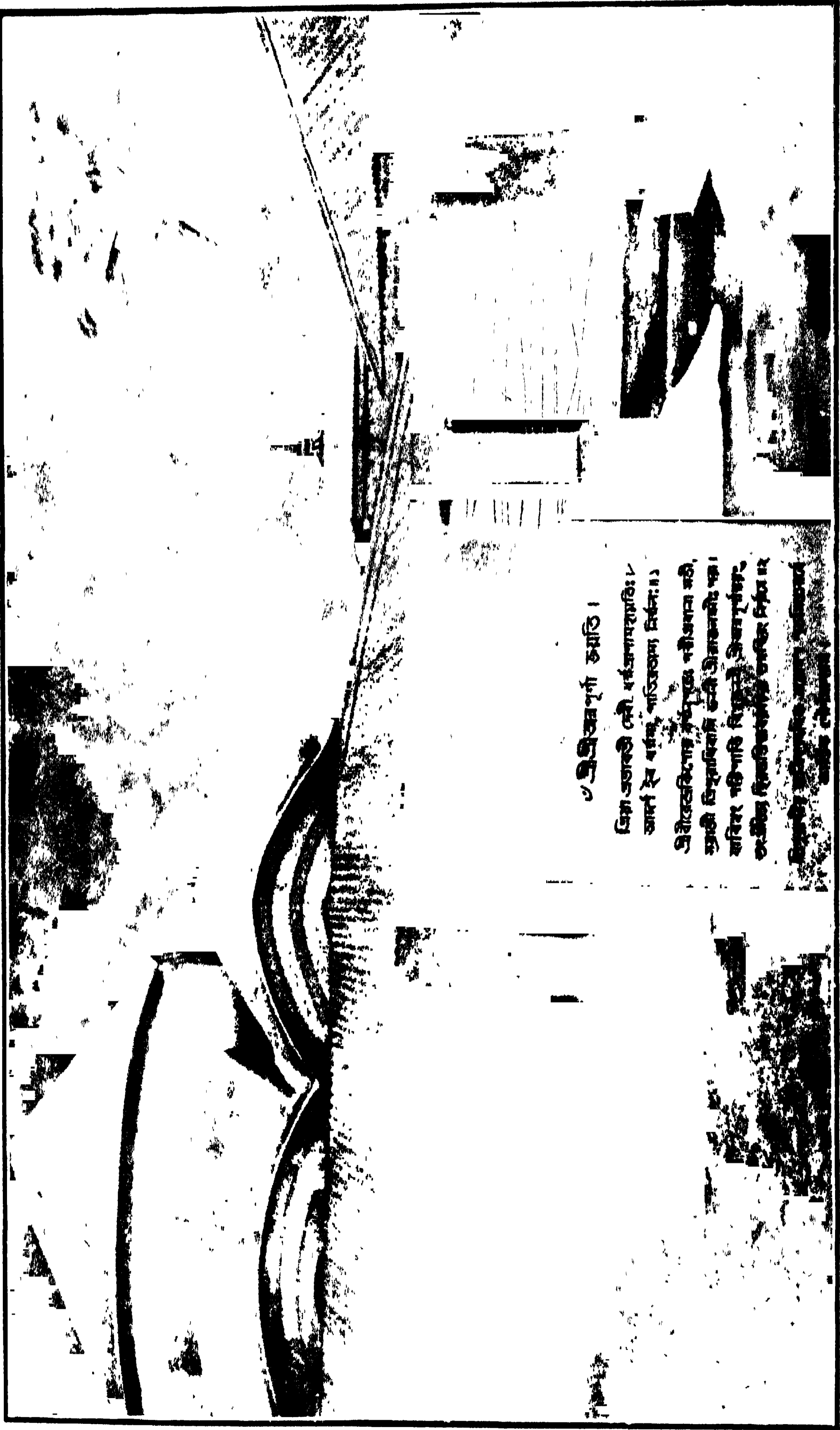
(২) পুরশ্চরণ—মন্ত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক তৎসিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ বিশেষ । এতদ্বিষয়ে ষোগিনী হৃদয়ে লিখিত আছে ;—

“গুরুরাজ্ঞাং সমাদায় গুহ্যস্তঃ করণেনরঃ ।
ততঃ পুরক্ষিয়াং কুৰ্য্যান্নম্ন-সংসিদ্ধি কাময়া ॥
জীবহীনো যথা দেহী সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ন ক্ষমঃ ।
পুরশ্চরণ হীনোহপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥”

মৰ্ম্ম ;—“পবিত্রচেতা মানব গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করিবার অভিলাষে মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধান করিবেন । পুরশ্চরণ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধি হইবার অন্য উপায় নাই । জীবহীন দেহীর যেমন কোন বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ পুরশ্চরণ হীন মন্ত্রেরও কোন সামর্থ্য নাই ।”

(৩) দিব্য-ভাব—তান্ত্রিক আচার বিশেষ । দিব্য, পশু ও বীর এই তিন ভাবে তান্ত্রিক কাৰ্য্য হইয়া থাকে । তন্মধ্যে এতদ্বিষয়ক যে বিধান আছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল ;—

“শূণু ভাবত্ৰয়ং দেবি দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ ।
দিব্যস্ত দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধত মানসঃ ॥
সত্যত্রেতার্কি পর্য্যস্তং দিব্যভাব বিনির্শয়ঃ ।
ত্রেতাধাপর পর্য্যস্তং বীরভাব ইতীরিতং ॥
মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ ।
শ্মশান সাধনং ভদ্রে চিত্তসাধনমেব চ ॥
এতন্তে কথিতং সৰ্ব্বং দিব্যবীর মতং প্রিয়ে ।
দিব্যবীর মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে ॥”
কালীবিলাস তন্ত্র ।



৩ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা জন্মতি ।

শ্রীম্মা এতাবতী দেবী ধর্মপ্রদায়নমুখ্যতিঃ।
আদর্শ ইব ধর্মদায়ী, পাতিতকাল্য নির্বিনঃ।।১

শ্রীবীভেভেভিনোদ্যে স্তম্ভপুত্রো নবীপ্রবান সতী,
সুখতী ত্রিমুখিকালি ভবনী ত্রীমুক্তকলীঃ ক্ষম।
যাবিং নটীগাতি বিজয়তী, ত্রীঅন্নপূর্ণাঃ,
তৎপ্রীত্য ফিলভিতকবর্গিত ভবতিঃ স্তম্ভে ৪২

শ্রীম্মা এতাবতী দেবী ধর্মপ্রদায়নমুখ্যতিঃ।
আদর্শ ইব ধর্মদায়ী, পাতিতকাল্য নির্বিনঃ।।১

অন্নপূর্ণা ও বাডুবানিলের মন্দির ।

বীর ভাবী (১) হৈল রাজা তাহার পশ্চাৎ ।
 চক্রেতে (২) আরম্ভ করে অধর্ম সাক্ষাৎ ॥
 শ্মশান সাধন (৩) কার্যে রাজাকে বৈসায় ।
 সেই কালে বাসুয়াকে (৪) ব্রাহ্মণে শিখায় ॥
 রুক্ষে উঠি বাসুয়ায় ডাকি তাকে কহে ।
 সেনাপতি বলি দেহ দেখা হবে তাহে ॥
 আর দিন রাত্রে রাজা সেনাপতি নিয়া ।
 বলিদান করে রাজা শ্মশানেতে গিয়া ॥
 আর দিন মহারাজা বসিল শ্মশানে ।
 আর সেনাপতি চাহে নৃপতির স্থানে ॥
 আষ্ট জন সেনাপতি ক্রমে বলি দিল ।
 তথাপিহ মহারাজা দেবী না দেখিল ॥
 কৃষ্ণ বর্ণ হৈল রাজা সেনাপতি বধি ।
 এক জন বলিলেক নৃপতি সম্বোধি ॥
 স্নান কালে স্নান ঘরে (৫) নৃপেতে কহিল ।
 তোমা শত্রু মঘ পাঠান আনন্দ হইল ॥
 পৈতৃক সেনাধিপতি তুমি সে বধিলা ।
 রাজধানী স্থান তুমি বীর শূন্য কৈলা ॥

(১) বীরভাব—তান্ত্রিক ভাব বিশেষ, ‘দিব্যভাব’ শীর্ষক টীকায় বীরভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । যে তিন ভাবে তান্ত্রিক সাধন হয়, তাহা পুনর্বার এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“ভাবস্ত ত্রিবিধঃ প্রোক্তা দিব্য বীর পশুক্রমাৎ ।

গুরবস্ত ত্রিধা চাত্র তত্রৈব মন্ত্র দেবতা ॥”

রুদ্রযামল—১১শ পটল ।

(২) চক্র—তন্ত্রোক্ত ভৈরবী প্রভৃতি চক্র । তন্ত্র শাস্ত্রে ভৈরবী চক্রকে তন্ত্রচক্র বলা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত রুদ্রযামলে মহাচক্র, রাজচক্র, দিব্যচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পাঁচ প্রকার চক্রের কথা উল্লেখ আছে । চক্র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য ।

(৩) শ্মশান সাধন—তান্ত্রিকগণ শ্মশানে উপবিষ্ট হইয়া, স্বীয় ইষ্টদেবতার সাধনা করিবার ব্যবস্থা তন্ত্র শাস্ত্রে আছে ।

(৪) বাসুয়া—ব্রাহ্মণদিগের গোলাম সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, ত্রিপুরা অঞ্চলে তাহাদিগকে ‘বাসুয়া’ বলে । ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে, ‘বাসুয়া পাড়া’ নামে একটা গ্রাম আছে ; তথায় এই শ্রেণীর অনেক শূদ্রের বসতি ছিল ।

(৫) রাজার নিকট গুপ্ত কথা বলিবার নিমিত্ত স্নানঘরই সুবিধাজনক স্থান । একপ. নির্জন স্থান আর নাই । স্নান কার্যের নির্দিষ্ট ভৃত্য ব্যতীত অন্য লোকের তথায় প্রবেশাধিকার নাই ।

বীর শূন্য হৈল তোমা শূন্য নরেশ্বর ।
 ব্রাহ্মণে করিল তোমা এত অখাস্তর (১) ॥
 দেশের যতোক লোক অতি ভয় পায় ।
 কাহাকে কোন্ রাত্রে শ্মশানে লৈয়া যায় ॥
 আপনার বল রাজা আপনে ভাঙ্গিল ।
 ব্রাহ্মণের হেতু সর্ব্ব রাজ্য নষ্ট কৈলা ॥
 এতগুলি নৃপতিয়ে না দিল উত্তর ।
 সাধন করিতে গেল শ্মশান উপর ॥
 এসব শুনিয়া বিপ্রে মনে ভয় পাইল ।
 রাজারে ধরিয়া বিপ্রে শ্মশানে বধিল ॥
 বধিয়া রাখিল রাজা শ্মশান মাঝার ।
 লোকেতে জানায় বিপ্র বহু শিফটাচার ॥
 বিপ্র বলে মহারাজা মরিল শ্মশানে ।
 যক্ষ (২) কিন্নর (৩) ভয় পাইয়াছিল মনে ॥
 সৈন্য সহিতে বিপ্র চিতা স্থানে গেল ।
 মৃত রাজা দেখি সবে ক্রন্দন করিল ॥
 বিজয় কুমার মাতৃ চতুর্ভাইর কন্যা ।
 সহগামী হৈল রাণী রূপে গুণে ধন্যা ॥

(১) অখাস্তর—অনিষ্ট ।

(২) যক্ষ—দেবযোনি বিশেষ, কুবেরের ধন রক্ষক ।

(৩) কিন্নর—দেবযোনি বিশেষ, ইহাদের মুখ অশ্বের ত্রায়, অশ্রুত অবয়ব নহুয্য তুল্য ।

এই জাতি সঙ্গীত পটু, ইহারা দেব সভার গায়ক ।

ইন্দ্রমণিক্য খণ্ড ।

কনিষ্ঠা রাজরাণী ইন্দ্রমণিক্য জননী ।
দুরাচার বিপ্র সনে করিছিল তিনি ॥ *
সেই বিপ্র মন্ত্রণা করিল আপনি ।
ইন্দ্রমণিক্য রাজা করে রাজধানী ॥
রাজার প্রধান পুত্র বিজয় যে নাম ।
মহাশিল (১) দিয়া রাখে হিরাপুর গ্রাম ॥
এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয় ।
অড়াই শত যোদ্ধা আনি মিথিলা রাখয় ॥
লক্ষ্মী নারায়ণে করে রাজ্যের ব্যবার ।
কাট মার সদাকাল ব্রাহ্মণ দুরাচার ॥
এ সব অধর্ম দেখি ত্রিপুর সকল ।
মন্ত্রণা করয়ে সবে হইয়া সবল ॥
সর্বলোকে বোলে দেশে হৈল অগঙ্গল ।
ত্রিপুর রাজ্যের লোক অনাথ সকল ॥
দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি ॥
মন্ত্রণা করিয়া তারা ঘাটে চকি (২) দিব ।
রাজপুরে দ্বিজ আইসে সে কালে ধরিব ॥
দ্বিতীয় প্রহর কালে ব্রাহ্মণেতে কহে ।
রাজমাতা ব্যামোহ হৈল আসিয়া দেখ হে ।
উদরেত ব্যথা হৈছে শীঘ্র আসি দেখ ।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে দেখ বা না দেখ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন আমি দেখিয়াছি ভাল ।
দৈবগতি হৈতে পারে না জানি কি হৈল ॥

(১) মহাশিল—কয়েদ । পূর্বেকালে কয়েদীগণের বক্ষে শিল (প্রস্তর) চাপান হইত, এজন্য 'মহাশিল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

(২) চকি—পাহাড় ।

বীর শূন্য হৈল তোমা শূন্য নরেশ্বর ।
 ত্রাসাগে করিল তোমা এত অখান্তর (১) ॥
 দেশের বহু লোক অতি ভয় পায় ।
 কাহাকে কোন্ রাত্রে শ্মশানে লৈয়া যায় ॥
 আপনার বল রাজা আপনে ভাঙ্গিয়া ।
 ত্রাসাগের হেতু সর্ব রাজ্য নষ্ট কৈলা ॥
 এতগুনি নৃপতিয়ে না দিল উত্তর ।
 সাধন করিতে গেল শ্মশান উপর ॥
 এসব শূন্যিয়া বিপ্রে মনে ভয় পাইল ।
 রাজারে ধরিয়া বিপ্রে শ্মশানে বধিল ॥
 বধিয়া রাখিল রাজা শ্মশান মাঝার ।
 লোকেতে জানায় বিপ্র বহু শিষ্টাচার ॥
 বিপ্র বলে মহারাজা মরিল শ্মশানে ।
 যক্ষ (২) কিন্নর (৩) ভয় পাইয়াছিল মনে ॥
 সৈন্য সহিতে বিপ্র চিতা স্থানে গেল ।
 মৃত রাজা দেখি সবে ক্রন্দন করিল ॥
 বিজয় কুমার মাতৃ চন্দ্রাইর কন্যা ।
 সহগামী হৈল রাণী রূপে গুণে ধন্যা ॥

(১) অখান্তর—অনিষ্ট ।

(২) যক্ষ—দেবযোনি বিশেষ, কুবেরের ধন রক্ষক ।

(৩) কিন্নর—দেবযোনি বিশেষ, ইহাদের মুখ অশ্বের ছায়, অগ্ন্য অল্পব মনুষ্য তুল্য ।

এই জাতি সঙ্গীত পটু, ইহারা দেব সভার গায়ক ।

ইন্দ্রমণিক্য খণ্ড ।

কনিষ্ঠা রাজরাণী ইন্দ্রমণিক্য জননী
দুরাচার বিপ্র সনে করিছিল তিনি ॥ *
সেই বিপ্র মন্ত্রণা করিল আপনি ।
ইন্দ্রমণিক্য রাজা করে রাজধানী ॥
রাজার প্রধান পুত্র বিজয় যে নাম ।
মহাশিল (১) দিয়া রাখে হিরাপুর গ্রাম ॥
এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয় ।
অড়াই শত যোদ্ধা আনি নিধিলা রাখয় ॥
লক্ষ্মী নারায়ণে করে রাজ্যের ব্যবার ।
কাট মার সদাকাল ব্রাহ্মণ দুরাচার ॥
এ সব অধর্ম দেখি ত্রিপুর সকল ।
মন্ত্রণা করয়ে সবে হইয়া সবল ॥
সর্বলোকে বোলে দেশে হৈল অগঙ্গল ।
ত্রিপুর রাজ্যের লোক অনাথ সকল ॥
দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি ॥
মন্ত্রণা করিয়া তারা ঘাটে চকি (২) দিব ।
রাজপুরে দ্বিজ আইসে সে কালে ধরিব ॥
দ্বিতীয় প্রহর কালে ব্রাহ্মণেতে কহে ।
রাজমাতা ব্যামোহ হৈল আসিয়া দেখ হে ।
উদরেত ব্যথা হৈছে শীঘ্র আসি দেখ ।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে দেখ বা না দেখ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন আমি দেখিয়াছি ভাল ।
দৈবগতি হৈতে পারে না জানি কি হৈল ॥

(১) মহাশিল—কয়েদ । পূর্বেকালে কয়েদীগণের বক্ষে শিল (প্রস্তর) চাপান হইত, এজন্য 'মহাশিল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

(২) চকি—পাহাড় ।

চতুর্দোল (১) আন বলি ডাকয়ে সত্বর ।
 চৌদলে চড়িয়া বিপ্র যায়ে একেশ্বর (২) ॥
 নদী পার হৈয়া ঘাটে উত্তরিল (৩) যবে ।
 ত্রিপুরের সেনায় বিপ্র ধরিলেক তবে ॥
 সেই ক্ষণে শূলেতে দিলেক দ্বিজবর ।
 শ্লোক এক পড়ি মরে শূলের উপর ॥

অথ শ্লোকঃ ।

কিং নৈব সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
 হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ ।
 কোদগ্রহগ্রহতরাং খলু চাতকস্যা
 পৌরন্দরীং তদপি বাঞ্জতি বারিধারাং ॥

অথ পয়ার ।

পৃথিবীতে নাহি কিবা পদ্মে অলঙ্কত ।
 হংস শ্রেণী বলয়াকৃতি জল সন্নিহিত ॥
 কোন ছুগ্রহ তাতে নিশ্চয় চাতকের ।
 তথাপিহ বাঞ্জিত জলধারা ইন্দ্রের ॥
 পরে দৈত্য নারায়ণ মহা সেনাপতি ।
 সসৈন্যে সাজিয়া গেল যথায় নৃপতি ॥
 ইন্দ্রমাণিক্য রাজা আছাড়িয়া বধে ।
 আড়াই শ মিথিলা সেনা খেদাইল যুদ্ধে ॥
 কত মৈল কত গেল আত্মা রক্ষা করি ।
 রাজমাতা বধিলেক সর্বলোকে বেড়ি ॥

- (১) চতুর্দোল—উচ্চ অঙ্গের দোলা বিশেষ, চৌদল ।
 (২) একেশ্বর—একাকী ।
 (৩) উত্তরিল—উপস্থিত হইল ।



দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির
উদয়পুর।

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

পরে দৈত্য নারায়ণ হিরাপুরে গেল ।
সসৈন্যে গিয়া বিজয় দেবকে আনিল ॥
শুভক্ষণে বিজয় দেব বৈসায় সিংহাসনে ।
প্রণাম করিল সবে যত সৈন্যগণে ॥
বিজয় মাণিক্য নাম হইল নরপতি ।
তাহান মহাদেবী (১) নাম ছিল পুণ্যবতী ॥
ত্রিপুর কুলেতে সে যে শুভজন্মা কন্যা ।
পুণ্যবতী নামে হৈল পৃথিবীতে ধন্যা ॥
হোমনাবাদে দ্বিজে দিল বহুতর গ্রাম ।
তিষিণাতে দিল গ্রাম ব্রাহ্মণ অনুপাম ॥
তাম্রপত্রে লিখি দিল পুণ্যবতী নামে ।
পুণ্যবতী মতী সতী শ্লোকে অনুক্রমে ॥
বিধিমতে ভূমি কত উৎসর্গিয়া দিল ।
যেন মত নাম দেবী তেন ধর্ম কৈল ॥
দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান ।
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্মাণ ॥
শুভক্ষণে মঠ দিল দেবে উৎসর্গিয়া ।
উৎকল হৈতে জগন্নাথ ব্রহ্ম স্পর্শাইয়া ॥
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা আনিল ।
বার মাসে বার যাত্রা ক্রমে আরম্ভিল ॥
বহুতর ভক্তি করি পূজন করিল ।
বহু ভাগ্য সেনাপতির পূর্ব জন্মে ছিল ॥
সেই দেব নৃপতিয়ে সেবা করে গিয়া ।
সন্ধ্যাকালে জগন্নাথ আইসে প্রণমিয়া ॥
কত দিনে সেই মঠ ভূমি কম্পে ফাটে ।
হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে ॥

(১) ত্রিপুর রাজ্যে রাজমহিষীগণ 'মহাদেবী' ও 'ঈশ্বরী' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । সাধারণ ভাষায় তাঁহাদিগকে 'মাইদেবতা' বলা হয় । বেহারের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী' গ্রন্থে, রাণীদের 'আইদেবতী' উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় ।

নিঃশব্দে আছিল মাধব ঘরে বিমর্ষিয়া (১) ।
 দৈত্যের ভৃত্য মাধব আনিল ডাকিয়া ॥
 দৈত্য নারায়ণে বলে কোথায় গিয়াছিল ।
 সময়ে না দিলা অন্ন বহু বেলা কৈলা ॥
 পরে নানা বিধ অন্ন দিলেক মাধবে ।
 দৈত্য নারায়ণ অন্ন খাইলেক তবে ॥
 স্বভাবে ত্রিপুরা জাতি মগ্ন মাংসে রত ।
 অন্ন খাইয়া মগ্ন পান করিল বহুত ॥
 আর মগ্ন না খাইব কহে সেনাপতি ।
 পিয় বলি মাধবে পিয়ায়ে মগ্ন অতি ॥
 মগ্ন পানে সেনাপতি পড়িলেক খাটে ।
 খড়গ লৈয়া তখনে মাধবে মাথা কাটে ॥
 কাটিয়া দিলেক অগ্নি সেই মহা গৃহে ।
 ঘর পুড়ি মৈল হেন মাধবে যে কহে ॥
 অতি বড় অগ্নি দেখি হা হা করে লোকে ।
 গৃহ দাহে দৈত্য নারায়ণ মরিলেক দেখে ॥
 অশ্ব আরোহণ করি রাজা শীঘ্র গেল ।
 সকল দহিছে অগ্নি রাজায়ে দেখিল ॥
 হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা রাজনীতি যত ।
 সকল আনিল রাজা আপনা পুরীত ॥
 দৈত্য নারায়ণের কন্যা লক্ষ্মী আর রাণী ।
 মাধবে রাজার চক্র শুনিয়াছে তিনি ॥
 মাধব কুতর্ক রাণী রাজাতে কহিল ।
 রাণীর কুতর্ক রাজা কিছু না শুনিল ॥
 রাজা গেল শিকারেতে অঙ্গুরী রাখিয়া ।
 সেইরূপ অঙ্গুরী রাণী ঘটায়ে আনিয়া ॥
 সেই ত অঙ্গুরী রাণী মাধবকে পাঠায় ।
 অঙ্গুরী দেখিয়া মাধব আসিল ত্বরায় ॥
 রাণী আজ্ঞা মাধবকে বধিল তখনে ।
 এই বার্তা নৃপতিয়ে শুনিল তিন দিনে ॥

(১) বিমর্ষিয়া—বিমর্ষ হইয়া ।

ক্রোধ হইল নৃপতি অগ্নির সমানে ।
 যে লোকে মাধব বধে তাকে ধরি আনে ॥
 জিজ্ঞাসিল রাজা তোকে কেবা নিয়োজিল ।
 ভয়ে কম্পমান হৈয়া সভাতে কহিল ॥
 মহাদেবী আজ্ঞাদিল মাধব বধিতে ।
 এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা বড় উন্মাদ (১) হৈল ।
 তখনে প্রাস্তরে নিয়া তাহাকে বধিল ॥
 সেই ক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস ।
 হিরাপুরে রাখে রাণী জীবন নৈরাশ ॥
 হিরাপুর নাম পূর্বে লক্ষ্মীপুর ছিল ।
 উদয় মাণিক্য রাণী হিরাপুর কৈল ॥
 হিরাপুরে লক্ষ্মী রাণী বনবাস সেবী ।
 পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী ॥
 প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল (২) ।
 কত দিন পরে রাজা লক্ষ্মী রাণী নিল ॥

বিজয় মাণিক্য রাজা প্রথম যৌবন ।

উত্তর দক্ষিণ রাজ্য লৈতে করে মন ॥
 দক্ষিণ বাজু (৩) বাম বাজু (৪) রাজ সেনাগণ ।
 দক্ষিণ বাজু উত্তর রাজ্য নৃপে লৈতে মন ॥
 কালা নাজির আদি যত দক্ষিণ সৈন্যগণ ।
 উত্তর রাজ্য পাঠাইল করিবারে রণ ॥
 আত্মারাম আদি যত খাসিয়া নৃপ থানা ।
 ত্রিপুরে জিনিয়া করে আপন সীমানা ॥
 শ্রীহট্ট দেশে ত যত ছিল জমিদার ।
 মিলিল সকল লোক ত্রিপুর ভেটিবার ॥

(১) উন্মাদ—রাগাধিত ।

(২) প্রধান পাত্র মিত্রগণ, রাণীকে রাজত্বনে আসিবার নিমিত্ত রাজাকে অহুরোধ করিলেন ।

(৩) দক্ষিণ বাজু—(ডাইন বাজু) । উদয়পুর রাজধানীর উত্তর দিকস্থ প্রদেশ সমূহ 'দক্ষিণ বাজু' নামে অভিহিত ছিল ।

(৪) বাম বাজু—রাজধানীর দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশ সমূহ ।

খাসিয়ার রাজা আইসে আপনে মিলিয়া ।
 ত্রিপুর রাজাতে মিলে বহু আশাগিয়া ॥
 পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া তাকে দিল নৃপে ।
 সবৎসা হস্তিনী চাহে খাসিয়ার ভূপে ॥
 বিজয় মাণিক্য রাজা হস্তী ইনাম দিল ।
 হস্তিনী পাইয়া রাজা জয়ন্ত্যা দেশে গেল ॥
 নিজ দেশে গিয়া রাজা কহে উচ্চ স্বরে ।
 হস্তী ভেট দিছে আমা ত্রিপুর ঈশ্বরে ॥
 সবৎসা হস্তী যোটক আমি সে পাইল ।
 জয়ন্ত্যা রাজ্যে বার্তা দেশেতে কহিল ॥
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শুনি আসে জয়ন্ত্যা হনে (১) ।
 সে সবে শুনিয়া কহে ত্রিপুরের স্থানে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা বহু ক্রুদ্ধ হৈল ।
 হাড়ি সৈন্য (২) জয়ন্ত্যাতে যুদ্ধে আজ্ঞা দিল ॥
 রাজার রাজ্যেতে আছে যত হাড়িগণ ।
 চট্টলে স্বর্ণ গ্রামে শ্রীহট্টে যত জন ॥
 দ্বাদশ হাজার হাড়ি তালিক করিল ।
 যার যেই রাজ্যের হাড়ি সেনাপতি হইল ॥
 দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া ।
 হাড়িয়ে ডগর বাঘ চলে বাজাইয়া ॥
 চারি মাস হাড়ি সৈন্য পাইয়া বেতন ।
 মগ্ন শূকর খাইয়া চলিলেক রণ ॥
 ঘুর ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায় ।
 সাজনি সাজিয়া সব হাড়ি সৈন্য যায় ॥
 উত্তরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা (৩) ।
 বঙ্গ দেশী হাড়ি সব মধ্যে থাকে থানা ॥

(১) হনে—হইতে ।

(২) হাড়ি—হীনজাতি বিশেষ । ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ আছে । মলমূত্র পরিষ্কার, শূকর পোষণ, বাঘবাদন, পাঙ্কীবহন ও তাড়ি প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কার্য্য সম্প্রদায় বিভেদে করিয়া থাকে । চৌকিদারী করাও ইহাদের একটি কার্য্য ।

(৩) বানা—পতাকা ।

দক্ষিণ দিগের হাড়ি চাটিগ্রাম আদি ।
 তার সেনা পাছে চলে মহা শব্দ বাদি ॥
 চেমস্ ডগর বাজে নাচে উর্ক হাতে ।
 শূকর খেদান লাঠি পাকাইয়া (১) মাথে ॥
 এমত সাজিয়া সবে থানাতে গেলেন্ত ।
 শুনিল খাসিয়া রাজা এ সব বৃত্তান্ত ॥
 শীঘ্র গিয়া মিলিলেক হেড়ম্ব রাজাতে ।
 দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে ॥
 হেড়ম্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ ।
 পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন ॥
 নির্ভয় নারায়ণে পত্র হাসিয়া লিখায় ।
 রাজা নাম ধরে সে যে উচিত না হয় ॥
 হাড়িয়ে জয়ন্ত্যা যুঝে সর্ব লোকে কয় ।
 আমাকে দেখিতে ভাই ক্ষম মহাশয় ॥
 এই পত্র লিখিল নির্ভয় নারায়ণ ।
 পত্র পাইয়া হাড়ি সৈন্য ফিরায়ে রাজন ॥
 ত্রিপুর রাজার থানা শ্রীহটে বৈসাইল ।
 কালা নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল ॥
 চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজা ।
 দুই সহস্র চলিলেক সৈন্য মহাতেজা ॥
 চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান ।
 প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান ॥
 দুই মাস পাঠানের বাকী যে বেতন ।
 উজিরে পাঠান বেতন না দিল তখন ॥
 আজি দিব কালি দিব কথায় টালন ।
 পাঠানে মারিল উজির এই সে কারণ ॥
 প্রচণ্ড উজির মেহারকুলে মারা গেল ।
 তান পুত্র প্রতাপ নারায়ণ পলাইল ॥

(১) পাবাইয়া—ঘুণাইয়া ।

(২) হেড়ম্ব নৃপতি পরিহাস করিয়া লিখিলেন, জয়ন্ত্যায় হাড়িতে যুদ্ধ করে, সকলে এইরূপ বলিতেছে । রাজা হইয়া তোমার এরূপ করা অকর্তব্য । আমার দিকে চাহিয়া (আমার অহুরোধে) জয়ন্ত্যা রাজাকে ক্ষমা কর ।

রাখিল আপনা প্রাণ বনে প্রবেশিয়া ।
 যতেক পাঠান রহে বেগণা (১) হইয়া ॥
 রাঙ্গামাটি রাজবাটী লুটিতে চাহে পাঠান ।
 রাজবাটী প্রহরী গড় ধরে সাবধান ॥
 তথা চাটিগ্রামে সেই পাঠান বর্ষর ।
 রাজাকে মারিতে যুক্তি করেন অপর ॥
 মন্থ পানে পাঠানের কলহ জন্মিল ।
 পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে ব্যক্ত হৈল ॥
 পাঠানের তরে রাজা জিজ্ঞাসিল পুনি ।
 বঙ্গ চাটিগ্রামে পাঠান যুক্তি হৈছে শুনি ॥
 পুনরপি এই কথা রাজাতে কহিল ।
 নিশ্চয় জানিয়া রাজা পাঠান ধরিল ॥
 সহস্র শোয়ার কর্তা পাঠান বিস্তর ।
 চতুর্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥
 শীঘ্র গতি নরপতি রাঙ্গামাটি আইসে ।
 পথে শুনিল রাজা উজির মরিছে ॥
 ফিরিয়া নৃপতি পরে বঙ্গতে চলিল ।
 এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠানে শুনিল ॥
 ভঙ্গ দিয়া গেল পাঠান গোড়েশ্বর স্থানে ।
 ক্রোধে গোড়েশ্বর সৈন্য বহু দিল রণে ॥
 চাটিগ্রামে চলিলেক সৈন্য সেনাগণ ।
 চলি আইসে বহু সৈন্য করিয়া গর্জন ॥
 মমারক খাঁ (২) নামেত গোড়েশ্বর (৩) শালা ।
 মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভাল ॥
 তিন সহস্র অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি ।
 দশ সহস্র ঢালি চলে ধানুকী পদাতি ॥
 ছরস্ত পাঠান জাতি ক্রোধে অহঙ্কারী ।
 চলিয়াছে চট্টগ্রামে পাঠান সঙ্গে করি ॥

(১) বেগনা—সম্পর্কবিহীন, এস্থলে বিদ্রোহী ।

(২) মতান্তরে মহম্মদ খাঁ ।

(৩) এই গোড়েশ্বর, উড়িয়া বিজয়ী সুলতান সুলেমান ।

অমরক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল ।
 ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল ॥
 এই বার্তা শুনি রাজা মহা ক্রোধ হৈল ।
 সেনাপতি সকলেরে অনেক ভৎসিল ॥
 কালা নাজির দক্ষিণ বাজু (১) শ্রীহট্ট বিজয় ।
 বাম বাজু (২) সৈন্য পলায় পাঠানের ভয় ॥
 শোয়ার নাহিক দেখি ত্রিপুরের সেনা ।
 পাঠানে লইল আসি চট্টগ্রাম থানা ॥
 পাঠান শোয়ার রাজার হইল বেগনা ।
 অশ্বহীন রাজ সৈন্য দেখে সর্বজন্য ॥
 ত্রিপুরার সেনা যত অশ্ব আরোহিয়া ।
 যুদ্ধ হেতু নরপতি দিল পাঠাইয়া ॥
 আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে ।
 লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে ॥
 হেন শুনি বিজয় মাণিক্য ক্রোধ হইল ।
 সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল (৩) ॥
 শ্রীহট্ট হনে কালা নাজির আনিল ত্বরায় ।
 দক্ষিণ বাজুর সৈন্য লইয়া ত্রিপুরায় ॥
 পুত্রবৎ মান্য দিয়া পাঠায় নাজির ।
 সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল মহাবীর ॥
 প্রাতঃকালে কালা নাজির যুদ্ধ আরম্ভিল ।
 পূর্ব প্রেরিত বাম বাজু পশ্চাতে রহিল ॥
 দুই সৈন্য আগু হৈয়া সংগ্রাম মাঝার ।
 তাঁর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়গ ধার ॥
 খড়গাঘাতে মহাশব্দ ঝনঝন হৈল ।
 ত্রিপুর পাঠান মহা সংগ্রাম বাজিল ॥
 রক্তময় হৈল সব অশ্ব নর দেহে ।
 পৃথিবীতে দন্ত দিয়া হস্তী সব রহে ॥
 স্থানে স্থানে মত্ত গজ দন্তে দন্তে ভিড়ি ।
 দুই মেঘে গর্জে যেন করে জড়াজড়ি ॥

(১-২) রাজধানীর উত্তরভাগ (শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশ) দক্ষিণ বাজু এবং দক্ষিণভাগ (চট্টগ্রাম প্রভৃতি) বাম বাজু নামে অভিহিত হইত । (৩) ইহা রণ-পরাজুত সেনাপতিগণের দণ্ড বিশেষ ।

যার যেই সীমাতে থাকিয়া যুদ্ধ করে ।
 চতুর্থ প্রহর গেল দুর্জয় সমরে ॥
 চারি দণ্ড বেলা আছে সায়ং সময় ।
 আগে যুদ্ধে নাজিরে পশ্চাতে সৈন্য রয় ॥
 যুদ্ধে কালা নাজির নাম সেনাপতি ছিল ।
 নাজিরের নাম শুনি পাঠানে বেড়িল ॥
 পৈশুণ্যে (১) না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ ।
 যুদ্ধে পড়িল নাজির এই সে কারণ ॥
 যুদ্ধ জয় হৈল বলি পাঠান বর্কবর ।
 শ্রান্ত হৈয়া গেল তারা গড়ের ভিতর ॥
 বহুতর শ্রান্ত হৈছে ক্ষত হৈছে দেহ ।
 ক্ষুধায় ব্যাকুল পাঠান খাইতে চাহে কেহ ॥
 কেহ শান্ত হৈতে আছে কেহ জল খায় ।
 জল পিয়া হস্তী ঘোড়া সকল শান্তায় ॥
 রন্ধনেতে গেছে কেহ খাইতে লাগিছে ।
 হেনকালে ত্রিপুর সৈন্যে মন্ত্রণা করিছে ॥
 রাজার পালক পুত্র নাজির পড়িল ।
 কি উত্তর দিবা সবে গজ ভীমে কৈল ॥
 যুক্তি করিয়া সৈন্যে করিল নিশ্চয় ।
 সন্ধ্যাকালে কোঠ তলে সুরঙ্গ নির্মায় ॥
 হাতে হাতে সুরঙ্গ খনিল সৈন্যগণ ।
 রাজ সৈন্য কোঠে গেল করিবারে রণ ॥
 তিন সহস্র ত্রিপুরগণ খড়্গ চর্ম লৈয়া ।
 কাটয়ে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া ॥
 ভঙ্গ দিল পাঠান অনেক মারা গেল ।
 মাতৃ সমে মমারক খাঁ গড়ে লুকাইল ॥
 লুকাইয়া রহে গড়ে প্রাচীর উপর ।
 চারি পার্শ্বে ত্রিপুর সৈন্যে বলে ধর ধর ॥

(১) পৈশুণ্য—খলতা, ধূর্ততা। পূর্বে প্রেরিত সেনাপতিগণ পরাজিত হওয়ার, মহারাজ কোপান্বিত হইয়া, তাহাদিগকে স্ত্রী কাটয়া জীবিকা নির্বাহার্থ চরখা উপহার দিয়া ছিলেন, এবং কালা নাজিরকে তাহাদের নাগক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। এজন্য সেনাপতিগণ ধূর্ততা করিয়া যুদ্ধ করে নাই।

প্রাচীর বেড়িল সবে ত্রিপুর সেনাগণ ।
 মমারক বলিয়া সৈন্তে করয়ে তর্জন ॥
 মমারক খাঁর মাতা কহিল তখন ।
 অগ্নিয়ে পুরিলে মাটি না পাইব কখন (১) ॥
 মাতার কথন শুনি কহিল ডাকিয়া ।
 সত্য কর তোমা সব মিলিব আসিয়া ॥
 ত্রিপুরা সেনায়ে বলে না মারিব তোকে ।
 রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে ॥
 এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল ।
 লোহার পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল ॥
 কাফির (২) বলিয়া খাঁয়ে বহু গালি দিল ।
 ত্রিপুরের সেনা তাকে লইয়া চলিল ॥
 থানাদার চট্টগ্রাম গড়েতে রাখিয়া ।
 পাঠানের যত দ্রব্য সকল লুটিয়া ॥
 হস্তী ঘোড়া যত দ্রব্য সকল রাজার ।
 অন্য দ্রব্য লুটে সবে যেই পায়ে তার ॥
 স্বর্ণ কুশ্মাণ্ড ছিল সের পরিমাণ ।
 সকল পাঠাইয়া দিছে রাজা বিদ্রুমান ॥
 দৈবে কুশ্মাণ্ড এক পাইকে (৩) লুকাইয়া ।
 মদ্যপান করিছিল শুঁড়ী ঘরে নিয়া ॥
 পিতলের জানিয়া কুশ্মাণ্ড নিয়াছিল ।
 এক আনা মূল্য করি মদ্যপান কৈল ॥
 অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত ।
 স্বর্ণ কুশ্মাণ্ড হেন জানিল পশ্চাত ॥
 দ্রুত মুখে শুনি রাজা তদন্ত করিল ।
 শুঁড়ী ঘরে দিয়া পাইকে মদ্যপান কৈল ॥
 আশ্চর্য সের মদ্য তাতে করিয়াছে পান ।
 এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিদ্রুমান ॥

(১) মমারক খাঁয়ের মাতা তাহাকে বলিলেন, ত্রিপুর সৈন্যগণ যদি অগ্নিদ্বারা দগ্ন করে, তাকে মাটি পাইব না, অর্থাৎ মুসলমান ধর্মাত্মমোদিত কবর পাইব না ।

(২) কাফির—ধর্ম বিবর্জিত ব্যক্তি, অধার্মিক ।

(৩) পাইক—সৈন্ত ।

এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিয়োজিল ।
 কুশ্মাণ্ড সহিতে শুঁড়ী ধরিয়া আনিল ॥
 হেন মতে পঞ্চশত কুশ্মাণ্ড পাইল ।
 রাজায় কুশ্মাণ্ড নিয়া মূল্য যত দিল (১) ॥
 পরে মমারক খাঁকে পিঞ্জরে রাখিয়া ।
 স্তবর্ণ দ্বারের (২) বাহির রাখিলেক নিয়া ॥
 নৃপতির স্থানে সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 মমারক খাঁকে স্তবর্ণ দ্বারেতে আনিল ॥
 পিঞ্জর হতে খসাইতে নৃপে আজ্ঞা দিল ।
 বিচিত্র ভূষণ কত খাঁকে রাজা দিল ॥
 রাজা দেখি মমারক খাঁ সেলাম না করে ।
 কিছু না বলিল রাজা ক্রোধ নাহি তারে ॥
 রাজাজ্ঞাতে খাঁকে আনিল মহল দ্বারে (৩) ।
 গোড়েশ্বর শালা সে যে মনে গর্ব করে ॥
 নৃপতির ইচ্ছা আছে না বধিতে তাকে ।
 দৈবের নির্বন্ধ যার যে মত যে থাকে ॥
 দুর্লভ চন্ডাই নাম রাজাতে যে কহে ।
 চতুর্দশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে ॥
 নৃপতিয়ে বলে চন্ডাই উচিত না হয় ।
 মমারক খাঁ বড় লোক সর্ব লোকে কয় ॥
 চন্ডাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে ।
 দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে ॥
 নিঃশব্দে রহিল রাজা, অনুমতি জ্ঞানে ।
 চন্ডাই যে খাঁকে নিল রত্নপুর (৪) স্থানে ॥
 রজনী বঞ্চিল খাঁয়ে রত্নপুর গ্রামে ।
 রাত্রি অবসানে চন্ডাই দেওড়াই সমে ॥

(১) পাঠান্তর—“হেনমতে পঞ্চশত কুশ্মাণ্ড লইল ।

রাজঘর হনে কড়ি শুঁড়ীয়ে দেওয়াইল ।

(২) স্তবর্ণ দ্বার—সদর দরজা, সিংহদ্বার ।

(৩) মহল দ্বার—প্রাসাদের সদর দরজা ।

(৪) রত্নপুর—এইস্থানে চতুর্দশ দেবতার মন্দির ছিল ।

পৃষ্ঠ হস্তে বান্ধি তারে স্নান করাইল ।
 হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র খাঁকে পৈরাইল ॥
 চতুর্দশ দেব অগ্রে খাঁকে বৈসায় ।
 পশ্চিম মুখি হয় সে যে আপনা ইচ্ছায় ॥
 বলাৎকারে (১) পূর্বমুখ খাঁকে করে পরে ।
 পশ্চিমেত মুখ সে যে হৈল পুনর্ব্বারে ॥
 বারম্বার খাঁয়ে স্কন্ধ দিয়া যে ফিরায়ে ।
 সেই কালে খাঁয়ের ভৃত্য ছিল সে যাপায়ে ॥
 খাঁর ভৃত্যে সেই কালে খাঁকে বলিয়াছে ।
 হজরত আনি (২) ভ্রাতা তুমি জানা আছে ॥
 মমারক খাঁ তোমা নাম গোড় সেনাপতি ।
 হেন জন পড়িয়াছ কাফির সঙ্গতি ॥
 পশ্চিমেত খোদা আছে পূর্ব্ব কিবা নহে (৩) ।
 এমত সময় তোমার কি বিচার তাহে ॥
 কাফিরে (৪) মারিলে তোমা পরে ভাল হৈবা ।
 অন্যাসে তুমি যেন ভেস্তুতে (৫) যাইবা ॥
 স্কন্ধ মেলিয়া দেও পূর্ব্ব মুখ হৈয়া ।
 এই দেহ ছাড় তুমি শীঘ্র যে করিয়া ॥
 এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে কলিমা (৬) পড়িল ।
 পূর্ব্ব মুখি হৈয়া খাঁয় স্কন্ধ পাতি দিল ॥
 চস্তাই খিতুঙ্গ নামে (৭) দিল উৎসর্গিয়া ।
 লিকা দেহড়াই ছেদে বারণা (৮) লইয়া ॥
 কাটিল মমারক খাঁ ত্রিপুরার বৈরী ।
 কলিজা (৯) মস্তক রক্ত একত্রতা করি ॥

- (১) বলাৎকারে — বলপূর্ব্বক ।
- (২) হজরত আনি— প্রভুত্ব, প্রাধাত্য ।
- (৩) খোদা কেবল পশ্চিমে আছেন, পূর্ব্বদিকে নাই, এমন নয় । খোদা—ঈশ্বর ।
- (৪) কাফির—ধর্ম্মজ্ঞান বিগর্হিত ব্যক্তি ।
- (৫) ভেস্তু — পুণ্যময় স্থান, স্বর্গ ।
- (৬) কলিমা—মুসলমান ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ইহা উচ্চারণ করিলে, উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায় ।
- (৭) খিতুঙ্গ—চস্তাইর নাম ।
- (৮) বারণা—খড়গ ।
- (৯) কলিজা—হৃদপিণ্ড ।

দেবতা সাক্ষাতে নিয়া উৎসর্গিয়া দিল ।
 যে মত বিধান ছিল তে মত করিল ॥
 হৃদয় ফাড়িতে তার দেখে গুরুতর ।
 সোণার পুতুল এক হৃদয় ভিতর ॥
 অপূর্ব দেখি চন্ডাই দেখায়ে রাজারে ।
 লক্ষ্মী চিন্তু বলি নৃপ রাখিল অন্তরে ॥

সপ্ত দিন পরে আইসে গোড়েশ্বর লিখা ।
 মমারক খাঁ ছাড়ি দেও তুমি আমার সখা ॥
 পদ্মা অবধি করি যাত্রাপুর (১) দেশ ।
 সীমানা করি দিব রাজ্য তোমাকে বিশেষ ॥
 পত্র শুনিয়া রাজা হইয়া বিস্মিত ।
 চন্ডাই গঞ্জিল রাজা সভার বিদিত ॥
 মমারক থাকে দিত যদি হৈত গোড় বশ ।
 তুমি চন্ডাই করিলা যে আমা অপযশ ॥
 নৃপে বলে চিন্তিয়া যে নহে কিছু কাজ ।
 খাঁয়ের মরণ বার্তা লিখে মহারাজ ॥
 কনক রচিত পত্র (২) বিশ্বাসে লিখিল (৩) ।
 নৃপ পত্র শূনি গোড় উখিত হইল ॥
 পুনর্ব্বার বাদসায়ের দূতকে পাঠায়ে ।
 দিল্লী সৈন্য সঙ্গে করি আসিব ছরায়ে ॥
 পরিবার সমে সাহা আসে ত্রিপুরাতে ।
 দূতে কহে বাদসায় বলিল যে মতে ॥

(১) যাত্রাপুর—ইছামতীর তীরবর্তী স্থান বিশেষ ।

(২) পুরাকালে পত্র রঞ্জিত করিবার নিয়ম ছিল । সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত পত্র উত্তম, রৌপ্য রঞ্জিত পত্র মধ্যম এবং রক্তাদি দ্বারা রঞ্জিত হইলে তাহা অধম পত্র বলিয়া গণ্য হইত । এতদ্বিষয়ে বররুচির মত এই ;—

“সুবর্ণ রূপ্য রক্তাঙ্কুরঞ্জয়েৎ পত্রমুত্তমং ।

সামান্তোত্তম মধ্যমাং পত্ররঞ্জনমীশ্রিতম্ ॥”

বররুচিকৃত পত্র কৌমুদী ।

(৩) রাজার পত্র লেখক নির্দিষ্ট কর্মচারী থাকিত, পত্র কৌমুদী আলোচনার ইহা পাওয়া যায় । ত্রিপুর রাজ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল । রাজ দরবারের পত্র লেখক ‘বিশ্বাস’ ও ‘পত্রনবীস’ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেন ।

তুষ্ট হৈয়া নৃপতি করিল অঙ্গীকার (১) ।
 আর দিন দূতেতে জিজ্ঞাসে পুনর্ব্বার ॥
 একাব্বর (২) পশ্চিমেতে আমি পূর্ব্বদিগ ।
 মধ্যেতে পাঠান জাতি রাজ্য করে ভোগ ॥
 এ কথা শুনিয়া দূত দিলেক উত্তর ।
 দাউদ বাদসা (৩) হয়ে বড় মহত্তর ॥
 দুই পত্নী দুই দিগে স্থখে নিদ্রা যায় ।
 এই মতে স্থখে বঞ্চে দাউদ বাদসায় ॥
 দূত বাক্যে ক্রোধ হৈল নৃপতি বিস্তর ।
 দূতেরে কাটিতে আজ্ঞা করিল সত্তর ॥
 বাছার (৪) সকলে দূত নিল সেই ক্ষণে ।
 গজ ভীম নারায়ণে কহিল কথনে ॥
 দূত মারিবার নহে উচিত রাজন ।
 পাঠান বর্ব্বর জাতি গুমান (৫) কথন ॥

(১) পাঠাস্তর—“পুনরপি গৌরপতি দূত পাঠাইল ।
 দিল্লীর সৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
 পরিবার রাখিবারে রাজার আবাসে ।
 দূত আসি বলিলেক একথা রাজাতে ॥
 তুষ্ট হৈয়া নরপতি কৈল অঙ্গীকার ।” ইত্যাদি ।

গৌড়েশ্বর দাউদশাহ, দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, পরিবারবর্গ নিরাপদে রক্ষার অভিপ্রায়ে ত্রিপুরায় প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া, মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । মহারাজও হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন ; কিন্তু মহারাজ দূতের অশিষ্ট ব্যবহারের দরুণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার, সেই স্থত্রেই গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই ।

(২) একাব্বর—আকবর বাদশাহ । ধার্মিকতা এবং সকল জাতির প্রতি সমদর্শিতার দরুণ তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন । একাব্বরী বা আকবরী মোহর (সুবর্ণ মুদ্রা) অত্ৰাপি লক্ষ্মীযুক্ত বলিয়া হিন্দুসমাজে আদরণীয় ; হিন্দুগণ তাঁহাকে ‘জগদীশ্বরো বা’ বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । তিনি পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইতেন ; একথা মাধবাচার্য্যের ‘দুর্গামঙ্গল’ গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা ;—

“পঞ্চ গৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার ।
 একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥”

(৩) দাউদ বাদসা—ইনি বঙ্গেশ্বর ছিলেন । ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি বিদ্রোহী হওয়ার, সম্রাট আকবর ইহাকে পরাস্ত করিয়া সলিনকে বাঙ্গালার মসনদে স্থাপিত করিয়া ছিলেন ।

(৪) বাছার—বাছাল । যুদ্ধ বিজিত কুকিগণের যে সকল র্তননী ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ বাছাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

(৫) গুমান—অহঙ্কার ।

রাজধানী পার করি দূতকে দিবার ।
 রাজাজ্ঞাতে সেই ক্ষণে দূত করে পার ॥
 গৌড়েশ্বর স্থানে দূতে কহিল বৃত্তান্ত ।
 বহুল ভৎসিল তাকে পাঠান ছুরন্ত ॥
 শ্রীতি করিবার তোকে পাঠায়ে বাদসায়ে ।
 কনহ করিয়া আইলে খোদার ইচ্ছায়ে ॥
 দূতে কহেত পাঠান এবে না রহিব ।
 মগলে পাইবে রাজ্য পাঠান ভাগিব (১) ॥
 এই অবকাশেতে বিজয় মাণিক্য রাজা ।
 বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈন্য প্রজা ॥
 পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন ।
 এক সহস্র অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন ॥
 নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ ।
 আর নৌকায় রাখিলেক পদাতি সমাজ ॥
 ভিক্ষি আদি নৌকায়ে রাখে যত সৈন্যগণ ।
 বিজয় মাণিক্য চলে অনেক সাজন ॥
 প্রথমে করিল রাজা ব্রহ্মপুত্র স্নান ।
 ধ্বজ আরোপিয়া (২) ঘাটে করে বিধি দান ॥
 তীর্থরাজ লোহিত্য (৩) দেখিল নরেশ্বর ।
 স্নান দান করিলেক পুণ্য কলেবর ॥
 ভৃগুরামে (৪) যথা ধ্বজ করিছে আরোপণ ।
 সেই স্থানে করে নৃপ ধ্বজের স্থাপন ॥
 সহস্র স্বর্ণ ধ্বজ আরোপিল ভূপে ।
 উৎসর্গিয়া দিল স্বর্ণ ব্রাহ্মণ সমীপে ॥

(১) ইহা পাঠান রাজত্বের শেষ অবস্থার সময় ; মোগল ও পাঠানের মধ্যে এইকালে সত্বর্ষ আরম্ভ হইরাছিল ।

(২) ধ্বজা রোপণ-- ইহা পুণ্যজনক কার্য্য। তীর্থস্থান, দেবালয় ও প্রাসাদ প্রভৃতিতে ধ্বজোত্তোলন না করিলে, তাহার বিগুহতা রক্ষিত হয় না । শাস্ত্রে ধ্বজা রোপণ সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

“চুলকে ধ্বজদণ্ডে চ ধ্বজে দেবকুলে তথা ।
 প্রতিষ্ঠা চ যথোদ্দিষ্টা তথা স্বন বদামি তে ॥”

অগ্নিপুরাণ—১০৩ অঃ ।

(৩) লোহিত্য—ব্রহ্মপুত্র । (৪) ভৃগুরাম—পরশুরাম ।

উৎসর্গ স্বর্ণ যত ব্রাহ্মণে লুটে ।
 বিজয় মাণিক্য কীর্ত্তি হৈল ধ্বজ ঘাটে ॥
 সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন ।
 পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ক্রয় করিল তখন ॥
 সেই পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল ।
 সেই হনে পঞ্চ দ্রোণা গ্রাম নাম হৈল ॥
 ধ্বজঘাট সমীপেতে পঞ্চ দ্রোণ গ্রাম ।
 বিজয় মাণিক্য রাজা পুণ্যতর ধাম ॥
 লোহিত্য পশ্চিম ভাগে বসতি জাহ্নবী ।
 পূর্বভাগে বসুনা যে সরস্বতী দেবী ॥
 ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ (১) মারিল (২) ।
 ধ্বজঘাট বিজয়ী বলি মহরে লিখিল ॥
 তীর্থরাজ স্নান পরে লক্ষ্মাতে গমন ।
 লক্ষ্মা স্নান বলি জরপ মারিল রাজন ॥
 ঐচ্ছানতী পথে পদ্মাবতী গেল পরে ।
 যাত্রাপুরে গিয়া রাজা স্নান তর্পণ করে ॥
 পদ্মাবতী স্নান পরে মহর মারিছে ।
 পদ্মাবতীর জল পান সসৈন্তে করিছে ॥
 কত দিন নরপতি রহিল তথাতে ।
 অব্যক্ত গোড়ের দূত (৩) আসিল দেখিতে ॥
 মহা এক বন্ধে চাড়ি দুই জন ভাট (৪) ।
 দেখিলেক পদ্মাবতীরে রাজা করে পাট (৫) ॥
 হেন কালে রাজদূতে দেখিল তাহাকে ।
 পারিয়া আনিল ভাট রাজার সম্মুখে ॥
 জিজ্ঞাসিল নরপতি সত্য করি কহ ।
 কাহার প্রেরক (৬) তুমি কি হেতু আইসহ ॥

- (১) জরপ—স্বর্ণমুদ্রা ।
- (২) মারিল—ছাপদিল, স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিল ।
- (৩) অব্যক্ত দূত—গুপ্তচর ।
- (৪) ভাট—অবস্থা বর্ণনকারী দূত বা বার্তাবাহ ।
- (৫) পাট—রাজার আবাস স্থান ।
- (৬) প্রেরক—প্রেরিত ।

রাজার বচন শুনি সে ভটে কহিল ।
 তোমাকে দেখিতে গৌড়েশ্বরে পাঠাইল ॥
 ত্রিপুরার সৈন্যগণ কিমত আকার ।
 কিবা ক্রমে ঘোড়া চড়ে, খড়্গ ঢাল তার (১) ॥
 এই ত স্বরূপ কথা আমি নিবেদিল ।
 তোমা চরে আগা পাইয়া ধরিয়া আনিল ॥
 একথা শুনিয়া রাজা ভট্ট বিদায় কৈল ।
 এ সব কহিত (২) গিয়া প্রাণে না মারিল ॥
 স্তব্ধ গ্রামেতে কত আছিল সুন্দরী ।
 বলেতে ধরিয়া আনে তাহার যে পুরী ॥
 বিক্রম পুরেতে যাইয়া আসিল কিরিয়া ।
 নিন্দা করে স্তব্ধ গ্রামে ত্রিপুর দেখিয়া ॥
 এসব দেখিয়া নৃপ মনে ক্রোধ হৈল ।
 স্তব্ধ গ্রামেতে নৃপ কত দিন ছিল ॥
 কুলীন চৌধুরী সবেসু সুন্দরী তার কন্ডা ।
 সেই ঘরে নৃপতির পালক রাখি ধন্য ॥
 সহস্রেক তঙ্কা পায় পালক সহিত ।
 এই রূপে স্তব্ধ গ্রামে করিল পরিমিত ॥
 এই দোষ নৃপতির শরীরেতে ছিল ।
 সুন্দরী নিকৃষ্ট জাতি তাকে না দৃশিল (৩) ॥
 শরীর সুন্দর রাজার চন্দ্র সমান খান ।
 গৌর বর্ণ পাণ্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান ॥
 কন্দর্প সমান রূপ অতি মনোহর ।
 রাজসিক ভাব নিত্য থাকরে অস্তর ॥
 এক দিনে ব্রহ্মপুত্রে পোল নিশ্চাইল ।
 সসৈন্য সহিতে রাজা পোল পার হৈল ॥

(১) তাঁহার খড়্গ, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র-বিক্রম । তাহা দেখিতে পাঠাইয়াছে ।

(২) কহিত—বলিবার নিমিত্ত ।

(৩) পাঠান্তর—“এক দোষ নৃপতির শরীরে আছিল ।

ভৌমিক সুন্দরী শুনি তাকে না বাছিল ॥”

এস্থলে ভূঁই নাগীকে ভৌমিক বলা হইয়াছে ।

সরণির পথ ক্রমে কৈলাগড়ে (১) আনি ।
 খনাইল এক নদী তথা নৃপে বসি ॥
 বিজয় নন্দিনী (২) নাম রাখিল নদীর ।
 শ্রীহটে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর ॥
 তার পরে জাঙ্গাল রাজা বাঙ্করে আজ্ঞাতে ।
 ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে (৩) ॥
 জিনার পুরেত (৪) রাজা খাল কাটি দিল ।
 ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হৈল ॥
 পঞ্চ খণ্ড দেশ হইয়া ইটাতে আসিল ।
 ভানু নারায়ণ তাতে ভানুকদার ছিল ॥
 চারিদিকে জমিদারে হিংসে যে তাহারে ।
 সীমা করিল নৃপে তাকে দিতে ইচ্ছা করে ॥
 নৃপ স্থানে প্রতিগ্রহ দ্বিজে ভূমি চাহে ।
 উৎসর্গিয়া দিল ভূমি তাম্র পত্রে তাহে ॥
 সেই হনে চৌধুরী খ্যাতি হৈল দ্বিজবর ।
 পুনি নৃপতি স্থানে চাহিল অপর ॥
 সমস্ত পাইল কহে সেই বিজবর ।
 চতুর্থাংশ রাজ ভূমি দিতে চাহে কর ॥
 তবেত রহিব আমি পুরুষানুক্রম ।
 তাহা নাহি হৈলে আমি বৃথা হৈল শ্রম ॥

(১) কৈলাগড়—কসবা ।

(২) বিজয় নন্দিনী—বিজয় নদী । তিতাস নদী হইতে, নয়ানপুরের সন্নিহিত বুড়িমা নদী পর্যন্ত একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে । বিজয়মাণিক্য এই নদীর বাঁক কাটাওয়া সোজা করায়, তদবধি নদীর নাম 'বিজয় নদী' হইয়াছে । ইহাকে বিজনা নদীও বলে ।

(৩) পাঠান্তর—“শ্রীহটে ত গেলেন বিজয় মহাবীর ॥

তরপে জাঙ্গাল বাঙ্কর রাজার আজ্ঞারে ।

ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি অত্মাপি কহয়ে ॥”

‘তরপে’ স্থলে, এখানে ‘তারপরে’ লিখিত হইয়াছে । তারপ শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণার নাম । এই পরগণার ভিতর যে প্রাচীন সড়ক আছে, তাহা বিজয় মাণিক্যের কীর্তি ।

(৪) জিনারপুর—এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ।

পরে নৃপতি বলে তোমা ইচ্ছা মতে ।
 কর দিতে কহে নৃপে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাতে ॥
 তথা হনে নরপতি চৌয়াল্লিশ দেশে ।
 শিকার করিল নৃপ হরিষ বিশেষে ॥
 বহু দিন সসৈন্যেতে নৃপ সেই স্থান ।
 রাজ সৈন্য লুটিতে রাজ্য করিল পয়ান ॥
 মহা খাড়াইত (১) তারা দুই সহস্র পাইক ।
 খড়্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ॥
 সাতবার ধন্য সাগর ফিরিতে যে পারে ।
 সেই জনা তার নাম খাড়াইয়া ধরে ॥
 দিবা রাত্র থাকে রাজ দ্বারেতে প্রহরী ।
 বড় বড় অঙ্গ তারার (২) বিক্রমে কেশরী ॥
 এক খাড়াইত গেল দেশ লুটিবার ।
 ভঙ্গ দিল বঙ্গদেশী (৩) দেখি ব্যবহার ॥
 এক নারীয়ে তাহার চরণে পড়িল ।
 কেশ দিয়া খাড়াইত পায়েতে বান্ধিল ॥
 পদে বান্ধিল নারী নড়িতে না পারে ।
 হেন কালে তার পতি আসিল সহরে ॥
 প্রহার করিল স্বামী পাইকের মাথে ।
 সূর্য্য খাড়াইত মরে প্রহারের ঘাতে ॥
 রাজার সাক্ষাতে বার্তা গেল ততক্ষণ ।
 অগ্নি সম ক্রোধ হৈল শুনিয়া রাজন ॥
 গ্রাম সমে (৪) ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা দিল ।
 ধরিলেক কত জনা কত পলাইল ॥
 জমিদারে ধরি দিল যে জনা মারিছে ।
 সূর্য্য খাড়াইত যেই প্রাণেতে বধিছে ॥

- (১) 'খাড়াইত' উপাধি বহু প্রাচীন । এই লহরের টীকায় খাড়াইতের বিবরণ পাওয়া যাইবে ।
- (২) তারার—তাহাদের । ইহা ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা ।
- (৩) এই সময় খ্রীষ্ট অঞ্চল বঙ্গের শাসনাধীন ছিল ।
- (৪) গ্রামসমে—গ্রাম সহিত, গ্রামের সমস্ত লোক ।

তথা হনে নরপতি বালিশিরা গেল ।
 বিজয়পুর নাম গ্রাম তথাতে বৈসাইল (১) ॥
 কত দিন পরে রাজা ঊনকোটি (২) গেল ।
 এক ঊনকোটি লিঙ্গ তথাতে দেখিল ॥
 লঙ্গলা দেশ হৈতে ধম্মনগর আইসে ।
 হর গৌরী পূজিছিল কামনা বিশেষে ॥
 ডাঙ্গর ফার পুরী মধ্যে ছিল কত দিন ।
 নারেন্দ্র কমলা বাগ দেখিল প্রবীণ ॥
 ডাঙ্গর ফার আর বাড়ি তমকান (৩) স্থান ।
 তথাতে আছিল রাজা বীরদর্প জ্ঞান ॥
 রাঙ্গামাটি আসিল রাজা যশপুর পথে ।
 রাজধানী গিয়া রাজা বহু দান তাতে ॥
 তুলাপুরুষ (৪) আদি করি কল্পতরু (৫) দান ।
 এমত করিল দান পুণ্য অনুষ্ঠান ॥

(১) ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ নামক হস্তলিখিত পুস্তিকায় আছে,—

“সোনাই নদী উজাইয়া, নৌকা সব চলে ধাইয়া,
 দেখে ভূমি পতিত রহিল ।
 মহারাজা ভাবি মনে, আপনার নিজ নামে,
 বিজয়পুর গ্রাম বসাইল ॥”

(২) ঊনকোটি—একটি তীর্থ স্থান, ইহার বিবরণ পরবর্তী টীকায় দ্রষ্টব্য । এই স্থান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ।

(৩) তমকান—ইহা বালাঘাটের (খোয়াইর) প্রাচীন নাম । ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ পুস্তিকায় পাওয়া যায়,—

“শ্রীহট্টের গড়ে গিয়া, বাণ্যাচঙ্গ পরগণা হৈয়া,
 বালাঘাটে উপস্থিত হৈল ।
 হেরিয়া কমলা বন, আনন্দিত রাজা হন,
 পরিপকু কমলা আনিল ।”

(৪) তুলাপুরুষ দান—দাতা তুলা মণ্ডের একদিকে থাকিয়া, অপরদিকে সুবর্ণ ও রজত শ্রুতি দিয়া ওজন করতঃ সেই সকল বস্তু দান করাকে তুলাপুরুষ দান বলে । এক এক ধাতুদ্রব্য দ্বারা তুলাপুরুষ করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল শাস্ত্রে কীৰ্তিত হইয়াছে ; দান সাগর গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে ।

(৫) কল্পতরু—দেবলোকের বৃক্ষ বিশেষ । এই বৃক্ষের নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায় । মনুষ্যও পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত কল্পতরু হইবার বিধান শাস্ত্রে আছে । কল্পতরু হইবার কালে, যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিতে হয় । কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখা বাইতে পারে না ।

হীরাপুরে এক মঠ দুই দাঁধী তান ।
 ভূমি উৎসর্গিল তাম্র পত্রেতে প্রমাণ ॥
 হীরা গোপীনাথ নামে শ্রীযুক্তি স্থাপিয়া ।
 তাম্র পত্র করি তাতে শ্লোক যে লিখিয়া ॥

অন্য শ্লোক ।

ধন্য মাণিকা ভূপালো বহুভূবি তল্লভঃ ।
 তৎ সূত্রে দেব মাণিক্যস্তং সূত্রোবিজয় স্বয়ং ॥
 রাজা রাগশিরোরত্ননিষ্কট চরণমুজঃ (১) ।
 শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্যে রাজা রাজভিরাভ্যে ॥

পয়ার ।

ইত্যাদি কখন শ্লোক লিখে তাম্র পত্রে ।
 পয়ার করিয়া লিখে বুঝিবার তত্রে ॥
 শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পৃথিবী দুর্লভ ।
 তার পুত্র দেব মাণিক্য রত্নর সম্ভব ॥
 তাহার পুত্র বিজয় মাণিক্য রাজন ।
 রাজা সবের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণ ॥
 শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য দেব মহারাজা ।
 রাজা মধ্য বিরাজিত বলে মহাতেজা ॥
 ধ্বজ ঘাট হনে যত বানিয়া কাঁসারি ।
 আনিয়া বসাইল নাম ধ্বজ যে নগরী ॥

(১) তাম্রশাসনে এবস্থিধ গর্ভিত বাক্য উৎকীর্ণ করিবার দৃষ্টান্ত ইতাই প্রথম নহে । মহারাজ বিজয় মাণিক্যের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে (১১৬৫ শকে) সম্পাদিত দামোদর দেবের তাম্রশাসনেও এইরূপ বাক্য পাওয়া বাইতেছে,—

“ধ্বংগ প্রভবেন্দু সুন্দর বশো নির্ধোঁত লোকত্রয়ী বন্ধোঃ
 শ্রীপুরুষোত্তমস্য তনয়ঃ প্রৌঢ় প্রতাপোহভবৎ ।
 দেবঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য নৃপতির্ষেনাপি সেবানমৎ
 ভূমীপাল ললাটঘৃষ্টচরণঃ শ্রীবাসুদেবোহজনি ॥
 তশ্চাভ্যজঃ পুণ্যরাজশিরোমালশ্চাকিঞ্চনবিতান্নিনখচক্রময়ুখমালঃ
 প্রজ্ঞা প্রসারিত মহীদয়িত পুত্রঃ শ্রীদামোদরঃ সকল নৃপতি চক্রবর্তী ॥”

এই তাম্রফলকে দামোদর ‘ত্রিপুর জয়িনঃ’ বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন । এ বিষয় স্থানাঙ্করে আলোচিত হইবে ।

সেই কালে পুরাতন চন্ডাই মরিল ।
 নবীন চন্ডাই নৃপে করিতে চাহিল ॥
 প্রাতঃকাল হৈল তবে দেবতা পূজন ।
 সেই রাত্রে নৃপাভিরে দেখিল স্বপন ॥
 বিজয় দুর্লভ নারায়ণ চন্ডাই বিনে ।
 অন্য হস্তে পূজা না লভিব কদাচনে ॥
 এই স্বপ্ন নরপতি রাতেতে দেখিল ।
 সেই সে কারণে দুর্লভ চন্ডাই হইল ॥
 সেই দিনে দুর্লভ করে দেবতা পূজন ।
 তেম মতে রাজ্যপদ করেন রাজন ॥

নরপতির দুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রমে ।
 ডুঙ্গু তীর্থে (১) জন্ম জ্যেষ্ঠ ডুঙ্গুর নাম উত্তম ॥
 অনন্ত হইল নাম তাহার কনিষ্ঠ ।
 কুচরিত্র দুই পুত্র প্রকৃতি অনিষ্ট ॥
 তাহা দেখি নরপতি মনেতে বিস্ময় ।
 দৈবজ্ঞেতে জিজ্ঞাসিল কুষ্ঠীর নির্ণয় ॥
 ডুঙ্গুরের কুষ্ঠী মাঝে ছেদযোগ (২) হয় ।
 অনন্তের রাজযোগ (৩) দৈবজ্ঞে করয় ॥
 তাহা শুনি নরপতি বিবেচনা করে ।
 ডুঙ্গুর ফাকে উড়ন্যাতে পাঠাইতে সত্বরে ॥
 মুকুন্দ নামে ছিল উড়ন্যা ভূপতি ।
 তাহান স্থানে পত্র লিখে বিজয় নৃপতি ॥

(১) গোনগী নদীর উৎপত্তি স্থানকে ডুঙ্গু বা ডুঙ্গুর বলে। এই নদীর টাঁকাই দিল্লীকে জটীয়া ।

(২) ছেদযোগ—গ্রহ নক্ষত্রাদির সে অশুভ যোগকালে জন্মগ্রহণ করিলে, জাঃ শিশুর জন্মাদি দ্বারা অঙ্গ ছেদ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহাকে 'ছেদযোগ' বলে ।

(৩) রাজযোগ—গ্রহ নক্ষত্রাদির যে শুভ সংযোগ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু ভবিষ্যতে রাজা হইবে বশিষ্ঠা স্মৃতিত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ' বলে । শ্রীচন্দ্রদেবের তন্ত্রশাসনে 'স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্ত্তে' বাক্যের উল্লেখ আছে। আপ্তের অভিধানে 'রাজযোগ' শব্দের নিয়ন্ত্ররূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,—“a configuration of planets, asterisms etc., at the birth of a man, which indicates that he is destined to be a king.”

অষ্ট গ্রাম জমি কত দিয়া উড়ষ্যাতে ।
 ডুঙ্গুর ফা পুত্রকে দিয়া রাখিবা যে গ্রীতে ॥
 ডুঙ্গুর পুত্রের সঙ্গে রাজ-পত্র যায় ।
 অনেক স্বর্ণ দিল জন্মাবধি খায় ॥
 জগন্নাথ সেবিবারে শিখায়ে তাহারে ।
 পুত্র স্নেহ ছাড়ি রাজা পাঠাইল দূরে ॥
 জগন্নাথ সেবা করি হইবা অমর ।
 উড়ষ্যাতে ডুঙ্গুর পুত্র পাঠায় সত্বর ॥
 অনন্ত পুত্রকে রাজ্য দিবেক নৃপতি ।
 সর্বক্ষণ খেলে সে যে কুৎসিত প্রকৃতি ॥
 লুকালুকি খেলে সে যে শিশুগণ সঙ্গে ।
 পণ রাখি খেলা করে কোতুহল রঙ্গে ॥
 শুইয়া শয্যাতে সে যে কাপড় বেড়ায় ।
 মৃত মনুষ্য মত দাহিতে লইয়া যায় ॥
 কদলির গাছ কান্ধে সঙ্গে যত জন ।
 আগে পাছে কত জন পথেতে গমন ॥
 ধাবমান গিয়া তাকে যেন করে মানা ।
 বহু গালি দিয়া তাকে করয়ে তর্জনা ॥
 এই মত কুচরিত্র কতেক কহিব ।
 ভয় নাহি মনে তার রাজ্যে গুনিব ॥
 কুপ্রকৃতি রাজপুত্র দেখিয়া রাজায় ।
 গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করায় ॥
 রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভালা ।
 আজি হতে তুমি আমার বেয়াই হইলা ॥
 প্রথমে আছিলি তুমি বাছার দফাতে ।
 ধর্মপুরে গিয়াছিলি রাজার কশ্মেতে ॥
 এক দ্বিজ বদরী বৃক্ষে লোভে উঠিছিলি ।
 বাঁশ খুঁচি দিয়া তোকে ভূমিতে ফেলিলা ॥
 দাও দিয়া বলি বিপ্রে তোকে গালি দিল । (১)
 বাঁশের বাড়িয়ে তোমা শরীর ক্ষত হইল ॥

(১) দাও দ্বারা বলি দিবে বনিয়া বিপ্রে গালি দিয়াছিল

পরে আমি তোকে দিল বড়ুয়া (১) পদবী ।
 আমার রক্ষন ঘরে মহামুন্সবি (২) ॥
 আমা অন্ন দিতে তোর হস্তেতে দেখিল ।
 ধ্বজ বজ্রাকুশ চিহ্ন (৩) তোর হস্তে ছিল ॥
 তার পরে মহল দ্বারে রাখিল সমুখে ।
 পরে গোপীপ্রসাদ নারায়ণ (৪) করিলাম তোকে ॥
 শালগ্রাম হরিবংশ নৃপতি সাক্ষাত ।
 পরসায়ে গোপীপ্রসাদ সেনাপতি তাত ॥
 নৃপে কহিল তুমি এমত সেনাপতি ।
 পুত্র তোমা সমর্পিলাম তোমা কন্যা পতি ॥
 সেনাপতি দণ্ডবতে কহিল কখন ।
 সেবকেরে এত দয়া করিছ রাজন ॥
 সেই কালে নৃপে পাত্রে পুত্র সমর্পিল (৫) ।
 সাতচল্লিশ বর্ষ নৃপের বয়স হৈয়াছিল ॥
 সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে ।
 দৈবগতি বসন্ত নৃপের হৈল শরীরে ॥
 মহাকষ্ট পায় রাজা বস্ত্রণা বিস্তর ।
 তাহার আঘাতে দেহ হৈল বহু জ্বর ॥
 ধন্বন্তরি নারায়ণ পিতা যাতু বৈদ্য ।
 প্রয়োগ করায়ে বহু কালে নহে সাধ্য ॥

(৬)

(১) বড়ুয়া—সেনাপতিগণের উপাধি ।

(২) মহামুন্সবি—মহামুন্সী । মহারাজের পাচকগণ ‘মহামুন্সী’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

(৩) ধ্বজ বজ্রাকুশ চিহ্ন—ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অক্ষুশাকার চিহ্ন । ভগবান্ বিষ্ণুর চরণে এই চিহ্ন অঙ্কিত আছে । মনুষ্যের হস্তে বা পদে এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, তাহা রাজযোগ বলিয়া কথিত হয় ।

(৪) নারায়ণ—রাজদত্ত উপাধি । ইহার বিবরণ পরবর্তী টীকায় দ্রষ্টব্য ।

(৫) সেইকালে নৃপ, পাত্রে (সেনাপতিকে) পুত্র সমর্পণ করিলেন । সেইকালে সেনাপতিগণই পাত্রে (মন্ত্রীর) কার্য্য করিতেন ।

(৬) পাঠান্তর—“বেয়াল্লিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ কৈল ॥

সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হইল যবে ।

দৈবগতি রাজার নীতলা হইল তবে ॥”

এই পাঠই বিস্তৃত । নকলকারীর ভ্রমে পাঠ বিকৃতি ঘটয়াছে ।

কালে ধরিল যবে ঔষধে কিবা কাজ ।
 তথাপি জীবান ইচ্ছা মনে মহারাজ ॥
 রাজা বলে যাচুরায় আমা সাহ (১) কর ।
 সর্বান্তে সুবর্ণ জড়িত করিব তোমার ॥
 ইচ্ছায়ে না হয় কিছু কাল বলবান ।
 শালগ্রাম ক্ষেত্রে রাজা স্বর্গে গেল প্রাণ ॥
 বড় গৃহে অগ্নি লাগি নির্বাপণ পায় ।
 তেমত বিজয় নৃপের রাজ্য ভোগ তায় ॥ (২)
 মহা কোলাহল হৈল রাজ অন্তঃপুরে ।
 রাজ পুত্র অনন্তমাণিক্য নাম পরে ॥
 রাজ শ্বশুর গোপীপ্রসাদ নারায়ণ ।
 জামাতাকে বসাইল রাজ সিংহাসন ॥
 বিজয়মাণিক্য মৃত স্নান করাইয়া ।
 রাজ আভরণ বস্ত্র সব পরাইয়া ॥
 বাদ্য ভাণ্ড দুন্দুভি কর্ণাল মৃদঙ্গ ।
 হস্তী ঘোড়া সৈন্য চলে চতুর্দোল সঙ্গ ॥
 মহাদেবী আগে করি যত নৃপ-ভার্য্যা ।
 শ্মশানে গমন করে স্বামী করি পূজা ॥
 বৈকুণ্ঠপুর স্থানে নৃপ দাহ হৈল ।
 অন্য মন্বন্তর (৩) যেন তেমত ঘটিল ॥
 শ্রাদ্ধ সান্ন পরে মঠ শ্মশানেতে দিল ।
 মুক্তিশিলা (৪) প্রস্তরেতে নির্মাইয়া ছিল ॥

(১) সাহ—আরোগ্য ।

(২) এই দুই পংক্তির ভাব দুর্কোধ্য । এই মাত্র অনুমান করা বাইতে পারে, বড় গৃহ ভস্মসাৎ হইলে যেমন অশান্তি ও অভাব ঘটে, বিজয় মাণিক্যের জ্ঞান সুযোগ্য রাজার অভাবে রাজ্যের তরুণ অবস্থা ঘটয়াছিল ।

(৩) মন্বন্তর—এক এক রাজার শাসনকালকে এক এক মন্বন্তর গণ্য করা হইয়াছে ।

(৪) মুক্তিশিলা—শ্মশানক্ষেত্রের মঠ ।

অনন্তমাণিক্য খণ্ড ।

বিজয়মাণিক্য রাজার পরলোক হৈল ।
অনন্তমাণিক্য রাজা মগদে (১) শুনিল ॥
গোপীপ্রসাদ নারায়ণ কার্ঘ্যের প্রধান ।
ভোজন করয়ে রাজা শ্বশুরের স্থান ॥
যেই দিনে তার ঘরে রাজা নাহি আইসে ।
ডাকিয়া আনিয়া রাজা খাওয়ায়ে বিশেষে ॥
নিত্য গিয়া রাজায় শ্বশুর গৃহে খায় ।
সদাকাল মহারাণী রাজাকে বুঝায় ॥
রাজা হইয়া শ্বশুর গৃহে নিত্য কেনে খাও ।
ভাল মন্দ নাহি বুঝ মরিবারে চাও ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা কহন্ত (২) আপনে ।
শ্বশুরে ডাকিয়া নিতে রহিব কেমনে ॥
পিতা সমর্পিয়া গিছে তাহার নিকট ।
তার আজ্ঞা লজ্জি আমি রহিতে সঙ্কট ॥
হেন শূনি মহাদেবী নিঃশব্দে রহিল ।
রাজারে ধরিল কালে মানা না শুনিল ॥
সপ্ত বৎসরের রাণী হৈল বুদ্ধিমতী ।
না ধরে কাহার বাক্য অবোধ নৃপতি ॥

হেন রূপে কত কাল গেল এই মতে ।
বিধি নিয়োজিত রাজা না পারে বুঝিতে ॥
গোপীপ্রসাদ মহামন্ত্রী সে যে রাজ্যলোভী হৈল ।
জামাতা বধিতে মন্ত্রী মন্ত্রণা করিল ॥
গদাভীম স্থানে মল্ল শিখয়ে রাজায়ে ।
গোপনে মল্লের স্থানে মন্ত্রীয়ে শিখায়ে ॥
যেই কালে মল্ল বিগ্ণা রাজারে শিখাইবা ।
নৃপ গলে বদ্ধ করি পরাণে মারিবা ॥

(১) মগদ—মঘ ।

(২) কহন্ত—কহেন, বলেন ।

তাহা শুনি গদা ভীমে কহিল সত্বর ।
 পুরুষানুক্রমে আমি তাহার চাকর ॥
 শতাবধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি ।
 তার বংশ মারি আমি নাহি অব্যাহতি ॥
 দশ দ্বিজ সম যেন এক রাজা হয় ।
 রাজবংশ বধে হয় নরক নিশ্চয় ॥
 ছত্রধারী সিংহাসন যেই রাজা হয় ।
 তার বধে মহা পাপ ধর্ম শাস্ত্রে কয় ॥
 বিশেষ আমার বংশ পালিলে নৃপবরে ।
 কিবা ধর্ম হয়ে আমি তাকে মারিবারে ॥
 এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিঃশব্দে রহিল ।
 পান দিয়া গদাভীম বিদায় করিল ॥
 তাহার ভাগিনা বীর মর্দন নারায়ণ ।
 তাহাকে শিখায়ে মন্ত্রী বধিতে রাজন ॥
 অঙ্গীকার কৈল মন্ত্রী রাজাকে বধিতে (১) ।
 গোপনে রহিল সে যে কোঠার মধ্যেতে ॥
 যে পথে নৃপতি যাইব করিতে ভোজন ।
 সেই পথে লুকি দিয়া (২) রহিছে সে জন ॥
 শ্বশুর বাড়ীতে রাজা আইসে অন্ন খাইতে ।
 কোঠা ঘর পথে রাজা তখনে যাইতে ॥
 গলে ত বান্ধিয়া বস্ত্র ফাঁসী লাগাইল ।
 অনন্তমাণিক্য রাজা ফাঁসীতে মরিল ॥
 বৎসর দেড়েক রাজা রাজ্যের শাসন ।
 পরলোক গেল রাজা শ্বশুর কারণ ॥

(১) পাঠান্তর—“অঙ্গীকার কৈল সেই রাজাকে মারিতে ।”

ইহাই বিগুহ পাঠ, মন্ত্রী (সেনাপতি) অঙ্গীকার করেন নাই, তিনি অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন ।

(২) লুকি দিয়া—গুপ্তভাবে ।

উদয়মাণিক্য খণ্ড ।

রাজার শশুর গোপী প্রসাদ ভুট্ট হইয়া ।
উদয়মাণিক্য নাম ধরে প্রকাশিয়া ॥
রাজার বাড়ীতে গিয়া সিংহাসনে বসে ।
তাহার কন্যায় তাকে গালি দিতে আইসে ॥
রাজবংশ নাশ কৈলে অতি পাপমতি ।
ক্ষুরধার নরকেতে তোমার বসতি ॥
বৃদ্ধ কালে কলঙ্ক নরকে বাস কৈলা ।
নৃপ বধ করি তুমি পাতকী হইলা ॥
এই মতে গালি তাকে বলিলেক যত ।
পুস্তক বাড়য়ে দেখি না লিখিল তত ॥
অষ্টম বৎসর আমি যাইব রাজ সঙ্গে ।
নির্বংশ হইবে তুমি দেখ লোকে রঙ্গে ॥
তাহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল ।
সহগামী যাইতে কন্যা ধরিয়া রাখিল (১) ॥
মহল দ্বারেতে রাজা মরা পড়িয়াছে ।
ধূলায় ধূসর রাজা যেন শুইয়াছে ॥
রাজ আজ্ঞা মৃত রাজা চারি পাইকে নিল ।
বিজয়মাণিক্য নিকট অনন্ত দহিল ॥
অনন্ত মাণিক্য-রাণী জয়া মহাদেবী ।
কহিতে লাগিল পুনঃ মনে উস্মা ভাবি ॥
রাজা সঙ্গে যাইবারে না দিলা পাপিষ্ঠ ।
অনন্ত মাণিক্য বধি তুমি হৈলা ভুট্ট ॥
স্বামী মারি রাজ্য নিলা স্ত্রী মাত্র সার ।
এ বলিয়া রাণী যায় পাটে উঠিবার ॥ } (২)

(১) কন্যাকে সহগামিনী হইতে দিলেন না, ধরিয়া রাখিলেন ।

(২) মহারাণী জয়া মহাদেবী পিতাকে বলিলেন, তুমি স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিয়াছ, স্ত্রী মাত্র আছে, তাহাও গ্রহণ কর, ইহা বলিয়া ক্রোধভরে পিতার সহিত সিংহাসনে বসিতে গেলেন ।

রাম নাম লৈয়া রাজা পাট হনে লামে ।
 সিংহাসন তুলি নিল চন্দ্রপুর গ্রামে ॥
 রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক ।
 চন্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক ॥
 উদয়মাণিক্য নামে হৈল নরপতি ।
 রাজবংশ মারিয়া সে করিল অখ্যাতি ॥
 রাঙ্গামাটী নাম রাজ্য পূর্বাবধি ছিল ।
 উদয় মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল ॥
 বহুল করিয়া যত্ন এক মঠ দিল ।
 চন্দ্র গোপীনাথ নাম শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল ॥
 উদয়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম ।
 তাতে দীঘী দিল রাজা চন্দ্রসাগর নাম (১) ॥
 দুই শ চল্লিশ নারী মহলে তাহার ।
 যোগ্যাযোগ্য তদন্তর না করে বিচার ॥
 গৃহস্থের কন্যা তাকে আনে বলাৎকারে ।
 ভুগিয়া অন্তরে দেয় মনে ধরে যারে ॥
 সেই সব নারী কত যুবতী হইল ।
 উদয়মাণিক্য পুত্রে সতীত্ব না রাখিল ॥
 অরিভীমের পুত্র গরুড়ধ্বজ ছিল ।
 সেই সব স্ত্রী সঙ্গে ব্যভিচার কৈল ॥
 সেই সব স্ত্রী রক্ষক যত সেনাগণ ।
 ভয়াতুর হৈয়া করে রাজায় নিবেদন ॥
 উদয়মাণিক্য রাজা অতি উগ্রমতি ।
 কর পদ নাশা কর্ণ কাটে শীঘ্রগতি ॥
 লোকেরে বাঙ্কিয়া রাখি কুকুরে খাওয়ায়ে ।
 হস্তী দিয়া বধে কত স্ব হস্তে খাড়ায়ে ॥
 অল্প অপরাধে প্রাণী বধে সে ছুরন্ত ।
 প্রতি সংক্রমণে সে যে হয় মতিমন্ত ॥

(১) উদয়পুরে, উত্তর চন্দ্রপুর গ্রামে অত্মাপি 'চন্দ্রসাগর' বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সরোবর দীর্ঘে ৫০৫ গজ ও প্রস্থে ২৬১ গজ । ইহার গর্ভে ৪১০ চারি দ্রোণ চারি কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে ।



মহারাজ উদয়সিংহকোব ভগ্ন প্রাসাদ।

(চন্দ্রপুর—উদয়পুর)।

গ্রাম্য শূকর খায়ে কুৎসিত ব্যবহার ।
 সেবিত্তে না পারে সবে বড় ছুরাচার (১) ॥
 এ সব ভাবিয়া রক্ষক মনে ভয় পায় ।
 গরুড়ধ্বজ পলাইয়া পিতা স্থানে যায় ॥
 গোড় সৈন্য সঙ্গে তার বহু ছিল রণ ।
 গরুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন ॥
 অমরমাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল ।
 পরে উদয়মাণিক্য কি কর্ম করিল ॥
 রণচতুর নারায়ণ কহে শুনহ রাজন ।
 নির্বংশ হইল উদয়মাণিক্য যেমন ॥
 গোড়েশ্বরে শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ ।
 চৌদ্দ শ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন ॥
 রাজ বংশ নাহি কেহ অন্য হৈল রাজা ।
 চাটিগ্রামে পাঠাইল সৈন্য মহাতেজা ॥
 ডরা নাম (২) পথ হৈয়া গোড় সৈন্য যাইতে ।
 রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল ছুরিতে ॥
 রাজ ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ ।
 সেনাপতি করে তাকে সৈন্যের রক্ষণ ॥
 বায়ান্ন হাজার সৈন্য তার সঙ্গে দিল ।
 তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল ॥
 চন্দ্রদর্প নাম চন্দ্র সিংহ নারায়ণ ।
 উড়িয়া নারায়ণ ছিল অরি ভীম তখন ॥
 আশুয়ান নারায়ণ আর গজ ভীম ।
 চলিল এ সব সৈন্য পরাক্রমে সীম ॥

(১) হুর্কৃত্ত রাজার সেবা করা, সেবকের পক্ষে নিরতই বিপজ্জনক । শাস্ত্রকারগণও তাহাই বলিয়াছেন । মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায় ;—

“শৌভীরশ্চ নরেন্দ্রশ্চ নিত্যমুদ্বিষ্ট চেতসঃ ॥

জনা বিরাগমাস্তি সদা হুঃসেব্য ভাবতঃ ।”

মৎস্য পুরাণ—২২০ অঃ, ২৬-২৭ শ্লোকার্ধ ।

(২) পাঠান্তর—“দাঁড়রার পথ দিয়া গোড় সৈন্য যাইতে ।”

“দাঁড়রার” শব্দকে বিকৃত করিয়া “ডড়া নাম” করা হইয়াছে । ‘ডরা’ কোন স্থানের নাম ছিল, এমন প্রকাশ পায় না ।

খণ্ডলে ত গিয়া তারা গড় করি রৈল ।
 পাঠান আইসে বলি সাবহিত্তে ছিল ॥
 ঘাটলার পথ দিয়া পাঠান গমন ।
 চাটিগ্রাম যাইব হেন বুঝিয়া লক্ষণ ॥
 হেন যুক্তি সবে করে রণাগণ বুড়া ।
 চট্টলের পথে রাখে সৈন্য হস্তী ঘোড়া ॥
 পূর্বকালে রণাগণে জিনিয়া পাঠান ।
 সেই হেতু বুড়িয়ার বড়ি গুমান (১) ॥
 মারিব পাঠান সৈন্য কুকুরের প্রায় ।
 অহঙ্কারে রণাগণ রাত্রে যুদ্ধে যায় ॥
 শৃগাল সকলে চারিদিকে ডাক ছাড়ে (২) ।
 গৃধ্রীনে বৃক্ষে বসি পথে পাখা ঝাড়ে ॥
 আকাশে ত উল্কাপাত (৩) সাচান ভ্রমে মাথে ।
 এইরূপ অমঙ্গল দেখিলেক পথে ॥

(১) গুমান—অহঙ্কার ।

(২) শৃগালের শুভাশুভ রব সম্বন্ধীয় অনেক কথা শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় ; তাহার একটা এখানে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“সর্কদিক্ষু শুভাদীপ্তা বিশেষণাক্সা শোভনা ।
 পুরে সৈন্তেহপসবা চ কষ্টা সূর্গ্যোমুখী শিবা ॥”

বৃহৎ সংহিতা—৮৯ অঃ, ৪ শ্লোক ।

এই বাক্যে সৈন্য সম্বন্ধীয় অশুভের কথা উল্লেখ আছে । শিবের দীপ্তস্বরকে অমঙ্গলজনক বলা হইয়াছে । দীপ্তস্বর কাহাকে বলে তাহাও শাস্ত্রকার নির্দেশ করিয়াছেন,—

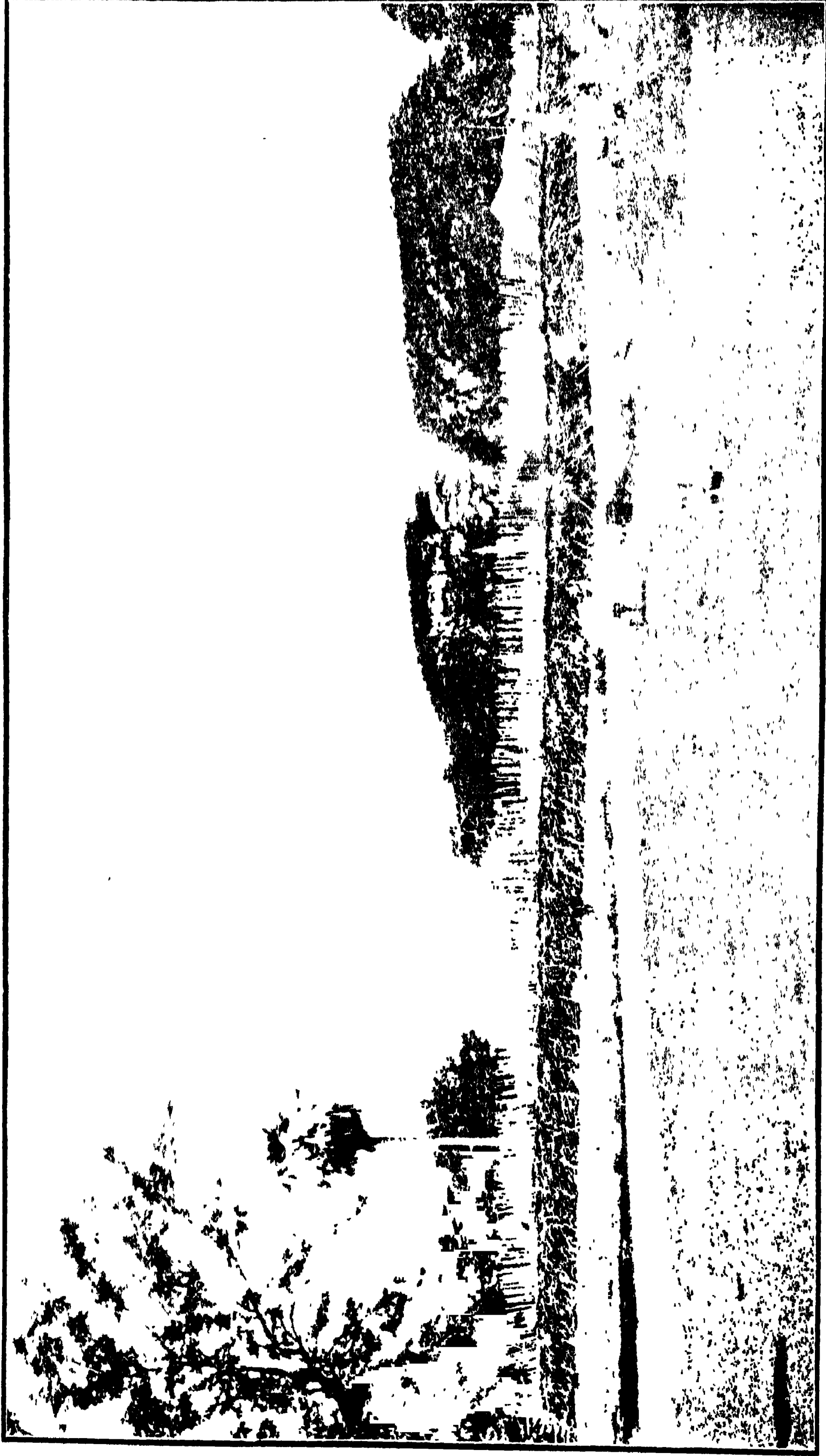
“শ্ৰুতি শৃগালাঃ সদৃশাঃ ফলেন বিশেষা এমাং শিনিরে মদাপ্তিঃ ।
 হু হুরু তাস্তে পর ৩শ্চ টা টা পূর্ণঃ স্বঃরাহর্ন্যকথিতাঃ প্রদীপ্তাঃ ॥
 লোমাশিকার্নাঃ খলু কক্ক শব্দঃ পূর্ণঃ স্বভাব প্রভবঃ স তস্মাঃ ।
 যেহেতুস্বরাস্তে প্রকৃতে রপে তাঃ সবে চ দীপ্তা ইতি সম্প্রদিতাঃ ॥
 পূর্বোদীচ্যাঃ শিবা শস্তা শান্তা সর্বত্র পূজিতা ।
 ধূমিতাভিমুখী হৃদিত স্বর দীপ্তা দিগীশ্বরান্ ॥”

বৃহৎ সংহিতা—৯০ অঃ, ১-৩ শ্লোক ।

(৩) উল্কাপাত বিষয়ে শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে অনেক কথা আছে । তাহার একটা এই ;—

“অশ্বরমধ্যাহ্নঃস্বয়া নিপতন্ত্যা রাজ্যান্তে নাশায় ।
 বংত্রমতী গগনোপরি বিভ্রমমাখ্যাতি লোকস্ত ॥
 সংস্পৃতা চন্দ্রাকৌ তদ্বিস্বভাবা স ভূপ্রকম্পা চ ।
 পরচক্রাগমনূপবধ তুভিক্ষা বৃষ্টি ভয় জননী ॥” ইত্যাদি ।

বৃহৎ সংহিতা—৩৩ অঃ, ১১-১২ শ্লোক ।



বাঁশার প্রাকার বিশিষ্ট অস্থায়ী সেনানিবাস (শিবিরের) আদর্শ ।

সেনাপতি সবে বলে না হয় উচিত ।
 পৃষ্ঠে রাখিয়া শত্রু রণ অবিহিত (১) ॥
 এমত কহিল সব সেনাপতিগণ ।
 সেই কালে ত্রিপুর গড়ে পাঠান আগমন ॥
 গড় লৈল পাঠানে ত্রিপুর হৈল দূর ।
 রণাগণ নারায়ণের গর্বে হৈল চূর ॥
 ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য আপনা বাঁচায় ।
 হস্তিনী শোয়ার বৃদ্ধ রণাগণ পলায় ॥
 দূরেতে থাকিয়া বলে পাঠান সকল ।
 পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যায় ত্রিপুরার বল ॥
 হর্মিত পাঠান সৈন্য পাছে পাছে যায় ।
 ত্রিপুরার সৈন্য যত পাঠানে খেদায় ॥
 মহা যোদ্ধা বলবান ত্রিপুরার সেনা ।
 পাঠান ত্রিপুর যুদ্ধে পড়ে বহু জনা ॥
 পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল সেই রণে ।
 চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে ॥
 পদাতি ধরিয়া অন্য পদাতিকে হানে (২) ।
 এমত বিক্রমী যোদ্ধা সব ছিল রণে ॥
 রণে ভঙ্গ ত্রিপুর সেনা রাজ্যেত তৎপর ।
 চট্টলের গড়ে গেল পাঠান সত্বর ॥
 গোড়েশ্বরে শুনিলেক এসব বৃত্তান্ত ।
 হরমিতে বহু সৈন্য পাঠায় সামন্ত ॥
 পীরোজ খাঁ আন্নি আর জামাল খাঁ পন্নি ।
 চট্টলে পাঠাইল গোড়ে তারা যোদ্ধা জানি ॥
 দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল তাহার সহিত ।
 মেহারকুল গড়ে যুদ্ধ হয়ে বিপরীত ॥
 ভালিঙ্গ ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ ।
 কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ ॥

(১) পাঠান্তর—“সেনাপতি সবে বোলে না হয়ে উচিত ।
 পৃষ্ঠে শত্রুকরি মারণ অবিহিত ॥”

(২) মনুষ্য ধরিয়া, ওদ্বারা অন্ত মনুষ্যকে (পদাতিকে) আঘাত করে ॥

তার পরে সেই যুদ্ধে তুমি সেনাপতি ।
 তুমি পরে অরি ভীম পাঠায় নৃপতি ॥
 সেই যুদ্ধে তথাতে করিলা বহু দিনে ।
 পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল পশ্চি সনে ॥
 চৌদ শ আটানব্বই শকেতে তখন ।
 পারার গুটিকা রাজা করিল ভঙ্গণ ॥
 স্ত্রী লোভে (১) গুটিকা রাজা ভঙ্গে অকস্মাৎ ।
 অণুকোষ ফাটি রাজা মরিল পশ্চাৎ ॥
 পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন ।
 এই মতে মরিল উদয়মণিক্য রাজন ॥
 সেই কালে অন্ধকার দিবা জ্ঞান হয় ।
 রাত্রি হেন জ্ঞান দিবা ত্রিপুর লোকে কয় (২) ॥
 সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী ।
 অস্থি পূর্ণ হৈল সব দেখি সারি সারি ॥
 অন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বহুতর নর ।
 তার পর সনে শস্য হৈল বহুতর ॥

জয়মণিক্য খণ্ড ।

উদয়মণিক্য পুত্র লোকতর ফা পরে ।
 জয়মণিক্য রাজা নাম ধরে অভ্যন্তরে ॥
 নৃপতির পিসা নাম রণাগণ নারায়ণ ।
 গোড় যুদ্ধ হৈতে তোমা আনায় সেই ক্রণ ॥
 তোমার যে রাজ যোগ আছিল কারণ ।
 রণাগণ যুদ্ধে তুমি বধিছ তখন ॥

(১) উদয়মণিক্য অতিশয় কামুক ছিলেন । বাজীকরণ জন্ত পারদ ভঙ্গণ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ।

(২) দিবাভাগে অন্ধকার দর্শন কু-লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । শাস্ত্রে আছে ;—

“রজসা বাথ ধূমেন দিশো যত্র সমাকুলাঃ ।

আদিত্য চন্দ্র তারাশ্চ বিবর্ণা ভয় বৃদ্ধয়ে ॥”

মৎস্য পুরাণ—২৩৮ অঃ, ২ শ্লোক ।

এ কথা শুনিয়া অমরমাণিক্য রাজন ।
 কহিতে লাগিল রাজা তাহার কারণ ॥
 আমি কিছু নাহি জানি কহিল তোমাতে ।
 রণাগণে চক্র করে আমাকে বধিতে ॥
 মেহারকুলের গড় ছাড়িছি তৎপর ।
 কলমি গড়ে সৈন্য সমে ছিলাম তদন্তর ॥
 রাজার আদেশ পাইয়া আসি রাজধানী ।
 রণাগণে কুমন্ত্রণা করিল তখনি ॥
 হরিবংশ শালগ্রাম পরশি দুই জন ।
 রণাগণে আমা সনে শপথ তখন ॥
 রণাগণ নারায়ণ নৃপতির পিসা ।
 জয়মাণিক্য নাম ধরে সবে মাত্র মিছা ॥
 রাজত্বের স্মৃৎ ভোগ রণাগণে করে ।
 তার মতে করে কার্য্য যেরা মনে ধরে ॥
 সৈন্য সেনাপতি সব তাহার যোগান ।
 চতুর্দোল শোয়ার চলে বড়ই গুমান (১) ॥
 অগ্র পশ্চাৎ না জানিয়া কুকর্ম্ম সদায় ।
 তুলা পুরুষ করে সে যে রাজা হৈতে চায় ॥
 এক দীঘি বিজয়মাণিক্য খনে অর্দ্ধেক ।
 বকচর খনি রাজা স্বর্গেতে গেলেক ॥
 রণাগণে পরে তাকে খনায়ে কতেক ।
 উৎসর্গিয়া বুড়া দীঘি (২) নাম রাখিলেক ॥
 রাজা হৈতে রণাগণের ইচ্ছা অতিশয় ।
 তার পত্নী মানা করে এই মাত্র ভয় ॥
 আর নারী সংগ্রহ করিল রণাগণ ।
 সে নারী পঠয়ে পুস্তক শুনিয়া পাগল ॥

(১) গুমান—অহঙ্কার ।

(২) এই দীঘি উদয়পুরে, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর বাড়ীর উত্তরদিকে অবস্থিত । ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫০ গজ ও প্রস্থ ২০০ গজ । ইহা বুড়ার দীঘি নামে পরিচিত । রণাগণকে প্রাচীনকালে সাধারণতঃ 'বুড়া' বলা হইত, যথা ;—

“পূর্বকালে রণাগণ জিনিয়া পাঠান ।

সেই ভেতু বুড়ার বড়ই গুমান ॥”

পাঁচালী পঠয়ে স্ত্রীয়ে অর্থ করে আপন ।
 দুই প্রহর রাজা হৈলে বসে ইন্দ্রাসন ॥
 এমত শুনিয়া বুড়া লোভ হৈল তায় ।
 আমা মারি রণাগণ রাজা হৈতে চায় ॥
 আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে ।
 মগ্ন পান করাইয়া চাহিল মারিতে ॥
 তাহা না জানিয়া আমি গেলাম তখনে ।
 পান বটু ছেদি আমা দেখায় অন্য জনে (১) ॥
 উদরেত ব্যাম হৈছে ফাকি দিল তাকে ।
 বাহ্য ভূমি যাইবার ইচ্ছা হৈল মোকে ॥
 রণাগণে কহে তার বাহ্য স্থানে যাইতে ।
 আমি কহি না যাইব সেই ত স্থানেতে ॥
 সেই স্থান হ'তে আমি চলিল ছরিত ।
 আমা অশ্ব তার দ্বারে না দেখি বিদিত ॥
 এক কায়েশ্বের ঘোড়া সেই স্থানে ছিল ।
 তাহাতে চড়িতে চাহি সে জন না দিল ॥
 তাহা হতে অশ্ব কাড়ি লইলাম বলে ।
 গৃহে আসি ইষ্ট মিত্রে ডাকিছি সকলে ॥
 হস্তী ঘোড়া সাজাইয়া সেনা লোকগণ ।
 রণাগণ সঙ্কে যুদ্ধ করিতে কারণ ॥
 রাজ পক্ষে রণাগণ যুদ্ধে সাজিয়াছে ।
 ছয় ছয় হাত বস্ত্র সেনা প্রতি দিছে ॥
 আমাকে পাইলে সে যে গেল ফাঁসী দিতে ।
 রণাগণ সাজি রহে রাজার দ্বারেতে ॥
 আমা পুত্র তারা সব সসৈন্যে সাজিয়া ।
 অশ্বারোহে শীঘ্র গতি আসিল চলিয়া ॥
 চৌহাটিয়া গ্রামে যাইতে গেল দিবাকর ।
 তার সৈন্য আমা পুত্রে কাটিল বিস্তর ॥

(১) অমর দেবকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র হইতেছে, এক ব্যক্তি পানের বোটা ছেদন করিয়া, ইঙ্গিতে তাহা জানাইয়াছিল ।

চৌহাটা আমার গড় নদীর সহিত ।
 রণাগণ গড় কচুয়া ছড়াতে বিহিত ॥
 ধুনাই লামপাড়া পথে তার সৈন্য ছিল ।
 সেইক্ষণে আমা বুদ্ধি ত্বরিতে জন্মিল ॥
 রণাগণ ভাই সমরজিত নারায়ণ ।
 শীঘ্র এক দূত পাঠাই তাহার সদন ॥
 রণাগণ নামে এক পত্র লিখাইয়া ।
 সমরজিত নিকট পত্র দিলাম পাঠাইয়া ॥
 ভাইর পত্র পাইয়া পঠয়ে সমরজিত ।
 রণাগণ ভাইয়ের পত্র জানিল নিশ্চিত ॥
 পত্র পাইয়া সমরজিত প্রণাম করিল (১) ।
 আমা দূতে তখন তার মস্তক ছেদিল ॥
 পরে রণাগণ দূত সমর নিকট ।
 সমরের বধে দূতে বুঝিল প্রকট (২) ॥
 গড়ে থাকি রণাগণে বলে বারে বারে ।
 সমরজিত ভাই আসে মারিবা সমরে ॥
 সেইক্ষণে সমর যুগু গড়েতে ফেলিল ।
 ভাইয়ের মস্তক দেখি মনে ভয় পাইল ॥
 গড় ছাড়ি রণাগণ ভঙ্গ দিয়া যায় ।
 খাটি পুষ্করিণীর (৩) জলে রণাগণ পলায় ॥

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র জানে, অমর দেবের পত্র হস্তে লইয়া, সমরজিত নত মস্তকে প্রণাম করিবার কালে দূতে মস্তক ছেদন করিয়াছিল ।

পত্র গ্রহণের প্রাচীন নিয়ম এই ;—

“রাজপত্রং নয়েনু ক্ৰি, ব্রাহ্মণানাং তথৈবচ ।
 ষতি সন্ন্যাসিনাঞ্চৈব স্বামিনশ্চ তথৈবচ ॥
 সাদরে নৈব যত্নেন তথা মূর্খানি ধারয়েৎ ।
 ভার্য্যা পুত্রস্য মিত্রস্য হৃদয়ে ধারয়েৎ সুধীঃ ॥
 প্রবীণানাং কণ্ঠদেশে পত্র ধারণমীরিতম্ ।
 এভেষাঞ্চৈব পত্রাণামুক্তং ধারণ লক্ষণম্ ॥”

পত্রকৌমুদী ।

(২) প্রকট—স্পষ্ট ।

(৩) খাটি পুষ্করিণী—মৎস্ত একস্থানে জড় করিবার নিমিত্ত যে গর্ত খনন করা হয়, তাহাকে খাটি বলে ।

মাথার পাতিল দিয়া রণাগণ জলে ।
 তার পুত্র হিরাপুর গ্রামে ধরা গেলে ॥
 ঢেঁকি ঘরে লুকাইছে বাঙ্কিয়া আনিল ।
 আমার নিকটে তার মস্তক ছেদিল ॥
 তিন দিন গড় মধ্যে ছিল রণাগণে ।
 দুই দিন লুকাইল পুষ্করিণীর জলে ॥
 জলে থাকি কম্পমান শরীর তাহার ।
 কুলে থাকি দেখি লোকে করিল প্রচার ॥
 সেই জনে কহে গিয়া আমা দূত স্থানে ।
 জল মধ্যে মনুষ্য এক দেখিল এখানে ॥
 আমার নিকটে দূতে তখনে জানাইল ।
 সসৈন্যে সাজিয়া তারে ধরিবারে গেল ॥
 জল হতে ধরি আনে আমা বিগ্ৰহমান ।
 রণাগণ মস্তক কাটিলাম সেই স্থান ॥
 রণাগণ মস্তক কাটিল যে পাইকে ।
 সাহস নারায়ণ খ্যাতি করিলাম তাকে ॥
 পরে আমি এই বার্তা রাজাতে কহিল ।
 তোমা শত্রু রণাগণকে কাটিয়া ফেলিল ॥
 আমা বাক্য শুনি রাজা নিঃশব্দে রহিল ।
 আমার কুটুম্ব রাজা সে হেতু বধিল ॥
 সৈন্য সমে গেল আমি রাজা প্রবোধিতে ।
 কোন অপরাধে আমা বন্ধু বধ তাতে ॥
 আমা সৈন্য দেখি রাজা মনে ভয় পায় ।
 হস্তিনী চড়িয়া রাজা দক্ষিণ দিকে ধায় ॥
 তবে বুঝিলাম রাজার চিন্তে কুমন্ত্রণ ।
 আমা পুত্র সব রাজার পশ্চাতে গমন ॥
 কালিকা দেবীর যে মন্দির সম্বিহিত ।
 সেই স্থানে জয়মাণিক্য ধরিল স্থরিত ॥
 আমা জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ নারায়ণ ।
 নৃপতিকে মল্ল যুদ্ধ শিখাইছে আপন ॥
 রাজবল্লভে ত রাজা বলিল তখন ।
 তুমি মল্ল বিদ্যা গুরু রাখহ জীবন ॥

রাজবল্লভে কহে আমি রাখিবারে নারি ।
 সৈন্য সবে মারে তোমা কি করিতে পারি ॥
 রাজা গলে ধনুগুণ দিয়া লামাইল ।
 সেই স্থানে জয়মাণিক্য প্রাণেতে বধিল ॥
 অমরমাণিক্য রণচতুর নারায়ণ ।
 দুয়েতে এ সব কথা ছিল আলাপন ॥

অমরমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল ।
 রাজ ঔরসে আমা জন্ম কি মতে হইল ॥
 রণচতুরে বোলেন শুন মহারাজ ।
 তোমা জন্ম যেই মতে বলি সভা মাঝ ॥
 এক দিন দেবমাণিক্য নৌকা আরোহণে ।
 কলুয়া ছড়া (১) পূর্বভাগে গিয়াছে তখনে ॥
 সেই দিন আমি ছিলাম নৃপতির সঙ্গে ।
 কলুয়া ছড়া উজাইয়া চলে রাজা রঙ্গে ॥
 কলুয়া ছড়াতে এক মাচান্ন তথায় ।
 মুক্তকেশে তোমা মাতা কেশ যে স্থথায় ॥
 সেই কালে তোমা মাকে দেখিল রাজায় ।
 সেই দিন ঋতু স্নান করে তোমা মায় ॥
 তোমা মাতা দেখি রাজা কামেতে পীড়িত ।
 এই কার ঘর বলি জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
 তথা গিয়া জিজ্ঞাসিল অনুচর জন ।
 হাজার ঘর কহে সব স্থানিগণ ॥
 রাজার সাক্ষাতে আসি কহে সেই জন ।
 হাজার ঘর এই শুনহ রাজন ॥
 ফৌজের হাজার ঘর চাটিগ্রাম গিছে ।
 রসান্ন মর্দন নারায়ণের সঙ্গেতে রহিছে ॥
 কামেতে পীড়িত রাজা দেখিয়া সুন্দরী ।
 কি মতে হাজার গৃহে যাইব শীঘ্র করি ॥
 যতেক সঙ্কের নৌকা আছে (২) চালাইল ।
 গুপ্তভাবে নৃপতি হাজার গৃহে গেল ॥

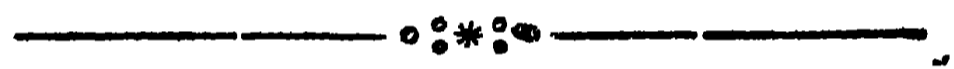
(১) ইহার অর্থ নাম কলুয়া ছড়া । (২) আছে—অগ্রে

সে ঔরসে দশ মাসে জন্ম যে তোমার ।
 শকুন্তলা গর্ভে যেন ভরত কুমার (১) ॥
 পঞ্চ বর্ষ অস্তে গৃহে হাজরা আসিল ।
 রাজ ঔরসে পুত্র দেখি হরিষ হৈল ॥
 বীর দর্পে খেলা করে অতি সুলক্ষণ ।
 রামদাস নাম তোমার আছিল তখন ॥
 দেবমাণিক্য পুত্র বিজয়দেব রাজা ।
 সম্পর্কেতে ভাই বলি ডাকে মহাতেজা ॥
 ষোড়শ বৎসর যখন বয়স তোমার ।
 ধ্বজ হস্তে বনে গিছ পক্ষী ধরিবার ॥
 সেই অরণ্য মাঝে অপূর্ব দেখিলা ।
 মনুষ্যের মুণ্ডমত পিষ্টক পাইলা ॥
 ক্ষুধাতে পীড়িত তাহা খাইছ তখন ।
 তোমার জন্মের কথা কহিল যেমন ॥
 রাজ বংশাবলী অমরমাণিক্য জিজ্ঞাসন ।
 রণচতুর নারায়ণ কহে সমাপন ॥

ইতি অমরমাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং রণচতুর
 নারায়ণ কথনং দ্বিতীয় কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

(১) মহারাজ ছদ্মস্ত মৃগের অনুসরণ করিয়া কণ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন, তৎকালে মুনিবর তপোবনে ছিলেন না। রাজা, মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করেন এবং নব পরিণিতা মহিষীকে আশ্রমে রাখিয়াই রাজধানীতে গমন করেন। রাজার সহযোগে শকুন্তলা গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তিনি রাজাকর্তৃক গৃহীত না হওয়ায়, তপোবনেই এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করেন; সেই পুত্র কালক্রমে ভরত নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারই নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



দ্বিতীয় লহরের মধ্য-অনি

(টীকা) ।

শ্রেণী ক্রমে কহ তুমি সে সব কথন ।
যে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পালন ॥”

রাজাবাবুর বাড়ীতে * রক্ষিত রাজমালায় এ বিষয় আরও বিশদভাবে বর্ণিত
আছে । তাহা এই ;—

“অমরমাণিক্য নাম নৃপতি আছিল ।
ত্রিপুর বংশের কথা তৎপর শুনিল ॥
শ্রীধর্মমাণিক্য ছিল ত্রিপুর সন্ততি ।
রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথি ॥ †
পুস্তক লিখাইছে তিনি পূর্ব রাজার কথা ।
তার পরে রাজা সব না হইছে গাঁথা ॥
অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন ।
জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুর নারায়ণ ॥
একশত পঞ্চ বর্ষ বয়স উহার ।
স্থির মতি গুণবস্ত ধৈর্য্যতা অপার ॥
শুন শুন বলি রণচতুর নারায়ণ ।
রাজবংশ কথা কিছু কহত আপন ॥
বয়সে বিশিষ্ট বট ত্রিপুর সন্ততি ।
তুমি জান ভাল পূর্ব রাজগণ রীতি ॥
শ্রীধর্মমাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল ।
যে রূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল ॥
কোন রাজা কিবা কর্ম করিল তখন ।
কহত সে সব কথা শুনিব এখন ॥
নৃপতির বচনে কহেস্ত সেনাপতি ।
পূর্বের প্রসঙ্গ বলি শুন মহামতি ॥
শ্রীধর্মমাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল ।
অনুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল ॥”

সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, এ কথা পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এই লহরের
রচয়িতা কে, তাহা পাওয়া যায় না । সেনাপতি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন, রাজমালার
উক্তি দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না । শতাধিক বৎসর বয়স্ক শ্রবির, সৈনিক বিভাগের
কর্মচারী দ্বারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভাব্যও নহে । রণচতুরের বর্ণনামুসারে নিশ্চয়ই
কোন সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল, সেই পণ্ডিতের
নামোদ্ধারে অকৃতকার্য্য হেতু নিতাস্তই দুঃখিত আছি ।

* এই বাড়ীর রাজা ভৃগুরাম রায় ও রাজা মুকুন্দরাম রায় অল্পকাল পূর্বে পরলোক গমন
করিয়াছেন । তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন । ইহারা মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের
বংশসম্বৃত । ইহাদের এক শাখা ঢাকায় রাজার দেউড়ীতে বাস করিতেছেন ।

† ইহা মহারাজ ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে বিরচিত রাজমালার প্রথম লহর ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের বয়স নির্ধারণ করিতে হইলে, মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল নির্ণয় করা আবশ্যিক । রাজমালায় এই সময় নির্ধারণক :
 রাজমালা দ্বিতীয় লহরের প্রাচীন হ ও অমরমাণিক্যের শাসনকাল ।
 স্পষ্ট উক্তি; থাকা সত্ত্বেও মতান্তর দেখা যায় । স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন—“১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ।” * মিঃ সেণ্ডিস সাহেব (E. F. Sandy's) তাঁহার রচিত “History of Tripura” নামক গ্রন্থে কৈলাস বাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন । † চাকলে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ কামিং সাহেবও (J. G. Comming I. C. S.) এই মতের সমর্থক । রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ সাহেব (Rev. James Long) অমরমাণিক্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের কাল নির্ণয় করেন নাই । ‡ কৈলাস বাবু প্রভৃতি কোন্ সূত্র অবলম্বনে অমরমাণিক্যের রাজ্যারোহণের কাল ১৫৯৭ খৃঃ (১৫১৯ শক) নির্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সে কথা বলেন নাই । এই নির্ধারণ রাজমালার মত- বিরুদ্ধ, স্মৃতির ইহা সমর্থনযোগ্য বলা যাইতে পারে না । রাজমালায় পাওয়া যায়,—

“চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব রাজা ।

পনরশ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা ॥”

রাজমালা—অমরমাণিক্য খণ্ড ।

প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“চৌদ্দশত উনশত শকে অমরদেব হৈল ।

পনরশত পূবা বর্ষে ভুলুয়া লুটিল ॥”

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার মতে ;—

“চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব হৈল ।

পোনরশ পূবা শকে ভুলুয়া লুটিল ॥”

উদ্ধৃত লিপিতে পরস্পর ভাষাগত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সকল রাজমালায়ই অমরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের কাল ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ) এক- বাক্যে ঘোষিত হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় এই প্রামাণিক বাক্য উপেক্ষা করিয়া, পূর্বেবক্ত ব্যক্তিগণের মত সমর্থন করা যাইতে পারে না । নিম্নোক্ত ঘটনার দ্বারাও ইহাদের মত অমূলক বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে ।

মহারাজ অমরমাণিক্য, অমরসাগর খননকালে তাঁহার অধিকারস্থ জমিদারগণ হইতে দাঁড়ি (কুলি) গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৬৮ পৃঃ ।

† History of Tripura—Mohammadan period, Page 18.

‡ J. A. S. B.—Vol. XIX.

কুলি প্রদান না করায়, তাহার বিরুদ্ধে বিপুল ত্রিপুর-বাহিনী প্রেরণ করা হয় । উক্ত জমিদার, আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই সূত্রে মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুরার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । ১৫০৪ শকে এই যুদ্ধ সজ্জাটিত হয় । যুদ্ধাবসানে, প্রধান সেনাপতি রাজধর দেব (অমরমণিক্যের পুত্র) যে পথে গেরুপ ভাবে প্রত্যাভর্জন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন ;—

“পনরশ চারি শাক পৌষ মাস শেষে ।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লইয়া আসে ॥
রাজধর চলিল ছলালী গ্রাম পথে ।
ইটাগ্রাম গৈয়া চলে উনকোটা তীর্থে ॥” ইত্যাদি ।

রাজাবাবুর বাড়াতে রক্ষিত রাজমালায় উক্ত বাক্যের সহিত ভাষাগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সময় নির্ধারণ সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থেই একমত । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

“পনরশ চারি শকে পৌষ শেষে রহিয়া ।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁকে গৈয়া ॥
রাজধর নারায়ণ ছলালীর পথে ।
ইটালি হইয়া গেল উনকোটা তীর্থে ॥” ইত্যাদি ।

বেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের মতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সজ্জাটিত হইয়াছিল । * ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ ও ১৫০৪ শকে পার্থক্য নাই, সুতরাং লঙ্ সাহেব রাজমানার সহিত ঐক্যমত হইয়াছেন । কৈলাস বাবু বলেন—“সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল ।” † সেণ্ডিস সাহেব তরপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া থাকিলেও,

* “Amar Manik resolved on virtuous deeds by digging tanks ; he ordered all the landlords of his kingdom to send coolies for this purpose, accordingly nine Zemindars sent 7300 coolies. The Zemindar of Taraf in Sylhet refused, an army of 22,000 men was sent against him, his son was taken prisoner, put into a cage, and brought to Udayapur. The Raja, next (A. D. 1582) marched an army against the Mohammadan commander of Sylhet whom he defeated. The order of the troops in battle resembled in figure the sacred bird *Gaduda*, the two generals in the van represented the beak, the troops on the flanks the wing, and the main army the body ; during the fight both parties became fatigued when a suspension of arms took place by mutual agreement ; they afterwards resumed the battle, when the Musalmans were defeated.”

J. A. S. B.—Vol. XIX.

† কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭০ পৃষ্ঠা ।

এই যুদ্ধের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন । কৈলাস বাবুর কথিত ১০০৯ ত্রিপুরাদে ১৫২১ শক হয়, সুতরাং তাঁহার এই নির্ধারণ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না ।

উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, যিনি রাজা হইবার পর ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃঃ) তরপ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিষেক কাল ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খৃঃ) হইতে পারে না । সুতরাং অমরমাণিক্য পূর্ব কথিত ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ) রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত নির্ধারণ বলিয়া অতর্কিতভাবে ধরা যাইতে পারে । ইনি চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১৩ শকে (১৫৯১ খৃঃ) পরলোক গমন করেন ।

উক্ত ১৫৭৭ খৃঃ হইতে ১৫৯১ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অংশ সার্বিক ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ ।

এই লহরের রচয়িতার নাম বা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । পরিচয় না পাইলেও লেখক ত্রিপুরা কিম্বা রাজমালার ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা । নোয়াখালী জেলাবাসী ছিলেন, রাজমালার ভাষা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । যথা ;—

- ১ । “সর্পেতে ধরিছে পট সন্ন্যাসীর মাথে ।”—গ্রন্থারম্ভ ।
- ২ । “মাচাঙ্গের নিচ হইতে ধত্বকে আনিছে ।”—ধর্মমাণিক্য খণ্ড ।
- ৩ । “আছে বসাইব তারে মাতে মিত্রাধিক ।”—ধর্মমাণিক্য খণ্ড ।
- ৪ । “তুই তুই বুন্য দিল পুতুলের হাতে ।”—ধর্মমাণিক্য খণ্ড ।
- ৫ । “মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভাল ।”—বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।
- ৬ । “রাজা বলে ষাটরায় আমা সাহ কর ।”—অনন্তমাণিক্য খণ্ড ।

এই প্রকারের আরও অনেক শব্দ আছে । পট (ফণা), মাচাঙ্গ (বংশ-মঞ্চ), আছে (আগে), বুন্য (মশাল), ভাল (ভাল), সাহ (আরোগ্য) রাজমালার রচয়িতা ত্রিপুরা জেলার লোক । ইত্যাদি শব্দ ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এজন্যই রচয়িতাকে ত্রিপুরা অথবা নোয়াখালী জেলার লোক বলিয়া মনে করা যাইতেছে । পূর্বকালে (শ্রীহট্ট অঞ্চলের রাজধানী পরিত্যাগের পর), নোয়াখালী অপেক্ষা ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমতটের রাজ-দরবারে অধিক প্রতিপত্তি ছিল । সুতরাং লেখক ত্রিপুরা জেলাবাসী হইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয় ।

রাজমালা প্রথম লহরের স্থায় দ্বিতীয় লহরেও স্থানে স্থানে ভাষা অতিরঞ্জিত এবং দৃঢ় বিশ্বাসমূলক । তাহা বাদ দিলে, ঐতিহাসিক উপাদানের হিসাবে ইহা অমূল্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যিক । প্রথম লহরের স্থায় এই লহরেও রাজগণের রাজ্যলাভ, রাজ্যচ্যুতি, সমর-কাহিনী, শাসন-বিবরণী ও রাজ-পরিবার সংস্রষ্ট প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । ইহা আলোচনায় ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় । ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক

প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই রাজমালার এই অংশ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজমালার দ্বিতীয় লহর ষোড়শ শতাব্দীর রচিত । এই সময় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির যুগ আসিয়াছিল । এই লহর রচনার সমকালে এবং তাহার অল্পকাল পূর্বে ও পরে যে সকল খ্যাতনামা ধর্ম্মানুরাগী অসাধারণ ব্যক্তি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ও যদুন্দনদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, যদুন্দনদাসের কৃষ্ণকর্ণামৃত, দ্বিজবংশীবদন প্রভৃতির মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডীকাব্য, কাশীরামদাসের মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ এই যুগের সমুজ্জ্বল রত্ন । এতদ্ব্যতীত এই সময় মাণিক গাঙ্গুলী, দ্বিজ হরিরাম প্রভৃতি বহুসংখ্যক কৃতিব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে যে অতুল সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই । তদানীন্তন কাল-শ্রোত যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । এই অনুকূল শ্রোতের সাহায্যে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে ।

পারিবারিক কথা ।

রাজমালায় পারিবারিক কথা খুব কমই পাওয়া যায় । দ্বিতীয় লহরে এতদ্বিষয়ক যে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল ।

বৈবাহিক বিবরণ ।

এই লহর সংস্কৃত মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ও প্রতাপমাণিক্য কোথায় বিবাহ রাজগণের বিবাহ করিয়াছিলেন, কোন গ্রন্থেই সে কথার উল্লেখ নাই ; বর্ত্তমান কালে সম্ভবীয় কথা । তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই । প্রতাপের ভ্রাতা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম কমলা মহাদেবী । একথা রাজমালায়ই পাওয়া যায় ;—

“বড় সেনাপতি দিল আপনার কন্যা ।

মহারাজী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা ॥”

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড—৮ পৃঃ ।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

“কমলা নামেতে হৈল তান মহারানী ।
নানাহানে দিল দীঘি আর পুরিণী ॥” ইত্যাদি ।

ধনুমানিক্যের পুত্র দেবমানিক্যের দুই মহিষীর মধ্যে প্রধানা মহিষী চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক চস্তাইয়ের দুহিতা ছিলেন, দ্বিতীয়া মহিষীর পরিচয় বর্তমান সময়ে পাওয়া যাইতেছে না । দেবমানিক্যের পুত্র ইন্দ্রমানিক্য নিতান্ত বাল্যাবস্থায় সিংহাসন লাভ করিয়া অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিবার পর, সেনাপতি কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ তিনি বিবাহ করেন নাই । ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়মানিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় ‘পুণ্যবতী’ লিখিত আছে । যথা ;—

“বিজয়মানিক্য নাম হৈল নরপতি ।
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী ॥”
বিজয়মানিক্য ৭৩—৩৯ পৃঃ ।

এই ‘পুণ্যবতী’ নাম বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না ; সম্ভবতঃ ইহা মহাদেবীর বিশেষণ । একপ ধারণা ভিত্তিহীন নহে । রাজমালায় অন্যত্র লিখিত আছে ;—

“হিরাপুরে লক্ষ্মীরানী বনবাস সেবী ।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী ॥
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল ।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মীরানী নিল ॥
বিজয়মানিক্য ৭৩—৪৩ পৃঃ ।

এতদ্বারা জানা যায়, মহারানীর নাম লক্ষ্মী দেবী ছিল । শ্রেণীমালায় রাণীর নাম আরও স্পর্শতরুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ;—

“বিজয়মানিক্য পত্নী নাম লক্ষ্মীবালী ।
পুণ্যবতী মহারানী ছিলেন অবলা ॥” শ্রেণীমালা ।

এ স্থলে মহারানীর নাম ‘লক্ষ্মীবালী’ পাওয়া যাইতেছে । ‘পুণ্যবতী’ শব্দটি মহারানীর বিশেষণ না হইয়া নামান্তর হওয়াও বিচিত্র নহে । পূর্বেবাক্ত “তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী,” এই বাক্য ব্যতীত রাজমালার নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারাও এই সন্দেহ জন্মিতেছে ।

“ত্রিপুর কুলেতে সে যে শুভ জন্মা কতা ।
পুণ্যবতী নামে হৈল পৃথিবীতে ধতা ॥
* * *
ভাস্করপত্রে লিখি দিল পুণ্যবতী নামে ।
পুণ্যমতী বতী সতী শ্লোক অমুক্রমে ॥
বিধিমতে ভূমি কত উৎসর্গিয়া দিল ।
যেন মত নাম দেবী তেন কার্য কৈল ॥”

বিজয়মানিক্য ৭৩—৩৯ পৃঃ ।

এই মহারাণী লক্ষ্মীবালা বা পুণ্যবতী, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা ছিলেন । ইঁহাকে বনবাস দিয়া বিজয়মাণিক্য দ্বিতীয় পরিণয় করিয়াছিলেন, সেই মহারাণীর পরিচয় আমরা জ্ঞাত নহি ।

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্য, প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম ছিল জয়াবতী মহাদেবী । * এই মহারাণী আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা “মহিলা মাহাত্ম্য” প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে ।

অনন্তমাণিক্যের স্বশুর গোপীপ্রসাদ, জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন । ইনি ২৪০টি মহিষী করিয়াছিলেন । তাঁহাদের অধিকাংশই ব্যভিচারিণী ছিলেন । ইঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল হীরাবতী । ইঁহার নামানুসারে লক্ষ্মীপুর গ্রামের নাম ‘হিরাপুর’ করা হয় । বিজয়মাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে,—

“হিরাপুর নাম পূর্বে লক্ষ্মীপুর ছিল ।
উদয়মাণিক্য রাণী হিরাপুর বৈল ॥”

উদয়মাণিক্যের অন্যান্য মহিষীগণের নাম বা পরিচয় পাইবার উপায় নাই ।

উদয়মাণিক্যের পুত্র লোকতর ফা, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনারূঢ় হন । ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, জানা যায় না । উদয় ও জয়মাণিক্য ভিন্ন বংশীয় হইয়াও অসতুপায় অবলম্বনে ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, পুনঃ রাজবংশীয় মহারাজ অমরমাণিক্য পৈতৃক সিংহাসনের উদ্ধার সাধন করেন ।

বহু বিবাহ অল্প বিস্তার পরিমাণে সকল রাজাই করিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়-
মাণিক্যের বিবাহ সংখ্যাই সর্বোচ্চ বলিয়া জানা যায় । মহারাজ
বহু বিবাহ ।

ত্রিলোচনও উদয়মাণিক্যের স্থায় ২৪০টি মহিষী গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য-মূলে একটা সদিচ্ছা নিহিত থাকিবার কথা জানা
যাইতেছে । রাজ্য মধ্যে শিল্পকলার উন্নতি এবং বিস্তার সাধনই তাঁহার বহু বিবাহের
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; এ বিষয় প্রথম লহরের টীকায় বিবৃত হইয়াছে ।

* (১) “অনন্তমাণিক্য রাণী জয়া মহাদেবী ।
কহিতে লাগিল পুনঃ মনে উন্মাদা ভাবি ॥”
উদয়মাণিক্য খণ্ড ।

(২) “অনন্ত তাহান পুত্র হইল নৃপতি ।
জয়া নামী তাহার রাণীর ছিল খ্যাতি ॥”
শ্রেণীমালা ।

শিক্ষা ।

নিতাস্তই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, রাজমালা দ্বিতীয় লহরে রাজা

কিন্মা রাজপরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ নাই ।
রাজগণের শিক্ষা ও
 সাহিত্যের গোপনতা
 বিষয়ক বিবরণ । রাজমালায় সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় বুঝা যায়, মহারাজ

ধর্মমাণিক্য সর্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত, ধার্মিক এবং উদারচেতা ছিলেন । সাহিত্য চর্চায়ও ইঁহার বিশেষ উৎসাহ থাকা প্রকাশ পাইতেছে । ইনি স্বীয় পূর্বপুরুষগণের পুরাবৃত্ত (রাজমালা) লিখিবার সূত্রপাত করিয়া, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন । পরবর্তী ভূপতিবৃন্দ ইঁহারই পদাঙ্কানুসরণে ক্রমশঃ রাজমালার কলেবর পূর্ষ করিয়াছেন ।

ধর্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য শৈশবে রাজা হইয়া, অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন । বাল্যকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন না । প্রতাপের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনুমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন । ইনি সুশিক্ষিত, রাজনীতি কুশল, প্রবল পরাক্রান্ত, সাহিত্যানুরাগী এবং সঙ্গীতকলার উন্নতিকামী ছিলেন । ইঁহার শাসনকালে কয়েকখানা শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে । তিনি ত্রিহৃত (মিথিলা) হইতে নৃত্য ও সঙ্গীত পারদর্শী লোক আনিয়া দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

মহারাজ দেবমাণিক্যের প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না । তিনি নিতাস্ত সরল বিশ্বাসী ছিলেন । উপাস্ত্র দেবীর দর্শন লাভের নিমিত্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক আগমী বিপ্রের প্ররোচনায়, ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে বধ করাই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ । পরিশেষে তিনিও সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন ।

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য বাল্যবয়সে রাজ্যলাভ করিয়া অল্পকাল পরেই নিহত হইয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহার শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য শিক্ষিত এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ; * তাঁহার শূরত্বও অতুলনীয় । শিল্পকলার উন্নতিকল্পে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল ।

অনন্তমাণিক্য বাল্যকালে নিতাস্ত অনাবিষ্ট এবং অশিক্ষিত ছিলেন । রাজা হইয়াও তিনি স্বীয় শ্বশুর গোপীপ্রসাদের ক্রীড়া পুস্তলী হইলেন । যে শ্বশুরের প্রতি তিনি আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন, সেই শ্বশুরই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিলেন । গোপীপ্রসাদ রাজ্য লোভে জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ।

* "গৌরবর্ণ পণ্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান ॥

* * * * *
 রাজসিক ভাব নিত্য থাকয়ে অন্তর ॥"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

সেনাপতি গোপীপ্রসাদ, উদয়মণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইনি সৈনিক বিভাগের কর্মচারী। উদয় অশিক্ষিত, নোঁয়াড় প্রকৃতি বিশিষ্ট, বিশ্বাসঘাতক এবং অত্যন্ত ব্যভিচারী ছিলেন। অবিচার, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং মুসলমানের আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ বিপ্লবে ইঁহার শাসনকাল কলঙ্কিত হইয়াছিল। মোটের উপর ইনি যুদ্ধবিদ্যা ব্যতীত অণু কোন বিষয়ে শিক্ষিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় না।

উদয়মণিক্যের পুত্র জয়মণিক্যের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। এই সময় জয়মণিক্যের পিতা সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের (রঙ্গনারায়ণ) প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; জয়মণিক্য, তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক হইলেন। লোভপরতন্ত্র রণাগণ রাজ্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন, অমরমণিক্য তাঁহাকে বধ করায়, বৃদ্ধের সেই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নাই।

মল্লবিদ্যা শিক্ষা করা পূর্বকালের মত এই কালেও রাজগণের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। ধর্মমণিক্য দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে ধবংস করিবার অভিপ্রায়ে, পীড়ার ভাগ করিয়া অস্তঃপুরে অবস্থান পূর্বক মল্লবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন। গদাভীম নামক ব্যক্তি মহারাজ অনন্তমণিক্যের মল্লবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। অমরমণিক্যের পুত্র রাজবল্লভের নিকট জয়মণিক্য মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। স্কুল কথা, অণুবিধ বিদ্যার সহিত মল্লবিদ্যার চর্চা সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

এই সময় স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদয়মণিক্য ও জয়মণিক্যের প্রধান সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের পত্নী, তাঁহাকে স্ত্রী-শিক্ষা। পাঁচালী পাঠ করিয়া শুনাইতেন। কোন কোন রাজ-মহিষীর প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা ছিলেন। এ বিষয়ে রাজমালার বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, তদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়।

ধর্মমণিক্য ত্রিছত হইতে সুশিক্ষিত লোক আনাইয়া রাজ্য মধ্যে নৃত্যগীত নৃত্যগীত বিষয়ক চর্চা। প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তদবধি ত্রিপুরাবাসিগণ নৃত্যগীত বিশারদ হইয়াছিল। মহারাজের এই অনুর্তানের সুফল অত্য়পি ত্রিপুরায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাহিত্য সেবা।

বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ যত্ন করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহাদের প্রযত্নে রচিত রাজমালাই বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি বিধান। এ বিষয়ের প্রধান প্রমাণ। মহারাজ ধর্মমণিক্য রাজমালা রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। এই মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম লহর তাঁহার শাসন কালে রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি সমগ্র মহাত্মারত্নের অনুবাদ করাইবার

কথা প্রচলিত আছে । দুঃখের বিষয়, সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্তমান কালে নাই । মহারাজ ধন্যমণিক্য বঙ্গ ভাষায় 'উৎকল খণ্ড পাঁচালী' এবং 'যাত্রা রত্নাকরনিধি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন । 'প্রেত চতুর্দশীর গীত' তাঁহার সময়েই রচিত হয় । এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষায় রাজকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করায় এই ভাষার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল ।

পারিবারিক বিশেষ নিয়ম ।

কোন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎক্ষণাৎ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনুমতি প্রদান করিতেন । এরূপ অনুমতি পাইবার পর, রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়ার নিয়ম ছিল ।

এই সময় রাজপরিবারে সহমরণ-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ; রাজমালার দ্বিতীয় লহরে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় । মহারাজ ধন্যমণিক্যের মহিষী কমলা মহাদেবী, মহারাজ দেবমণিক্যের প্রধানা মহিষী (বিজয়মণিক্যের মাতা) এবং বিজয়মণিক্যের মহিষীগণ আগ্রহের সহিত পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন । অনন্তমণিক্যের আট বৎসর বয়স্ক মহিষী পতির সহমৃত্যু হইবার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা বাধা প্রদান করায় সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে পারে নাই । প্রজাসাধারণের মধ্যেও সহমরণ প্রথার সমধিক প্রচলন ছিল ।

রাজমহিষীগণের দণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণের ব্যবস্থা রাজমহিষীর বনবাস ছিল । মহারাজ বিজয়মণিক্য স্বীয় প্রধানা মহিষীকে বনে দণ্ড দিয়াছিলেন ।

অন্যের অলঙ্কিতে কথা বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত ছিল । সেনাপতি রণাগণ, অমরমণিক্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে আহারের ইঙ্গিত । নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে নিয়াছিলেন । অমরমণিক্যের হিতাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি তরবারিধারা পানের বোটা ছেদন করিয়া তাঁহাকে দেখাইল । এই ইঙ্গিতদ্বারা অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, অমরমণিক্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

ধর্মমত ।

ধর্ম রক্ষণ এবং ধর্ম পালন ত্রিপুর ভূপতিরূন্দের কুলাগত বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গুণ । দেবতা স্থাপন, দেবালয় গঠন, ধর্মোদ্দেশ্যে ভূমি ও অর্থদান, জলাশয় খনন, ধর্মে অটল বিশ্বাস ইত্যাদি সদগুণের নিমিত্ত ত্রিপুর রাজবংশ চির-প্রসিদ্ধ । প্রথম লহরে এতদ্বিষয়ক অনেক বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে । দ্বিতীয় লহর সংস্কৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা গেল ।

মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম-পরায়ণ মহারাজ ধর্মমাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্বে
 রাজকুমারের সন্ন্যাসীবেশে দীর্ঘকাল নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া বিস্তর পুণ্য ও
 সন্ন্যাসাত্মক গ্রহণ। জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। মহামাণিক্যের পরলোকগমনের পর,
 তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্মকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইনি কোতুকাদি
 আট জন ব্রাহ্মণকে বারাণসী ধাম হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সমাগত বিপ্রাষ্টকের
 মধ্যে কোতুক কান্যকুজ দেশীয় ছিলেন। অপর সাত জন ব্রাহ্মণের পরিচয় বর্তমান
 কালে দুপ্রাপ্য।

ধর্মমাণিক্য ধর্মভাব প্রণোদিত হইয়া কুমিল্লায়, কৈলারগড়ে (কসবায়) এবং
 জলাশয় খনন ও উদয়পুরে 'ধর্মসাগর' নামক তিনটী সরোবর খনন করাইয়াছিলেন,
 ভূমি দান। তন্মধ্যে কুমিল্লা নগরীতে অবস্থিত সুবিশাল বাগীই বিশেষ
 বিখ্যাত। এই সরোবর প্রতিষ্ঠাকালে মহারাজ ব্রাহ্মণদিগকে শস্যপূর্ণা উনত্রিশ
 শ্রোণ ভূমি * তান্ত্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। এই দান সম্বন্ধে রাজমালায়
 লিখিত আছে;—

“পরকাল চিন্তি রাজা চিন্ত শাস্তাইল ।
 ভূমি দান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল ॥
 ধর্মসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া ।
 তার চারি পারে সব ব্রিজ বসাইয়া ॥
 মহাবিশুবতে দিল ভূমি উৎসর্গিয়া ।
 কোতুকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চিয়া ॥
 কোতুকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমি দান ॥
 তান্ত্রপত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ ॥”

ধর্মমাণিক্য খণ্ড,—৫ পৃঃ ।

সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে, আটজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা
 ধর্মমাণিক্যের হইয়াছিল। তন্মধ্যে কোতুক ও বাণেশ্বরের নাম রাজমালায়
 তান্ত্রশাসন। পাওয়া যায়। কোতুক কান্যকুজবাসী, ইনি বারাণসী ধাম হইতে
 ধর্মমাণিক্যের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাণেশ্বর
 রাজমালা প্রথম লহরের রচয়িতা, ইনি ত্রিপুর দরবারের রাজপণ্ডিত ও রাজপুরোহিত
 ছিলেন, রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় ইহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। দান
 প্রতিগ্রাহী অপর ছয় জন বিপ্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না। তান্ত্রফলকেও সকল

* আট হস্ত পরিমিত নলকে চারি পণ ধরিয়া ত্রিপুর রাজ্যে ভূমি পরিমাপ হইয়া থাকে ।
 ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় আখ্যা এই ;—২০ ধুরে—১ ক্রান্ত । ৩ ক্রান্তিতে—১ কড়া । ৪ কড়ায়—
 ১গণ্ডা । ২০ গণ্ডায়—১ কাণি । ১৬ কাণিতে—১ শ্রোণ ।

ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী বিভাগেও এই নিয়মে ভূমি পরিমাপ হইয়া থাকে । এই
 প্রণালীতে পরিমিত কাণিকে 'ত্রিপুরাই কাণি' বলে ।

বিপ্রেয় নামোল্লেখ নাই, “কৌতুকাদি” শব্দ মাত্র পাওয়া যায় । তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

“চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সূধীঃ ।
 শ্রীশ্রীমদ্বর্ষমাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কলোদ্ভবঃ ॥
 শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাক্ষে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ ।
 ত্রয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেঘে সূর্য্যস্ত সংক্রমে ॥
 কৌতুকাদি দ্বিজাগ্ৰ্যেষু পূজিতেষু চ চাষ্টসু ।
 ভূমিংদদৌ শস্যপূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং ॥
 জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্ম্মসাগরমাখ্যায়া ।
 সভূমি ফল বৃক্ষাদি ভূমিতং দত্তবানহং ॥
 মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূ পতিভবেৎ ।
 তস্য দাসস্যদাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লোপয়ৎ ॥”

মর্ষ্য ;—চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামাণিক্যের সূধীপুত্র, শশধর সদৃশ শ্রীশ্রীমদ্বর্ষমাণিক্য, ১৩৮০ শকের মেঘ সংক্রমণে (চৈত্র মাসের শেষ তারিখে) সোমবার, শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্রেকে শস্যসমন্বিত এবং ফল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ উনত্রিশ দ্রোণ ভূমি দান করিলেন । আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য অন্য কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব ।

একের প্রদত্ত দান অণ্ডে বিলোপ না করিবার অনুরোধ প্রাচীন অনেক তাম্রশাসনে আছে । শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের শেষভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“ভূমিং বঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি ।
 উভৌ তৌ পুণ্য কৰ্ম্মানৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
 বষ্টিধর্ম্ম সহস্রাণি স্বর্গর্গমোদতি ভূমিদঃ ।
 আক্ষেপ্তা চানুমস্তা চ তাগ্ৰেব নরকং বসেৎ ॥
 স্বদত্তাং পরদত্তায়া যো হরেত বস্করাম্ ।
 স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূঁহা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
 বহুভিবস্বধা দত্তা রাজভিঃ সগরাভিঃ ।
 ধস্য ধস্য বদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলম্ ॥
 ইতি কমলদলাষু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মহুচিস্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ ।
 সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥” *

পরকীর্তি লোপ (প্রদত্ত ভূমির প্রতি হস্তক্ষেপ) না করিবার নিমিত্ত ভাবী নৃপতিদিগের প্রতি নিষেধসূচক ধর্ম্মানুশাসনসম্বন্ধ উপরিউক্ত মর্্ম্মাত্মক শ্লোক অনেক প্রাচীন তাম্রশাসনেই পাওয়া যায় ; ইহা অশেষ মহত্বের পরিচায়ক । তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে ।

১৩৮০ শকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, ইহা সার্কি চারিশত বৎসরেরও কুমিল্লানগরীস্থিত কিঞ্চিৎ পূর্বেবর কথা । ধর্ম্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে এই দান ধর্ম্মসাগরের প্রাচীনত্ব করা হইয়াছিল, সুতরাং এই জলাশয়ের প্রাচীনত্ব সার্কি চারি শতাব্দী নির্ণীত হইতেছে । খননের পর, কখনও এই বিশাল বাপীর সংস্কার হয় নাই ; শীত্র সংস্কারের প্রয়োজন হইবে বলিয়াও মনে হয় না । অত্য়াপি এই সরোবরের জল উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য যেমন বীর, তেমনি ধার্ম্মিক ছিলেন । রাজমালায় দেবতা প্রতিষ্ঠা লিখিত আছে, তিনি এক মণ সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । রাজমালার উক্তি এই ;—

“শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা ধর্ম্মে চিত্ত দিল ।
প্রতিমা ভুবনেশ্বরী সুবর্ণে নির্ম্মাইল ॥
এক মণ সুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাইয়া ।
জীবন্তাস * করাইল সাধক আনিয়া ॥
প্রতিমা নামায় তুলা লাগাইয়া রাখে ।
খাসে তুলা উড়ি যায় + পূজা কালে দেখে ॥”

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড - ২৯ পৃঃ ।

* বিগ্রহ স্থাপন কালে তাঁহার জীবন্তাস বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় । প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন দেবতারই পূজা হইতে পারে না । শাস্ত্রে আছে ;—

“অকৃত্যায়ং প্রতিষ্ঠায়ং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ ।
যথা পূর্কং তথা ভাবঃ স্বর্গাদীনাং ন বিস্তুতা ॥
অন্তেষামপি দেবানাং প্রতিমাসু চ পার্থিব ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তব্যাত্মনাং দেবত্ব সিদ্ধয়ে ॥” দেবপ্রতিষ্ঠা তন্ত্র ।

পূজা পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গ-দেবতার পূজাদি সমাপনান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় ।

“আং হ্রীং ক্রৌং ষং ঝং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ
আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহ হিত, আনিত্যাদি অমুষ্য সর্কেঞ্জিয়াণি, আমিত্যাদি অমুষ্য বাওঁমনশ্চক্ষু
শ্রোত্র ভ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা । অষ্টৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অষ্টৈ প্রাণা
ক্ষরন্ত চ । অষ্টৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা তে বজুরীরয়ন্ ॥”

ইহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র । যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার নাম বস্ত্রী বিভক্ত্যন্ত করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যিক ।

দেবতার বন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রে যে সকল স্থানের কথা লিখিত আছে, সেই সকল স্থানে হস্ত দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উজ্জীবন করিতে হইবে । এই নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার পর, দেবতার দেবত্ব হইয়া থাকে ।

+ প্রতিমার নামানুসারে স্থাপিত তুলা উড়িয়া বাইবার সম্বন্ধে জেম্‌স লঙ্ সাহেব (Rev. James Long) এক অদ্ভুত কথার অবতারণা করিয়াছেন । তিনি বলেন ;—“He made



“ছোট মা” বিগ্রহ ।

(এই মূর্তি পীঠদেবী যিপুৱা স্কন্দদেব সহিত একই মন্দিরে পূজিতা হইতেছেন ।
 প্রবাদানুসারে এই মূর্তি দেবালয়েই সমিষ্ঠিত নির্মিত্বী গবে পাওয়া গিয়াছে । অনেক বলে,
 চট্টগ্রাম হইতে যিপুৱাস্কন্দরা মূর্তি আনিয়া মহাবাজ ধৰ্ম্মাণিকা কতক স্থাপিতা হইবার
 পূর্বে এই মূর্তি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন ।)

এই বিগ্রহ এত গোপনে রাখা হইত যে,—“রাজার পুত্রে মূর্তি দেখিতে না
 ভুবনেশ্বরী বিগ্রহের পারে।” এই আদরের ও যত্নের বিগ্রহ এখন নাই। কোন
 অবস্থা। সময়ে কি অবস্থায় এই মূর্তির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, তাহা
 জানিবারও উপায় নাই। উদয়পুর রাজধানী মঘ এবং মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত
 ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের কোন জাতিই উক্ত বিগ্রহ লুণ্ঠন করিয়া
 থাকিবে ; এতদ্ব্যতীত এই বিগ্রহের বিলোপযোগ্য অন্য কোন ঘটনা সঙ্গটিত হওয়া
 প্রকাশ পায় না।

ধনুমাণিক্যের ধর্মকার্যানুষ্ঠানের আরও অনেক নিদর্শন আছে। তিনি
 পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্তি চট্টগ্রাম হইতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, এ বিষয়
 প্রথম লহরের টীকায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর বর্তমান মন্দিরও তাঁহার
 নিশ্চিত। এই মন্দির বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনার্থ নির্মাণের সঙ্কল্প ছিল, দৈব ঘটনার
 বিষ্ণুর পরিবর্তে শক্তি মূর্তি স্থাপন করিতে হইল। এতদ্বিষয়ে রাজমালায় লিখিত
 আছে ;—

“আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল ।
 বাস্তুপূজা সঙ্কল্প বিষ্ণু প্রীতে কৈল ॥
 ভগবতী রাজ্যে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে ।
 এই মঠে আমা স্থাপ রাজ্য মহাসম্মে ॥
 চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট ।
 প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥
 তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ ।
 পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ ॥”

• ধনুমাণিক্য খণ্ড—৩০ পৃঃ ।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর, যে ভাবে পাষণময়ী মূর্তি চট্টগ্রাম হইতে আনা
 হইয়াছিল, তাহা প্রথম লহরের টীকায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ ধনুমাণিক্য স্বপ্নাদর্শ হইয়া, বিষ্ণুর জন্ম নিশ্চিত মঠেই দেবীকে
 স্থাপন করিলেন। এই মঠের সম্মুখভাগে একখণ্ড শিলালিপি
 ত্রিপুরা সুন্দরী স্থাপন করিলেন। এই মঠের সম্মুখভাগে একখণ্ড শিলালিপি
 দেবীর মন্দির। ছিল, অনেক কাল পূর্বেই তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা
 মন্দিরটী প্রথম দর্শনকালে (১৩০২ ত্রিপুরাকে) মন্দির দ্বারের উপরিভাগে একটা

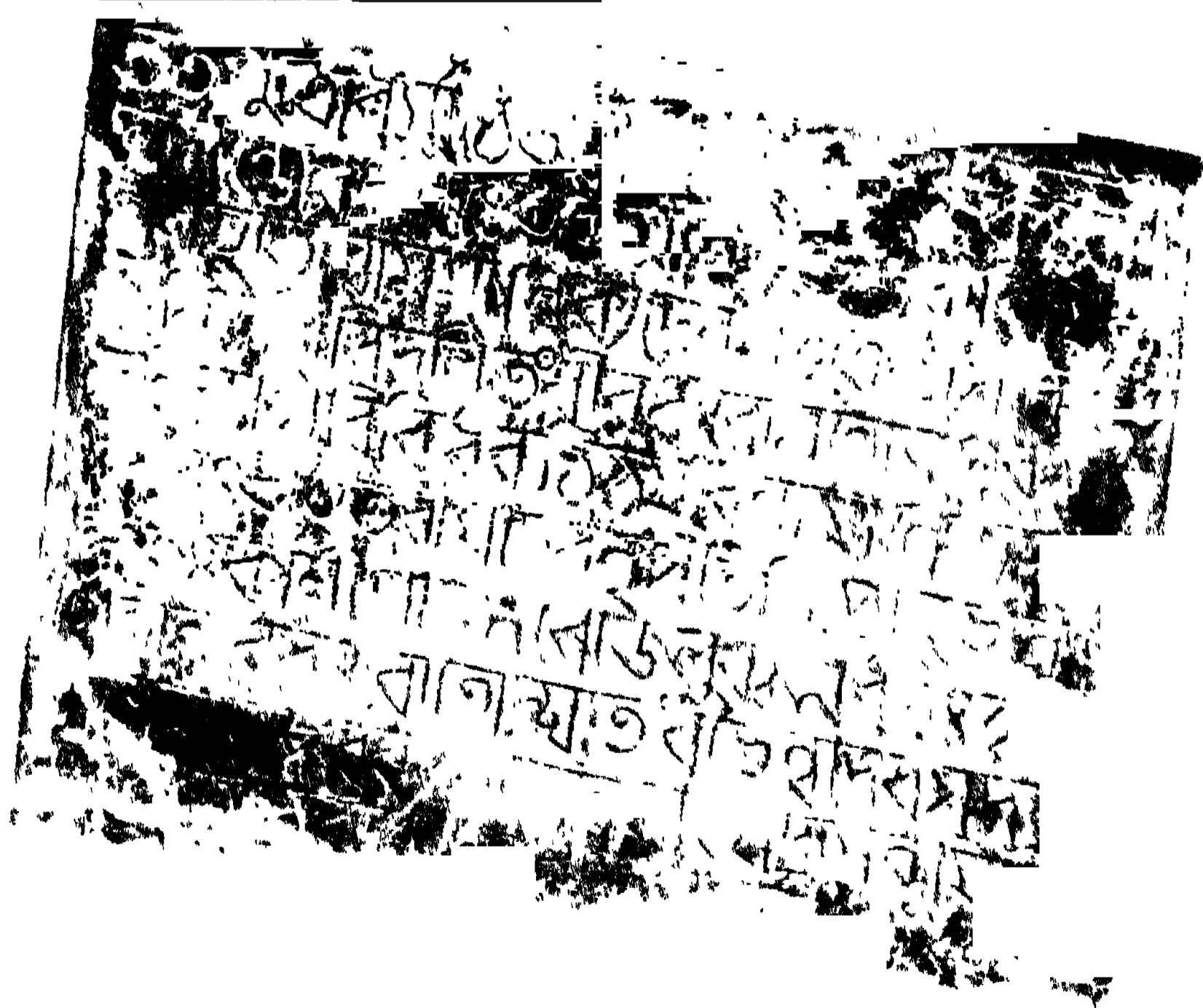
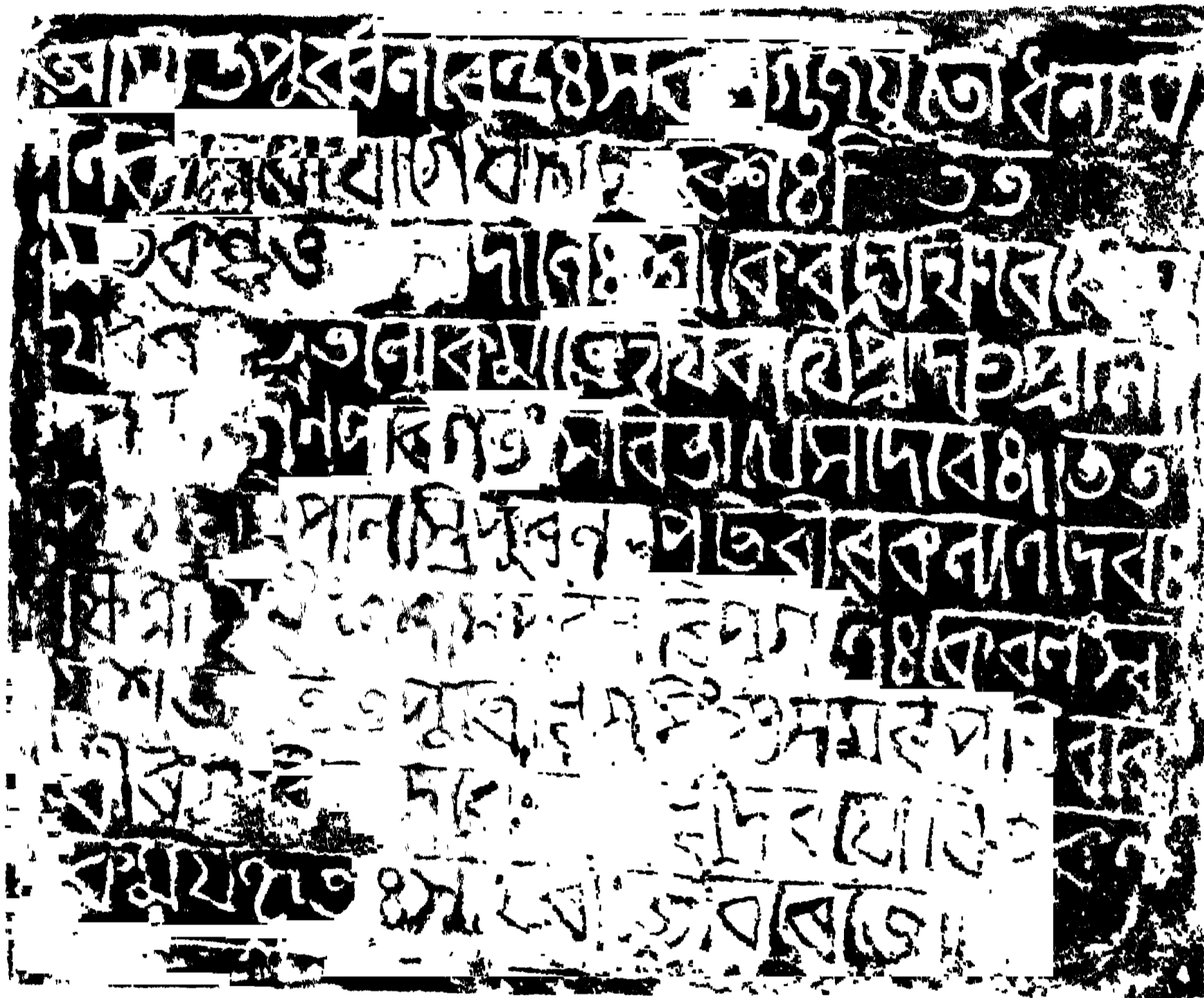
an image of Bhubaneswari of Small gold, weighing a maund, he placed
 cotton in her nostrils so that at the Puja time when the Prana Pratista
 ceremony is performed, her breath might blow it away, the people all
 cried out that a miracle had been performed, though a pipe perforating
 the body and in contact with the mouth of a priest accounts for the whole,
 we have many instances of similar tricks in Europe in the Middle ages.”

J. A. S. B.—Vol. XIX.

ভারতীর সাধকগণ কর্তৃক দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বে ইউরোপীয় ইজ্জতাল নহে,
 লঙ্ সাহেবের তাহা জানা থাকিলে বোধ হয় এবিধ প্রস্তাবের অবতারণা করিতেন না।



পীঠদেবী শ্রীশ্রীত্রিপুৱাসুন্দরীর মন্দির, উদয়পুর।



শাস্ত্রী নন্দনন্দনীর দেবীর মন্দির গায়ে শিলালিপি ।

(প্রথম ও দ্বিতীয় লহর)

(দ্বিতীয় খণ্ডে উৎকীর্ণ শ্লোক ।)

“তৎপুত্রো ধর্মচেতাঃ ক্রিতিপতিভিলকঃ কাশ্বদাস্তো বদান্তঃ
 শ্রীশ্রীমান্ সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো রামমাণিক্য দেবঃ ।
 চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিমলিতং বীর ধীরো মনোজ্ঞঃ
 পূর্বস্বাদম্বিকারৈ বিবিধ রুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং ॥
 বীর শ্রীযুত রামদেব নৃপতির্বিপ্রোহজ ভানুঃ কৃতিঃ
 কালীপাদসরোজলুকমধুগঃ পৃথীপতীনাং বরঃ ।
 বাতোদঘাতবিভিন্ন দেবমদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং
 শাকৈ নেত্রবিয়ঙ্গসেন্দুমিলিতে পীঠে ভবান্তাঃ পুনঃ ॥

শকাব্দা ১৬০৩”

(প্রথম খণ্ডের অনুবাদ ।)

“পূর্বকালে সমগ্র গুণসম্পন্ন ধন্যমাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন । তিনি দানে কর্ণ তুল্য ছিলেন, তাঁহার যাগে স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন । তিনি ১৪২৩ শকাব্দে গগনভেদী এই প্রাসাদ দেবগণ সেবিতা লোক-জননী অম্বিকাকে দান করেন । তাঁহার পর, ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ কল্যাণদেব প্রবল রিপুগণ পীড়িতা পৃথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তি দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, ধীর প্রকৃতি গোবিন্দদেব রাজাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন । তাঁহার দানে ব্রাহ্মণ রমণীগণ স্বর্ণময় হইয়াছিলেন । তিনি সাম্রাজ্যে বিরাজ করিয়াছিলেন ।” *

(দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ ।)

“তাঁহার পুত্র মহারাজ রামমাণিক্য ধার্মিক, সত্যবাদী, নিখিল-গুণসম্পন্ন, কমণীয় মূর্তি, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্ত ছিলেন । মহারাজ ধন্যমাণিক্য অম্বিকার উদ্দেশ্যে যে মন্দির দান করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, বীরবর ও ধীর প্রকৃতি মহারাজ রামদেব ঐ মন্দির মনোজ্ঞ করেন । দ্বিজ পঞ্চজ সেবিতা কালীপদ-পদ্মলুক-মধুপ ভূপতি শ্রীযুত রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে বাতাঘাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ্ঞ করেন । শকাব্দা ১৬০৩ ।”

উক্ত লিপিস্বর আলোচনার জন্য যার, ১৪২৩ শকে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্তৃক মন্দির নির্মিত হইবার পর, ১৬০৩ শকে মহারাজ রামমাণিক্য কর্তৃক তাহার সংস্কার হইয়াছিল । মন্দির নির্মাণের কিঞ্চিৎকাল দুই শতাব্দী পরে এই সংস্কার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে । ইহার পূর্বের আরও দুইবার মন্দিরটা সংস্কৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু উক্ত শিলালিপিস্বয়ে তদ্বিবয়ক কোন কথার উল্লেখ নাই ।

* এই অনুবাদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিষ্ণাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ‘শিলালিপি সংগ্রহ’ পুস্তিকা হইতে গ্রহণ করা হইল ।

রামমাণিক্যের সময় ও তাঁহার পূর্ববর্তী কালের সংস্কার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ।

মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে একখণ্ড শিলালিপি সংযোজিত থাকিবার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহা বঙ্গভাষায় লিখিত । এই প্রস্তর কলকের ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট ; এবং মধ্যে মধ্যে অক্ষর বিনষ্ট হইয়াছে । শ্রীযুক্ত বিষ্ণুবিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিলুপ্ত অক্ষরগুলি যথাশক্তি উদ্ধার ও তাহা বঙ্গভাষায় অভ্যস্তুরে সন্নিবেশ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ পাঠ নির্ধারণ করিয়াছেন ।

এএতু	মাম	
শ্রীমলিভিম		না
রা (য়) ৭	ত্রিপুরা	
শ্রী(হরি) ব (লভ)		না
রায়(৭)	বিশ্বা (স)	
	শক ১৬ ৩	

এ স্থলে অঙ্কিত শকাঙ্ক বিশুদ্ধ নহে । ১৪২৩ শকে নির্মিত মন্দিরের গাত্রে ১৬৩ শকের শিলালিপি সংযোজিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব ।

বলিভীম নারায়ণ ।

এই প্রস্তরকলকে বলিভীম নারায়ণের নামোল্লেখ আছে । ইনি মহারাজ রামমাণিক্যের শ্যালক এবং তাঁহার সমসাময়িক লোক । রামমাণিক্য ইঁহাকে যুবরাজ উপাধি প্রদানদ্বারা শ্যালক-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ! এই সময় বলিভীমের প্রভাব যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যুবরাজ উপাধিই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ । রামমাণিক্যের শাসনকাল ১৫৯২ হইতে ১৬০৪ শক পর্য্যন্ত । তাঁহার অনুজ্ঞায়, বলিভীমের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সংস্কার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই শিলা-পট্ট সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায় । শিলা-লিপিতে অঙ্কিত '১৬ ৩' স্থলে "১৬০৩" হইবে, এরূপ নির্ধারণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ।

উপরিউক্ত অঙ্ক নির্ধারণ অযথা করা হইতেছে না । সেকালে একাধিক অঙ্কের মধ্যবর্তী (০) শূন্য না লিখিয়া তৎস্থলে কাঁক রাখিবার প্রাচীন প্রণালী । দৃষ্টান্ত বিরল নহে । আগরতলা উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে ত্রিপুরেশ্বরগণের শাসনকাল নির্দেশক একখানা অতি জীর্ণ কাগজ আছে । তাহাতে '১৫০২' স্থলে '১৫ ২'—'১৬০৭' স্থলে '১৬ ৭'—'১৭০৫' স্থলে '১৭ ৫' লিখিত আছে । প্রথম লহরের পূর্বভাষে ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে । ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব সার্ভে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পরলোকগত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয় ধর্ম্মনগর হইতে একখানা প্রাচীন ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও শকাঙ্কের মধ্যবর্তী (০) শূন্য লিখিত নাই, শূন্যের স্থলে কিঞ্চিৎ কাঁক রাখা হইয়াছে মাত্র । কাছাড় জেলার অন্তর্গত

হালিয়াকান্দির সন্নিহিত স্থানে যে ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে “শুভমস্তু শকাব্দা ১৪ ৯” অঙ্কিত আছে । ইহা ত্রৈপুর ভূপতির কীর্ত্তি বলিয়া সাধারণের ধারণা । এই ইষ্টকে ১৪০৯ স্থলে শূণ্যের স্থান ফাঁক রাখিয়া ১৪ ৯ লিখিত হইয়াছে । * এই সকল অবস্থা, পূর্বেবাক্ত বিবরণসহ আলোচনা করিলে শকসংখ্যা ‘১৬ ৩’ স্থলে ‘১৬০৩’ হইবে, ইহা নিঃসন্দিক্তরূপে স্থির করা যাইতে পারে । মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিলালিপি আলোচনাদ্বারাও এই বাক্যের দৃঢ়তা প্রমাণিত হইবে । পূর্ব পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় খণ্ড শিলালিপিতেও রামমাণিক্য কর্তৃক ১৬০৩ শকে মন্দিরের সংস্কার হইবার কথা উল্লেখ আছে ; এই লিপির বিবরণ পূর্বেই প্রদান করা গিয়াছে । মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব সংলগ্ন একখণ্ড শিলালিপির আদর্শ এই ;—

শ্রীধন্যমাণিক্য স্থিতে
কৃতি ॥ শকাব্দা ১৪২৩ ॥
তত অভ্যাস্তরে শ্রীরণাগণ
রামমাণিক্য ধর্ম্মরাজ
পতি । শকাব্দা ১৬০৩

এবম্বিধ অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট ভাষাদ্বারা কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুঃস্বপ্ন ব্যাপার । শিলা-খণ্ডে ধন্যমাণিক্য, রণাগণ, রামমাণিক্য, এই তিনটি নামসহ, ধন্যমাণিক্য কর্তৃক মন্দির নির্মাণের কাল ১৪২৩ শকাব্দ, এবং রামমাণিক্য কর্তৃক সংস্কারের কাল ১৬০৩ শকাব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছে । এই প্রস্তর ফলক কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এই লিপিতে উল্লেখিত রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গ নারায়ণ) মন্দির নির্মাতা ধন্যমাণিক্যের পরবর্ত্তী, এবং তাহার সংস্কারক রামমাণিক্যের পূর্ববর্ত্তী কালের লোক । ইনি প্রথম উদয়মাণিক্যের (সুবা গোপীপ্রসাদের) ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন । উদয়মাণিক্য ১৪৯৮ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন । ইহার পরে, জয়মাণিক্যের সময়ও রণাগণ কিয়ৎকাল জীবিত এবং সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । পরে অমরমাণিক্য কর্তৃক নিহত হন । শিলালিপিতে রণাগণের নাম সংযোজিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, উদয়মাণিক্যের শাসনকালে, রণাগণ কর্তৃক এই মন্দিরের সংস্কার কার্য সমাহিত হইয়াছে । তদ্বিত্ত প্রস্তরফলকে ইহার নাম অঙ্কিত হইবার অণ্ড কোন কারণ থাকিতে পারে না । মন্দির নির্মাণের ৭০।৭৫ বৎসর পরে, এই সময় একবার সংস্কার হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না । ইহাই মন্দিরের প্রথম সংস্কার বলিয়া জানা যাইতেছে ।

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—পূর্বাংশ, উপসংহার, ১১ পৃষ্ঠা ।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক দ্বিতীয়বার এই মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল ।

দ্বিতীয় বারের
সংস্কার বিবরণ । রাজমালায় কল্যাণমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

“কালিকার মঠ চূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল ।
পুনর্ব্বার মহারাজা নির্মাণ করিল ॥”

এই সংস্কারের পরিচায়ক কোন শিলালিপি মন্দির গাত্রে নাই । কল্যাণ-
তৃতীয় বারের
সংস্কার বিবরণ । মাণিক্য ১৫৪৭ শকে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, ৩৪ বৎসর কাল
রাজত্ব করেন । এই কাল মধ্যে কোন এক সময়ে, মন্দিরের
সংস্কার হইয়াছিল । পূর্ববর্ণিত রণাগণের সংস্কারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, কল্যাণ-
মাণিক্য কর্তৃক পুনঃ সংস্কার হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় । ইহার অর্দ্ধ শতাব্দী
পরে, ১৬০৩ শকে রামমাণিক্য পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পূর্ববই
প্রদান করা হইয়াছে । ইহা তৃতীয় বারের সংস্কার বলিয়া জানা যায় ।

১৬০৩ শকের পরে ১৭৭৮ শক পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের মধ্যে
এই মন্দিরের গাত্রে কাহারও হস্তক্ষেপ হইবার নিদর্শন পাওয়া
মহারাজী স্মিত্রা
মহাদেবী কর্তৃক
পুনঃ সংস্কার । যাইতেছে না । ১২৬৭ ত্রিপুরাঙ্গে (১৭৭৯ শকে) মহারাজী
স্মিত্রা জগদীশ্বরী * কর্তৃক এই মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হইবার
প্রমাণ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় শিলালিপি আলোচনায় পাওয়া যায় । উক্ত লিপি
নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ।

শাকে র x সমুদ্রারি ধরণিযুতে লোক
মাত্রেহম্বিকায়ৈ প্রাসাদরাজং বিটপি
বিদলিতং ধন্যমাণিক্য পাদ
সরোজ লুক মধুপা মহিষীন্দুমুখী
পরাজগদীশ্বরীতি বিখ্যাত চক্রে
মনোজ্ঞং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা মাঘ †

মর্ম্ম—১৬ ৭ (৭) শকে, বৃক্ষদ্বারা বিদারিত ধন্যমাণিক্য (দন্ত ৭) এই উৎকৃষ্ট
প্রাসাদ (কালী ৭) পাদপদ্যে লুক মধুপ স্বরূপা অন্ত ইন্দুমতী তুল্যা জগদীশ্বরী উপাধি
ভূষিতা রাজমহিষী লোক মাতা অম্বিকার প্রীতির জন্ত পুনর্ব্বার মনোজ্ঞ করেন ।

এই লিপির শকাঙ্ক বুঝা যায় না । ১২৬৭ ত্রিপুরাঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়,
শকাঙ্ক ১৭৭৯ নির্ধারণ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছে ।

* ইনি মহারাজ চূর্ণমাণিক্যের মহিষী । ত্রিপুরার মহারাজীগণ সাধারণতঃ ‘মহারাজী’ ও
‘ঈশ্বরী’ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন । ইনি ‘জগদীশ্বরী’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

† এই লিপি বিস্তৃত নহে । রচিততা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না ।

ইহার পর ১৩১৪ খ্রিপূরাক্ষে (১৮২৬ শকে) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য পুনর্ব্বার মন্দিরের সংস্কার কার্য সম্পাদন করিয়াছেন । এই মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক পুনঃ সংস্কার । ভবিষ্যৎকালে এই সংস্কারের কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক ।

এই মন্দির ১৪২৩ শকে নির্মিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা চারি শত বৎসরের মন্দিরের প্রাচীনত্ব । কিছু অধিক কালের প্রাচীনকীর্তি ।

ধন্যমাণিক্য এই মহাপীঠের ভৈরব লিঙ্গ এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কালক্রমে সেই মন্দির বিনষ্ট হওয়ায়, কল্যাণ-ভৈরবের মন্দির । মাণিক্য পুনর্ব্বার নূতন মন্দির নির্মাণ করেন ; ইহার বিবরণ যথাস্থানে পাওয়া যাইবে ।

উদয়পুরস্থ সুবিশাল ধন্যসাগর মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ধর্ম্মশীলতার অন্যতম পরিচায়ক । এই বিশালবাপী দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ । ইহার গর্ভে ৮৫০ কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে । পূর্ব্বোক্ত মঠ ব্যতীত উদয়পুরে ধন্যমাণিক্যের নির্মিত আরও কতিপয় মঠ এবং মন্দির আছে । তিনি স্বীয় পিতার এবং ভ্রাতার শ্মশানে মঠ নির্মাণ করাইবারও প্রমাণ পাওয়া যায় । * বরদাখাত পরগণায় ইহার এক দীর্ঘিকা আছে ।

ধন্যমাণিক্যের মহিষী মহারাণী কমলা মহাদেবী পুণ্যবতী এবং দানশীলা ছিলেন । তাঁহার খনিত কমলাসাগর, কসবার সন্নিহিত কালিকা মহাদেবীর কীর্তি । দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বিরাজমান থাকিয়া অত্য়পি মহারাণীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । এই সরোবরের জল সুনির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত । এতদ্ব্যতীত উদয়পুরেও দ্বিতীয় কমলাসাগরের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ।

মহারাজ দেবমাণিক্য, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া, তন্ত্রসম্মত শ্মশান-সাধন ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত ছিলেন । ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, এবং সেই বিশ্বাস ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা । অন্ধ বিশ্বাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল । ইনি স্বীয় গুরুর নামানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপিত করেন । এই বিগ্রহ অত্য়পি ত্রিপুর রাজ-বংশের কুলদেবতারূপে সম্বন্ধে পূজিত হইতেছেন । এই বিগ্রহ সম্বন্ধে ত্রিপুর বংশাবলীতে লিখিত আছে,—

“লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিল ।
আপনার ইষ্টসাধন মহারাজ করিল ॥” ইত্যাদি ।

* “আর এক মঠ দিল অতি মনোহর ।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্রীধর্ম্মমাণিক্য উপর ॥
আর এক মঠ দিল পিতার উপর ।
লিখিলেক শ্লোক তাথে দিয়া শ্বেত পাথর ॥”

ত্রিপুর বংশাবলী।

ইনি পুরীধামে যাইয়া শ্রীমূর্তি দর্শন এবং জগন্নাথকে বহু মূল্যবান এক চূড়া অর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য পুণ্য সঞ্চয়কল্পে, ব্রাহ্মপুত্র তীর্থে স্নান, দান ও তথায় মহানাদ বিজয়মাণিক্যের ধ্বজা রোপণ করিয়াছিলেন। ইনি বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত খন্দারুঠান ও পঞ্চদ্রোণী। মহেশ্বরদী পরগণায় ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করেন; এই দান হইতে উক্ত স্থানের নাম 'পঞ্চদ্রোণা' বা 'পাঁচদোণা' হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ভূমি দান, তুলাপুরুষ, কল্পতরু, জলাশয় খনন, দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ ধর্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উদয়পুরস্থ বিজয়সাগর ইহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ৩৮২ গজ ও প্রস্থ ২৩৭ গজ। কিঞ্চিদধিক ২১/০ কাণি ভূমি লইয়া এই জলাশয় খনিত হইয়াছে। ইনি হীরাপুরে (উদয়পুরের সন্নিকটে) এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া হীরা গোপীনাথ নামক শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিজয়মাণিক্য বিশেষ ধার্মিক, ততোধিক বীর ছিলেন। তিনি ধর্মসাধন-বিজয়মাণিক্যের কালেও শূরত্বের গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই তাম্রশাসন। মহাপুরুষ পূর্বেবক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাম্রফলকদ্বারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই তাম্রশাসনের ভাষাই তাঁহার বীর-দর্পের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উক্ত শাসনের কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

“ধর্মমাণিক্য ভূপালো বহুভিভূবি হুর্ভঃ।

তৎসুতো দেবমাণিক্যাস্তৎসুতো বিজয়শুভঃ ॥

রাজা রাজ শিরোরত্ন নিযুট চরণায়ুজঃ।

শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যরাজা রাজতি রাজতে ॥”

এই শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ধর্মোদ্দেশ্যে ভূমি দানকালেও মহারাজ বিজয়, নৃপতিবৃন্দের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণ করিবার গর্ব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। এ স্থলে শূরত্বের ছায়াপাতে, ধর্ম্যভাব কথঞ্চিৎ স্নান হইয়া থাকিলেও সেকালে ধর্মসাধন অপেক্ষা ক্ষাত্র বীর্যের মর্যাদা কম ছিল না, তাম্রফলক আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। একরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা পরে বলা হইবে।

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের ধর্ম কার্য্য সম্পাদন বিষয়ক উল্লেখ-উদয়মাণিক্যের ধর্ম যোগ্য কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার শশুর ও সেনাপতি কাখ্যারুঠান। বিশ্বাসঘাতক গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভে জামাতাকে বধ করিয়া, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এক মঠ নির্মাণ করিয়া সেই মঠে “চন্দ্র গোপীনাথ” মূর্তি স্থাপন করেন। উদয়পুরের “চন্দ্রসাগর” নামক সুবিস্তীর্ণ সরোবর ইহারই কীর্ত্তি। এই সরোবর দীর্ঘে ৫০৫ গজ, প্রস্থে ২৬১ গজ। কিঞ্চিদধিক ৪১০ কাণি ভূমি জুড়িয়া এই বৃহৎ জলাশয় বর্তমান রহিয়াছে। ইনি ধর্মোদ্দেশ্যে নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকিলেও ধার্মিক ছিলেন না ;



শ্রী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ।

বরং অধাৰ্মিক, কদাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলিয়াই রাজমালা আলোচনায় জানা যায় ।

উদয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তৎপুত্র লোকতরফা, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক কিয়ৎকাল রাজাশাসন করিয়া, অনরমাণিক্য কর্তৃক নিহত হন । ইনি কোনরূপ ধৰ্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে বর্ণিত ভূপতিবৃন্দ, কুলাগত প্রথানুসারে শিব, শক্তি এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন । কোন কোন নরপতি তাত্ত্বিক মতে অস্থাবান ছিলেন । ধনুমাণিক্য, পাঠান বিজয় কামনার স্বীয় গুরুদ্বারা তাত্ত্বিক অভিচার কার্য্য করাইয়াছিলেন । ইনি ভক্তি-প্রণোদিত চিত্তে সুবৰ্ণনগী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পাঠস্থানে ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ ও ভৈরবলিঙ্গ স্থাপনদ্বারা শাক্ত এবং শৈব মতে আস্থিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । দেবমাণিক্য লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলাবাসী জনৈক সিদ্ধপুরুষের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে চক্র-সাধন ও শ্মশান-সাধন ইত্যাদি যোগানুষ্ঠান করিবার কথা রাজমালায় প.৩য়। যায় । পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইনি স্বীয় গুরুর নামানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এই বিগ্রহ ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতার মন্যে স্থান পাইয়াছেন । * মোটের উপর এই সময় ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ শিব, শক্তি এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শৈব মতই অধিকতর প্রবল ছিল ; রাজমালা আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে ।

দেবার্চনায় বানদান, ত্রিপুর রাজবংশের চিরাচরিত প্রথা । শাস্ত্রানুসারে দেবতার নামে যাত্রা উৎসর্গ করা হয়, তাহাই বলি পদবাচ্য । এতদ্ব্যতীত, মনুষ্য, পশু, যক্ষ, প্রেত, পিশাচ, পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে আহাৰ্য্য প্রদান করা হয়, তাহাও বলি মধ্যে পরিগণিত । জীব বলির ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে । কাশিকাপুরাণের মতে, পক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, মৃগ, মহিষ, ছাগ, মেঘ, শূকর, কৃষ্ণনার, গোবিকা, শরভ, সিংহ, শার্দূল, মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণী

* 'ত্রিপুর বংশাবলী' মুক্তিকায় দেবমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

“মিথিলা নগরবাসী দ্বিজ একজন ।
ত্রিপুর রাজ্যেতে আসি উপস্থিত হন ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বিজের নামকরণ ছিল ।
দেবমাণিক্য স্থানে উপস্থিত হইল ॥
* * * * *
মহাজ্ঞান শিখিবারে রাজার ইচ্ছা হৈল ।
গুরু স্বীকার করি রাজা দীক্ষিত হৈল ॥
* * * * *
গুরু নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিল ।
আপনার ইষ্ট সাধন রাজ্য করিল ॥”

এবং স্বীয় গাত্রের রুধির বলিদান প্রদান। এতদ্ব্যতীত কুম্ভাণ্ড, ইক্ষু এবং মত্ৰও বলি মধ্যে পরিগণিত। উক্ত পুরাণের মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাশ্চাগলাস্তথা ।
মহিষো গোধিকা শাল্লস্তথা নববিধা যুগাঃ ॥
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ ঘমঃ পঞ্চানন স্তথা ।
মৎস্যঃ স্বগাত্র রুধিরং চোষ্ট্রিকা বলয়ো নতাঃ ॥
অভাবে চ তথৈ বৈষাং কদাচিদ্রহস্তিনৌ ।
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ ॥
বলির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।” ইত্যাদি।

কালিকাপুরাণ,—৫৬ অঃ ।

ত্রিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ ছাগ, মেষ, মহিষ, গবর, কচ্ছপ, হংস, পাৰাবত এবং নর বলি। হংস ডিম্ব বলি প্রদান করা হয়। উক্ত রাজ্যে বর্তমান নরবলি হইয়াছে, এত অধিক সংখ্যক বলি ভারতের অন্য কোন স্থানে হয় নাই।* এই রাজ্যে নর-বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল স্থলেই যথাস্থ্য প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কি রকমের মনুষ্য বলির যোগ্য, শাস্ত্রে তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা ;—

“পিতৃ মাতৃ বিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধি বর্জিতম্ ।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদার বিহীনকম্ ॥
অজারিকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মূলকং বরম্ ।
তদ্বন্ধুভ্যা ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মু-ন্যাতিরেকতঃ ॥”

ভূর্গোৎসব তত্ত্ব ।

এ স্থলে পিতৃমাতৃহীন, ব্যাধি বর্জিত, দীক্ষিত ও বিবাহিত শূদ্র-যুবক বলির যোগ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে হইবে। ত্রিপুরায়, মনুষ্য ক্রয় করিয়া বলি দেওয়ার প্রথা না ছিল এমন নহে, কিন্তু জাতির বিচার করা হইত বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য চণ্ডাল বলিদ্বারা অভিচার কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এক সম্প্রদায়ের লোক, বলির মনুষ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল, তাহারা স্থানীয় ভাষায় ‘মৈচিলী’ বা ‘মছলু’ নামে অভিহিত হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত লোক ব্যতীত যুদ্ধে ধৃত প্রতিপক্ষ এবং স্বপক্ষের বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে দেবতা সমক্ষে বলি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল ; এই স্থলে জাতি বিচার করা হইত না। মহারাজ বিজয়মাণিক্য,

* ত্রিপুর রাজ্যের নরবলি সম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন ;—

“Human Sacrifices prevailed at an early period in Tripura, and even of the late years strong suspicions have been entertained of the practice being occasionally observed at the shrine of Kamakhya in Assam, and at Kalighat in Calcutta. But in no part of India were more human victims offered than in Tripura which appears to have been one of the strongest holds of Hinduism.”

J. A. S. B.—Vol. XIX.

স্বীয় সৈনিক বিভাগের একসহস্র বিদ্রোহী পাঠান অশ্বারোহী সহ বিস্তর পাঠান সৈন্য চতুর্দশ দেবতার সমক্ষে বলিদান করিয়াছিলেন । * এবং গোড়ের পরাজিত পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় রাজদরবারে নীত হইলে, তাঁহাকেও চতুর্দশ দেবতার সদনে বলি দেওয়া হইয়াছিল । বিজিত শত্রু ধরা পড়িলেই তাহার উত্তপ্ত শোণিতে চতুর্দশ দেবতার এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইত ।

শাস্ত্রে শত্রু বলির বিধান আছে, তাহা জীবন্ত শত্রু নহে ; ক্ষীরদ্বারা নির্মিত পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই পুতুলকে বলি প্রদান করা হয় । † ত্রিপুরেশ্বরগণ জীবন্ত শত্রু বলিদ্বারা শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন । সমরক্ষেত্রে ধৃত প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু হস্তগত থাকা অবস্থায় ক্ষীরের পুতুল ছেদন করিয়া শত্রু বলির ক্ষোভ মিটাইবেন কেন ? শব বিচ্যমান থাকা অবস্থায় কেহ কুশ-পুতুল দাহের ব্যবস্থা করে না ।

ত্রিপুর রাজ্যে নরবলির সীমা সংখ্যা ছিল না । মহারাজ ধনুমাণিক্য তাহার সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া, লোকসমাজের বিস্তর হিত সাধন করিয়াছেন । এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“পূর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত ।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥
শ্রীধনুমাণিক্য মানা তাহাকে করিল ।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশদেবে ।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥
দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয় ।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময় ॥
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা ।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড,—২৯ পৃঃ ।

* “সহস্র সোয়ার কর্তা পাঠান বিস্তর ।
চতুর্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

শত্রু বলি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থা নিম্নে প্রদান করা হইল ;—

“ততঃ শত্রু বলিং রাজা দত্তাৎ ক্ষীরেন নির্মিতম্ ।
স্বয়ং বিন্দ্যাৎ ক্রোধ দৃষ্টা প্রহার জনকেন চ ॥
কোপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃৎস্বা বৈ শত্রুনাম্না মহেশ্বরি ॥
শত্রুক্ৰয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।”

বৃহস্পতি তন্ত্র ।

ধর্ম সঙ্ক্লে অনেক রাজার অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। মহারাজ দেবমণিক্য স্বীয়
 ধর্মে গুরু লক্ষ্মীনারায়ণের প্ররোচনায় দেবতার দর্শন লাভের প্রত্যাশায়
 অন্ধবিশ্বাস। ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে শ্মশানে নিয়া বলিদান করিয়া-
 ছিলেন। পরিশেষে এই অন্ধ-বিশ্বাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, এ কথা
 পূর্বেই বলা গিয়াছে।

ত্রিপুরেশ্বরগণের ধর্মমত ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, তাহার
 রাজানুশাসনে সম্যক আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব। এক কথায় বলিতে গেলে
 ধর্মের পুষ্টি বিধান। রাজগণ চিরকালই সনাতন হিন্দু ধর্মের পোষক এবং সংরক্ষক
 ছিলেন। রাজনহিষীগণ ধর্মোদ্দেশ্যে জীবন দান করিতেও কুণ্ঠিতা ছিলেন না,
 সহমরণের আধিক্যই এ কথার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ,
 সর্বদেশে সর্বকালে প্রজাগণ রাজার আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে এবং
 বর্তমান কালেও তাহাই করিয়া থাকে। সে কালে ত্রিপুর রাজ্যে, রাজানুশাসনের
 ফলে ধার্মিকের সংখ্যা অধিক ছিল, এবং ধর্ম সাধন তাহাদের জীবনের প্রধান ক্রত
 বলিয়া গণ্য হইত, রাজমালায় এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এইরূপ অবস্থায়ও সে কালে দেশে অধার্মিক লোক না ছিল, এমন নহে।
 রাজমালায় পাওয়া যায়, সে কালে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার সময় হরিবংশ
 গ্রন্থ, এবং শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করা হইত। ইহা ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাসের
 পরিচায়ক। কোন কোন পাপাশয় ব্যক্তি এরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও সেই
 প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেনাপতি গোপীপ্রসাদই এই শ্রেণীর
 লোকের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি জামাতার মঙ্গল সাধনার্থ শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া
 প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও, পরিশেষে রাজ্যলোভে জামাতার বধ সাধন এবং স্বয়ং
 সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ অর্জন এবং ধর্মের গ্লানি
 করিয়াছিলেন।

তীর্থ স্থানের বিবরণ ।

ত্রিপুর রাজ্যে কতিপয় তীর্থস্থান আছে ; তন্মধ্যে উদয়পুরস্থ (মহাপীঠ),
 উনকোটা তীর্থ, ডম্বুর বা ডুম্বু তীর্থ এবং ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থের নাম বিশেষভাবে
 উল্লেখযোগ্য। মহাপীঠের বিবরণ প্রথম লহরের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে। রাজমালা
 দ্বিতীয় লহরে যে সকল তীর্থের নামোল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সন্নিবিষ্ট
 হইল।



(পর্বত গায়ে প্রস্তুত খোদিত মন্দির ভগ্নাবশেষ) ।

উনকোটা তীর্থ—কৈলাসহর ।



তীর্থমুখ।

উনকোটা তীর্থ—কৈলাসহর।

উনকোটা তীর্থ ।

এই স্থান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর বিভাগীয় অফিস
উনকোটা তীর্থের
পথ । হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী পূর্বদিকস্থ পর্বতের সামুদেশে
অবস্থিত । এই পর্বত উনকোটা শৈলের একটি শৃঙ্গ । এই
স্থানে যাইবার পথ দুর্গম হইলেও অতি মনোরম । অধিকাংশ স্থলে ক্ষীণ-সলিলা
পর্বত নির্ঝরিণীর মধ্য দিয়া চলিতে হয়, মধ্যে মধ্যে পর্বতে আরোহণ এবং
অবরোহণেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে । এই নির্ঝরিণীর উপরিভাগ বৃক্ষ এবং
পর্বতজাত বাঁশের পাতায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, সমগ্র পথ প্রকৃতির নিভৃত রম্যকুঞ্জে
পরিণত হইয়াছে ! এই রাস্তাটি আমাদের পরিচিত । কৈলাসহরের ভূতপূর্ব
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কানেক্টর স্বর্গীয় হেমকুমার চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক অপেক্ষাকৃত সহজ
এবং সুগম আর একটি রাস্তা নির্মিত হইবার কথা শুনিয়াছি, সেই পথ অত্যাপি
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।

উনকোটা একটি প্রাচীন তীর্থ স্থান । কতকাল যাবত এই স্থান পবিত্র-
উনকোটা তীর্থের
প্রাচীনত্ব । ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন । রাজমালা
আলোচনায় জানা যায়, বহু প্রাচীনকালে বিমারের পুত্র মহারাজ
কুমার এই তীর্থে যাইয়া শিবারাধনা করিয়াছিলেন । তদনন্তর প্রায় চারিশত বৎসর
পূর্বের মহারাজ বিজয়মাণিক্য উনকোটা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন । * তৎপর
মহারাজ অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর দেব উনকোটাতে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায় ।
ইহাও কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসরের কথা । † ‘উনকোটা মাহাত্ম্য’ নামক হস্ত
লিখিত পুস্তিকা আলোচনা করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া
যাইবে । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

“বিক্র্যাদ্রেঃ পাদসমুতো বরবক্রঃ স্পৃগ্যাদঃ ।

দক্ষিনশ্রাং নদশ্রান্ত পুণ্যা মনুনদীস্বতা ॥

* “কত দিন পরে রাজা উনকোটা গেল ।

এক উনকোটা লিঙ্গ তথাতে দেখিল ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

† “রাজধর চলিল ছালালীগ্রাম পথে ।

ইটাগ্রাম হৈয়া চলে উনকোটা তীর্থে ॥

স্নান দান করে তথা রাজধর নারায়ণ ।

উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ ॥”

অমরমাণিক্য খণ্ড ।

অতঃপর মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ১৩১৩ ত্রিপুরাকে এই তীর্থে গমন করিয়াছিলেন,
তাহা ২০ বৎসর পূর্বের কথা । অল্পকাল পূর্বে, পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য
বাহাদুরও এই তীর্থ দর্শন করিয়াছেন ।

অনয়োরস্তুরা রাজন্ উনকোটাগিরির্মহান্ ।
 বত্র তেপে তপঃ পূৰ্ৰং স্মহং কপিলোমুনিঃ ॥
 তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্ ।
 লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥”

উনকোটা তীর্থ মহাশ্রম ।

উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা জানা যায়, বিষ্ণুশৈলের পাদদেশোৎপন্ন পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদের দক্ষিণে পুণ্য-সলিলা মনুনদী প্রবাহিতা হইতেছে । এই বরবক্র ও মনুনদীর মধ্যবর্তী স্থানে উনকোটা পর্বত অবস্থিত । পূর্বের মহর্ষি কপিল উক্ত পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন । কপিল তীর্থ তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং মানব-গণের সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক কপিল স্থাপিত শিব লিঙ্গ সেই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন । কথিত উনকোটা তীর্থ, বরবক্র এবং মনুনদীর মধ্যবর্তী উনকোটা পর্বতেরই অংশ বিশেষ । এই স্থান মনুনদীর অতি সন্নিহিত ছিল, কালক্রমে এই নদী পথান্তর অবলম্বন করায়, বর্তমান সময়ে কিছু দূরবর্তী হইয়াছে ।

এই তীর্থের প্রকাশক বা সংস্থাপক মহর্ষি কপিল অতি প্রাচীন কালের যোগী কপিল মুনির বিবরণ । পুরুষ । উপনিষদে ইঁহার নাম পাওয়া যায়, যথা ;—

“ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিতর্কিত্বি ।”

শ্বেতাশ্বতর—৫।২ ।

মর্শ্ব ,—“প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সর্বপ্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন ।”

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায়ও ইঁহার নাম আছে । স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন,—
 আমি,—

“গন্ধর্কানাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ।”

গীতা—১০।২৬ ।

মর্শ্ব ;—“আমি গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহামুনি কর্দমের ঔরসে, দেবছতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি সাঙ্খ্য দর্শন প্রণেতা ; এবং ইঁহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল । ইঁহার দ্বারা সংস্থাপিত উনকোটা তীর্থ যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্থানের অবস্থা, প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে অঙ্কিত অসংখ্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি এবং পর্বতের সান্নিদেশে অবস্থিত প্রস্তর-মূর্তি সমূহের বিষয় আলোচনা করিলে, এই তীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

কপিল মুনি এক স্থানে বসিয়া তপস্যা করেন নাই । হরিদ্বারে, গঙ্গার সাগর-

সঙ্গম স্থানের সন্নিহিত সগর দ্বীপে এবং আসামে, বদরপুরের
 কপিলাশ্রম ।

নিকটবর্তী বরবক্র নদীর তীরে কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । বর্তমান কালেও আসামের কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশ্বর শিব বিরাজমান রহিয়াছেন ।

এই স্থানও উনকোটা পর্বতের অন্তর্ভুক্ত এবং ‘কপিল-তীর্থ’ নামে পরিচিত । *
শাস্ত্র গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

“যত্র তেপে তপঃ পূর্বং স্মহং কপিল মুনিঃ ।

যত্র বৈ কপিল তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ ॥”

বায়ু পুবাণ ।

অতঃপর এখানে আর এক মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল । সংস্কৃত রাজমালায়
মহর্ষি মনু । লিখিত আছে ;—

“পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিত শিবঃ ।

তত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদীতটে ॥”

সংস্কৃত রাজমালাধৃত যোগিনী তন্ত্র বচনং ।

রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি ।

মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি ॥

মনু নদী তীরে মনু বহু তপ কৈল ।

তদবধি মনু নদী পুণ্যানদী হৈল ॥”

মহর্ষি মনু, মনু নদীর তীরে শিব আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবার কথা উক্ত
বচনদ্বারা জানা যাইতেছে । উক্ত নদীর তীরে, উনকোটা তীর্থ ব্যতীত অন্য কোন
স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই, এবং পুরাকালে থাকিবার কথাও জানা যায় না ।
সুতরাং এই উনকোটাতেই কপিল মুনির স্থাপিত শিবলিঙ্গ মহর্ষি মনু কর্তৃক
অর্চিত হইয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । ‘মনু’ নামের সহিত ‘রাজন’ বা
‘রাজ’ শব্দ সংযোজিত হওয়ায় কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি মহর্ষি মনু নহেন,
মনু নামক কোন রাজা ছিলেন । চতুর্দশ মনুর প্রত্যেকেই প্রজাপতি এবং

* ইতিপূর্বে যে বচন উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে ;—

“বিক্র্যাদ্রেঃ পাদসম্মুতা বরবক্রঃ স্পৃগ্যাদঃ ।

দক্ষিণশ্রাং নদশ্রাশ্র পুণ্যা মনু নদীস্মৃতা ॥

অনয়োরস্তরা রাজন্ উনকোটা গিরির্মহান্ ।

যত্র তেপে তপঃ পূর্বং স্মহং কপিলোমুনিঃ ॥

তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্ ।

লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥”

উনকোটা তীর্থ মাহাত্ম্য ।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের পশ্চিম ভাগস্থ পর্বতমালা পর্যন্ত
উনকোটা শৈলের অন্তর্গত, এবং এই সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ কপিল তীর্থ নামে অভিহিত ।
আমাদের কথিত উনকোটা তীর্থ এবং আসামের কপিলাশ্রম, এতদ্ব্যতীত স্থান এই সীমা মধ্যে
অবস্থিত ।

মহম্মদের প্রথম রাজা, এ কথা বোধ হয় তাঁহারা ভাবেন নাই। মনু একাধারে রাজা এবং মহর্ষি এ উভয়ই মনু নামের সাহিত 'রাজন্' বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রালোচনায় জানা যায়, কপিল এবং মনু উনকোটা শৈলকে পবিত্র স্থান জানিয়াই, সেই স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন। এই শৈলের পার্শ্ববর্তী বরবক্র নদ ও তাহার দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা মনু নদী পুণ্যপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বরবক্র সম্বন্ধে পাওয়া যায় ;—

“বিদ্বাপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্র স্পৃগ্যদঃ ।
 যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নরঃ সদগতিমাপ্নুয়াৎ ॥
 যজ্জলে মনুজব্যাস্ত্র মনুজো মৃত এ বহি ।
 তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সূর্যাপথেন চ ॥
 প্রাচ্যাদেশে মৃতোজস্তু নরকং প্রতিপত্ততে ।
 যানদ্বর্ষ সহস্রানি যজ্জলেত্য়মৃতো ভবেৎ ॥
 ষট্শ্রবং নদরাজস্ত বক্রো বক্রো চ পুণ্যদঃ ।
 তীর্থঃ প্রসন্তঃ বিখ্যাতঃ বরবক্রস্ত তঃ স্মৃতঃ ॥”
 বায়ু পুৰাণ ।

মনু নদী সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

“সমুদ্রস্তোত্তরে দেশে ততো মনু নদী স্মৃতঃ ।
 যং গঙ্গাপি মহারাড্‌ন্ পিত্বা পানীয়মুক্তমং ॥
 মনু নদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং ।
 তত্র স্নাত্বা নরোযথ্যতি চন্দ্রলোকং মনুভমং ॥”
 বায়ু পুৰাণ ।

মনু নদী এবং মনু ও বরবক্রের সঙ্গম স্থান বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রকার উক্ত বাক্যদ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন।

অতঃপর উনকোটা নামান্বিতা বিষয়ক দুই একটা কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক।

উনকোটা
 তীর্থ নামান্বিতা ।

বাহারীভক্তে, পীঠ নির্ণয় প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে ;—

“উনকোটা পীঠ মধ্যে প্রধানং তানি শকর ।
 এবাস্ত দেবতাঃ সর্গাঃ এবাস্ত দশ ভৈরবাঃ ॥
 মনোরমোত্তর ভাগে উচ্চ ভূমিং প্রদৃশতে ।
 তত্র কোটীশ্বরং লিঙ্গং একোনং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥
 তত্রো মৃতঞ্চ কুণ্ডঞ্চ নির্মিতং বিশ্বকন্মণা ।
 স্নাত্বা পিত্বা চ যো ভক্ত্যা তুল্যং বৈ দণিকর্ণিকা ॥
 শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণঞ্চৈব দর্শনং স্পর্শমেব চ ।
 তত্রোধিষ্ঠাতৃ দেবানাং সর্গ তীর্থ ফলং লভেৎ ॥

* * * * *
 তত্রো উনকোটা সংলিঙ্গং লিঙ্গ বাসীং বিরাজতে ॥

মাঘাদি মাস ষট্কেষু অক্ষয়া যদি লভ্যতে ।

তদ্দিনে চ মহাদেব সৰ্ব্ব তীর্থং ফলং লভেৎ ॥”

বরাহী উক্ত ।

বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

“চৈত্র মাসি সি তাষ্টমাং অক্ষয়া যদি লভ্যতে ।

তদ্দিনে চ মহাপুণ্যং পুণ্যাংপুণ্যতরৌ স্মৃতৌ ॥

অমৃতশ্চ শ্ৰুতির্ভক্ত সাক্ষাৎ দেব জনাৰ্দ্দন ।

সৰ্বপাপ হরেৎ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ॥” ইত্যাদি ।

এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে, এ স্থলে সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না । প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণত্রয়োদশী তিথিতে এবং অশোকাস্তমীতে এই তীর্থে মহামেলা হইয়া থাকে ; এবং নানাস্থান হইতে সমাগত যাত্রীগণ উক্ত মেলাদ্বয়ে সমবেত হইয়া স্নানাदि করে । তৎকালে এই তীর্থে চারি পাঁচ সহস্র লোকের সমাগম হয় । এতদ্ব্যতীত সর্বদাই সাধু সন্ন্যাসিগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন ।

ক্রমান্বয়ে চারিবার এই তীর্থদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে । স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের গমনকালে তাঁহার সঙ্গেই প্রথম উনকোটা তীর্থ দর্শন । দর্শন লাভ হয় । তৎপর যে তিনবার গিয়াছি, তখন দেখিয়াছি, এই অল্পকালের মধ্যেই তথাকার অনেক দেবদেবীর মূর্তি ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে ; এবং অনেকগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে । ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্প এই সকল মূর্তির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, মূর্তিগুলির কতক প্রস্তরময় পর্বত গাত্রে খোদিত এবং কতক প্রস্তরফলক কর্তনদ্বারা নির্মিত । ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয়, ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯২ খৃঃ) এই স্থানে উনকোটায় শিব, হরগৌরী, বিষ্ণুপদ, কালভৈরব, বাসুদেব, রাক্ষস ও রাক্ষসী মূর্তি, হনুমান, পঞ্চমুখ শিব, গণপতি, লক্ষ্মী, রাবণ, রাম-লক্ষ্মণ, শিবলিঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন । অম্পর্কিত অঙ্কন দৃষ্টে অধিকাংশ মূর্তির পরিচয় সংগ্রহ পক্ষে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন ।

আমাদের প্রথম দর্শনকালে এই সকল মূর্তির অধিকাংশই বিচ্যমান ছিল, পরবর্তী কালে দেখা গিয়াছে, তাহার অনেকটা ধ্বংস হইয়াছে । উনকোটা তীর্থে প্রতিষ্ঠিত পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত প্রস্তর মূর্তিগুলির কতক ভগ্ন হইয়াছে এবং পর্বত গাত্রে খোদিত মূর্তির কোনটা সম্পূর্ণ এবং কোনটা আংশিক ধ্বসিয়া পড়িয়াছে । অবশিষ্টগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না, ক্রমশঃ ধ্বসিয়া বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক । এই সকল মূর্তিতে শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন আছে । সুদীর্ঘকাল অনাবৃত স্থানে থাকিবার দরুণ নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, বিশেষতঃ বর্ষার

বারিধারায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অধিকাংশ মূর্তিই পরিচয়ের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। উনকোটা শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে খোদিত মূর্তিসমূহের অস্পষ্ট এবং ভগ্নাবস্থা হইতে, এখনও দশমহাবিছা, রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং পুতনা বধ ইত্যাদি কতিপয় মূর্তি অতি কষ্টে টিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিনষ্ট মূর্তিগুলি কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে ধ্বংস হয় নাই; খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালাপাহাড় কর্তৃকও এই তীর্থের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার পার্শ্ববর্তী ভুবনেশ্বর তীর্থ ও তুঙ্গেশ্বর শিব তৎকর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, এত অধিক সংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি সমন্বিত উনকোটা তীর্থে তাহার আগমন বিশেষ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।

এক স্থানে এত অধিক সংখ্যক বিগ্রহ দুই একটা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত
 উনকোটাশ্বর শিব বিগ্রহ। অন্য কোথাও আছে কি না, জানি না। ইহার মধ্যে পর্বতগাত্রস্থ
 উনকোটাশ্বর শিবের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট
 মূর্তির নিম্নভাগ ধ্বসিয়া গিয়াছে। উর্দ্ধভাগ এখনও পর্বতগাত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।
 এই মূর্তির এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্তের পরিসর চতুর্দশ হস্ত, কপাটকল্প
 দুইটা কর্ণে বৃহৎ ঢালের ন্যায় দুইটা কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। গৌণের একদিক
 ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপর দিকে দেড় হস্ত পরিমিত গুম্ফ বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তে
 ত্রিশূল এবং পদতলে দুইটা বৃষ বিরাজমান। বৃষ দুইটা পর্বতগাত্র চূত হইয়া
 সম্মুখস্থ সমভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এরূপ বিরাট মূর্তি পূর্বের কখনও দৃষ্টিগোচর
 হয় নাই। অনেকে মনে করেন, এই সকল প্রতিমূর্তি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন
 কীর্তি; এই ধারণা সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিপরীত
 সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সূত্র বিদ্যমান আছে, তাহা নিম্নে আলোচনা করা
 যাইতেছে।

এই তীর্থ স্থানে একটা মন্দির ছিল। তাহার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এবং ইষ্টক ও
 প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরাদি সরঞ্জাম এখনও পর্বতের শৃঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।
 লুপ্তপ্রায় নিদর্শন। এই মন্দির কাহার নির্মিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ
 হন নাই। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিছাবিনোদ মহাশয়
 বলিয়াছেন ;—

“শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্তিবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কালে
 ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়। একটা মন্দির যে
 অতি অল্প দিন পূর্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল মন্দির কে কখন
 নির্মাণ করিয়াছিলেন, কোথাও উল্লেখ নাই। তবে, অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে,
 তাহা ত্রিপুর নরপতিগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কারণ, ত্রিপুরাধীশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেই
 পূণ্যবুদ্ধিতে উনকোটা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।” ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ পুস্তিক।



উনকোটিস্থর শিব ।
উনকোটি তীর্থ—কৈলাসহর ।

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা এ বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথাই উদ্ধৃত
করিয়াছেন, স্বীয় অভিমত প্রদান করেন নাই । *

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

“যখন স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য উনকোটাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি অল্পদিন পূর্বে
নষ্ট একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলি কে কখন নির্মাণ
করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার ঘো নাই।”

ইহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে জানিতে পারিতেন, রাজমালায়ই মন্দির
নির্মাতার নামোল্লেখ আছে।

সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“বিমারশ্চ স্নাতা জাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ ।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ ॥
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্চাম্বুল নগরাস্তরে ।
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীং সুবড়াই কৃতে মঠে ॥”

রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“বিমার হইল রাজা তাহার তনয় ।
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুলনগর ।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তিতর ॥
সুবড়াই খুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান ।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান ॥
* * * * *
গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি ।
মনুরাজ সত্যসুগে পূজিছিল অতি ॥
মনুনদী তীরে মনু বহু তপ কৈল ।
তদবধি মনু নদী পুণ্য নদী হৈল ॥”

এই ‘ছাম্বুল নগর’ উনকোটা ও তাহার পার্শ্ববর্তী কৈলাসহর প্রভৃতি স্থানের
ছাম্বুল নগরের অবস্থান প্রাচীন নাম । বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা চন্দ্রশেখর পর্বতকে ছাম্বুল-
নির্গয়। নগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার গুরুতর ভুল ।
উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা জানা যায়, এই স্থান মনু নদীর তীরবর্তী কিরাত প্রদেশে অবস্থিত,
এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, রাজা সুবড়াই তথায় মঠ নির্মাণ করাইয়া-
ছিলেন । সুবড়াই, মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর । আমাদের কথিত উনকোটা
তীর্থ মনু নদীর সন্নিহিত কিরাত প্রদেশে অবস্থিত, বর্তমান কালেও ইহার অদূরবর্তী
স্থানে কিরাত (কুকি) গণ বাস করিতেছে । এখানে অদ্যাপি উনকোটীশ্বর শিব

বিরাজ করিতেছেন ; এবং প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল অবস্থা পূর্বেদ্বিতীয় রাজমালার বাক্যের সহিত রেখায় রেখায় মিলিতেছে । মনু নদীর সন্নিহিত একরূপ অবস্থাপন্ন অল্প কোন স্থান নাই । সুতরাং ছাশুলনগর উনকোটীরই নামান্তর এবং তথাকার মন্দির মহারাজ ত্রিলোচন (সুবড়াই) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না । এই স্থানে অবস্থিত ইষ্টকরাশির গঠন দৃষ্টিতেও তাহার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, উনকোটীর বিগ্রহসমূহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীর্তি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । উপরোক্ত অবস্থা বিগ্রহসমূহের প্রাচীনত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বেও এই স্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য ছিল, এবং ত্রিলোচন মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন মাত্র ; তৎকর্তৃক বিগ্রহ স্থাপনের কথা রাজমালায় বা অন্য কোনও গ্রন্থে নাই । ত্রিলোচনের পূর্বে, কৈলাসহর অঞ্চলে ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রভু স্থাপনের প্রমাণাভাব, সুতরাং তাঁহার পরবর্তী রাজগণের দ্বারা উনকোটীর মূর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও দৃষ্ট হয় না । সম্যক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে ইহা মহর্ষি কপিল এবং মনুর কীর্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । * মূর্তি সমূহ এক সময়ের নির্মিত ও খোদিত নহে, অবয়ব দৃষ্টিতে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি একরূপ সিদ্ধান্ত করেন । উক্ত ঋষিদ্বয়ের মধ্যে একের কার্য অন্যের কার্যের পরবর্তী কালে সাধিত হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত ; সুতরাং বিশেষজ্ঞগণের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না । ঋষিদ্বয়ের পরবর্তী কালেও কোন কোন মূর্তি ত্রিপুরেশ্বরগণ কর্তৃক স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে ।

এই স্থান যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম । উনকোটা ছড়া যে স্থানে প্রস্তরের ফাঁক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটা অতি সুন্দর ।

পুরাকালে উনকোটা বিশেষ জাগ্রত তীর্থ ছিল ; স্থানের অবস্থা দৃষ্টিতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । পরবর্তী কালে এই তীর্থে যাত্রী সমাগম হ্রাস হইবার বিশেষ কোন হেতু ছিল, একরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে । অভিনিবেশ চিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সে কালে এই স্থান নিতান্ত দুর্গম ছিল, এবং ইহার আশে পাশে বিস্তর

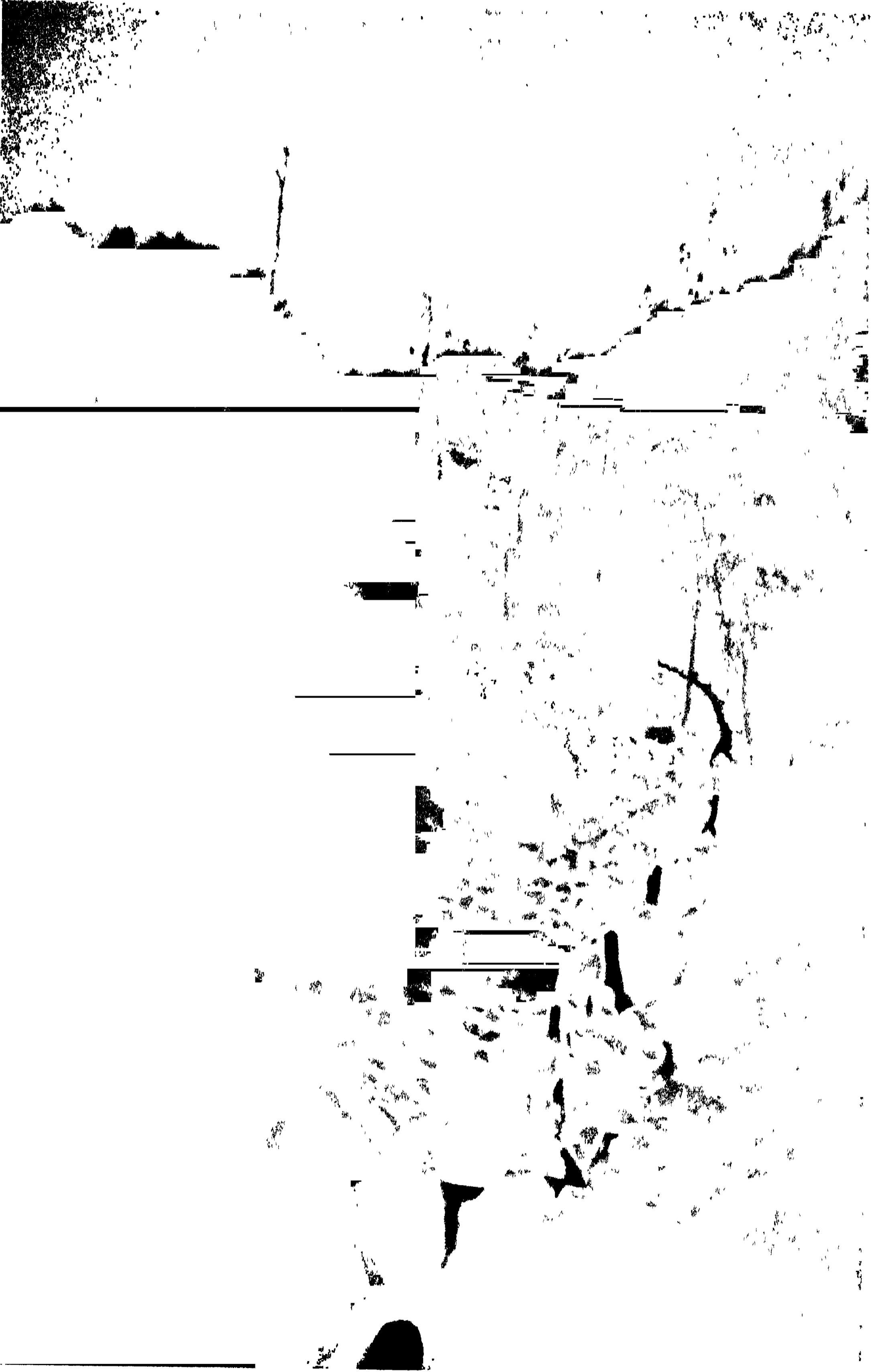
উনকোটা তীর্থের
প্রাচীন ও আধুনিক
অবস্থা ।

* ভবিষ্য পুরাণস্থ ব্রহ্মখণ্ডের ১৯শ অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

“মেঘানদ্যা পূর্বকচ্ছে দ্বিসহস্র ব্যতীক্রমে ।

কপিল লিঙ্গ সন্নিধৌ গ্রামোহি নব পালকঃ ।”—৪২ শ্লোক ।

অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকোক্ত মেঘা নদীর পূর্বতীরবর্তী কপিল লিঙ্গ ও উনকোটা তীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ অভিন্ন । এই ধারণা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । আসামস্থ কপিলেশ্বরে স্থাপিত লিঙ্গের নাম “সিদ্ধেশ্বর শিব” । উনকোটা তীর্থ ব্যতীত তদঞ্চলে অল্প কোন স্থানে কপিল মুনি স্থাপিত অল্প শিব নাই । সুতরাং এই তীর্থের শিবই “কপিল লিঙ্গ” নামে অভিহিত হওয়া সম্ভবপর ।



উষ্ণৰ জল-প্ৰপাত ।
(উল্লেখ) ।

নর-খাদক ও উগ্র স্বভাব কুকির আবাস ভূমি ছিল ; সুতরাং পথকষ্ট এবং কুকিভীতি, এতদুভয় কারণে এই তীর্থের অবনতি ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না । এই স্থানের অধিষ্ঠাতা মহর্ষিগণের তিরোধানের পর, এই তীর্থের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত কোনরূপ যত্ন হইবার অথবা সমাগত যাত্রীবৃন্দের সুবিধার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকিবার প্রমাণ নাই । এই সকল কারণেই ক্রমশঃ তীর্থটা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে ।

অধুনা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসাদে এই তীর্থে যাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু এতদ্বারা ইহার অতীত গৌরব পুনরাগত হইবার আশা করা যাইতে পারে না । ভবিষ্যকালে আবার কখনও যদি কপিল অথবা মনুর স্থায় কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তাঁহার পবিত্র চরণ স্পর্শে, লুপ্ত তীর্থ-মাহাত্ম্য পুনর্ববার জাগ্রত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু সে দিন সূদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয় ।

ডম্বুর বা ডুম্বু তীর্থ ।

বিজয়মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

“নরপতির দুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রম ।

ডুম্বু তীর্থে জন্ম জ্যেষ্ঠ ডুম্বুর নাম উত্তম ॥”

ডুম্বু তীর্থে জন্মহেতু বিজয়মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম “ডুম্বুর ফা” ডুম্বুর তীর্থের অবস্থান হইয়াছিল । এই ডুম্বু তীর্থ সাধারণতঃ ‘ডম্বুর’ নামে অভিহিত ।
নির্ণয় । ইয়ুরোপীয়গণ ইহাকে ডুমরি ফল (Dumeria-Fall) বলে ; ইহা একটা সূদৃশ্য জলপ্রপাত । এই প্রপাত হইতে গোমতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । আঠারমুড়া পর্বত জাত সাইমা নদী এবং লংতরাই পর্বতোৎপন্ন রাইমা নদী গোমতীর আদি মাতা, তাহার নিম্ন দেশস্থ আরও অনেক নদী এবং ছড়া আত্ম-সমর্পণদ্বারা গোমতীর পুষ্টিবিধান করিয়াছে । যেই জলপ্রপাত হইতে গোমতী বহির্গত হইয়াছে, সেই প্রপাতের নাম ডম্বুর । অনেকে বলে, প্রপাতের আকৃতি মহাদেবের হস্তস্থিত ডম্বুরের আকারবিশিষ্ট বলিয়া, ইহার নাম ডম্বুর হইয়াছে ; “ডুম্বু” শব্দ ‘ডম্বুর’ শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয় ।

স্থানটা অতি নির্জন ; এই স্থানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, ডম্বুর তীর্থের সংক্ষিপ্ত তিনিই মোহিত হইয়াছেন । প্রস্তরময় স্থানের নানাদিক হইতে
বিবরণ । আগত জলপ্রপাতের জলদ্বারা সর্ব্ব নিম্নে মণ্ডলাকার, শত হস্ত পরিমিত ব্যাসের একটা কুণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে । এই কুণ্ডের গভীরতা বিশ হস্ত হইবে । ইহার উপরে ক্রমাগত আরও কয়েকটা কুণ্ড আছে ; এবং প্রত্যেক কুণ্ডের বিশেষ বিশেষ নাম আছে । সাধারণতঃ প্রথমোক্ত কুণ্ডকে ‘রাণী কুণ্ড,’ চতুর্থ কুণ্ডকে ‘কাছুরা কুণ্ড’ এবং আর একটা কুণ্ডকে ‘কমলা কুণ্ড’ বলা হয় । এই

সুদৃশ্য জলপ্রপাত পূর্বকালে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল । এ স্থানে অনেক যাত্রী সমাগম হইত এবং ত্রিপুরেশ্বরগণ অনেক সময় পরিবারবর্গসহ এই স্থানে যাইয়া স্নান দানাদি করিতেন । এই সময় মহারাণীগণ যেই কুণ্ডে স্নান করিতেন তাহা ‘রাণী কুণ্ড’ এবং কাছিয়া রাণীগণের স্নানের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কুণ্ড ‘কাছিয়া কুণ্ড’ নামে অভিহিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ মহারাজ ধনুমাণিক্যের মহিষী, মহারাণী কমলা মহাদেবী হইতে ‘কমলা কুণ্ড’ নাম হইয়া থাকিবে ।

এই স্থানে ক্রমান্বয়ে সাতটি কুণ্ড অবস্থিত থাকায় অনেকে ইহাকে ‘সাত ওশুর’ বা ‘সাততারা’ বলে । ক্রমে নিম্ন সাতটি স্তরবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর দিয়া রজতনিভ জলরাশি অনুচ্চ শব্দে গড়াইয়া পড়ায়, স্থানটা বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে ।

কাল প্রভাবে, এই সুরম্য ও বিজন স্থানের তীর্থ-জনিত সম্মান বিনষ্ট হইয়া থাকিলেও, মনোহারিত্বের নিমিত্ত এখনও ইহা সর্বজন সমাদৃত । কবি এবং চিত্রকরণের এই স্থান অশ্রু দর্শনীয় বলিয়া মনে হয় ।

সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ ।

সামরিক বল ।

মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈন্যবল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল । তিনি বার কোটি সৈন্য লইয়া মুসলমানগণের সৈনিক বিভাগের প্রণালী অবলম্বনে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন । *

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সামরিক বলও বিশেষ দৃঢ় ছিল । বঙ্গাভিযান বিজয়মাণিক্যের
বঙ্গাভিযান । কালে তাঁহার সর্গীয় নৌ-বহরে পঞ্চ সহস্র নৌকা ছিল । এতদ্ব্যতীত সহস্র অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক গোলন্দাজ ও তীরন্দাজ সহ ছাব্বিশ হাজার পদাতি সৈন্য গমন করিয়াছিল । তাঁহার অশ্বারোহী দলের

* “গৌড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার ।

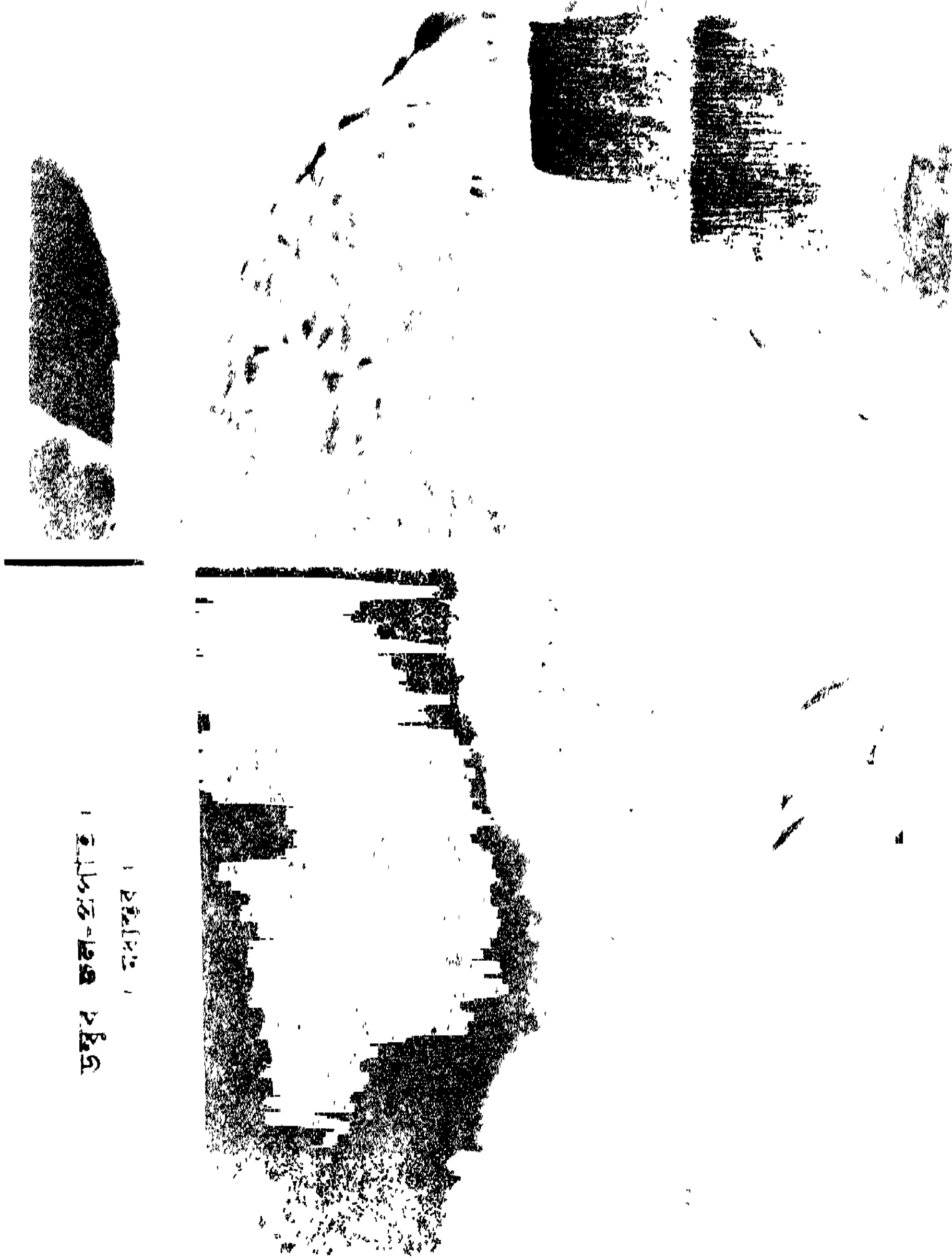
বার কোটি পদাতি নৃপ করয়ে প্রচার ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

এই সময় ত্রিপুর রাজ্যবাসী পুরুষ মাত্রই যোদ্ধা এবং ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল । সে কালে রাজ্যের সীমাও বহু বিস্তৃত ছিল । সৈন্যগণের সকলকে সর্বদা কার্যে উপস্থিত থাকিতে হইত না, কিন্তু প্রয়োজন কালে সমরার্থ উপস্থিত হইতে সকলেই বাধ্য ছিল ।

ডম্বুর কল-প্রপাত।

। নিমন্তর।



ডম্বুর কল-প্রপাত।

। নিমন্তর।



ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বেড়ার নৌ-বিতানের আদর্শ

এক সহস্র জলপথে গমন করিয়াছিল, ইহারা রাজার শরীর রক্ষক। এতৎসম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;—

“এই অবকাশেতে বিজয়মণিক্য রাজা ।
বঙ্গদেশে চলিলেক মৈয়া মৈয়া প্রজা ॥
পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন ।
এক সহস্র অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন ॥
নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ ।
আর নৌকায় রাখিলেন পদাতি সমাজ ॥” *

মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুলফজল স্বকৃত “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

“ভাটী প্রদেশের + সহিত সংলগ্ন একটা স্বাধীন রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা)। আর তাহার অধিপতির নাম বিজয়মণিক (মণিক্য)। * * * এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে ; কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।” ‡

ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, বিজয়মণিক্যের সঙ্গে যে পাঁচ সহস্র রণ-তরী গিয়াছিল, তন্মধ্যে পিনিশ (কোষনৌকা), পান্সী, কোন্দা (১),

* এই অভিধান সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লঙ্ সাবেব বলিয়াছেন ;—

“At this time Bijoya Raja of Tripura marched to Bengal with an army composed of 26,000 infantry, and five thousand horses besides artillery ; he went by 5,000 boats along the streams Brahmaputra and Lakhi to the Padma.” J. A. S. B.—V.—XIX.

+ হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনা নদের তীর পর্যন্ত নিম্নভূমিকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ‘ভাটী’ নামে পরিচিত করিয়াছেন। আধুনিক জেলা চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাথরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

‡ আবুলফজল ‘অশ্ব অতি বিরল’ বলিয়াছেন। বিজয়মণিক্যের অভিধান কালে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে থাকিবার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, বিজয়মণিক্য দশ হাজার পাঠানদ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করিয়াছেন, যথা ;—

“তৎপরে দশ হাজার পাঠান আনিয়া ।
অশ্বারোহী পদে রাখে নিযুক্ত করিয়া ॥”

এরূপ অবস্থায় ‘অশ্ব বিরল’ বলা যাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যিনি এক সহস্র হস্তী সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তিনি যে বঙ্গেশ্বর অপেক্ষাও অধিক পরাক্রান্ত ছিলেন, এ কথা স্বীকার্য।

(১) কোন্দা ;—এই নৌকা বৃহদাকারের বৃক্ষ খোদাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে কাঠের জোড়া নাই এবং লোহার পেড়াগ বা পাতাম ব্যবহার করা হয় না।

মরকোষ (১), লাখাই (২), সরঙ্গা (৩), পলোয়ার (৪) এবং ওথার (৫) ইত্যাদি নানা জাতীয় নৌকা ছিল ।

উদয়মণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ কিয়ৎ পরিমাণে দুর্বল ছিল । এই দুর্বলত্বের সময়ও পাঠানের আক্রমণ হইতে চট্টগ্রাম কালের সৈনিক বল । রক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ান্ন হাজার সৈন্য ও তিন হাজার সেনাপতি সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় । রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ ।
সেনাপতি করে তাকে, সৈন্তের রক্ষণ ॥
বায়ান্ন হাজার সৈন্ত তার সঙ্গে দিল ।
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল ।”

দ্বিতীয় লহর,—উদয়মণিক্য খণ্ড, ৬৯ পৃঃ ।

যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার সেনাপতি যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহার সামরিক বল তুচ্ছ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য । প্রাচীন কালে ত্রিপুরবাহিনী যে বিশেষ দৃঢ় এবং পরাক্রান্ত ছিল, এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ অতঃপর পাওয়া যাইবে ।

ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় লোক নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । তন্মধ্যে ত্রিপুর এবং কুকিগণই রাজ্যের সৈনিক বিভাগের কামচারিগণের বিবরণ । মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল । মহারাজ বিজয়মণিক্যের শাসনকালে পাঠান জাতীয় একদল অশ্মারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হয় । এই সময় বিস্তর বঙ্গদেশীয় লোকও সৈনিক বিভাগে স্থান পাইয়াছিল । * ইহার পর,

(১) মরকোষ ;—ইহা চেপ্টা ও লী বিশিষ্ট এবং সুপ্রশস্ত নৌকা । ক্ষীণতোয়া পার্বত্য নদীতে চলাচল পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

(২) লাখাই ;—এই নৌকারও তলদেশ চেপ্টা (সমতল), এই জাতীয় নৌকার সম্মুখের গলই কিয়ৎ পরিমাণে ঘোড়ার মস্তকের আকৃতি বিশিষ্ট ।

(৩) সরঙ্গা ;—ইহা অতি বৃহদাকারের নৌকা । চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই জাতীয় নৌকার অধিক প্রচলন দেখা যায় ।

(৪) পলোয়ার ;—ইহা বৃহদাকারের সুপ্রশস্ত নৌকা । ঢাকার পলোয়ার নৌকা পূর্ব-বঙ্গে বিশেষ বিখ্যাত ।

(৫) ওথার ;—ইহা জেলেদের ব্যবহার্য্য সুদীর্ঘ এবং স্বল্প পাশবিশিষ্ট নৌকা । এই জাতীয় নৌকা খুব দ্রুতগামী ।

* “চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজ ।
দুই সহস্র চলিলেক সৈন্ত মহাতেজা ॥
চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান ।
প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহস্র বঙ্গ ষান ॥”

দ্বিতীয় লহর,—বিজয়মণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃঃ ।

সে কালের বাঙ্গালী যে হীন-বীৰ্য্য ছিল না, ইতিহাসে তাহার বিস্তর নিদর্শন আছে ।

মিথিলাবাসী, ব্রাহ্মণ জাতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ব্যক্তি—ইন্দ্রমাণিক্যকে সাক্ষী-গোপাল রাজা করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন । এই সময় তিনি আড়াই শত মৈথিল যোদ্ধা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাইয়াছিলেন । *

মহারাজ বিজয়ের আর এক অদ্ভুত কার্যের নিদর্শন পাওয়া যায় । তিনি জয়ন্তিয়া অভিযানে জয়ন্তিয়াপতির প্রতি রুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত হাঁড়ি সৈন্ত । করিবার অভিপ্রায়ে দ্বাদশ সহস্র হাঁড়ি জাতীয় লোকদ্বারা এক সৈনিক দল গঠন করিয়া জয়ন্তিয়া রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । † তদবধি হাঁড়িগণও সৈনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় । ইহারা লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক ছিল । ঐতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে ।

সেনানায়ক ।

পূর্বকালের ন্যায় এই সময় ভ্রাতা অথবা জামাতাকে সেনাপতি করিবার সেনানায়ক নির্বাচন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকিলেও, সাধারণতঃ রাজার আত্মীয়কে প্রধান প্রণালী । সেনাপতি করা হইত । ধন্যমাণিক্য স্বীয় শশুর দৈত্য নারায়ণকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন । অনন্তমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণ তাঁহার শশুর ছিলেন । উদয়মাণিক্য স্বীয় ভগ্নিপতি রণাগণ নারায়ণকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায় । জয়মাণিক্যের কালেও তিনিই প্রধান সেনাপতি ছিলেন । ইহার পরবর্ত্তী কালে রাজপুত্রদিগকে সেনাপতি করিবারও প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে ।

* “এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয় ।

আড়াই শত যোদ্ধা আনি মিথিলা রাখয় ॥”

ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড,—৩৭ পৃঃ ।

† হাঁড়িগণের যুদ্ধ যাত্রার কিঞ্চিৎ আভাস নিয়ে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“দ্বাদশ হাজার হাঁড়ি হাতে কোদাল লৈয়া ।

হাঁড়িতে ডগর বাণ্ড চলে বাজাইয়া ॥

চারি মাস হাঁড়ি সৈন্তে পাইয়া বেতন ।

মস্ত শূকর খাইয়া করিলেক রণ ॥

ঘুর ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায় ।

সাজনি সাজিয়া সব হাঁড়ি সৈন্ত যায় ॥

* * * *

চেমস ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে ।

শূকর খেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে ॥” ইত্যাদি ।

বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৪৪ পৃঃ ।

দুঃখের কথা এই যে, রাজ-আত্মীয়গণ সেনাপতি হইয়া কোন কোন ব্যক্তি
যে রূপ প্রাধান্য-প্রয়াসী এবং বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন, নিঃসংশয় ব্যক্তিগণ তদ্রূপ
করেন নাই । ইহাদের দুষ্কার্যের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

সেনাপতিগণের পদ মর্যাদানুসারে, সরদার, হাজারী বা হাজরা, বড়ুয়া ও
সেনাপতিগণের উপাধি । নারায়ণ ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত ছিল । কোন কোন সেনাপতির
খা উপাধি থাকিবার প্রমাণও আছে ; ইহারা পার্বত্য জাতীয়
ছিলেন । মহারাজ ধনুমানিক্যের শাসনকালে সরদার ও হাজারী উপাধির প্রচলন হয় ।
রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“সরদার করিলেক অর্ক সৈন্য দিয়া ।

হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড,—১২ পৃঃ ।

এক হাজার সৈন্য ষাঁহার অধীনে থাকিত, তিনি হাজারী উপাধি লাভ
করিতেন । ইহাদিগকে হাজরাও বলা হইত । জয়মানিক্য খণ্ডে লিখিত
আছে ;—

“ফৌজের হাজার ঘর, চাটিগ্রাম গিছে ।

রসান্দমর্দন নারায়ণের সঙ্গেতে রহিছে ॥”

বড়ুয়া উপাধিও ধনুমানিক্য কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে রাজমালা
বলেন ;—

“শ্রীধনুমানিক্য রাজা তদবধি সেনা ।

বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড,—১২ পৃঃ ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে রাজ্যময় সকলেই যোদ্ধা এবং সৈনিক
পার্বত্য প্রদেশে সৈন্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল । সেকালে পার্বত্য প্রধান ব্যক্তিগণ
রক্ষার প্রণালী । তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাগণের নায়করূপে নির্বাচিত হইতেন, এবং
তাঁহাদিগকে সরদার, হাজারী ও বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত ।
কালক্রমে পার্বত্য জাতি সমূহ সৈনিক বিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও প্রধান
ব্যক্তিদিগকে সৈনিক বিভাগের প্রচলিত উপাধি প্রদানের প্রথা রহিত হয় নাই ।
তাঁহাদিগকে সরদার, হাজারী, সেনাপতি ও বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা
অত্যাধি চলিয়া আসিতেছে । এই সকল উপাধি বর্তমানকালে কেবল পূর্ব স্মৃতি
উদ্বোধক রাজদত্ত সন্মানের নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রাজধানীতে পার্বত্য সিপাহীদ্বারা সংস্থাপিত গারদের এবং পার্বত্য প্রদেশস্থ
বিনন্দিয়া সৈন্য ও সৈনিকগণের পরিচালনের ভার ষাঁহার হস্তে অর্পিত হইত, তিনি
নাজির উপাধি । ‘নাজির’ উপাধি লাভ করিতেন । মহারাজের নিকট সম্পর্কিত
ব্যক্তিগণের প্রতি এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে । এই শ্রেণীর সৈন্যগণ সাধারণতঃ

“বিনন্দিয়া সৈন্য” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বর্তমানকালে বিনন্দিয়াগণ পার্বত্য অঞ্চলে, কিয়ৎ পরিমাণে পুলিশের কার্যও করিয়া থাকে । *

প্রধান সেনাপতিগণের ‘নারায়ণ’ উপাধি ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

এই উপাধি ধন্যমানিক্যের সময়ে আরম্ভ হইয়া সুদীর্ঘ কাল নারায়ণ উপাধি ।

প্রচলিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় । মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

“ভাটি রাজ্যের সহিত সংলগ্ন একটা স্বাধীন রাজ্য আছে । সেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা (ত্রিপুরা) । * * * * সেই রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ “নারায়ণ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।”

আবুল ফজলের এই উক্তি অশ্রুত নহে ; কিন্তু তাঁহার ভ্রম জন্মিবার একটা কারণ ছিল । সেকালে নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট প্রধান সেনাপতিগণই রাজ্যশাসন এবং মন্ত্রীত্ব করিতেন । রাজপুত্রগণ সেনাপতি পদে বরিত হইয়া “নারায়ণ” উপাধি লাভ করিবার দৃষ্টান্তও অনেক আছে । এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়াই আবুল ফজল উক্ত উপাধি “আমীর ওমরাহ”গণের লভ্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রধান সেনাপতিগণের উপাধি । রাজমালা দ্বিতীয় লহরে রণচতুর নারায়ণ, রসাজ্জমর্দন নারায়ণ, দৈত্য নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ, বিজয়চুল্লভ নারায়ণ, গোপীপ্রসাদ নারায়ণ, রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ (ইহার নাম ছিল ভাঙ্গিল ফা), † আণ্ডুয়ান নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, গরুড়ধ্বজ নারায়ণ, সমরজিৎ নারায়ণ ও রাজবল্লভ নারায়ণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই সেনাপতি ছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকের হস্তে শাসন ভারও ছিল । রাজমালা তৃতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, অমরমাণিক্য তাঁহার পুত্র চতুর্দশকে সেনা নেতৃত্বে বরণ করিয়া ‘নারায়ণ’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা ;—

“অমরাবতী মহাদেবী সতী পতি মতি ।
তান গর্ভে চারি পুত্র যোগ্যবান্ অতি ॥
রাজচুল্লভ নারায়ণ, রাজধর ধীর ।
অমরচুল্লভ নারায়ণ, যুঝার সিংহবীর ॥
চারি পুত্র নৃপতির পদবী নারায়ণ ।
সিংহাসনে বসে রাজা অতি সুশোভন ॥”

অমরমাণিক্য খণ্ড ।

* এতৎসম্বন্ধে কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন,—“গভর্নমেন্টের পুলিশ পদাতিগণের স্ত্রায় “বিনন্দিয়া” আখ্যা বিশিষ্ট ত্রিপুরাপতির এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা ছিল । ইঁহাদের সরদার নাজির উপাধি প্রাপ্ত হইতেন । মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ এই নাজির পদ লাভ করিয়াছেন ।”
কৈলাস বাবুর রাজমালা—১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৪৯ পৃঃ ।

† “ভাঙ্গিল ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ ।

কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ ॥”

অমরমাণিক্য খণ্ড ।

তৃতীয় লহরে 'নারায়ণ' উপাধিধারী আরও অনেক সেনাপতির নাম সন্নিবিষ্ট
রহিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 'নারায়ণ' উপাধি সম্বন্ধীয় বিশেষ
বিবরণ অতঃপর প্রদান করা যাইবে।

এতদ্ব্যতীত এক শ্রেণীর সৈনিকের 'খাড়াইত' উপাধি ছিল, ইহাদের সংখ্যাও
খাড়াইত উপাধি। নিতান্ত কম ছিল না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান কালে
তাহার সঙ্গে দুই সহস্র খাড়াইত থাকিবার কথা রাজমালায় উল্লেখ
আছে। যেই বলশালী ব্যক্তি উদয়পুরস্থিত সুবিশাল ধনুসাগর * সাতবার প্রদক্ষিণ
করিতে সমর্থ হইত, তাহার উপাধি হইত 'খাড়াইত'। নিম্নোক্ত বিবরণ দ্বারা
খাড়াইত শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যাইবে ;—

“মহা খাড়াইত তারা দুই সহস্র পাইক ।
খড়্গ চন্দ্র জাঠী হাতে দেখি ভয়ানক ॥
সাতবার ধনুসাগর ফিরিতে যে পারে ।
সেই জনা তার নাম খাড়াইয়া ধরে ॥
দিবারাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী ।
বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

সেকালে সেনাপতিগণ যুদ্ধ জয় কিম্বা সাহসের পরিচায়ক কোন কার্য করিলে,
সৈনিক বিভাগে গৌরব তাহা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এক একটা উপাধি
সূচক উপাধি। প্রদানদ্বারা গৌরবান্বিত করা হইত। এ স্থলে তদ্রূপ দুই একটা
উপাধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসনকালে, রসান্দ
(আরাকান) প্রদেশের কিয়দংশ বিজেতা 'রসান্দমর্দন নারায়ণ' উপাধি লাভ করিয়া-
ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“রাধু ছত্রশিক রাজা আমল করিল ।
রসান্দ জিনিয়া কিল্লা পুঙ্গবী খনিল ॥
নিজ রসান্দ লইতে না পারে সেনাপতি ।
রসান্দমর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড,—২৪ পৃঃ ।

আর এক সেনাপতি গোড়ের সহিত বারম্বার সংগ্রাম করিয়া 'গরুড়ধ্বজ'
আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন ; যথা ;—

“গোড় সৈন্য সঙ্গে তার বহু ছিল রণ ।
গরুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন ॥”

উদয়মাণিক্য খণ্ড ।

* এই সাগরের দৈর্ঘ্য ১০০০ হাজার গজ এবং প্রস্থ ২৭০ গজ ।

যে ব্যক্তি সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের মস্তক ছেদন করিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি 'সাহস নারায়ণ' উপাধি পাইয়াছিলেন । * এক সেনাপতি বিশেষ দক্ষতার সহিত হস্তী খেদার কার্য সম্পাদন ও হস্তী ধৃত করায় "গজভীম নারায়ণ" উপাধি লাভ করেন । এবম্বিধ অনেক উপাধির উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায় ; ইহার কোন উপাধিই নিরর্থক নহে । বৃটিশ গভর্নমেন্ট, বিজয়ী সৈন্যাদিকদিগকে বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন, ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত উপাধি বৃটিশ শাসনের অনেক পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল ।

যুদ্ধান্ত ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, সেকালে সৈনিক বিভাগে যুদ্ধান্তের প্রকার ভেদ । ধনুর্বাণ, খড়গ, চর্ম্ম (ঢাল), জাঠা, বন্দুক এবং কামান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত । ইহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ।

- (১) "দুই সহস্র পদাতি আসিল ধনুঃসরে ।"
ধনুর্মাণিক্য খণ্ড,—১৫ পৃঃ ।
- (২) "দুই সৈন্ত আগু হৈয়া সংগ্রাম মাঝার ।
তীর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়গ ধার ॥"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৪৭ পৃঃ ।
- (৩) "তিন সহস্র ত্রিপুরগণ খড়গ চর্ম্ম লৈয়া ।
কাটয়ে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া ॥"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৪৮ পৃঃ ।
- (৪) "নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ ।
আর নৌকার রাখিলেক পদাতি সমাজ ॥"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৫৪ পৃঃ ।
- (৫) "খড়গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৫৮ পৃঃ ।
- (৬) "ভাঙ্গিল ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ ।
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ ॥"
জয়মাণিক্য খণ্ড,—৭১ পৃঃ ।

ইহা সম্পূর্ণ কামান বন্দুকের যুগ নহে ; ধনুর্বাণ ও খড়গ চর্ম্মের সহিত কামান বন্দুক ব্যবহৃত হইত । কিন্তু এই সময় কোন শক্তিরই আগ্রহ অস্ত্রের

* "রণাগণ মস্তক কাটিল বেই পাইকে ।

সাহস নারায়ণ খ্যাতি করিলাম তাকে ॥"

জয়মাণিক্য খণ্ড,—৭৬ পৃঃ ।

সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না ; তাহা থাকিলে ধনুর্বাণ বা জাঠা, শূল লইয়া রণক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব হইত । সেকালে কেবল ত্রিপুর রাজ্যেরই এরূপ অবস্থা ছিল না ; ত্রিপুরার প্রবল-প্রতিযোগী মুসলমানগণও কামান, বন্দুকের সঙ্গে ধনুর্বাণ ও খড়্গ চর্মাদি ব্যবহার করিতেন । গোড়েশ্বর হোসেন সাহ, ধর্ম্মাণিক্যের বিরুদ্ধে ১৪৩৭ শকে যে বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে “লক্ষিক পদাতি চলে, ধানুকী কটক ।” * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, পাঠানবাহিনী চট্টগ্রাম আক্রমণ করে । মমারক খাঁ নামক পাঠান সেনাপতি এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“মমারক খাঁ নামে ত গোড়েশ্বর শালা ।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা ॥
তিন সহস্র অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি ।
দশ সহস্র ঢালি চলে ধানুকি পদাতি ॥”

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পাঠান শাসনকালেও ধনুর্বাণের প্রচলন কম ছিল না । মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর সমর কালেও তীরের ব্যবহার ছিল । ইংরেজ শাসনকালেই এ দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহাদের উপর সংহরণ ভার অর্পণ করিয়া ধনুর্বাণ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে । সেকালের অক্ষয় কবচরূপী বর্ম্ম এবং চর্মাও ধনুর্বাণের সহগামী হইয়াছে ।

এই সময় হস্তী, ঘোড়া এবং নৌকা যুদ্ধ কার্যে ব্যবহৃত হইত । অশ্ব যুদ্ধ যান । কোন জাতীয় প্রাণী বা অন্তবিধ যান ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

অভিযান ও সমর ।

মহারাজ ধর্ম্মাণিক্য যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার শাসনকাল তেমনি শান্তিময় হইয়াছিল । তাঁহার বত্রিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল মধ্যে কোনরূপ অশান্তি বা যুদ্ধ বিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হয় নাই । †

ধর্ম্মাণিক্যের পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া সেনাপতিগণ কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন । প্রতাপ

* রাজমালা—ধর্ম্মাণিক্য খণ্ড,—২৫ পৃঃ ।

† “চিরকাল রাজ্য পালিলেক মহারাজা ।

শত্রু নাহি ছিল তার বঞ্চিলেক প্রজা ॥”

অধাশ্মিক এবং অত্যাচারী বলিয়া, অল্পকাল পরে সেই সেনাপতিগণ দ্বারাই রাত্রিকালে গোপনে নিহত হইলেন । সুতরাং তিনি যুদ্ধাদি সঙ্ঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই ।

অতঃপর প্রতাপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যমণিক্য একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসন লাভ করেন । ইনি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন । রাজ্য লাভের কয়েককাল পরে মহারাজ ধন্য, বঙ্গদেশ বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গাধীপের অধীনস্থ মেহেরকুল (১), পাটিকারা (২), গঙ্গামণ্ডল (৩), বগাসারি (৪), বেজুরা (৫), কৈলা (৬), ভানুগাছ (৭), বিষ্ণাউড়ি (৮), লঙ্গলা (৯), বরদাখাত (১০) প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন ।

খণ্ডল পরগণা অধিকার করিতে যাইয়া মহারাজ ধন্যকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল, খণ্ডলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিয়োজিত লস্করকে ধৃত করিয়া গোড়াধিপতির দরবারে উপস্থিত করিয়াছিল । উক্ত লস্কর গোড়েশ্বরের আদেশে হস্তী পদতলে পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জন করেন । এই কার্যের প্রতিশোধ যে ভাবে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা অতঃপর বর্ণিত হইবে ।

ইহার অল্পকাল পরে, থানাংচি নামক কুকি প্রদেশে একটা শ্বেতহস্তী ধৃত হইয়াছিল । ত্রিপুরেশ্বর এই হস্তী লইবার অভিলাষী হইলেন, কিন্তু কুকিরাজ তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না । এই সূত্রে তাঁহার সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় । ত্রিপুর সেনাপতি রায় কাচাগের কৌশলময়

(১) মেহেরকুল ;—গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী বিস্তীর্ণ পরগণা । কুমিল্লা নগরী এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত । প্রাচীনকালে মেহেরকুল ও পাটিকারা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ।

(২) পাটিকারা ;—মেহেরকুল পরগণার পশ্চিম সীমায় মন্নামতী পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, ইহা একটা বিস্তীর্ণ পরগণা ।

(৩) গঙ্গামণ্ডল ;—পাটিকারা পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগে এই পরগণা অবস্থিত ।

(৪) বগাসারি ;—মেহেরকুল পরগণার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত পরগণা বিশেষ । কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাজবন্দু আছে, তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে ।

(৫) বেজুরা ;—শ্রীহট্ট জেলাস্থ মাধবপুর থানার এলাকাভুক্ত একটা পরগণা ।

(৬) কৈলা ;—কৈলাসহর । এই স্থানে বর্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যের বিভাগীয় আফিস ইত্যাদি আছে । এই স্থান মনু নদীর তীরবর্তী ।

(৭) ভানু গাছ ;—ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত, কুলাউড়া থানার অধীনস্থ একটা পরগণা ।

(৮) বিষ্ণাউড়ি ;—ইহা একটা গ্রাম । এই স্থান কসবার পূর্বদিকে ও বিশালগড়ের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ।

(৯) লঙ্গলা ;—ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণা । আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টিলাগাও স্টেশন এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত ।

(১০) বরদাখাত ;—ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা । এই স্থান মেঘনা ও গোমতী নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত । এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশ্বরী বিশেষ প্রসিদ্ধ ।

বীরত্ব প্রভাবে, আট মাসের চেষ্টায় সেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র কুকি প্রদেশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত হয়। এই সময় ত্রিপুর রাজ্যের পূর্বসীমা ব্রহ্মদেশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্য, ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ) সেনাপতি রায় কাচাগের (চয়চাগের) চট্টগ্রাম অভিযান ও অধিনায়কত্বে বিস্তর সৈন্য লইয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন।
বিজয়। তিনি এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া, গোড় সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“তারপরে শ্রীধন্যমণিক্য নৃপবর ।
চাট্টগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর ॥
চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল ।
চাট্টগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥
গোড়ের যতক সৈন্য চট্টলেতে ছিল ।
শ্রীধন্যমণিক্য তাকে দূর করি দিল ॥”

ধন্যমণিক্য খণ্ড ।

‘কামরূপ কোপতা বিজয়ী’ গোড়েশ্বর হোসেন সাহ পরাজয় বার্তা শ্রবণ করিয়া হোসেন সাহের ত্রিপুরা স্কুদ্ধ হইলেন, এবং গোড়াইমল্লিক নামক সেনাপতির অধীনে আক্রমণ। বিস্তর সৈন্য ও হস্তী, ঘোড়া সহ বিপুল নৌ-বহর ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা গোমতী নদী পথে কুমিল্লায় আসিয়া মেহেরকুল দুর্গ আক্রমণ ও জয় করিল। ত্রিপুর সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া চণ্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মোগল বাহিনী তাহাদের অনুসরণ না করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল।

এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ কৌশলক্রমে পাঠান সৈন্যদিগকে যে ভাবে নদী স্রোতে ডুবাইয়া মারিয়াছিল, তদ্বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে। এ যাত্রায় গোড়াই-মল্লিক হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইত্যবসরে চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার গোড় সৈন্য আগমন করায়, ধন্যমণিক্য তথায় ধন্যমণিক্যের আইয়া উক্ত প্রদেশ সম্যকরূপে হস্তগত এবং পাঠানদিগকে আরাকান বিজয়। বিতাড়িত করিয়া এক সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন। অতঃপর রসাজ (আরাকান) রাজ্য আক্রমণ ও কিয়দংশ অধিকার করিয়া, বিজিত প্রদেশে এক কিল্লা স্থাপন ও পুঙ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিজয়ী সেনাপতিকে পূর্ব্বকথিত “রসাজমর্দন নারায়ণ” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই সেনাপতি রসাজের অবশিষ্টাংশ জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, মহারাজ ধন্যমণিক্য তাঁহার সাহায্যার্থ রায়কাচাগ (চয়চাগ) ও রায়কছম নামক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতিদ্বয়কে পাঠাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হোসেন সাহ পুনর্ব্বার ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত বিস্তর

সৈন্য প্রেরণ করায়, ত্রিপুরেশ্বরকে এ যাত্রায় আরাকান বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খৃঃ) কথা ।

হোসেন সাহ এবার বিপুল-বাহিনীসহ হৈতন খাঁ ও করা খাঁ নামক সেনাপতি-
 হোসেন সাহের দ্বয়কে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । এই অভিযানে পাঠানের
 পুনরাক্রমণ । এক শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র ঘোটক এবং এক লক্ষ পদাতিক
 সৈন্য ছিল ।

এই সময় ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চাগ) চট্টগ্রাম রক্ষার নিমিত্ত
 তথাকার সেনানিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন । পাঠান বাহিনীর আগমন বার্তা
 শ্রবণে তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য চট্টগ্রামে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ হৈতন খাঁয়ের
 বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন ।

এবার পাঠান সৈন্য গোমতী পথে না আসিয়া, সরাইল, কৈলারগড় (কসবা) ও
 বিশালগড়ের পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ জামির খাঁ গড় আক্রমণ করিল ।
 এই গড়ের অধিনায়ক খড়গ রায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষণে সমর্থ হইলেন না ।
 হৈতন খাঁ দুর্গ অধিকার করিলেন, পরাজিত ত্রিপুর সেনানী ছয়ঘরিয়া দুর্গের আশ্রয়
 গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন । হৈতন খাঁ প্রবল বিক্রমে এই দুর্গও আক্রমণ করায়
 দুর্গরক্ষক সেনাপতি গগন খাঁ তৃতীয় প্রহরকাল ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, পরিশেষে
 পাঠানের প্রবলবেগ সহ করিতে অপারগ হইয়া শ্রান্ত সৈন্যদলসহ রাজ্যমাটি (উদয়পুর)
 অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । এ দিকে বিজয়ী হৈতন খাঁ রাজধানী আক্রমণে উদ্যুক্ত
 হইলেন এবং ডোমঘাটের পথে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষায়
 রহিলেন ।

এবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চাগ) পূর্বব কোশল অবলম্বন
 করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছিলেন । তিনি পাঠানদিগকে
 বিনাগুদ্ধে পাঠান
 বাহিনীর পরাজয় । গোমতীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া-
 ছিলেন । এই সময় পলায়নপর হৈতন খাঁএর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল ।
 তিনি—

“ছকড়িয়ার ঘাটে গিয়া সত্য করি কৈল ।
 এত সৈন্য সঙ্গে আনি জিনিতে না পাইল ॥
 এহার অধিক সৈন্য যাহার যে হয় ।
 সে পুনি আসুক এথা পরম নির্ভয় ॥
 তা হইতে অল্প সৈন্য না আসুক হেথা ।
 শপথ করিল আমি এই সত্য কথা ॥
 যে সৰ পাঠান হয় যেই যোদ্ধা সব ।
 অল্প সৈন্তে যে বা আসে সে সব গর্দভ ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড,— ২৮ পৃঃ ।

হোসেন সাহ কর্তৃক তৃতীয় বার ত্রিপুরা আক্রান্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। হোসেন সাহের তৃতীয় এইবার মুসলমানগণ কৈলারগড় (জাজিনগর বা কসবা) দুর্গ আক্রমণ ও জয়লাভ। আক্রমণ করিয়াছিল। কৈলারগড়ের পশ্চিম দক্ষিণ দিক্তী এক মাইল দূরে, বিজয় নদীর তীরে পাঠান-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন অচ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু রাজমালায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। * এই সময় কৈলারগড়ের সন্নিহিত স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত ও ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন সাহের কুক্ষিগত হইয়াছিল, এরূপ বুঝা যায়; এবশ্বিধ অনুমানের প্রকৃষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে। স্ববর্ণগ্রামে অবস্থিত মসজিদের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, সুলতান হোসেন সাহের শাসন-কালে ইক্বাম মোজমাবাদের উজীর এবং ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্তা খওয়াস খাঁ ৯১৯ হিজরী (১৪২২ শকে) সেই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। † এই “ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্তা” বাক্যদ্বারাই ত্রিপুরার কিয়দংশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ‡

তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাস্ত হইয়া থাকিলেও তদ্রূপ ত্রিপুরার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইয়াছিল না এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই।

পাঠান সেনাপতি ছুটি খাঁএর অনুজ্ঞায় কবি শ্রীকর নন্দী ১৫৮৬ শকে অশ্বমেধ শ্রীকর নন্দীর তোষা-মোদ-প্রিয়তা। পর্ব রচনা করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ “ছুটিখানের মহাভারত” নামে অভিহিত হইয়াছে। হোসেন সাহের পূর্বেবক্ত অকিঞ্চিৎকর বিজয়ের সূত্র ধরিয়া, শ্রীকর নন্দী তাহার রচিত গ্রন্থের পুরোভাগে লিখিয়াছেন;—

“তান এ সেনাপতি লঙ্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥

* স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন;—

“কৈলারগড় সন্নিহিতে হোসেন সাহের সহিত মহারাজ ধনুমানিক্যের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, রাজমালা লেখক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় ইহার পরিণাম ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই, এ জন্যই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ৩য় অঃ।

† This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the Kingdom of Soloman, Allauddungawaddin Abil Muzaffar Hussain Shah—* * * * by the great and noble Khan, namely Khawac Khan, Governor of the land of Tipperah and Vazir of the District Muazzamabad,—may God preserve him in both worlds. Dated 2nd Robi II., 919 (7-6-1513).

J. A. S. B.—Vol. XII. I.,—P. P. 333-334.

এই খৃষ্টাব্দের অঙ্ক বিস্তৃত নহে। ৯১৯ হিজরীতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না, ১৫০১ খৃষ্টাব্দ হইবে।

‡ এই শিলালিপির বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

ত্রিপুর নৃপতি ষার ডরে এড়ে দেশ ।
 পৰ্ব্বত গঙ্ঘরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
 গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্মান ।
 মহা বন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ ॥
 অতাপি ভয় না দিল মহামতি ।
 তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥” ইত্যাদি ।

ইহা কবির আশ্রয়দাতাকে বীরেন্দ্র সমাজে উচ্চ আসন প্রদান করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত আর কিছু নহে । হোসেন সাহ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে বারম্বার পরাজিত হইবার কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; তাঁহার দুর্গতি ভোগের আরও অনেক কথা আছে, তাহা অতঃপর বলা হইবে । তৎসমুদয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, পূর্বেবক্ত বর্ণনা তোষামোদকারী কবির স্তাবকতা মাত্র ।

ধনুমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য ভুলুয়া প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর দেবমাণিক্যের ভুলুয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন ।
 ও চট্টগ্রাম বিজয় ।

ধনুমাণিক্য পাঠান আহবে লিপ্ত থাকি কালে, মঘগণ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল, দেবমাণিক্য তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া, হত-প্রদেশের পুনরুদ্ধার ও তথায় একটা থানা (সেনানিবাস) সংস্থাপন করেন ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য উত্তরদিকে শ্রীহট্ট এবং খাসিয়া (জয়স্তা) রাজ্যের বিজয়মাণিক্যের শ্রীহট্ট কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্টে এক সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন ।
 বিজয় বিবরণ । পূর্বক, সৈন্যাধ্যক্ষ কালানাজিরকে সেই দেশ রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

গৌড়েশ্বর সুলতান সুলেমান কররাণি, * ত্রিপুরা জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার শ্যালক ও সেনানায়ক মমারক খাঁকে (মতাস্তুরে মহম্মদ খাঁ), তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন । চট্টগ্রামে মমারক খাঁয়ের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈন্যগণ পরাস্ত ও পলায়নপর হইয়াছিল, পরে নব-বল সংগ্ৰহ করিয়া

* রাজমালার রচয়িতা গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই । কৈলাস বাবু বলিয়াছেন,—
 “কররাণি বংশীয় উড়িয়া বিজয়ী সুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম অধিকার জন্ত মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন ।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫৭ পৃঃ ।

এতৎসম্বন্ধে ত্রিপুর বংশাবলী পুথিতে পাওয়া যায়,—

“বঙ্গদেশের অধিকারী সোলেমান ছিল ।
 চট্টগ্রামের থানা আসি আক্রমণ করিল ॥
 মহম্মদ খাঁ সোলেমানের সেনাপতি ।
 তের হাজার সৈন্যসহ হৈল উপস্থিতি ॥” ইত্যাদি ।

বিক্রমপুরের মধ্যে গিয়া, কীর্তিনাশা * পাড়ি দিয়া,
 কলাকোপার গড়ে উত্তরিল ।
 কতদিন সেইখানে, রহিল আনন্দ মনে,
 যমুনা পাড় হৈয়ে শেষে গেল ॥
 ব্রহ্মপুত্র ভাটি বাইয়া, নসিরাবাদ গড় হৈয়া,
 মেঘনা নদী উজাইয়া গমন ।
 শ্রীহট্ট নগর মাঝে, উত্তরিল মহারাজে,
 দেখি লোক চমকিত মন ॥” ইত্যাদি ।
 ত্রিপুর বংশাবলী ।

রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ বিজয় সুবর্ণগ্রাম বিজয়ের পর, লক্ষ্মী ও ইছামতী অতিক্রম করিয়া পদ্মা নদীতে গিয়াছিলেন । ইছামতীর তীরবর্তী যাত্রাপুর নামক স্থানে কয়েককাল অবস্থান করিবার কথাও রাজমালায় পাওয়া যায় । তৎপর মহারাজ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া † কৈলারগড়ে গমন করেন । তথা হইতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন । শ্রীহট্ট হইতে তাহার পার্শ্ববর্তী নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, রাজধানী রাঙ্গামাটি নগরে প্রত্যাবর্তন করেন । এই যাত্রায় তিনি যে সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান অল্পায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল ।

শেষ জীবনে বিজয়মাণিক্যের কয়েক পরিমাণে দৌর্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল । এই সময় তিনি মঘদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম রক্ষা লইয়া বিশেষ মঘ জাতির সহিত সজ্জ্বধ । বিব্রত ছিলেন । রাক্ষিয়াং (আরাকান) ও রাশুবাসী মঘগণের সমবেত চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম কখনও ত্রিপুরেশ্বরের এবং কখনও বা মঘদিগের হস্তগত হইতেছিল । বিজয়লক্ষ্মী তাহার অক্ষয়িণী হইবেন, তাহা অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল ।

মহারাজ বিজয় যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসর খ্যাতনামা ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী রল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন,— “সাতগাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম ।

* ‘কীর্তিনাশা’ পদ্মানদীর অংশবিশেষের নাম । বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্তি চিহ্নগুলি উদরসাৎ করিয়া ‘কীর্তিনাশা’ নাম লাভ করিয়াছে । ইহাদের শেষ কীর্তি রাজাবাড়ীর মঠ ১৯২৩ খৃঃ অব্দে এই নদীগর্ভে লীন হইয়াছে । সলরজঙ্গ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়া বাহাদুরের বাসভবন সহ অতুলনীয় কীর্তিকলাপও এই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত উভয় তীরবর্তী কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কীর্তি যে এই সর্কগ্রাসিনী নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই ।

† লোহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র নদের) পশ্চিমভাগস্থ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মহারাজ বিজয় গমন করিয়াছিলেন, রাজমালায় এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;—

“লোহিত্য পশ্চিমভাগে বসতি জাহ্নবী ।

পূর্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

এই সময় রাক্ষিয়াং ও রাম্বুবাসী মঘদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । ত্রিপুরা পতির দুর্বলতায় চট্টগ্রাম বা পোর্টগ্রেণ্ডা বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হস্তগত হয় ।” *

বিজয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র অনন্তমাণিক্য ত্রিপুরা অনন্তমাণিক্যের হত্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন । দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার পর বিবরণ । অনন্তের শশুর ও প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । অনন্তমাণিক্যের অল্পকাল ব্যাপী শাসন সময়ে কোন সংগ্রাম উপস্থিত হয় নাই ।

সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনারূঢ় উদয়মাণিক্য ও হইলেন (১৪৯৪ শক—১৫৭২ খৃঃ) । গোড়েশ্বর শুনিলেন, দায়ুদ সাহ । ত্রিপুরার রাজবংশ বিনাশ করিয়া ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন । ইহাই চট্টগ্রাম বিজয়ের উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন । এই যুদ্ধ সঙ্ঘটনের শকাঙ্ক রাজমালায় নাই । পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, উদয়মাণিক্য ১৫৭২ খৃঃ অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, এই কালে সুলেমান কররাণির পুত্র, শেষ পাঠান শাসনকর্তা দায়ুদ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ইনি ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়া বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন । এবং এই যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দিল্লীর আনুগত্য স্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য হন । এই দায়ুদকেই চট্টগ্রাম আক্রমণকারী বলিয়া মনে হয় । পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন, উদয়মাণিক্য ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । মিঃ জে, জি, কামিং, সি-আই-ই, এবং মিঃ ই, এফ, সেণ্ডিস্ কৈলাস বাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই মত অশ্রান্ত নহে । রাজমালায় স্পর্শটাক্ষরে উল্লেখ আছে, মহারাজ উদয় ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ অব্দে) রাজা হইয়াছিলেন । † কৈলাস বাবু আরও বলেন,—

“এই সময় মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হন । এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উদয়মাণিক্য তাহাদিগকে পথি মধ্যে অবরোধ করিবার জন্ত বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন ।” ‡

* From Satagan I travelled by the country of the King of Tippera, with whom the Mogen have almost continual wars. The Mogen which be of the Kingdom of Recon and Rame, be stronger than the King of Tippera. So that Chatigan, or Portogrando, is often times under the King of Recon.—(Rolph Fitch.)

† “গোড়েশ্বরে শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ ।

চৌদ্দশ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন ॥”

উদয়মাণিক্য খণ্ড,—৫৯ পৃঃ ।

‡ কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৫ম অঃ, ৬৫ পৃঃ ।

কৈলাস বাবুর কথিত ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে উদয়মণিক্য রাজ্য লাভ করিলে, তাঁহার শাসনকালের প্রথম ভাগে মোগলগণ কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সম্ভবপর হইত। তাঁহার এই উক্তিও ভ্রমসঙ্কুল। মোগল কর্তৃক উদয়মণিক্য আক্রান্ত হন নাই, পাঠান কর্তৃক আক্রমণের কথা রাজমালায়ই পাওয়া যায়। * রেভারেণ্ড লড্ সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। † স্মরণ্য কৈলাস বাবুর নির্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই যুদ্ধে উদয়মণিক্য, স্বীয় ভগিনীপতি ও প্রধান সেনানায়ক রণাগণ ^{উদয়মণিক্যের} ^{পরাজয়।} নারায়ণের অধীনে তিন হাজার সেনাপতি সহ বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‡ সেনাপতিগণের মধ্যে চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, আণ্ডয়ান নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা বীর পুরুষ গিয়াছিলেন; হস্তী, ঘোড়াও অনেক ছিল। বৃদ্ধ রণাগণ একবার পাঠানদিগকে জয় করিয়া গর্বিবত হইয়াছিলেন। তাই তিনি গর্বেবান্নত শিরে, রাত্ৰিকালেই পাঠান শিবির আক্রমণ জন্য যাত্রা করিলেন। তৎকালে চতুর্দিকে শৃগাল দল উচ্চরব করিয়া নিস্তব্ধ দিগ্গন্তল মুখরিত করিতেছিল, বৃক্ষ ডালে গৃধসমূহ পাখা ঝাড়িতেছিল এবং মুহূর্মুহুঃ উল্কাপাত হইতেছিল। এই সকল অমঙ্গলসূচক ঘটনা দর্শনে সেনাপতিগণ, রাত্ৰিকালে শত্রু সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু গর্বিবত রণাগণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পাঠানগণ প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া, ত্রিপুর বাহিনীর অজ্ঞাতসারে পশ্চিমধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ত্রিপুর সৈন্যগণ এই অভাবনীয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, তাহাদের অধিকাংশ পাঠান হস্তে নিহত হইল এবং কতক পলায়ন করিল। রণাগণ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অরণ্যপথে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুুরার চল্লিশ সহস্র সৈন্য ক্ষয়

* “খণ্ডলে ত গিয়া তারা গড় করি রৈল।

পাঠান আইসে বলি সাবহিতে ছিল ॥”

উদয়মণিক্য খণ্ড—৭০ পৃঃ।

† As the Pathans were marching on Chittagong.

J. A. S. B.—Vol. XIX.

‡ “রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ।

সেনাপতি করে তাকে সৈন্তের রক্ষণ ॥

বায়ান্ন হাজার সৈন্ত তার সঙ্গে দিল।

তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল ॥”

উদয়মণিক্য খণ্ড,—৬৯ পৃঃ।

হইয়াছিল, পাঠানের নিহত সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চ সহস্র । * ত্রিপুরার একুশ গুরুতর ক্ষতি পূর্বের আর কখনও হয় নাই ।

এই যুদ্ধের পর গোড়েশ্বর চট্টগ্রামের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে পিরোজ খাঁ আলি ও জামাল খাঁ পল্লি নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে আরও বিস্তর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রাম পুনর্ববার আক্রমণ করিয়া, বিপুল বিক্রমে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারও বিজয়লক্ষ্মী পাঠানের অক্ষয়িনী হইলেন । এই যুদ্ধেই উদয়মণিক্যের চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের আশা নিশ্চল হইয়াছিল ।

রাজার যুদ্ধে গমন ।

পূর্বকালের ন্যায় এই সময়ও রাজগণের স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রার নিয়ম ছিল । পূর্ব রাজগণের শৌর্য্য । কথিত বিবরণ সমূহ আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাজ ধন্য বারম্বার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ধন্যমণিক্যের পুত্র দেবমণিক্য স্বয়ং ভুলুয়া হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করেন । বিজয়মণিক্যের সময়ে পাঠান সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, মহারাজ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন । তিনি দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া পশ্চিমে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা জয় করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন, মহারাজ বিজয় এই অভিযান কালে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । এতদ্ব্যতীত রাজকুমারগণের সেনাপতিরূপে যুদ্ধযাত্রার দৃষ্টান্ত অনেক আছে । স্থলকথা, সেকালে রাজগণ রাজ্যভোগ-বিলাসী মোমের পুতুল ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই সাহসী এবং বলবীর্য্যশালী বীরপুরুষ ছিলেন । দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল শয্যা অপেক্ষা সমরক্ষেত্রে শয়ন তাঁহাদের অধিকতর স্পৃহনীয় ছিল । সেকালে ত্রিপুরার ক্ষত্রবীর্য্য মূর্ত্তভাবে আবির্ভূত হইবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে । বারম্বার ঘাত-প্রতিঘাত সহ করিয়াও ত্রিপুরেশ্বরগণ যে ভাবে রাজ্যের স্বার্থ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল ।

সে কালে বিজিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । রাজমালায় এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আছে ।

* “পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল সে রণে ।

চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে ॥”

উদয়মণিক্য খণ্ড,—৭১ পৃঃ ।

এই ক্ষতি সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লণ্ড সাহেব বলেন ;—

“The Tripura troops were routed with a loss of 40,000 men while the Pathans lost only 5,000.” J. A. S. B.—Vol. XIX.

রণ-কৌশল ।

ত্রিপুর বাহিনী কোন কোন সময় অদ্ভুত রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে ।

মহারাজ ধনুমাণিক্যের সেনাপতি রায়কাচাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খানাংচি দুর্গ জয় ।
কৌশলী ছিলেন । তিনি আট মাসের চেষ্ঠায়ও খানাংচি নামক উদ্ভূঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গস্থিত কুকিগণের সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন । সেই দুর্লভ্য পর্ব্বতারোহণের উপায় উদ্ভাবন অসম্ভব মনে করিয়া, তিনি দিন দিন ভগ্নোৎসাহ হইতেছিলেন । এই সময় একটা সুবৃহৎ গোধিকা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং সেই গো-সর্প ই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন । গোধিকার কটিদেশে বেত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে পর্ব্বতে চড়াইয়া দিলেন । গোসাপটী ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিল, এদিকে ক্রমাগত সূদীর্ঘ বেত্র যোজনা করা হইতেছিল । গোধিকা পর্ব্বতের সান্নিদেশে আরোহণ করিবার পর হস্তস্থিত বেত্র টানিয়া দেখা হইল, তাহা বিশেষ দৃঢ় হইয়াছে । অতঃপর রাত্ৰিকালে, সেই বেত্র অবলম্বন করিয়া, সৈন্যগণ একে একে পর্ব্বতারোহণ করিল এবং অকস্মাৎ কুকিদিগকে আক্রমণ করিয়া অল্পায়াসেই দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল ।

ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত হোসেন সাহ, গৌরমল্লিক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাঁহার সৈন্যদল গোমতী নদীপথে আগমন পূর্ব্বক হোসেন সাহের পরাজয় বিবরণ ।
ত্রিপুরেশ্বর ধনুমাণিক্যের মেহেরকুল গড় আক্রমণ ও জয় করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত বিজয়োল্লাসে যাত্রা করিল, একথা পূর্ব্বই বলা হইয়াছে । তাহাদের নৌ-বাহিনী গোমতীর বন্ধ আচ্ছাদন করিয়া রাঙ্গামাটির (উদয়পুর) দিকে চলিল । ত্রিপুর সেনানায়ক রায়কাচাগ উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্বীয় উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বনে, গোমতী নদীর উপরিভাগে (উজানে) সূদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করিলেন । পার্শ্বত নদী একমাত্র পর্ব্বত নিঃসৃত জলধারা দ্বারা একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে । নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্রোত বন্ধ হইয়া বাঁধের নিম্নভাগ শুষ্ক হইয়া গেল এবং উপরিভাগের জল স্ফীত হইয়া উঠিল । পাঠানগণের অগণিত নৌকা গোমতীর বালুকাময় বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায়, সৈন্যগণ মধ্যে অনেকে নৌকা ছাড়িয়া চড়ায় শিবির স্থাপন করিল । এইভাবে তিন দিবস অতীত হইয়া গেল । চতুর্থ দিবস রাত্ৰিতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, আবদ্ধ জলরাশি সশব্দে প্রবলবেগে আসিয়া মুসলমানগণের উপর পড়িল । তাহারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল,—আত্মরক্ষার অবসর ঘটিল না । তাহাদের নৌ-বহর, সৈন্যদল, যুদ্ধ-সরঞ্জাম সমস্তই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল । এই ঘটনায় আত্মরক্ষা করাই সেনাপতি গৌরমল্লিকের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । তিনি হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । তাঁহার পরিত্যক্ত হস্তী, ঘোড়া এবং নানাবিধ বস্তু ত্রিপুর সৈন্যগণের হস্তগত হইল ।

গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের এই পরাজয়-কলঙ্ক অসহনীয় হইল, তিনি পুনর্ব্বার হোসেন সাহের দ্বিতীয় হৈতন খাঁ ও করা খাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধিনায়কত্বে বার পরাজয় । বিপুল-বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন । এই অভিযানে একশত হস্তী, পঞ্চ সহস্র ঘোটক ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল । এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ বাঙ্গালার (বার ভূঞাগণের) প্রদত্ত সৈন্যগণও এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল । *

পাঠান সেনানী, জামিরখাঁ গড় ও ছয়ঘরিয়া গড় জয় করিয়া ডোমঘাটিতে যাইয়া ছাউনী করিলেন । এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ, পর্ব্বতজাত বিষলতা ফেলিয়া গোমতীর জল বিষাক্ত করিয়াছিল । † সেই জল পান করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে দুই চারিজনের মৃত্যু হইবার পরেই তাহারা ত্রিপুর সৈন্যের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিল । এবং জল পানের নিমিত্ত দুই প্রহরের মধ্যে এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া লইল । এই জলাশয় মুসলমানগণের খনিত বলিয়া ‘তুরুক দীঘি’ নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহা দেবমণিক্য কর্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল ; তাহার অস্তিত্ব অত্য়পি বিদ্যমান আছে ।

এইবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ পূর্ব্ব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া তাহার উপরিভাগে জল আবদ্ধ করিলেন ; এই বাঁধ সাত দিবস রাখা হইয়াছিল । পাঠানগণ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ নদীগর্ভে নামিতে সাহসী হইল না ; যখন দেখা গেল, দীর্ঘকাল নদীর অবস্থা একরূপই আছে, তখন পার্ব্বত্য উচ্চনীচ পথ অপেক্ষা, শুষ্ক নদী পথ সুগম ও বিশেষ সুবিধা-জনক মনে করিয়া, তাহারা রাত্রিকালে গোপনে নদী পথ ধরিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল । এ দিকে ত্রিপুর সৈন্য অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল । মুসলমানগণ নদীগর্ভে নামিয়া আরামের সহিত উজানের দিকে যাইবার কালে, নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এক সপ্তাহের সঞ্চিত বারিরাশি প্রবল বেগে আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল । সেই প্রবল স্রোতের সঙ্গে সহস্র সহস্র ভেলা ভাসিয়া আসিতেছিল, প্রত্যেক ভেলায় মনুষ্যাকৃতি তিনটি করিয়া পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হাতে প্রজ্জ্বলিত মশাল ছিল । মুসলমানগণ নদীবেগ হইতে আত্মরক্ষা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর আবার মশাল হস্তে

* “একশত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটক ।

লক্ষক পদাতিক চলে ধামুকী কটক ॥

দ্বাদশ বাঙ্গালা চলে হৈতন খাঁ সহিতে ।”

ধনুমাণিক্য খণ্ড—২৫ পৃঃ ।

† বিষলতার উৎপত্তি স্বর্কীয় প্রবাদ বাক্য অতঃপর প্রদান করা হইবে ।

অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে মনে করিয়া, ভীত ও চিন্তিত হইল। ইত্যবসরে ত্রিপুর সৈন্য পশ্চাত্তাগস্থ নিবিড় অরণ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন দ্বারা পথ রুদ্ধ করিয়া, নদীর দুই পাড় হইতে মুসলমানদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। সম্মুখে জল প্রবাহ, পশ্চাত্তাগে দাবানল এবং উভয় পার্শ্বে শত্রু সৈন্য, এ হেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত সেনাপতি হৈতন খাঁ ও করা খাঁ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সর্বস্ব পরিত্যাগপূর্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন, সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশ নদীগর্ভে সমাহিত এবং ত্রিপুর সৈন্য কর্তৃক হত হইল। * যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইল।

প্রাচীনকালে রণক্ষেত্রে পরাজিত সেনাপতি কিম্বা বিশেষ ব্যক্তি ধৃত হইলে রণক্ষেত্রে ধৃত তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজদরবারে উপস্থিত করা হইত। সেনাপতিগণের অবস্থা। পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

পুরস্কার ও দণ্ড ।

রণ-জয়ী সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজদরবারে উপাধি লাভ করিয়া সম্মানিত ও স্বরণীয় হইতেন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরস্কার। পরিচ্ছদ, পুষ্প, হস্তী এবং ভূ-সম্পত্তি পুরস্কার লাভের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সেনাপতি রায়কাচাগ কুকিগণের থানাংছি দুর্গ ও কুকি প্রদেশ জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার পর, মহারাজ ধনুমানিক্য তাঁহাকে নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন ;—

“হাসিয়া নৃপতি তাকে বহুমাণ্ড কৈল ।
বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়া গৃহে পাঠাইল ॥
বহুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম ।
রায়কাচাগ রায় কছম যুদ্ধেতে উত্তম ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড ।

* স্পেনীয়গণ কর্তৃক লিডন্ (Leyden) আক্রান্ত হইবার পর, ওলন্দাজেরা এবস্থিৎ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন,—

The historical basis of this myth is probably that the Tripura troops adopted the same practice as was employed by the Dutch against the Spaniards at the siege of Leyden, Viz, breaking down embankments so that the hemmed in waters might sweep away the enemy.

সৈনিক বিভাগে দণ্ডের ব্যবস্থা কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। যুদ্ধে পরাজিত
সৈন্যাদ্যক্ষদিগকে অবমাননার নিদর্শনস্বরূপ চরকা উপহার দেওয়া
দণ্ড। হইত। থানাংছি দুর্গ অধিকারে অক্ষম ত্রিপুর সৈন্যদিগকে
সেনাপতি চয়চাগ (কাচাগ) শাসাইয়া বলিয়াছিলেন ;—

“কাপুরুষ হও তোরা চরখা হস্তে লবা।

রাজার সাক্ষাতে ঘাইয়া কি উত্তর দিবা ॥”

ধন্যমানিক্য খণ্ড।

পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিবার পর, ত্রিপুর বাহিনী
আট মাস যুদ্ধ করিয়াও হত প্রদেশের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, মহারাজ
বিজয়মানিক্য সেই সময়ে নূতন সেনাপতি প্রেরণ করিয়া, পূর্ব প্রেরিত সৈন্যাদ্যক্ষ-
দিগের নিম্নলিখিতরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন ;—

“আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে।

লহিতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে ॥

হেন গুনি বিজয়মানিক্য ক্রোধ হৈল।

সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল ॥”

বিজয়মানিক্য খণ্ড।

যুদ্ধে অপারগতা হেতু, সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত রাজার
ইঙ্গিত পাওয়া বীরপুরুষের পক্ষে কিরূপ অপমানজনক, তাহা একমাত্র বীরেরই
হৃদয়ঙ্গমযোগ্য।

সেনাপতিগণের আধিপত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

প্রাচীনকালে প্রধান সেনাপতিগণের হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত হইত,
সৈনিকবল ও শাসন- একথা অনেকবার বলা হইয়াছে। সৈন্যবল ও শাসনভার এক
ভার এক হস্তে হস্তে পতিত হওয়ায়, সেনাপতিগণ রাজ্য এবং রাজার উপর প্রভাব
অর্পণের কুফল। বিস্তারের বিশেষ সুযোগ পাইতেন। ইঁহারা ক্ষমতাগর্বে ক্রমশঃ
এরূপ দুর্দান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিলেন যে, রাজ্যেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত
করিয়া, অপর ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া
দাঁড়াইত। কোন কোন দুর্ভাগ্য সেনাপতি রাজ্যলোভে, অথবা আক্রোশমূলে রাজাকে
বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজমালায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, নিম্নে
এতদ্বিষয়ক আভাস প্রদান করা যাইতেছে।

মহামানিক্যের পরলোকগমনের পর, সিংহাসন লইয়া বিষম গোলমাল
সেনাপতিগণের উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় স্বর্গীয় মহারাজের জ্যেষ্ঠ কুমার
প্রভাব। ধর্মদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সম্যাসীবেশে বারাণসীধামে বাস
করিতেছিলেন। তাঁহার অনুজ চতুর্ভয় সিংহাসন লাভের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ

আরম্ভ করিলেন । সেনাপতিগণও রাজকুমারদিগকে উপেক্ষা করিয়া, প্রত্যেকেই রাজ্যলাভের প্রয়াসী হইলেন ; অথচ একে অন্নের ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতে ছিলেন না । পরিশেষে কুমার ধর্মকে রাজা করাই সঙ্গত এবং নিরাপদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল । এই মীমাংসায় সেনাপতিগণেরই প্রাধান্য ছিল ।

ধর্মমণিক্য, ধন্য ও প্রতাপ নামক দুই পুত্র বর্তমান রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন । এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিলে জানা যায়, সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্রমূলে জ্যেষ্ঠ ধন্যকে উপেক্ষা করিয়া

সেনাপতিগণের প্রাধান্য
হেতু ধর্মমণিক্যের
অবস্থা।
রাজ্যের চিরস্থান বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় কনিষ্ঠ প্রতাপকে সিংহাসনে বসাইলেন । কিয়ৎকাল পরে আবার তাঁহারাই বালক প্রতাপের শিরে অধার্মিকতার অভিযোগ চাপাইয়া রাত্রিকালে গোপনে তাঁহাকে নিহত করিলেন । প্রতাপের নিধন সাধনের পর সেনাপতিগণ একে অন্নকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন । এই সময় উচ্ছ্বল সেনাপতিবৃন্দের অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল ; তাহারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ; কুমার ধন্য স্বীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিতের গৃহে লুক্কায়িত ভাবে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইলেন । অনেক কাটাকাটি মারামারির পর, প্রধান সেনাপতি বুঝিলেন, রাজপুত্র ধন্যকে সিংহাসন অর্পণ করা ব্যতীত উপস্থিত রাষ্ট্রবিপ্লব নিবারণের উপায়ান্তর নাই । তাঁহার প্রস্তাবে অন্ন সেনাপতিগণ সন্মত হইয়া, ধন্যের অমুসন্ধানার্থ ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন । ধাত্রী দলবদ্ধ সেনানীদিগকে দেখিয়া মনে করিলেন, ধন্যের নিধন সাধনদ্বারা রাজ্যলাভের পথ নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা বন্ধপরিকর হইয়াছেন । স্মতরাং তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই ধন্যের সন্ধান বলিলেন না । ধাত্রীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রধান সেনাপতি শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলিলেন, “ধন্যের কোনরূপ অনির্ঘেটর আশঙ্কা নাই, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইবে ।” তখন ধাত্রী আশ্বস্তা হইয়া, ধন্যের পুরোহিত গৃহে অবস্থিতির কথা বলিয়া দিলেন ।

সেনাপতিগণ অশ্বগজাদি সমন্বিত বিপুল-বাহিনী সহ পুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন । তদর্শনে রাজকুমার ধন্যের মনে ধাত্রীর ন্যায়ই সংশয় জন্মিয়াছিল । তিনি ভয়ান্তর্চিত্তে জীবন রক্ষার নিমিত্ত গৃহকোণে একটা বাঁশের মাচার নীচে যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন । কিন্তু এই অবস্থায় অধিককাল অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ; অমুসন্ধান তৎপর সেনাপতিগণ তাঁহাকে মঞ্চের নিম্নদেশ হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন । এই সময় ধন্য একাদশ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন । বালক, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সেনাপতিগণের হস্তে পতিত হইয়া আপনাকে নিতান্তই নিঃসহায় এবং বিপন্ন মনে করিলেন । তিনি বালকোচিত বিনয়বাক্যে বলিলেন, “আমি রাজ্যলাভের অভিলাষী নহি, পুরোহিতের গৃহে

ভৃত্যভাবে থাকিয়া এক মুষ্টি অন্নদ্বারা জীবন যাপন করিব। তোমরা আমাকে হত্যা করিয়া অনর্থক অপঘণ অর্জন করিও না।” পুরোহিত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, “ইহারা তোমাকে হত্যা করিবেন না, রাজা করিবার নিমিত্ত লইতে আসিয়াছেন।” এই অবস্থায় সেনাপতিগণ ধন্যকে আনিয়া সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

সেনাপতিগণের উচ্ছ্বলতার পরিণাম।

ধন্যমণিক্য সেনাপতিগণের এবম্বিধ অসঙ্গত ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ প্রদান করিতে ছাড়েন নাই। তিনি সিংহাসন লাভ করিবার পর এক বৎসর কাল কূর্মনীতি অনুসরণে, সেনাপতিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রমত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ দিন দিন তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠিতভাবে অসঙ্গত আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের এরূপ ব্যবহারে মহারাজ উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সেনাপতিগণ সৈনিক বলে বলীয়ান, শাসন যন্ত্র তাঁহাদের হস্তগত, ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্গুলী সঙ্কেতের বশবর্তিনী; রাজার ধন ও প্রাণ সেনাপতিগণের কৃপা-ভিখারী। এই অবস্থায় বালক ধন্য, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না, অথচ উচ্ছ্বলতা নিবারণকল্পে ইহাদিগকে দমন করা যে একান্ত আবশ্যিক, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন।

অতঃপর পূর্বেবক্ত পুরোহিতের মন্ত্রণানুসারে রাজা পীড়ার ভাণ করিয়া তিন মাসকাল অস্তঃপুরে রহিলেন। রাজকার্য্য পূর্ববৎ সেনাপতিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষগণ, পুরোহিতের নিকট রাজদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাদিগকে দমন করিবার ইহাই উত্তম সূযোগ মনে করিয়া, পুরোহিত হৃৎচিন্তে সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পর দিবস রাত্রিকালে সেনাপতিদিগকে রাজ-অস্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা রাজদর্শনের পর, বিদায়ের অভিবাদন করিবার কালে, মহারাজের শরীর-রক্ষকগণ পুরোহিতের ইঙ্গিত মতে তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিল। এই উপায়ে দুই সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া মহারাজ ধন্য স্বীয় বিশ্বস্ত কতিপয় লোককে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; তন্মধ্যে সেনাপতি রায়কাচাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরূপ পরাক্রান্ত এবং খ্যাতনামা ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব ইহাকে ত্রিপুরাধীশ্বর চয়চাগ মণিক্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। * এই সময় হইতে সৈনিক বিভাগ পরিচালনের ভার মহারাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল।

মহারাজ দেবমাণিক্যের দীক্ষাগুরু লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কপটাচারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বধ করিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে রাজা করিলেন ; এবং জ্যেষ্ঠ বিজয়কে হীরাপুর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন । ইন্দ্রমাণিক্য শিশু ছিলেন ; তাঁহার জননীর সহযোগে দুই ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন । এই বিপ্র মিথিলা নিবাসী ছিলেন ; তিনি নিজকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে আড়াইশত মৈথিলকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অল্পকাল মধ্যেই প্রকৃতিপুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া উঠিল । প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ এই সময় গত্যস্তর না দেখিয়া সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন । তিনি বেলা দুই প্রহরের সময় দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট চরদ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, রাজমাতা অকস্মাৎ বেদনা-রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকে শীঘ্র আসিয়া না দেখিলে আর দেখিবার আশা থাকিবে না । ব্রাহ্মণ এই সংবাদ পাইয়া ব্যস্তভাবে চতুর্দলে আরোহণ করিয়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দৈত্য নারায়ণের নিয়োজিত চরের হস্তে তিনি নিহত হইলেন । অতঃপর সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ সদলবলে রাজপুরীতে প্রবেশ ও জননীসহ শিশু ইন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিয়া, বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

এই সময় মহারাজ বিজয় অল্পবয়স্ক ছিলেন । রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলেন । তিনি রাজাকে অগ্রাহ করিয়া, রাজভাণ্ডারের সমস্ত দ্রব্য, এমন কি হস্তী যোড়া, বাঘ-ভাণ্ড সমস্তই আপন আলয়ে লইয়া গেলেন । রাজা চাহিয়াও কোন বস্তু পাইতেন না ; দৈত্য নারায়ণ বলিতেন,—“আমার মৃত্যুর পরে রাজার সমস্ত বস্তু রাজা লইবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না ।” দৈত্য নারায়ণের ভ্রাতা দুর্লভ নারায়ণ অগ্রজের অমিত প্রভাবে বলীয়ান হইয়া, রাজ্য মধ্যে নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল । তাঁহার বিরুদ্ধে উৎপীড়ন, পরস্প্রীহরণ ইত্যাদি অভিযোগ রাজদরবারে আসিতে লাগিল, কিন্তু দৈত্য নারায়ণের প্রভাবে মহারাজ কোনরূপ প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেন না । এই অবস্থায় কয়েককাল অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত (ষোল বৎসর বয়স্ক) হইলেন । তখন তিনি শ্বশুরের আশুগত্যে রাজত্ব করা নিতান্তই অস্পৃহনীয় মনে করিলেন এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের শাস্তিবিধানের নিমিত্তও তাঁহাকে দমন করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বুঝিলেন ; কিন্তু এবম্বিধ শক্তিশালী ব্যক্তির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক রাজকার্য্য অথবা রাজ-ভাণ্ডারের দ্রব্যজাত কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায়, তাঁহাকে নিহত করিয়া সর্ববিধ বাধাবিঘ্ন উন্মোচন করাই মহারাজ সঙ্গত মনে করিলেন । তিনি দৈত্য নারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা মাধবকে ভূষণার লক্ষ্মণ পদ প্রদানের আশ্বাসদ্বারা বশীভূত করিয়া, কার্য্যোদ্ধার করিলেন । মাধব, দৈত্য নারায়ণকে

অতিরিক্ত মত্ত প্রদান দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া, পরিশেষে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিল ।

অতঃপর মহারাজ বিজয়, দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী ও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন । তিনি সেনাপতিগণের হস্ত হইতে শাসন ক্ষমতা উঠাইয়া লইয়া, “উজীর” পদবীধারী নবনিয়োজিত কর্মচারীর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন । এই পদবী মুসলমান শাসনের অনুরোধে সৃষ্ট হইয়াছে ।

এবার আর একটা বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথা বলা হইবে, তাঁহার নাম গোপীপ্রসাদ নারায়ণ । ইনি বাছাল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন । মহারাজ বিজয়মাণিক্য ইঁহাকে, প্রথমতঃ বড়ুয়া উপাধি প্রদান করেন । কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে স্বীয় সুপকার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ত্রিপুর রাজ্যে মহারাজের পাচকগণ ‘মহামুন্সী’ পদবাচ্য হইয়া থাকে । ইহার পর মহারাজ, গোপীপ্রসাদকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত ও নারায়ণ উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করেন । গোপীপ্রসাদ এই পদ প্রাপ্তিকালে, শালগ্রাম ও হরিবংশ স্পর্শ করিয়া, সর্বদা রাজার হিতকামী হইবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্ত দেব নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন ও অনাবিষ্ট ছিলেন । ইনি ভাবী রাজা, ইঁহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ বিজয়, অনেক চিন্তার পর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং সর্বদা পুত্রের হিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিবার নিমিত্ত সেনাপতিকে সত্যপাশে আবদ্ধ করাইলেন ।

বিজয়মাণিক্যের স্বর্গারোহণের পর, অনন্তমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । মহারাজ অনন্ত সর্বতোভাবে শ্বশুরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ; তিনি শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে প্রতিদিন তাঁহার আলয়ে যাইয়া ভোজন করিতেন । অনন্তমাণিক্যের মহিষী (গোপীপ্রসাদের কন্যা) পিতার ব্যবহারে সন্দেহান্বিত হইয়া, মহারাজকে সর্বদা শ্বশুরালয়ে যাইয়া ভোজনাদি করিতে বারণ করিতেছিলেন, কিন্তু মহারাজ এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেন না । এই সূত্রে মহারাজী পতিকে বিস্তর ভৎসনাও করিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ববিধ চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল ।

এ দিকে গোপীপ্রসাদ অবাধ আধিপত্যের ফলে উত্তরোত্তর এরূপ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, সিংহাসন লাভ ব্যতীত ইঁহার প্রভুত্বের পিপাসা মিটিতেছিল না । পরিশেষে ভোজনার্থ স্বীয় ভবনে আগত জামাতাকে গুপ্তচরদ্বারা নিহত করিয়া ‘উদয়মাণিক্য’ নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনারূঢ়

হইলেন । তিনি স্বীয় ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গ নারায়ণ) কে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

এই উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যের শাসনকালে, সেনাপতি রণাগণ রণাগণের প্রাধান্ত্য ও পরিণাম । সর্বময় কর্তা হইলেন । তিনিও স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সতী ও ধর্ম পরায়ণা স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করিয়া রাজাকে হত্যা করিতে সাহসী হইতেছিলেন না । অল্পকাল পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনর্ববার দারপরিগ্রহ করিলেন । নব পরিণিতা স্ত্রী এবার তাঁহাকে রাজ্য-লাভের নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । ইনি লেখাপড়া জানিতেন, পাঁচালী পাঠ করিয়া স্বামীকে বুঝাইতেন—দুই প্রহর কাল রাজত্ব করিলেও অস্ত্রমে দেবরাজ বাসবের আসন লাভ হইয়া থাকে । রাজ্যলাভ স্পৃহা পূর্ববাবধিই বৃদ্ধের হৃদয়ে জাগরুক ছিল, ইহার উপর যুবতী ভার্য্যার উৎসাহ বাক্য এবং পাঁচালীর লোভনীয় উক্তি তাঁহাকে অধিকতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল । এই সময়, অপর সেনাপতি (দেবমাণিক্যের পুত্র) অমরদেব বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন । বৃদ্ধ রণাগণ বুঝিলেন, রাজার নিধন সাধন দ্বারাও রাজ্যলাভের পথ নিষ্ফল হইবে না । প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অমরদেব, নিশ্চয়ই তাঁহার এই সঙ্কল্পের পরিপন্থী হইয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন ; এবং রাজ্য পুনর্ববার প্রাচীন রাজবংশের হস্তগত হইবে । এজন্য তিনি অমরদেবের নিধন প্রয়াসী হইলেন । একদিবস রাত্রিকালে অমরকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আনিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিলেন । এই সময় অমরের জনৈক হিতৈষী ব্যক্তি তরবারী দ্বারা পানের বোটা ছেদন করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিল । এই ইঙ্গিত দ্বারা অমর সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন এবং অসুস্থতার ভাণ করিয়া স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলেন । অতঃপর রণাগণ সহ জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, অমরমাণিক্য পিতৃ সিংহাসনের উদ্ধার-সাধন এবং বৃদ্ধ রণাগণের রাজ্যলাভের প্রবল পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন ।

উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া সামান্য কারণেও বিদ্রোহাচরণ করিতে সৈনিক বিভাগে কুণ্ঠিত হইত না । মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান উচ্ছৃঙ্খলতা । সৈন্যদলের দুই মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল । এই সামান্য অছিলায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, উজীরকে বধ করিল । রাজাকে বধ করিয়া রাজধানী লুণ্ঠনের নিমিত্তও ষড়যন্ত্র করিতেছিল, মহারাজ বিজয় ইহা জানিতে পারিয়া অধিকাংশ পাঠানকে ধৃত করিলেন এবং কতক পলায়ন করিল । ধৃত পাঠানদিগকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান দ্বারা তাহাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছিল ।

সেনাপতি বধ ।

সেনাপতিগণের পূর্বোক্তরূপ ঔদ্ধত্যের ফলে, অনেক সময় তাঁহাদের জীবনান্ত হইবার দৃষ্টান্ত পূর্ববই উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা আলোচনায় জানা যাইবে,

মহারাজ ধন্য, উচ্ছৃঙ্খল সেনাপতিবৃন্দকে নিধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয়-মাণিক্য স্বীয় শশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে বধ করিয়া, শাসনযন্ত্র নিরাপদ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি রণাগণের রাজ্যলাভের দারুণ পিপাসা, অমরদেবের অস্ত্রমুখে প্রশমিত হইয়াছিল।

মহারাজ দেবমাণিক্য স্বীয় দীক্ষাগুরুর প্ররোচনায় তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের অভিলাষে ক্রমান্বয়ে আটজন সেনাপতি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড সেনাপতিগণের দোষজনিত নহে, রাজার ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের ফলেই এবশ্বিধ বীভৎস অভিনয় হইয়াছিল।

উদ্ধত ও ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিগণের দুর্গতি ঘটবার দৃষ্টান্ত অগ্ৰত্ৰও বিরল নহে। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জেনিজারি সৈন্যদলের এই অবস্থা ঘটয়াছিল। *

দুর্গ ও সেনানিবাস ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভূত সময়ে অনেকগুলি দুর্গ ও সেনানিবাস ছিল। তন্মধ্যে মেহেরকুল দুর্গ, চণ্ডীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, জামিরখাঁগড়, ছয়ঘরিয়া বা সুগরিয়াগড়, যশপুরগড়, গাস্তারী বা গামারিয়াগড় ও সংরাইশগড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দুর্গের অবস্থানের বিবরণ অতঃপর প্রদান করা যাইবে ; রাজধানীর সন্নিক্ত চতুষ্পাশ্বে দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত দূরবর্তী নানাস্থানেও সেনানিবাস থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, এতদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“যত সব সেনাপতি যুদ্ধের কারণ ।

থানায় থানায় সবে করে নিয়োজন ॥

দক্ষিণ দিকে চট্টগ্রাম এক থানা হয় ।

দশ সেনাপতি তথা নিয়োগ করয় ॥

শ্রীহট্টে উত্তর থানা বড়ই ভীষণ ।

সেই থানায় সেনাপতি রহে বিশ জন ॥

কলাকোপা পদ্মার পারে পশ্চিমের থানা ।

সেই থানায় সেনাপতি রহে চল্লিশ জনা ॥

* এতৎসম্বন্ধে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ সাবেব বলিয়াছেন ;—

“The fate of these Generals, in the penalty they suffered for their imperious and intriguing conduct, resembled that of the janizzaries of the Turkish Empire who were cut off at a stroke in 1826 ; like them and the Mamalukes of Egypt, these Generals appear to have been always more or less involved in political intrigues.”

নসিরাবাদ গড়ে বটে থানা চমৎকার ।
 ত্রিশ জন সেনাপতি কার্যে সে থানার ॥
 বিশালগড়ে মেহেরকুলে ছই থানা আছে ।
 পনের জন সেনাপতি তাহাতে রৈয়াছে ॥
 বিশগাঁও বটে থানা পাহাড় নিকট ।
 সেনাপতি পাঁচ জন বড়ই বিকট ॥
 সুসঙ্গ আর এক থানা পঞ্চাশ সেনাপতি ।
 দশ হাজার সেনা তথা করয়ে বসতি ॥”

ত্রিপুর বংশাবলী ।

এই সকল থানা বা সেনানিবাস মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল । এতদতিরিক্ত যে সকল দুর্গ ও সৈন্যবাসের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজমালায় তৎসমস্তের বিবরণ পাওয়া যায় ।

কোনও নূতন প্রদেশ জয় করা হইলে, সেই স্থানের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নববিজিত প্রদেশের নিমিত্ত এক একটা সেনানিবাস বা থানা সংস্থাপন করিয়া, বিশ্বস্ত শাসন প্রণালী ও পরাক্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সেই স্থানে রাখা হইত । এই সকল সেনাপতি ‘থানাদার’ পদবী লাভ করিতেন ; নববিজিত প্রদেশের শাসন কার্য ইহাদের দ্বারাই নির্বাহিত হইত ।

সৈনিক বিভাগের ভোজ ।

পূর্বকালে কোন কোন সময়, বিশেষতঃ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে সৈন্যদিগকে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর রাজ সরকার হইতে ভোজ দেওয়া হইত । মহারাজ ছেংথুম্ ফাএর প্রদত্ত ভোজ । মহিষী, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী, গোড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব দিবস স্বীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষনাদি করাইয়া সৈন্যদলকে বিরাট ভোজদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সৈনিকদিগকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে ধন্যমাণিক্যের উল্লেখযোগ্য । সেই সঙ্গে জাতি এবং ব্রাহ্মণদিগেরও ভোজনের প্রদত্ত ভোজ । ব্যবস্থা ছিল । রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“দ্বিজ জাতি ভোজন করায় নৃপবর ।
 আর খাওয়াইল সৈন্য সেনা বহুতর ॥”

এই ভোজ ধন্য সাগরের তীরে হইয়াছিল এবং জাতি ও শ্রেণী অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষন ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, এ কথাও রাজমালায়ই পাওয়া যায় ;—

“সাগরের চারি পাড়ে বৈসায় নানাজাতি ।
 রক্ষন ভোজন তথা যার যেই পংক্তি ॥”

এই বিশেষ ভোজ উপলক্ষে ত্রিপুরা সমাজে “কাঠিছোঁয়া” নামে একটি
কাঠিছোঁয়া সম্প্রদায়। সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায়, ত্রিপুরা প্রদেশে এই ভোজ চিরস্মরণীয়
হইয়াছে। ‘কাঠিছোঁয়া’ নামকরণ হইবার কারণ রাজমালায়
নিম্নোক্তরূপ পাওয়া যায় ;—

“সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চেতে বসিল ।
কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল ॥
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুখে ।
সরদার গণিবারে গেলেন সম্মুখে ॥
সেনা অন্ন-ঘণ্টি লৈয়া স্পর্শিয়া গণিল ।
খাইতে ছুইল যাকে কাঠিছোঁয়া হৈল ॥
* এই মতে কাঠিছোঁয়া নাম কত সেনা ।
শ্রীধনমণিক্যাবধি হইল গণনা ॥”

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, সৈন্যগণের ভোজনকালে কুকির সরদার ভাতের
কাঠিছোঁয়া স্পর্শ করিয়া যে সকল সৈন্যকে গণনা করিয়াছিল, তাহারাই ‘কাঠিছোঁয়া’
সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন ;—

“He once gave a great feast to the Brahmans and their relations,
they had to cook their own food. he ordered the Commanders of the
Kuki troops to count their men, they did so with a stick while they
were eating, the kukis were required by their law to drop eating, but
through fear of losing their lives they swallowed the food which was
in their mouth,—they have had a nick name applied to them ever
since on account of this.” *

লঙ্সাহেবের এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, কুকি জাতীয় কতক লোক ‘কাঠিছোঁয়া’
হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কোন কুকির আহারকালে তাহাকে অন্য কুকিতে
স্পর্শ করিলে তদ্রূপ আহাৰ্য্য বস্তু অপবিত্র, অথবা ভোক্তার জাতিচ্যুতি ঘটিবার কারণ
হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল ত্রিপুরা ও বাঙ্গালী সৈন্যকে ভোজনকালে কাঠিছোঁয়া
স্পর্শ করা হইয়াছিল, তাহারাই জাতিভ্রষ্ট এবং ‘কাঠিছোঁয়া’ নামে অভিহিত হইয়াছে।
এই সম্প্রদায় নানাজাতির সমবায়ে গঠিত এবং একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত
হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরা জাতির সঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী। অত্যাঁপি এই
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

সৈনিকগণের ভোজ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে।
ত্রিপুররাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে ইহা ‘হসমভোজন’ নামে বিখ্যাত।
হসমভোজন। ইহা প্রকৃত সরকারী ভোজ (State Dinner)। ইহা প্রতি বৎসর
বিজয়া দশমী দিবস রাত্রিকালে হইয়া থাকে। এই ভোজে সাধারণতঃ পার্বত্য প্রজা ও
সরদারগণ আমন্ত্রিত হয়।

হসমভোজনের অর্থ অনেকে অনেক রকম বলিয়া থাকেন । কেহ বলেন, 'হসমভোজন' অসম অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন হয় বলিয়া ইহা 'হসমভোজন' নামে অভিহিত হইয়াছে । অনেকে বলেন, শূকরকে হসম বলা হয়, এই ভোজে বহুসংখ্যক শূকর বধ করিবার ব্যবস্থা ছিল, এই জন্য 'হসমভোজন' নাম হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বহুসংখ্যক লোকের সাধারণ আখ্যা 'হসম' । এই ভোজে বিস্তর লোক উপস্থিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'হসমভোজন' হইয়াছে । * আমরা দেখিতেছি, প্রাচীন রাজমালার ভাষা সংশোধন প্রয়াসী আধুনিক লিপিকারে দ্বারা এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে । ত্রিপুররাজ্যে পূর্বকালে সৈনিকদিগকে হসম বলা হইত । † রাজমালার ভাষা সংশোধক, 'হসম' শব্দের পরিবর্তে 'সৈন্য', 'সেনা' ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করায়, 'হসম' শব্দের অর্থ বিভ্রাট ঘটয়াছে । বর্তমানকালে অনেকেই প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করেন না, অথবা আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন না ; কারণ উক্ত গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত প্রায় । এই কারণেই অনেকে 'হসম' শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া, নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন । প্রকৃতপক্ষে, সামরিক বিভাগের ভোজকেই 'হসমভোজন' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে । সেকালে পার্বত্য প্রজাগণ সকলেই

* হালামগণ কুকির একটা শাখা । ইহাদের ভাষায়, বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইলে সেই জনসঙ্ঘকে 'হসম' বলে । ইহা অবলম্বনেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে ।

† প্রাচীন রাজমালার অনেকস্থলেই 'হসম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় । তাহার কতিপয় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

(১) “রাজা আইল গড়ে দেখিতে হসম ।”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

(২) “দশ সেনাপতি মধ্যে হসম বিস্তর ।
রাজ সৈন্য আমি মাত্র হই একেশ্বর ॥”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

(৩) “হসম দেখিয়া তারা আসিয়া মিলিল ।
বিষকুন্ত পয়োমুখ মতে মিত্র কৈল ॥”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

(৪) গোড়েশ্বরের গুপ্তচর, বিজয়মাণিক্যের শিবির দেখিতে আসিয়া ধৃত হয় । সে কি জন্ত আসিয়াছে, জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল ;—

“তোমার হসম কত দেখিতে পাঠাইল ।”
বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

(৫) “তুই লক্ষ আসিলেক মথের হসম ।
পাঠান সকলে দেখি পাসরে বিক্রম ॥”
অমরমাণিক্য খণ্ড ।

যোদ্ধা ছিল, এবং প্রয়োজন মতে সকলেই মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য ছিল, সুতরাং হসমভোজনে তাহাদের কোন শ্রেণীই বাদ পড়িত না। এই ভোজ কোন্ রাজার শাসন সময়ে, অথবা কতকাল যাবত প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহা যে বহু প্রাচীন প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ভোজের মধ্যে এক গভীর রাজনীতি নিহিত রহিয়াছে। রাজ্যের হসমভোজন প্রথার শান্তিবিধানের সহিত এই নীতি প্রবর্তনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে পার্বত্য প্রজাগণ—বিশেষতঃ কুকি ও হালাম শ্রেণীর প্রজাবর্গ নিতান্ত দুর্ধর্ষ এবং উগ্র স্বভাবাপন্ন ছিল। বিজয়া দশমী দিনে যুদ্ধ যাত্রা করা ইহারা বিশেষ পুণ্যকার্য্য এবং অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই যাত্রাকে হালামদিগের ভাষায় ‘হাকুথুম্’ বলে। তাহারা এই কৌলিক প্রথা রক্ষার নিমিত্ত এবং স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে পার্শ্ববর্তী পল্লী সমূহে অকস্মাৎ পতিত হইয়া নরহত্যা এবং প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। সেকালে ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু জনপদ উচ্ছন্ন এবং অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শারদীয় পূজার কালে ইহাদিগকে আবদ্ধ করা না হইলে সেই উপদ্রব নিবারণ করা অসম্ভব ছিল, এবং রাজানুকম্পাসূচক কৌশল অবলম্বন ব্যতীত এক সময়ে সকলকে এক স্থানে অপরুদ্ধ রাখিবার অন্য উপায় ছিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই রাজনীতি-কুশল ত্রিপুরেশ্বর ‘হসমভোজন’ প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; এবং অद्याপি সেই প্রথা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

দুর্গোৎসবের বোধনের দিবস হইতেই দূরবর্তী পার্বত্য প্রজাগণের রাজধানীতে আগমন আরম্ভ হয়। প্রজাগণ সকলেই, বিশেষতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সরদারগণ এই সময় রাজদত্ত ভোজে যোগদান করিতে বাধ্য ছিল। সরদারগণই অনির্ঘটপাতের মূল, সুতরাং তাহাদের উপস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। যে সরদার বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিত, তাহাকে কঠোর দণ্ড প্রদানের বিধান ছিল। রাজার আমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া সকলেই গৌরবজনক এবং অবশ্য কর্তব্য মনে করিত, সুতরাং অনুপস্থিতির সংখ্যা অধিক হইত না। বর্তমানকালে পার্বত্য প্রজাগণ দ্বারা পূর্বের ন্যায় অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, এ জন্য তাহাদিগকে ভোজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত রাজদরবার হইতে পূর্ববৎ পীড়াপীড়ি করা হয় না। তথাপি প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক এই বিরাট ভোজে উপস্থিত হইয়া থাকে।

অশিক্ষিত এবং উচ্ছৃঙ্খল পার্বত্য প্রজাবর্গকে বৎসরে একবার রাজা-প্রজা সম্বন্ধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া এই ভোজের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সময় উপস্থিত প্রজাগণ রাজার নজর প্রদান করে, এবং রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে বস্ত্র, বিবিধ দ্রব্যজাত ও মুদ্রা রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদান করা হয়। সরদারদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই সময় উপাধি প্রদানদ্বারা গৌরবান্বিত করিবার ব্যবস্থাও আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে এই ভোজ হয় । হসমভোজনে হালাম এতদুপলক্ষে কোন্ সম্প্রদায়ের লোকে কি কার্য করিবে, তাহার সরদারের প্রাধাত্য । বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে । হালাম সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিকে এই ব্যাপারের কর্তা, তিনি ভোজনে উপবেশনের পরে তাঁহার আদেশ গ্রহণান্তে অন্ত সকলকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং আহারান্তে পাত্র ত্যাগের জন্তও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক ।

বিজয়া দশমীর পর দিবস রাত্রিতে, ইহাদিগকে লইয়া রাজকর্মচারীবর্গের এক উপচৌকন প্রদান বৈঠক হয় । এই বৈঠকে প্রজাদিগকে মজ্ঞ এবং বস্ত্রাদি উপহার প্রদানের ব্যবস্থা আছে । এই সময় সর্ব সম্প্রদায়ের সরদারগণের সহিত আলোচনা করিয়া, পর্বতবাসী জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থা, ধান্য ও কার্পাস ইত্যাদি জুমে উৎপন্ন শস্যের অবস্থা, সামাজিক বিবরণ, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তাহাদের সুখ শান্তি ও অভাব অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা হয় । রাজধানীতে বসিয়া, সমগ্র পার্বত্য প্রদেশের যথাযথ বিবরণ ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ হইতে অবগত হইবার এরূপ সুযোগ রাজপুরুষগণ বৎসরে একবার মাত্র পাইয়া থাকেন । এই ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের যে সকল অবস্থা অনায়াসে জানা যাইতেছে, সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া প্রতি বৎসর তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে না । হসমভোজনের ইহাও একটা সুফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । পার্বত্য প্রদেশে রাজকর অবধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলমাল থাকিলে, তদ্বিষয়ক তর্কও এই সময় মীমাংসিত হইয়া থাকে ।

সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা রহিয়া গেল । এ স্থলে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব বিধায় নিরস্ত থাকিতে হইল ।

রাজ্যের অবস্থা ।

রাজধানী ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে যে সকল রাজার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে রাজধানীর অবস্থান । (ধর্ম্মমণিক্য, প্রতাপমণিক্য, ধন্যমণিক্য, ধ্বজমণিক্য, দেবমণিক্য, ইন্দ্রমণিক্য, বিজয়মণিক্য, অনন্তমণিক্য, উদয়মণিক্য ও জয়মণিক্য), তাঁহাদের শাসনকালে রাজধানী কখনও স্থানান্তরিত হয় নাই । রাজ্যমাটিতে রাজপাট রাখিয়াই ইঁহারা রাজ্যশাসন করিয়াছেন । মহারাজ উদয়মণিক্য রাজধানীর নাম পরিবর্তন এবং স্বীয় নামানুসারে 'উদয়পুর' নামকরণ করিয়াছিলেন ।

মুসলমান এবং মঘ কর্তৃক ত্রিপুররাজ্য বারম্বার আক্রান্ত হইয়াছে । ত্রিপুরেশ্বরগণ কেবল সেই সকল আক্রমণ হইতে রাজ্য ও রাজধানী রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহারা অরাতিগণের রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদান করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন ।

রাজ্য বিস্তার ।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজ্যের সীমা প্রসারিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন । তিনি মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসাইর, বেজুরা, ভানুগাছ, বিষাজুরি (বিষাউড়ি) লঙ্গলা এবং বরদাখাত প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থান সমূহ বঙ্গের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন । এই সকল স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থান পূর্ববর্তী রাজগণের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ববার সেই ক্ষতি উদ্ধার করেন । খণ্ডল প্রদেশ অধিকার কালে মহারাজকে কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়া থাকিলেও পরিশেষে সেই প্রদেশ ত্রিপুরবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল । তদ্দেশবাসী জনসাধারণের এমন দুঃবস্থা ঘটিয়াছিল যে, বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের পরিধানের অন্য সম্বল ছিল না ; তদ্বিবরণ ইতিপূর্বে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

ইহার পর ধন্যমাণিক্য, খানাংচি রাজ্য এবং সমগ্র কুকি প্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন । ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ), গোড়েশ্বর হোসেন সাহের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন । ইহার শাসনকালে, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হোসেন সাহ বারম্বার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষতি উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই । একবার কিয়ৎকালের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলেও ১৪৩৭ শকে (১৫১৫ খৃঃ) ধন্যমাণিক্য আবার তাহা পাঠানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । তৃতীয় বারের যুদ্ধে রাজ্যের কিয়দংশ হোসেন সাহের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য ।

ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য ভুলুয়ারাজ্যসহ দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । তৎকালে চট্টগ্রাম, তাঁহারই হস্তগত ছিল ।

দেবমাণিক্যের পুত্র মহারাজ বিজয়মাণিক্য খাসিয়া রাজ্যের কিয়দংশ এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি রাজ্যের উত্তর প্রান্তস্থিত দেশ সমূহ জয় করিয়াছিলেন । এই সময় পাঠানগণ পুনর্ববার চট্টগ্রাম আক্রমণ করায়, ক্রমান্বয়ে আট মাস যুদ্ধের পর মহারাজ বিজয়কর্তৃক প্রতিপক্ষগণ বিশেষভাবে পরাজিত হয় । এই যুদ্ধ গোড়েশ্বর সুলতান সুলেমান কররাণির সঙ্গে হইয়াছিল ।

বিজয়মাণিক্য মুসলমানগণের আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদানের অভিপ্রায়ে
 বিজয়মাণিক্যের বঙ্গদেশ বিজয়ে বহির্গত হইবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই
 অভিযানকালে, পাঠান বংশীয় শেষ নবাব দায়ুদ সাহ বঙ্গের
 সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । পাঠান ও মোগল সঙ্ঘর্ষের ফলে, এই সময় বঙ্গের
 শাসনতন্ত্র শিথিল হওয়ায়, মহারাজ বিজয় অনায়াসে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে
 স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । তিনি প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের
 মুসলমান শাসনকর্তাকে জয় করিয়া, তথায় তীর্থ কার্য্য সমাপনান্তে ক্রমান্বয়ে পদ্মা
 অতিক্রম করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ জয় করিয়াছিলেন ।
 তাঁহার অভিযান বর্ণনোপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন ;—

“লোহিত্য পশ্চিমভাগে বসতি জাহ্নবী ।
 পূর্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী ॥” *

মহারাজ উদয়মাণিক্য জামাতাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন সত্য,
 উদয়মাণিক্যের কিন্তু তিনি রাজ্যরক্ষার পক্ষে অযোগ্য ছিলেন । তাঁহার শাসন-
 শাসনকাল । কালে চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরার কুক্ষিচ্যুত হইয়াছে ।

জয়মাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রণাগণের দুর্ব্যবহারের ফলে অন্তর্বিবলন
 জয়মাণিক্যের উপস্থিত হইয়া থাকিলেও এই সময় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধীয় কোনরূপ
 শাসনকাল । পরিবর্তন ঘটে নাই । জয়মাণিক্যই দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভুক্ত
 শেষ নরপতি ।

প্রাকৃতিক উপদ্রব ।

ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবদ্বারা সময় সময় রাজ্যের
 ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ বিশেষ অনিষ্ট ঘটয়াছে । বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার
 প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদয়পুরস্থ জগন্নাথ
 দেবতার মন্দির প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল ।† মহারাজ উদয়মাণিক্যের
 স্বর্গারোহণের বৎসর (১৪৯৮ শকে), রাজ্যমধ্যে এক সঙ্গে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ

* বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৫ পৃষ্ঠা ।

† “দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান্ ।

জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্মাণ ॥

* * * *

কত দিনে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে ।

হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড

উপস্থিত হওয়ায় বহু প্রজা বিনষ্ট হয় । * তৎপূর্বেব রাজ্যের উত্তরভাগে (কৈলাসহর প্রভৃতি অঞ্চলে) এরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে, পরিবারবর্গের মধ্যেও একে অন্যের সাহায্যে কুণ্ঠিত ও অপারগ হইয়াছিল । এই দুর্ভিক্ষে মুদ্রার বিনিময়ে শস্য পাওয়া অসম্ভব হওয়ায়, অনেক অর্থশালী ব্যক্তিকেও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল । রাজমালা প্রথম লহরে এতৎ সংস্কৃত কাতাল ও কাকচাঁদ সম্বন্ধীয় একটা প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যাইবে । এই দুর্ভিক্ষের দরুণই কৈলাসহর হইতে ত্রিপুরার রাজধানী উঠাইয়া লইতে হইয়াছিল এবং উক্ত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ত্রিপুরায় অনেক সময় রাজ্যময় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিবার বিস্তর
মহামারী। প্রমাণ পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে বসন্তরোগের কথাই বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য । রাজমালার দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ধর্ম্মমণিক্য, ধন্যমণিক্য এবং বিজয়মণিক্য—এই তিনজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভূপতি বসন্তরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ধন্যমণিক্যের পরবর্ত্তী এবং বিজয়মণিক্যের পূর্ববর্ত্তী মহারাজ দেবমণিক্য ও ইন্দ্রমণিক্য শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । তাঁহাদের রোগে মৃত্যু হইলে বসন্তরোগের হাত এড়াইতে পারিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন । সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে সর্ব্বাপেক্ষা রাজাকে নিরাপদ রাখিবার সূব্যবস্থা করা একান্ত স্বাভাবিক । এরূপ অবস্থায়ও উপযুক্তপরি তিন জন রাজা বসন্তরোগে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সেকালে রাজ্য মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বিশেষ তীব্র ছিল, এবং তদরুণ ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইত ।

বসন্তরোগের প্রাবল্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, সেকালে বসন্তরোগের প্রাবল্যের
কারণ। টিকা গ্রহণ করা হইত না । রাজ্য মধ্যে এই রোগ লাগিয়া থাকিবার ইহা এক প্রধান কারণ । এতদ্ব্যতীত নৈসর্গিক কোন কারণ ছিল কি না, বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই । বর্ত্তমানকালেও কুকি প্রভৃতি পার্বত্য প্রজাগণ গো-বীজ টিকা গ্রহণ করিতে গুরুতর আপত্তি করিয়া থাকে । রাজসরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না ।

* “চৌদ্দশ আটানব্বই শকেতে তখন ।

পারার গুটিকা রাজা করেন ভক্ষণ ॥

* * * *

সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী ।

অস্থি পূর্ণ হৈল সব দেখি সারি সারি ॥

অন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বহুতর নর ।”

উদয়মণিক্য খণ্ড ।

রাজধানী



শিল্প ।

প্রথম লহরোক্ত শিল্প কার্যগুলি এই সময়ে ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ
 শিল্প কার্য ও
 শিল্পকার। করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মহারাজ বিজয়মাণিক্য ধ্বজঘাট হইতে
 অনেক কাংশ্র বণিক আনিয়া রাজ্য মধ্যে কাস-পিত্তলের শিল্প
 প্রচলন করেন। ইহাদিগকে ধ্বজঘাট হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের বসতি
 স্থানের নাম 'ধ্বজনগর' হইয়াছে। এই স্থান বিশালগড় থানার এলাকায় অবস্থিত।
 এইসূত্রে রাজ্য মধ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বাঁশ, বেত, কাষ্ঠ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক সুন্দর
 সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করা হইত। বর্তমানকালে সেই সকল
 বিবিধ শিল্প। শিল্পের আদর কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া থাকিলেও তাহার কোনটাই
 সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুবর্ণাদি ধাতু নির্মিত নানাবিধ আভরণ, গজদন্তের পাটী ও
 উৎকৃষ্ট কারুকার্যখচিত বিবিধ বস্তু এবং নানাপ্রকার খেলার সামগ্রীর কথা এস্থলে
 উল্লেখযোগ্য।

বয়ন-শিল্পের স্থান সকলের উপরে। ত্রিপুর রাজ্যে এই শিল্প অতিশয়
 উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। নানাশ্রেণীর পাছুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র
 বয়ন-শিল্প। এবং চাদর ইত্যাদি সচরাচর সকল পরিবারের মধ্যেই বয়িত
 হইত এবং বর্তমানকালেও অনেক পরিবারেই সেই শিল্প অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের
 সর্বদা পরিধানযোগ্য এক প্রকারের মোটা বস্ত্রের প্রচলন আছে, স্থানীয় ভাষায়
 তাহাকে 'দুবড়া' বলে। এই 'দুবড়া' শব্দ নিতান্ত আধুনিক নহে। প্রাচীন
 বঙ্গসাহিত্যেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। * দুই বেড়দ্বারা পরিধান করা হইত
 বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম 'দুবড়া' হইয়াছে। কুকিগণ কার্পাসদ্বারা একপ্রকার আসন
 প্রস্তুত করে, তাহার নাম 'পরী'। ইহা গালিচার প্রণালীতে বয়ন করা হয়। 'পরী'
 যেমন পুরো, তেমনি কোমল। ইহা কুকি-শিল্পের বিশেষত্ব। অন্য কোন জাতীয়
 শিল্পী ইহা বয়ন করিতে জানে না এবং শিক্ষার চেষ্টাও করে না। মণিপুরী স্ত্রীলোকের
 পরিধেয় একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার
 পাড়ের সুচিকার্য শিল্প দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

ত্রিপুরার সর্বোৎকৃষ্ট বয়ন-শিল্প রিয়া বা কাঁচলির শিল্প নৈপুণ্য এবং আদরের
 রিয়া বা কাঁচলি। কথা প্রথম লহরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাঁচলির
 ব্যবহার অতিশয় প্রাচীন। সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার
 বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষা বিজয়ের পর, সীতা দেবীকে তাঁহার

* "গুলিলে শ্রাঙ্কের নাম বজমানের পাড়া।

বান্ধা দিয়া খায়্যা যার স্ত্রীর দুবড়া ॥"

সমক্ষে উপস্থিত করিবার কালে যে বেশবিন্যাস করা হইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায়,—

“হৃদিমাবে শোভে তার বিচিত্র কাঁচলি ।
মুকুতার হার উপরে করিছে ঝলমলি ॥”
কুন্তিবাস ।

দ্বিজবংশী দাস প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিই কাঁচলির উল্লেখ করিয়াছেন ।
সেকালে এই বস্ত্রের কারুকার্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং শিল্পীগণ ইহাতে শিল্প-
নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য বিশেষ যত্নবান থাকিতেন । কবি রূপরামের ধর্মরাজের গীত
হইতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ;—

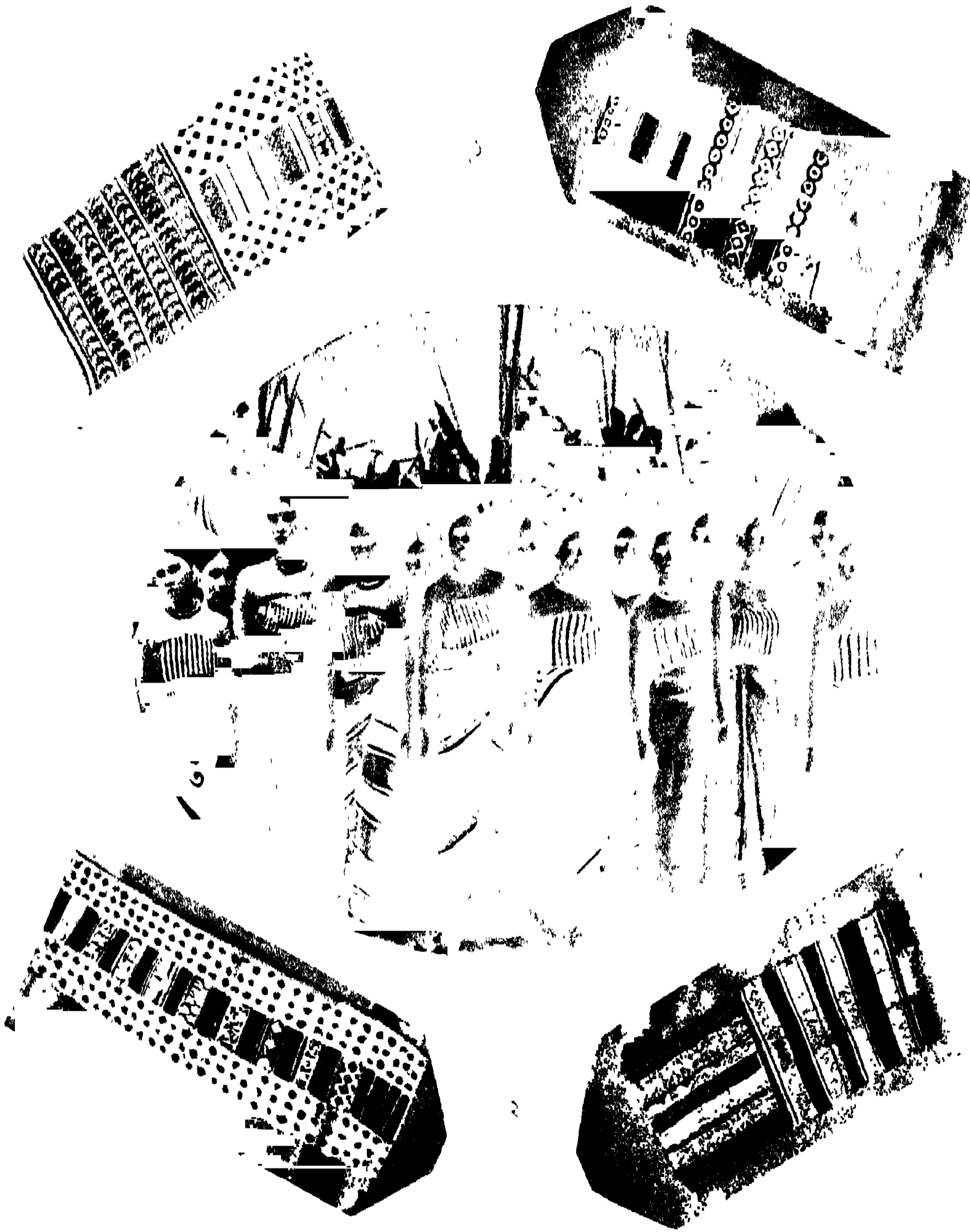
“কাঁচলির সম্মুখেতে পূর্ণরাস লেখা ।
মাধবেরে গোপিনী যেখানে দিল দেখা ॥
সারি সারি শোভা পায় মোল শ গোপিনী ।
তার মধ্যে দণ্ডাএ আছেন চক্রপানি ॥
* * * * *
পূর্ণরসে লিখিল সম্মুখে দান খণ্ড ।
ভাস্কানায় রাধাকাণ্ড তরঙ্গ নিখণ্ড ॥” ইত্যাদি ।

রূপরামের ধর্মরাজের গীত ।

এইরূপ অক্ষুর সংবাদ, রাসলীলা, দানকেলী, দেবীযুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ
প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবীর চিত্র এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির চিত্রদ্বারা কাঁচলির শোভা
বর্ধন করা হইত । ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত রিয়া বা কাঁচলি দেখিলে বুঝা যাইবে,
এই রাজ্যেও কাঁচলির বয়ন কার্যে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে । ইহার
শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য কয়েকখানা কাঁচলির চিত্র দেওয়া যাইতেছে । উল্লেখ করা
আবশ্যক যে, ইহার সমস্তই রাজপরিবারস্থ মহিলাগণের দ্বারা বয়িত । শিল্প কার্যগুলি
বুনটে করা হইয়াছে, ইহা ছুঁচের কাজ নহে ।

ত্রিপুরার রেশমের কারখানা এবং রেশমী বস্ত্র এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল । তাহা
প্রধানতঃ চীন দেশে রপ্তানী হইত । সেই দেশের সহিত ত্রিপুরার বিনিময় বাণিজ্য
প্রচলিত ছিল ।

ত্রিপুরার বয়ন এবং সীবন শিল্প মহিলাগণের করণীয় । স্মরণাতীতকাল হইতে
শিল্পকার্য মহিলাগণের করণীয় । এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে । রাজমালা আলোচনা করিলে জানা
যাইবে, কলির প্রারম্ভকাল হইতে (ত্রিপুরায় শিল্প কলার প্রবর্তক
মহারাজ ত্রিলোচনের সময় হইতে) বর্তমানকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে
নাই । কেবল ত্রিপুরায় নহে—সমগ্র ভারতেই বৈদিককাল হইতে সূত্র প্রস্তুত এবং
বস্ত্র বয়ন মহিলাগণের কর্তব্য ছিল । ঋগ্বেদের ২য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম মণ্ডলে এ বিষয়ের
উল্লেখ পাওয়া যায় ।



ত্রিপুরার বয়ন-শিল্প ।

১-২ । বিবিধ প্রকারের 'রিয়া' (কাঁচালি) ।

৩ । বক্ষে 'রিয়া' পরিহিতা রমণীবৃন্দ ।

রাজ্যের বিশেষত্ব ।

ত্রিপুর রাজ্যে স্বর্ণের খনি থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায় ।
খনিজ পদার্থ। ধন্যমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

“আর তত্ত্ব মহারাজা শুনিল তখন ।
কুকি রাজ্যে স্বর্ণের হসে ত উৎপন্ন ॥
* * * * *
জামাতা হোপকলাউ মনে গর্ব ভার ।
থাংচান্স চড়িয়া যায় সোণা আনিবার ॥
কিরাত সকলে মিলে যুক্তি করে সার ।
সোণা পাইলে থানা এথা থাকিব রাজার ॥
মন্ত্রণাতে জামাতাকে মতপান দিল ।
মুগ্ধেতে বিহ্বল জামাই কুকিরে মারিল ॥”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড ।

বৈদেশিক পরিব্রাজকগণও এই রাজ্যের স্বর্ণ খনির সংবাদ রাখিতেন ॥
টেভার্নিয়ার এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ত্রিপুর রাজ্যের অনেক কথা পাওয়া যায়, তিনি স্বর্ণ খনির
কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । এই ভ্রমণকারীর গ্রন্থ হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে
উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

“There is nothing in *Tipra* which is fit for strangers (strangers).
There is a Mine of Gold, but the Gold is very coarse (coarse). And
there is a fort (sort) of very coarse (coarse) Silk, which is all the Revenue
the King has. He exacts no Subsidies (Subsidies) from his Subjects ;
but only that they, who are not of the prime Nobility, should (should)
work six (six) days in a year in his Mine, or in his Silk-works. He
sends (sends) his Gold and his Silk into *China*, for which they bring
him back Silver, which he coins into pieces to the value of ten Sous.
He also (also) makes thin pieces of Gold, like the *Ajpers* (*Aspers*) of
Turky ; of which he has two forts (sorts), four of the one fort (sort)
making a Crown, and twelve of the other.”—(Tavernier's Travells, by
J. Phillips, Book III., Part II., Chap. XVI. Of the Kingdom of Tipra.)

উদ্ধৃত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুরার উৎপন্ন স্বর্ণ চীন দেশে রপ্তানী
হইত, এবং তদ্বিনিময়ে চীন হইতে রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার
ব্যবস্থা ছিল ।

এতদ্ব্যতীত লৌহ, কয়লা, কেরোসিন তৈল, লবণ ও কেওলিন (বাসন এবং
পুতুল ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণের মাটী) প্রভৃতির খনি রাজ্যমধ্যে ছিল এবং বর্তমানকালেও
আছে ।

ত্রিপুরার পর্বতে পূর্বে ঘোড়া ছিল । কুকিগণ অনেক সময় রাজাকে অন্যান্য বস্তু ঘোটকের বিবরণ । বস্তুর সহিত ঘোড়া উপঢৌকন প্রদান করিত । *

ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী মণিপুরের জঙ্গলে অত্যাধিক ঘোটকের অস্তিত্ব বিদ্যমান ঘোড়া উৎপত্তির কথা । রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় ত্রিপুর পর্বতে ঘোড়া থাকা বিচিত্র নহে । কোনও আদিদৈবিক কারণে অথবা পার্বত্য প্রদেশে জন বসতির আধিক্য হেতু ঘোটক বংশ বিলুপ্ত কিম্বা স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহাই অনুমিত হয় । বর্তমান সময়ে এ রাজ্যের জঙ্গলে ঘোড়া পাওয়া যায় না ।

বন্য হস্তী ত্রিপুরার এক বিপুল সম্পদ । এই রাজ্যের হস্তী অতিশয় সুন্দর এবং দীর্ঘজীবী । প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে খেদা করিয়া হস্তী ধরা বন্য হস্তীর বিবরণ । হয় । জন বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তীযুথ ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে । এই কারণে, অশ্বের ন্যায় হস্তীও এ রাজ্যের জঙ্গলে ক্রমশঃ দুস্প্রাপ্য হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করে । হস্তী সম্বন্ধীয় স্থূল বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে ।

শাসন-তন্ত্র ।

রাজমালা প্রথম লহরে দেখা গিয়াছে, সেনাপতিগণই শাসন বিভাগের কর্তা সেনাপতিগণের বাবহার । ছিলেন । দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, এই কালেও সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই । সৈনিক ও শাসন বিভাগ এক হস্তে পতিত হওয়ায়, অনেক সময় রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অশান্তি ও বিপ্লব সঞ্চারিত হইয়াছে । দুর্দর্শ ও প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্বহস্তে শাসনভার পাইয়া নিজকে সর্ববিসর্বা মনে করিতেন ; অনেক সময় রাজাকে উপেক্ষা করিয়া, স্বীয় প্রভু স্বাপনের প্রয়াসী হইতেন, এমন কি তাঁহাদের সঙ্কল্পের পরিপন্থী রাজাকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না । এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । কোন কোন সেনাপতি ক্ষমতা গর্বে এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, রাজাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই । অনেক রাজা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও ইহাদের প্রভাব খর্ব করিতে সমর্থ হন নাই ।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে কালা খাঁ, গগন খাঁ ও খাঁ ছাম্থুম্ খাঁ উপাধিকারী (ছাম্থুম্ খাঁ) নামক ব্যক্তিত্রয় অমাত্য হইয়াছিলেন, অথচ ইহারা সেনাপতিগণ । সকলেই পরাক্রমশালী সেনাপতি ছিলেন । ধর্ম্মমাণিক্য এবং বিজয়মাণিক্যের সময়ও ইহারা সেনাপতির সম্মানিত পদ হইতে বঞ্চিত হন নাই ।

* (১) “নানাবিধ বস্তু যত নানারঙ্গ ঘোড়া ।

সহস্র সহস্র কুকি আসিল দিগম্বরী ॥”

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড ।

(২) “পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া তাকে দিল নৃপে ।”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসনকালে জামির খাঁ গড় পাঠানগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেনাপতি গগন খাঁ প্রবল পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময়ে সৈন্যধ্যক্ষ কালা খাঁ 'নাজির' উপাধি ও মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তিনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মাভূতি প্রদান করেন । † খাঁ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পার্বত্য রিয়াং জাতীয় ছিলেন । রিয়াংগণের মধ্যে 'চাপিয়া খাঁ' উপাধি বর্তমানকালেও আছে । এই উপাধির ব্যক্তিগণ ভাবী রায় (রাজা) । ত্রিপুরার সৈনিক ও শাসন বিভাগে রিয়াং জাতির প্রাধান্য লাভের বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; এ স্থলে রায় কাচাগু ও রায় কছমের নাম উল্লেখযোগ্য । খাঁ উপাধি বিশিষ্ট সেনাপতিদিগকে রিয়াং জাতীয় বলিয়া নির্দেশ করিবার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট কারণ । ইহারা অপ্রতিহতভাবে এক হস্তে শাসন বস্ত্র এবং সামরিক বল পাইয়াও কোনরূপ বিচলিত হন নাই, ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে । অত্যাচ্য উপাধিধারী সেনাপতি ও শাসনকর্তাগণের বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান করা হইয়াছে ।

শাসন-প্রণালী ।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময়ে মুসলমানগণের অনুকরণে যে শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত কালে সেই শাসন-প্রণালী পরিবর্তনের চেষ্টা । প্রণালীই অব্যাহত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই সময়ও সেনাপতিগণই শাসনের কর্তা ছিলেন । মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে 'উজীর' পদের প্রতিষ্ঠাদ্বারা মন্ত্রণাদি কার্য সেনাপতিগণের হস্তচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই ।

দূরবর্তী অথবা নব বিজিত প্রদেশের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইত, তাঁহারা 'লস্কর' পদবী বাচ্য ছিলেন । খণ্ডল ও ছান্দুলনগর লস্কর পদের প্রবর্তনা । (কৈলাসহর) ত্রিপুর রাজ্যের নির্যোজিত লস্করদ্বারা শাসিত হইতেছিল । মহারাজ বিজয়মাণিক্য, মাধবকে ভূষণার লস্করীপদের প্রলোভনে বাধ্য

* "গগন খাঁ নামেতে রাজার সেনাপতি ।"

তার মনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাতাহাতি ॥"

ধনুমাণিক্য খণ্ড—২৫ পৃঃ ।

† "প্রাতঃকালে কালা নাজির যুদ্ধ আরম্ভিল ।

পূর্ব প্রেরিত বাম বাজু পশ্চাতে রাখিল ॥

* * * *

পৈশুণ্যে না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ ।

যুদ্ধে পড়িল নাজির এই সে কারণ ॥"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৪৭।৪৮ পৃঃ ।

করিয়া, তদ্বারা সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে বধ করাইবার কথা পূর্বের বলা হইয়াছে ।
সেকালে লক্ষ্মণের পদ বিশেষ সম্মানিত ছিল এবং তাঁহারাই আপন আপন
বিভাগের সর্ব্বময় শাসনকর্তা ছিলেন । এই পদ মুসলমান শাসনের অনুকরণে সৃষ্টি
হইয়াছিল ।

বিচার কার্যের নিমিত্ত তৎকালে লিখিত আইন, অথবা আদালত প্রতিষ্ঠিত
ছিল না । শাসনকর্তাগণ ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত যুক্তি অবলম্বনে
স্বীয় বিবেকানুযায়ী বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন । সেকালে
আইন ব্যবসায়ীর কুটবুদ্ধি ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইত না । দোষী
ব্যক্তি সরল চিত্তে বিচারক সমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করিত, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত
করিয়া নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস ছিল না । বিচারপ্রার্থীগণ
বিচারককে পিতা, অভিভাবক অথবা দেবতার ন্যায় মনে করিত এবং কোন পক্ষই
তাঁহার নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, সুতরাং সেকালের বিচারে
বর্ত্তমানকালের ন্যায় আইন-নজিরের ‘মারপেঁচ’ অথবা সওয়াল-জবাবের সোর হাঙ্গামা
ছিল না ; এই কারণে বিচারের পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদঘাটিত
হইত । অপিচ, অর্থী-প্রত্যার্থীকে রক্ষ্ম, তলনানা, বারবরদারী ইত্যাদির চাপে সর্ব্বস্বাস্ত
হইতে হইত না ।

অপরাধিগণের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল কি না, বুলিবার উপায় নাই । গুরুতর
অপরাধের নিমিত্ত শিরচ্ছেদ, অথবা শূলে চড়াইয়া প্রাণদণ্ড করিবার
ব্যবস্থা ছিল । কোন কোন সময় দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে কুকুরদ্বারা
খাওয়ান হইত । এতদ্ব্যতীত হস্তী পদতলে নিষ্ক্রেপ এবং নাসা, কর্ণ ইত্যাদি ছেদনের
ব্যবস্থা থাকাও জানা যাইতেছে । এই সকল দণ্ডদেশ প্রাপ্তরে কিম্বা অন্য প্রকাশ্য
স্থানে সাধারণের সমক্ষে কার্য্যে পরিণত করিবার বিধান ছিল । ইহার কোন কোন
দণ্ড বর্ত্তমানকালে কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে সময়োপযোগী
ব্যবস্থা ছিল, সমসাময়িক বিভিন্ন দেশীয় দণ্ড পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলে ইহা
স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে । *

* অতীত রাজ্যের আইনে ধ্বংস সম্প্রদায়িক ভেদ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরায় তদ্রূপ ব্যবস্থা
কোন কালেই ছিল না । ত্রিপুর রাজ্যের পার্শ্ববর্তী হেডম্ব রাজ্য মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের শাসন-
কালে যে দণ্ডবিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নোক্ত ধারাগুলি লক্ষ্যযোগ্য ;—

“মারণে মারণ—মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয়, তবে তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল
শূলাদিদ্বারা মারিতে হয় ।”

“কৃতাপরাধোপি রাজনি কৃতপ্রহারঃ শূল মারোপ্যাগ্নেপচেৎ—কৃতাপরাধী যে রাজা, তাকেহ
যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব ।”

“ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং প্রহরণ শূদ্রঃ পাণি ছেদন দণ্ডঃ—শূদ্র যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে
হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয় ।”

দরবারের বিশেষ নিয়ম ।

সে কালে দরবারের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত ছিল । রাজগণ প্রতিদিন দরবারকালে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন । এবং দরবারে পালনীয় পদ্ধতি । রাজাকে প্রণাম করিবার কালে বাচুদ্বারা ইঙ্গিত করা হইত, সেই ইঙ্গিত মতে সকলে সমকালে রাজাকে প্রণাম করিত । * বর্তমানকালের বিগুল বা ব্যাগু বাজাইয়া সেলামি প্রদান ইহারই অনুরূপ প্রথা । দরবারে সকলকেই দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত । অতি অল্প সংখ্যক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি উপবেশনের অধিকার পাইতেন ।

কুট-নীতি ।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক সময় কুট-নীতি প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় । মহারাজ ধনুমাণিক্য, ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিদিগকে কৌশলজালে কুটনীতির আশ্রয় । আবদ্ধ ও নিহত করিবার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । † এতদ্ব্যতীত তিনি খণ্ডলের ভূমাধিকারী (বসিক) দিগকে বিদ্রোহচরণের প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি বসিক (ভূমাধিকারী) দিগকে মিত্রভাবে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট

“সভাসনেবসন শূদ্রঃ কট্যাং কৃত চিত্তঃ (ছিন্ন) অথবা নিতম্ব সমীপ মাংসখণ্ডং কর্তয়েৎ—
ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয় ।”
ইত্যাদি ।

এই আইন বিবাদ-দর্পণ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এবং প্রচলিত হইয়া থাকিলেও বর্তমানকালে এবিধ দণ্ডবিধি লোকে মানিয়া লইবে কি ?

মুসলমান আমলের আইন আরও অদ্ভুত, তাহার বর্ণে বর্ণে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইয়াছে । নিম্নে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ;—

“When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission : and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam,—the true religion and to shew contempt to false religions.”—(Von Neor's Akbar.)

শূল মর্শ্ব—“যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতি সহকারে তাহা দিতে হইবে ; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে খুখু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিয়া তাহা লইতে হইবে । ইহাতে তাহাদের স্বগার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই ; এই খুখু প্রদানের কয়েকটা নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশুতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলাম ধর্মের গৌরব ও মিথ্যা ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে ।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,—৩য় সংস্করণ, ৪২২ পৃঃ ।

* “ইসারাতে কহে সেলাম বাচু বাজাইয়া ।”

ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

† ধনুমাণিক্য খণ্ড—১১ পৃষ্ঠা ।

সহ্যবহার করিয়াছিলেন । পরিশেষে রাজাজ্ঞানুসারে বসিকগণ একদিবস দরবারে উপস্থিত হইলে, মহারাজের ইঙ্গিতমতে সৈন্যগণ তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিল । অতঃপর মহারাজ ধন্য স্বয়ং খণ্ডে যাইয়া সেই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন । *

মহারাজ বিজয়মাণিক্য যেমন বীর, তেমনি রাজনীতি-কুশল নরপতি ছিলেন ।

বিজয়মাণিক্যের
অবলম্বিত নীতি । তাঁহার প্রগাঢ় কূটনীতির একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দর্শনে অনেকেই
বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন । তৎসম্বন্ধীয় শুল বিবরণ নিম্নে
প্রদান করা যাইতেছে ।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মহারাজ বিজয়ের শ্রীহট্ট জয় কালে, তৎপার্শ্ববর্তী
জয়ন্তিয়ারাজের
অসত্য ব্যবহার । জয়ন্তিয়ারাজ ভীত হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরের সহিত প্রীতি স্থাপনার্থ
নানাবিধ উপঢৌকন সহ তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা
স্বীকার করিয়াছিলেন । মহারাজ বিজয়, জয়ন্তিয়ারাজের এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া
তাঁহাকে কতিপয় হস্তী উপহার প্রদান করেন । জয়ন্তিয়ারাজ স্বরাজ্যে যাইয়া প্রচার
করিলেন—“ত্রিপুরেশ্বর ভীত হইয়া আমাকে হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন ।”

অল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজ বিজয়ের কর্ণগোচর হইল । তিনি
হাডি সৈন্যের
জয়ন্তিয়ারাজের অভিযান । জয়ন্তিয়ারাজের অসঙ্গত স্পর্ধার কথা শুনিয়া কোপান্বিত হইলেন,
এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাদশ সহস্র হাডি জাতীয়
সৈন্য প্রেরণ করিলেন । দুর্বলের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ অথবা তাঁহাকে দমন করিবার
নিমিত্ত সৈনিক বল প্রয়োগ করা মহারাজ বিজয় সঙ্গত বোধ করেন নাই, এ জন্যই হাডি-
দিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল । শূকর তাড়াইবার সুদীর্ঘ যজ্ঞী তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং
ডগর রণবাণ ছিল । এই নববিধানের অভিযান নিশ্চয়ই আমোদজনক এবং হাস্যোদ্দীপক
হইয়াছিল । জয়ন্তিয়ারাজ এই ঘটনায় লজ্জিত এবং ভীত হইয়া, হেড়ম্বেশ্বরের
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই সময় নির্ভয় নারায়ণ হেড়ম্বের অধিপতি ছিলেন । †

* ধন্যমাণিক্য খণ্ড—১৫ পৃষ্ঠা ।

† রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“এমত সাজিয়া সবে থানাতে যায়ন্তু ।
শুনিল খাসিয়া রাজা এ সব বৃত্তান্ত ॥
শীঘ্র গিয়া মিলিলেক হেড়ম্ব রাজাতে ।
দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে ॥
হেড়ম্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ ।
পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৪৫ পৃঃ ।

রাজমালার এই উক্তিদ্বারা ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ও হেড়ম্বেশ্বর নির্ভয় নারায়ণ সমসাময়িক
নির্ণীত হইতেছেন । আসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট সাহেবের মতে, শত্রুদমন বা প্রতাপ

তিনি জয়ন্তিয়াপতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনার্থ মহারাজ বিজয়কে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলেন । বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া হইতে হাঁড়ি সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া হেড়ম্বেশ্বরের অনুরোধের মৰ্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন । *

এই সময় জয়ন্তিয়ার (খাসিয়ার) রাজা কে ছিলেন, জানা আবশ্যিক । পুরাবৃত্ত পরাজিত আলোচনায় জানা যায়, জয়ন্তিয়া নারীদেশ বলিয়া জৈমিনি ভারতে জয়ন্তিয়া রাজ কে ? উক্ত হইয়াছে । এই প্রদেশের অধীশ্বরী বীরঙ্গনা প্রমীলার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল । তদবধি সুদীর্ঘ কাল জয়ন্তিয়া রাজ্য হিন্দুরাজ্য কর্তৃক শাসিত হইয়াছে । তৎপর খস ও সিন্ঠেঙ্গ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণ কর্তৃক হিন্দু রাজ্যের বিলোপ ঘটে ; এবং জনৈক পার্বত্য সরদার জয়ন্তিয়া প্রদেশের শাসন দণ্ড ধারণ করেন, তাঁহার নাম পর্বত রায় । গেইট সাহেবের মতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ।

পর্বত রায়ের পরে, মাঝ গোসাঞি (১৫১৬—১৫৩২ খৃঃ), বুড়া পর্বত রায় (১৫৩২—১৫৪৮ খৃঃ), বড় গোসাঞি (১৫৪৮—১৫৬৪ খৃঃ), রাজত্ব করিয়াছেন ।

নারায়ণ ১৬১০ খৃঃ অব্দে হেড়ম্বের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি কোন্ সন হইতে কোন্ সন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, গেইট সাহেব তাহা বলেন নাই । খ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশের উপসংহারে লিখিত আছে ;—“কেবল জয়ন্তিয়াপতি নহে, বীরবর শত্রুদমন আহোম নৃপতি প্রতাপ সিংহকে পরাজয় করেন, এবং স্বয়ং প্রতাপ নারায়ণ নাম ধারণ পূর্বক রাজধানী মাইবঙ্গকে কীর্ত্তিপুৰ নামে অভিহিত করেন । ইনিই কাছাড় রাজবংশাবলীতে নির্ভয় নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন ।” এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে, গেইট সাহেবের কথিত শত্রুদমন বা প্রতাপ নারায়ণ এবং রাজমালার নির্ভয় নারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি । বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন । নির্ভয় নারায়ণ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ; তিনি ইহার কতিপয় বৎসর পূর্বে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণ অসুস্থ হইয়া অসঙ্গত হইবে না । সুতরাং ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ও হেড়ম্বের অধিপতি নির্ভয় নারায়ণ সমসাময়িক ছিলেন, এক্ষণ নির্ধারণ করা যাইতে পারে ।

কৈলাস বাবুর রাজমালার কাছাড় (হেড়ম্ব) রাজগণের যে বংশলতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নির্ভয় নারায়ণ, পাণ্ডুপুত্র ভীমের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই নির্ধারণ নিতান্তই অযৌক্তিক । যিনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি মহাভারতোক্ত ভীমসেনের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় হইতে পারেন না । ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য, মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ১০৮ স্থানীয় । ত্রিপুর, যুদ্ধিরের সমসাময়িক রাজা, সুতরাং নির্ভয় নারায়ণকে ভীমের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় ধরা হইলে, তিনি বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক অথবা ১৬১০ খৃঃ অব্দের রাজা হইতে পারেন না । এই কারণে কৈলাস বাবুর নির্ধারণ প্রমাদমূলক সাব্যস্ত হইতেছে ।

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ খ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ে এবং কৈলাস বাবুর রাজমালার ২য় ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

বড় গোসাঞির পর বিজয়মাণিক জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। * ইনি ১৫৬৪ হইতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; এতদ্বারা ইনি জয়ন্তিয়াপতি বিজয়মাণিকের সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন এবং এতদ্বয়ের মধ্যেই পূর্বেবক্ত সজ্বর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতাও ইহাই বলিয়াছেন, যথা ;—

“বড় গোসাঞির পর বিজয়মাণিক (সম্ভবতঃ) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার সময়ে ত্রৈপুর রাজবংশেও বিজয়মাণিক্য নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই বিজয়মাণিক্য প্রখ্যাতকীর্তি রত্নমাণিক্যের ষষ্ঠ পুরুষ স্থানীয়। * * ইহার পরাক্রমের সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তিয়াপতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তৎসহ মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন।” †

এই ‘মৈত্রী স্থাপন’ ফলেই জয়ন্তিয়াপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন এবং তন্মূলে উৎপন্ন মনোমালিন্য হেতু হাঁড়ি সৈন্য দ্বারা জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। হেড়ম্বেশ্বরের মধ্যবর্তীতায়, জয়ন্তিয়াপতি ত্রিপুরেশ্বরের ক্ষমা লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু এই দারুণ অপমানের কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। প্রতিহিংসা পরতন্ত্র জয়ন্তী-নাথ ত্রিপুর রাজ্যস্থ পর্বতবাসী কিরাতদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে বিজয়মাণিক্যের কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন।

মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতি কুশল ও কূট-নীতিজ্ঞ ভূপতির নিকট এই জয়ন্তিয়া রাজনীতিক কৌশল। গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অধিককাল গোপন রহিল না। তিনি জয়ন্তিয়া রাজ্যের কার্যের প্রতিবাদ না করিয়া, আত্মবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে কালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্তী, ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা ‘সাখাসেপ্’ ও ‘খাজাচেপ্’ আখ্যাত হালাম সম্প্রদায়ের কুকিগণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের রাজ্যের সীমা ও রাজসম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুরক্ত প্রজা হইলেও রাজনীতি কুশল মহারাজ বিজয় এই সময় তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জয়ন্তিয়াপতির কুহকে ভুলিয়া কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতঃপর মহারাজ কুকিদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া, চির-বশ্যতাবিগর্হিত কোন কার্যে লিপ্ত না হইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন ; এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদিগকে ধাতু নির্মিত বিতস্তি পরিমিত একটা হস্তী ও একটা ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি

* রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় ‘রাজ চিহ্ন’ শীর্ষক অংশে জয়ন্তিয়ার তিন জন ভূপতি ‘মাণিক’ উপাধি গ্রহণ করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিজয়মাণিকের নাম পাওয়া যাইবে।

† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অধ্যায়।



উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । উক্ত মূর্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে বঙ্গাক্ষরে, নিম্নোক্ত সংস্কৃত বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“পূর্বাপোষ্য ক্রমাদ্ভবন্ত আত্মীয়া,
ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি,
তদোপরি ধর্মঃ শশ্ব নাশোভবি- *
শ্রুতি পশ্চাদ্গজ শার্দূলৌ ॥”

এই বাক্যাবলী বিশুদ্ধ এবং বিস্পর্ষিত নহে ; ইহা ইঙ্গিতবাণী মাত্র । লিপির কোন কোন অংশ ক্ষয় হেতু অস্পর্ষিত হওয়ায়, আয়তনবর্ধক কাঁচের (magnifying glass) সাহায্যে পাঠ করিতে হয় । আমরা অতি কষ্টে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি । এই সাক্ষেতিক বাক্যের স্থূলমর্ম্য নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“তোমাদের সহিত পূর্বাপর যে আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে, ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম ও শশ্ব বিনষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দূল কর্তৃক তোমরাও বিনষ্ট হইবা ।” †

কুকিগণ দুর্ধর্ম হইলেও সাধারণতঃ ধর্মভীরু এবং রাজভক্ত ; রাজাকে তাহারা কুকি জাতির দেবতা বলিয়া জানে । ইহাদের স্বকৃত শশ্বই জীবিকা নির্বাহের রাজভক্তি। একমাত্র সম্বল । সর্বদা অরণ্যে বাস করিতে হয়, স্তুরাং প্রবল শত্রু হস্তী ও ব্যাঘ্র তাহাদের চির সহচর এবং এই সকল রিপু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয় । তাহারা প্রতিজ্ঞাব্রহ্ম হইলে, পূর্বোক্ত রাজ-শাসনে ধর্ম ও শশ্ব নষ্ট এবং গজ ও শার্দূল কর্তৃক নিহত হইবার ভীতিসঙ্কুল অনুজ্ঞা থাকায়, কুকিগণ সেই আজ্ঞাকে দেবতার আদেশ জ্ঞানে, বংশ পরম্পরা বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছে ; এবং উক্ত মূর্তিদ্বয়কে দেবতা জ্ঞানে প্রতিদিন ভক্তির সহিত অর্চনা করিয়া থাকে । ওঝাইগণ ‡ এই পূজার অধিকার পাইয়াছে ।

এই প্রতিমূর্তিদ্বয় মহারাজ বিজয়ের রাজনীতিক গান্ধীর্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উগ্রস্বভাব অসভ্য কুকিগণের কর্কশ হৃদয়ে রাজ ভক্তির বীজ চিরস্থায়ী করা যাইতে পারিত কি না, বর্তমানকালে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে ।

* পাঠের প্রথমাবধি “শশ্ব নাশোভবি” পর্যন্ত গজ পৃষ্ঠে এবং পরবর্তী অংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।

† এতদ্বিবক্ষিত বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত “মহারাজ বিজয়মালিকা” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

(নব্যভারত—কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৩০৪ বাং) ।

‡ কুকির পৌরোহিত্য কার্যের ভার যাহাদের হস্তে অর্পিত হয়, তাহারা ‘ওঝাই’ আখ্যা পাইয়া থাকে ।

সে কালে রাজকর কি নিয়মে নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। সমভূমির করের হার অতি অল্প ছিল, ইহা বুঝা যায়।

রাজকর ।

পার্বত্য কুকিগণ, পূর্ব প্রথানুসারে নানাবিধ বস্ত্র এবং বগ্ন জন্তু বার্ষিক ভেট প্রদান করিত এবং তাহাই কর স্বরূপ গণ্য হইত। মহারাজ ধন্যমাণিকোর শাসনকালে কুকিগণের প্রদত্ত ভেটের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

“গজদন্ত গবয় ছাগ কাংশু বাণ্ড ঘোঙ্গ ।
রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বস্ত্র বিশাল স্ত-বস্ত ॥
কাংশু থালি পিকদানী তাম্রের কঙ্কণ ।
উবা ফেরু জল পাত্র দেবদারু বন ॥
কিরাতিয়া খড়্গা শক্তি পিত্তল কাংশু বাড়ি ।
রাজভেট পাঠাইল পূর্ব অন্তসারি ॥
নানাবিধ বস্ত্র নানা রঙ্গ ঘোড়া ।
সহস্র সহস্র কুকি আমিল দিগম্বর ॥”

এই তালিকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, গজদন্ত, ঘোড়া ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুর সহিত, রাজগণের অগ্রাহ্য তাম্রের কঙ্কণ ইত্যাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুও আছে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, কুকিগণ যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত এবং তাহাদের ভক্তি প্রণোদিত হৃদয়ে যে বস্তু রাজাকে প্রদান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহাই রাজদরবারে উপস্থিত করা হইত। সেই বস্তু মূল্যবান হউক বা অকিঞ্চিৎকর হউক, ভক্ত প্রজার প্রদত্ত উপহার বলিয়া রাজা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত পর্বতবাসী অন্ত্র শ্রেণীর প্রজা এবং কুকিগণ রাজকরের বিনিময়ে, বৎসরের মধ্যে ছয় দিবসের নিমিত্ত সোণার খনিতে এবং রেশমের কারখানায় কার্য্য করিতে বাধ্য ছিল। এবং সরকারী হস্তীখেদার কার্য্যকালে ইহারা উপস্থিত থাকিয়া, উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত রাজকর্ম্মচারীর আদেশ ও উপদেশানুসারে খেদার কার্য্য সম্পাদন করিত। রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরের স্বার্থ এবং সম্মান রক্ষার নিমিত্ত ইহারা যুদ্ধ করিত। পার্বত্য প্রদেশে সরকারী সংবাদ প্রচার করা এবং রাজকর্ম্মচারিগণ পর্বতে গেলে তাঁহাদের সঙ্গীয় জিনিসপত্র বহন করিয়া এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল কারণে ইহারা করের দায় হইতে মুক্ত ছিল। সমভূমির প্রজাগণ হইতে মুদ্রা কর গ্রহণ করা হইত, তাহার হার অতি সামান্য ছিল।

এই সময় ত্রিপুরায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। ইহা রাজদরবারের

মুদ্রা।

তদ্বাবধানে প্রস্তুত হইত। রাজগণ কোনও উল্লেখযোগ্য সংকার্য্য করিলে অথবা স্বয়ং নূতন প্রদেশ জয় করিলে, তাহা স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে নূতন মুদ্রা প্রস্তুত এবং ঘটনার স্থূলমর্ম্ম তাহাতে উৎকীর্ণ হইত।

সিংহাসনারোহণ, তীর্থ কার্য সম্পাদন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করতঃ মুদ্রা প্রস্তুতের নিদর্শন রাজমালায় অনেক পাওয়া যাইবে। * সে কালে মুদ্রার স্থলে কড়ির প্রচলন থাকিবারও নিদর্শন পাওয়া যায়। †

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা রাজমালায় পাওয়া যায় না। প্রথম

সমাজতত্ত্ব ।

লহরের টীকায় বলা হইয়াছে, রাজমালায় কেবল রাজগণের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অথচ রাজা সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন। যে গ্রন্থে সাধারণের বিষয় আলোচিত না হয়, তাহাতে সমাজতত্ত্ব পাইবার আশা যে বিরল, এ কথার উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। আনুসঙ্গিকভাবে যে দুই একটা কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইবে।

সুরাব প্রভাব ।

সে কালে রাজ্যমধ্যে মদ্যের প্রচলন অধিক ছিল। কুকি প্রভৃতি পার্বত্য জাতি জলের ন্যায় মদ্য ব্যবহার করিত, বর্তমানকালেও তাহার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। থানাংচির কুকিগণ ত্রিপুরবাহিনী কর্তৃক সুদীর্ঘ আট মাস কাল দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও মদ্যপানে বিরত হয় নাই। ‡ রাজার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বগণের মধ্যেও মদিরার আদর ছিল। ধন্যমানিক্য স্বীয় জামাতা হোপাকলাউকে স্বর্ণ সংগ্রাহের নিমিত্ত কুকি প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুকিগণ বুঝিল, উক্ত প্রদেশে স্বর্ণখনি থাকিবার বিষয় প্রকাশ পাইলে ত্রিপুরেশ্বর তথায় থানা বসাইবেন। তদ্বরণ তাহাদের নানাবিধ অসুবিধা ঘটবে এবং সোণার খনিতে কাজ করিতে হইবে। তাহারা এই উপদ্রব নিবারণোদ্দেশ্যে মদ্যব্রত করিয়া রাজ জামাতাকে সমস্মানে গ্রহণ করিল, পরিশেষে মিত্রভাবে অতিরিক্ত মদ্যদ্বারা বিহ্বল করিয়া,

* (১) “চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল ।

চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥”

ধন্যমানিক্য খণ্ড ।

(২) “ফলমতি তীর্থে স্নান করে মহামতি ।

মোহর মারিল তথা দান ধন্য যতি ॥”

দেবমানিক্য খণ্ড ।

(৩) “ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ মারিল ।

ধ্বজ ঘাট বিজয়ী বলে মোহরে লিখিল ॥”

বিজয়মানিক্য খণ্ড ।

+ “হেন মতে পঞ্চশত কুম্বাণ্ড লইল ।

রাজঘর হনে কড়ি শুড়িরে দেওয়াইল ॥”

বিজয়মানিক্য খণ্ড ।

‡ থানাংচির কুকিগণ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“গড়ের উপরে মৈত্র মদে মত্ত হৈয়া ।

ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়া ॥”

ধন্যমানিক্য খণ্ড ।

সংক্রান্তীন অবস্থায় তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল । * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের আদেশানু-
সারে মাধব নামক ব্যক্তি, প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে অত্যধিক সুরা পান
করাইয়া বিহ্বল অবস্থায় নিহত করিবার নিদর্শনও রাজমালায় পাওয়া যায় । †
সৈনিক বিভাগে সুরার প্রাদুর্ভাব থাকিবার কথা প্রথম লহরে পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়
লহরেও এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই । সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কথা উপরে
বলা হইয়াছে । ত্রিপুরেশ্বরের পাঠান সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উজীরকে বধ করিয়াছিল ;
এবং বিজয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল ।
কিন্তু সুরামত্ত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কলহ হওয়ায়, গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া
পড়িল । ‡ মহারাজ বিজয় তাহাদিগকে এই ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া-
ছিলেন, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । মহারাজ বিজয় চট্টগ্রাম জয় করিয়া যে সকল
বস্তু পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি স্বর্ণকুশাণ্ড § ছিল । জনৈক সৈন্য

* “মন্ত্রণাতে জামাতাকে মত্ত পান দিল ।
মত্তেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল ॥”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

† “জন্ম খাটিয়া মত্ত পান করিল বল্লভ ॥
আন মত্ত না খাইব কহে সেনাপতি ।
পিয় বলি মাধবে পিয়ায় মত্ত অতি ॥
মত্ত পানে সেনাপতি পরিলোক খাটে ।
খড়গ লৈয়া তখনে মাধবে নাথা কাটে ॥”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

‡ “মত্ত পানে পাঠানের কলহ জন্মিল ।
পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে বাক্ত হৈল ॥”
বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

§ সে কালে সোণাঘারা কুশাণ্ডের আকারবিশিষ্ট ডেলা প্রস্তুত করিয়া তাহা রক্ষা করা
হইত ।

প্রাচীন কালে সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং দেশময় স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি
ছিল । সোণার ভাঁটা বালকগণের খেলার সামগ্রী ছিল । ইহা দূর দেশের কথা নহে, ত্রিপুর
রাজ্যের পার্শ্ববর্তী (পরবর্তী কালে রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট) মেহেরকুলেরই এবস্থিৎ সমৃদ্ধি ছিল ।
এরূপ অবস্থার কালে কুশাণ্ড আকারের স্বর্ণ ভাঁটার অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না ।
‘ময়নামতীর গানে’ সে কালের অবস্থা পাওয়া যায় ;—

“কাহার বাটিতে কেহ উদার না চাইত ।
সোণার ঢেলুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত ॥
হাড়াইলে ঢেলুয়া পুনি না চাহিত য়ার ।
এমতে গোআইল লোকে হরিষ অপার ॥
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলিবাঁশের বেড়া ।
গৃহস্তের পরিদান সোণার পাছুরা ॥” ইত্যাদি ।
(ভবানী দাস ।)

গোপনে একটী কুম্ভাণ্ড শুঁড়িকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে মদ্যপান করিয়াছিল । * রাজপরিবারের মধ্যেও মদ্যের প্রচলন না ছিল এমন নহে । অমরমাণিক্য, জয়মাণিক্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকাকালে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি রণাগণ, তাঁহাকে মদ্যপান করাইয়া নিহত করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন । †

কেবল পুরুষগণের সুরাসক্তির কথা বলিলে চলিবে না । রমণী সমাজেও মদ্যের প্রচলন থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । মহারাজ ধনুমাণিক্যের মহিষী সৈন্তের রমণীদিগকে মদ্যপান করাইয়া তাহাদের অবস্থা দর্শনে আনন্দ লাভ করিতেন । ‡

সেকালে মদ্য অতি সুলভ ছিল । স্বর্ণ কুম্ভাণ্ডের বিনিময়ে মদ্য পান করিবার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে । এতদুপলক্ষে রাজমালা বলেন ;—

“পিতলের জানিয়া কুম্ভাণ্ড নিয়াছিল ।
এক আনা মূল্য করি মদ্য পান কৈল ॥
অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত ।
স্বর্ণ কুম্ভাণ্ড হেন জানিল পশ্চাত ॥
দূত মুখে শুনি রাজা তদন্ত করিল ।
সুঁড়ি ঘরে দিয়া পাইকে মদ্য পান কৈল ॥
আষ্টসের মদ্য তাতে করিয়াছে পান ।
এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিত্তমান ॥” §

রাজমালার এই উক্তিদ্বারা জানা যায়, এক আনা মূল্যে আট সের অর্থাৎ প্রতি পয়সায় দুই সের মদ্য পাওয়া যাইত । সেকালে প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য চুঁয়াইবার অধিকার ছিল এবং বর্তমান কালের ন্যায় সুরার উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য ছিল না ।

* “দৈবে কুম্ভাণ্ড এক পাইকে লুকাইয়া ।
মদ্য পান করিছিল শুঁড়ি ঘরে গিয়া ॥”
বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

† অমরমাণিক্য স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

“আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে ।
মদ্য পান করাইয়া চাহিল মারিতে ॥”
জয়মাণিক্য খণ্ড ।

‡ “সাগরের খনন দেখিতে মহারানী ।
সৈন্তের রমণী সনে রাত্রিতে আপনি ॥
জ্যোৎস্নাকাল কোন রাত্রে নারিগণ সঙ্গে ।
মদ্য মাংস খাওয়াইয়া চাহে বহু রঙ্গে ॥”
ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

§ রাজমালা—বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

বিশেষতঃ মদিরা প্রস্তুতের উপকরণ তৎকালে বিনামূল্যে অথবা অল্প মূল্যে পাওয়া যাইত । মদিরা এত সুলভ হইবার ইহাই কারণ ।

সমাজে আর একটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা কোন কার্য সম্পাদনার্থ ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান অথবা পান প্রদান দ্বারা আমন্ত্রণ ও সম্মান প্রদর্শনের প্রথা ।

বিদায় কালে পান প্রদান করা । সেনাপতি ও মন্ত্রী গোপীপ্রসাদ নারায়ণ, স্বীয় জামাতা অনন্তমাণিক্যকে বধ করিবার নিমিত্ত রাজার মল্ল-গুরু গদাভীমকে অনুরোধ করিলেন । গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিল ;—

“পুরুষানুক্রমে আমি তাহার চাকর ॥
শতধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি ।
তার বংশ মারি আমি নাহি অব্যাহতি ॥
দশ দ্বিজ সম যেন এক রাজা হয় ।
রাজ বংশ বধে হয় নরক নিশ্চয় ॥
ছত্রধারী সিংহাসন সেই রাজা হয় ।
তার বধে মহাপাপ ধর্মশাস্ত্রে কয় ॥
বিশেষ আমার বংশ পালিল নৃপবরে ।
কিবা ধর্ম হয়ে আমি তাকে মারিবারে ॥” *

মন্ত্রী বুঝিলেন, ইহার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । তখন,—

“এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিঃশব্দে রহিল ।
পান দিয়া গদাভীম বিদায় করিল ॥” †

অন্যত্রও পান প্রদানদ্বারা আহ্বান বা বিদায় করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । রত্নমাণিক্যের শাসনকালে তিনি, স্বীয় মাতুল বলিভীম নারায়ণ, অনুজ দুর্জয় দেব এবং রাজবংশজাত গৌরীচরণ ও চম্পকরায় এই চারি জনকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । রাজা অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া যুবরাজগণই রাজকার্য সম্পাদন করিতেন । এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিশ্রুত হস্তী উপহার না পাওয়ায়, ঢাকার সুবা বাহাদুর খাঁ বহু সংখ্যক সৈন্যসহ কেশরলালকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । মোগল সেনাপতি কেশরলাল, স্বীয় অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ত্রিপুরেশ্বর হস্তী প্রদান করিতেছেন না । বলিভীমই এই অনর্থের কারণ । তোমরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আন । হস্তী না পাইলে যুদ্ধ

* রাজমালা—অনন্তমাণিক্য খণ্ড ।

† এইরূপ পান প্রদানের প্রথা হিন্দু সমাজে আধুনিক নহে ; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে এই প্রথা প্রচলিত থাকিবার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে ।

অনিবার্য্য । বলিভীমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি সাহসী হও, সে দর্প সহকারে আমার হস্তের পান গ্রহণ কর ।” *

কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন সময়ে যুবরাজ হরিমণি দেব, ইফ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপ্তানের † সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন । তিনি প্রত্যাগমন কালে সাহেব তাঁহাকে বিদায় উপহার স্বরূপ একটা উৎকৃষ্ট বন্দুক, একটা পিস্তল, একখান বনাত ও পান প্রদান করিয়াছিলেন । ‡

ত্রিপুর রাজ্যে পান প্রদানদ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা অद्याপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । কোন শুভ কার্য্য সম্পাদনার্থ রাজাজ্ঞা গ্রহণকালে এবং সেই কার্য্যোপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার কালে পান প্রদান করা হয় । ইহা ত্রিপুর সমাজের সুপ্রাচীন প্রথা ।

রাজদরবারে পান ও গন্ধ দ্রব্য প্রদান করা হিন্দু রাজত্বকালের নিয়ম । সেকালে পানের সহিত চন্দন দেওয়া হইত ; সেই প্রাচীন প্রথা অনুসরণে অद्याপি হিন্দুগণের বিবাহ সভায় পান ও চন্দন দেওয়া হয় । মুসলমান শাসনকালে চন্দনের পরিবর্তে আতর প্রচলিত হইয়াছে । তদবধি রাজদরবারে পান এবং আতর প্রদান করা হয় । ত্রিপুরার রাজদরবারেও এখন পানের সহিত চন্দনের বিনিময়ে আতরই প্রদান করা হইতেছে ।

এই কালের রাজ-মহিষীগণ ধর্ম্মপরায়ণা, সাধবী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন ।

ভূমিদান, জলাশয় খনন এবং দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ মহিলা সাহস্য । প্রকারের পুণ্য-কার্য্যদ্বারা অনেকে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । অনেক রাজ-মহিষী সহস্র বদনে পতির চিত্তারোহণ দ্বারা হিন্দুমহিলার সতীত্ব গরিমার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ।

রাজ-মহিষীগণের তেজস্বিতা ও বুদ্ধি প্রার্থ্যের দৃষ্টান্ত অনেক আছে ; এস্থলে তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ।

* ‘চম্পকবিজয়’ নামক হস্তলিখিত পুথিতে এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

“কোন ব্যক্তি ঘাইবা যে হও আগুমান ।

দর্প করি হস্ত হনে লও গুয়া পান ॥”

† এই সাহেবের নাম কৃষ্ণমালায় ‘কিংলাক’ লিখিত হইয়াছে । এই নাম বিশুদ্ধ কি না, বুঝিবার উপায় নাই । রাজমালা ও কৃষ্ণমালা লেখকগণ অনেক ইংরেজের নাম বিকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে ভূত বনাইয়াছেন ।

‡ কৃষ্ণমালা নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

“পিস্তল বন্দুক তই ইম্পাত নিশ্চাণ ।

এই অস্ত্র আমার যুদ্ধেতে প্রধান ॥

এই বনায়ত যে অঙ্গের আভরণ ।

তোমাকে দিলাম খাতিরজমার কারণ ॥

পান দিয়া সাহেবে যে বহু আখাসিয়া ।

বাসা যাইতে যুবরাজ বিদায় করিয়া ॥” ইত্যাদি ।

অনন্তমণিক্য, তাঁহার শশুর গোপীপ্রসাদের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই
 অতিরিক্ত বশ্যতাই তাঁহার বিনাশের কারণ হইয়াছিল, এ কথা
 রাজ-মহিষীর প্রার্থ্য। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। রাজ-মহিষী (গোপীপ্রসাদের কন্যা),
 পিতার ব্যবহারে সন্দেহ হইয়া রাজাকে সর্বদা শশুরালায়ে যাইতে নিষেধ করিতেন,
 কিন্তু রাজা তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। পরিশেষে গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভে রাজাকে
 নিধন করিলেন। মহারানী পতিসহ চিতা আরোহণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু
 পিতা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি
 শোকে এবং ক্ষোভে অভিভূত হইয়া ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় দুষ্কর্মান্বিত পিতাকে
 আক্রমণ করিলেন এবং তীব্র বাক্যবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।
 রাজ্যলোভাক্ত গোপীপ্রসাদ দুহিতার কর্কশ বাক্যে ও করুণ রোদনে কর্ণপাত না
 করিয়া, তাড়াতাড়ি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই দৃশ্য রাজ-মহিষীর অসহনীয়
 হওয়ায়, তিনি সিংহীর ন্যায় গর্জন করিয়া বলিলেন,—“তুমি রাজ্যলোভে রাজাকে
 হত্যা করিয়া ক্ষুরধার নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছ; আমাকে পতির সহগামিনী
 হইতে বাধা জন্মাইয়া ঘোর পাপজনক কার্য্য করিয়াছ। রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য
 গ্রহণ করিয়াছ, রানী বাকী থাকিবে কেন?” ইহা বলিয়া মহারানী পিতার বাম
 পার্শ্বে বসিবার নিমিত্ত সিংহাসনারোহণ করিলেন। পাপিষ্ঠ গোপীপ্রসাদ এবার
 কন্যার নিকট পরাজিত হইলেন; কন্যাকে বাম পার্শ্বে বসিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি
 রাম নাম উচ্চারণ পূর্বক সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর গোপীপ্রসাদ
 রাজধানীর সম্মিহিত চন্দ্রপুর গ্রামে সিংহাসন উঠাইয়া নিয়াছিলেন। *

এই সময় রাজ্য মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেনাপতি গোপী-
 প্রসাদের (উদয়মণিক্য) দ্বিতীয়া পত্নী, পাঁচালী পাঠ করিয়া
 স্ত্রীশিক্ষার নিদর্শন। পতিকে শুনাইবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। প্রতিভাময়ী
 রাজ-মহিষীগণের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহাই
 প্রতীয়মান হয়; কিন্তু রাজমালাকার তদ্বিষয়ক কোনও স্পষ্ট বিবরণ প্রদান করেন নাই।

ইঙ্গিত ও সাক্ষেতিক চিহ্ন।

মনোগত ভাব অণ্ডকে বুঝাইবার নিমিত্ত ত্রিপুরায় নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত
 ছিল; তদ্বারা অনেক গুরুতর বিষয়ও সহজে বুঝান যাইত।
 ইঙ্গিত। জয়মণিক্যের সেনাপতি অমরদেব স্বয়ং বলিয়াছেন;—

“আমা মারি রণাগণ রাজা হৈতে চায় ॥

আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে।

মত্তপান করাইয়া চাহিল মারিতে ॥

* হস্তলিখিত ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ গ্রন্থ আলোচনার জানা যায়, উদয়মণিক্য (গোপীপ্রসাদ)
 কন্যাকে চণ্ডীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদানপূর্বক সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। চণ্ডীগড়,
 উদয়পুর ও সোণামুড়ার মধ্যবর্তী, মেলাগড়ের সম্মিহিত স্থানে অবস্থিত।



কদবা-চিহ্ন।

তাহা না জানিয়া আমি গেলাম তখনে ।

পান বটু ছেদি আমার দেখায় অত্ন জনে ॥”

জয়মণিক্য খণ্ড—৭৪ পৃঃ ।

পানের বোটা ছেদন করিতে দেখিয়াই অমরদেব সমস্ত ক্লেশবস্থা বুঝিয়াছিলেন এবং অসুস্থতার ভাগ করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন । এই ইঙ্গিত না পাইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য ছিল ।

গোপনে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ ভাব জানাইবার নানাবিধ ইঙ্গিত সমাজে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমান কালেও আছে । এ স্থলে তাহার একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে । পার্বত্য ত্রিপুরাগণের মধ্যে বিবাহ-প্রার্থী বরকে এক বৎসর কাল কন্যার বাড়ীতে থাকিয়া বিনাবেতনে কন্যার অভিভাবকগণের নির্দেশমতে জুম ক্ষেত্রের ও সংসারের নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিতে হয় । এবশ্বিধ প্রথার মর্ম এই যে, ভাবী জামাতা ও কন্যার মধ্যে পরস্পর সম্ভাব জন্মিবে কি না এবং বিবাহ-প্রার্থী ব্যক্তি কন্যাকে পালন ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে কি না, কন্যার অভিভাবকগণ এই সুযোগে তাহা বুঝিয়া লয় । এবং ভাবী জামাতাদ্বারা বিনা বেতনে কার্য করাইয়া, তাহা পণের বিনিময় বলিয়া মনে করে । কন্যা-পণ প্রদানে সমর্থ ব্যক্তিকে এরূপ খাটিতে হয় না । যদি কোন ভাবী বরকে কন্যা পছন্দ না করে, তবে সে কোন কথা না বলিয়া, অন্তের অলক্ষিতভাবে বরের ভাতের মধ্যে অঙ্গার কিম্বা অন্তবিধ অখাচ্য বস্তু গুঁজিয়া দেয়, পানীয় জলে মুন কিম্বা বাটা লঙ্কা গুলিয়া দেয় । এইরূপ ব্যাপার দেখিলেই ভাবী বর বুঝিতে পারে, এখানে তাহার সুবিধা হইবে না ; তখন সে নীরবে সরিয়া পড়ে ।

অনেক সাক্ষেতিক চিহ্ন রাজ কার্যেও গ্রহণ করা হইত । কোন স্থাবর

সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, অথবা কোন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ
কদ্বা ।

হইলে, লিখিত ক্রোকি পরওয়ানা কিম্বা নিষেধ আজ্ঞা প্রচারদ্বারা নিরক্ষর ও বর্বর পার্বত্য প্রজাদিগকে তাহা বুঝান কঠিন হইত ; একটা সাক্ষেতিক চিহ্নদ্বারা সেই উদ্দেশ্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে । স্থানীয় ভাষায় সেই চিহ্নকে ‘কদ্বা’ বলে । একখণ্ড বাঁশের মাথা চৌফলা করিয়া, চিড়া স্থানের ফাটলে আড়াআড়িভাবে (× ক্রম্ভাবে) দুই টুকড়া বাঁশের চটা বসাইয়া, সেই বংশদণ্ড যেই স্থানে বা যেই সম্পত্তির সান্নিধ্যে পুঁতিয়া দেওয়া হইত, সেই স্থানের আশে পাশে কেহ যাইত না এবং এরূপ চিহ্নদ্বারা ক্রোক করা সম্পত্তি কেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না । কালক্রমে সরকারের অগোচরে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যে সে ব্যক্তি এই চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিল । এই কারণে, বিশেষতঃ আইনের বিধানানুযায়ী কার্য পরিচালনের কড়াকড়ি হেতু, সাক্ষেতিক চিহ্ন কার্যক্ষেত্রে অকর্মণ্য হওয়ার, এই চিহ্ন ব্যবহারের প্রথা ক্রমশঃ রহিত হইয়াছে ।

পার্বত্য প্রদেশের নিমিত্ত আর একটি সাক্ষেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল, তাহা বিশেষ গুরুতর। এই চিহ্ন লৌহ নির্মিত ছিল ; স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম 'ফুরাই'। এই চিহ্নবাহক পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া বাচনিক যে আজ্ঞা জ্ঞাপন করিত, তাহা পার্বত্য প্রজাগণ নিঃসঙ্কোচে রাজাজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিত। রাজার আদেশ ব্যতীত এই চিহ্ন বাহির করা হইত না ; এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত সামান্য কারণে ইহা ব্যবহারের প্রথা ছিল না। এই চিহ্নটি লইয়া সরকারী 'বিনন্দিয়া' সিপাহী পার্বত্য যে কোন পল্লীতে যাইয়া, যে আদেশ পালন করিতে হইবে তাহার মর্ম্ম জানাইত, এবং ফুরাইটি সেই পল্লীতে দিয়া আসিত। সেই পল্লীর লোক অবিলম্বে, তাঁহাদের সন্নিহিত অন্য পল্লীতে ফুরাই পৌঁছাইয়া রাজাজ্ঞা জানাইয়া দিত। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে ফুরাই চালিত এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজার আদেশ প্রচারিত হইত। ফুরাইটি হাতে হাতে সমস্ত পার্বত্য পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিত।

এই নিয়মে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পার্বত্য প্রদেশে রাজনিদেশ প্রচারিত হইত। সাধারণতঃ পার্বত্য প্রজাদিগকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্ধারিত স্থানে সন্মিলিত হইবার নিমিত্ত ফুরাই প্রেরণ করা হইত। ফুরাইতে কোন প্রাণীর রক্ত মাখাইয়া দিলে বুঝা যাইত—যুদ্ধ কার্যো যোগদান করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে লক্ষা মরিচ বাঁধিয়া দিলে বুঝা যাইত, কার্য্য বিশেষ জরুরী। একরূপ স্থলে এক পল্লীতে ফুরাই উপস্থিত হওয়া মাত্র মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া সেই পল্লীর লোকেরা অন্য পল্লীতে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য ছিল। দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে এই চিহ্ন চালাইতে হইত ; ঝড় ঝড়ি বা কোন প্রকারের বাধা বিঘ্নই এই কার্য্যের বাধা ঘটাইতে পারিত না। কোন পল্লীর লোক যথাসময়ে ফুরাই প্রেরণ পক্ষে শৈথিল্য করিলে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত।

বাঁশের দ্বারাও অনেক সময় ফুরাই প্রস্তুত করা হইত, তাহাকে স্থানীয় ভাষায় 'ওয়াথলং' বলে। এতদ্বারাও ফুরাইর উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত। বংশ নির্মিত ফুরাই বা 'ওয়াথলং'এর গোড়াভাগ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলে তাহা জরুরী বলিয়া গণ্য হইত।

স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথম আমল পর্য্যন্ত এই প্রথা সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কাল-মাহাত্ম্যে 'কদ্বার' ন্যায় 'ফুরাই' চালনার কার্য্যেও ব্যভিচার আরম্ভ হইল। সরকারের অগোচরে সময় সময় পার্বত্য পল্লীতে 'ফুরাই' প্রেরণ করা হইত। এই নিয়মের ব্যভিচারে রাজ্যে নানাবিধ অনির্ঘটপাত ও অশান্তি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকায়, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে খাস আপীল আদালতের (বৃটিশ গবর্নমেন্টের হাইকোর্ট স্থানীয়) ১২৯৫ খ্রিপূর্বাব্দের ২২শে আশ্বিন তারিখের আদেশমূলে এই প্রথা রহিত



ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক চিহ্ন ।

(১) ওয়াথলং ।

(২) ফুরই ।

হইয়াছে । যে প্রস্তাব ও আদেশদ্বারা ফুরাই চালনার প্রথা নিবারণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—



৪১ নং সেহা ।

মেমো ।

শ্রীশ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর কুমিল্লা অঞ্চলে পদার্পণ উপলক্ষে সোণামুড়া টাউনের জঙ্গল পরিষ্কার হেতু ত্রিপুরাগণকে সংগ্রহ করার অমুমতি প্রচার হইলে, অত্র সোণামুড়া থানার আছাবদ্দীন কনষ্টেবল বড় নারায়ণ নিবাসী শ্রামরায় চৌধুরীর বাড়ীতে কুলী সংগ্রহ হেতু গমনপূর্বক পীড়িত হওয়ায় নিজে যাইতে অক্ষম হইয়া অত্যাণ্ড ত্রিপুরাগণকে সংবাদ দেওয়ার জন্ত উক্ত শ্রামরায় চৌধুরী দ্বারা ফুরাই চালাইয়াছিল । শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ ভিন্ন এই প্রকার ফুরাই সাধারণে চালাইবার প্রথা নাই ।

অত্রত্য বিনন্দিয়া গারদের বরখাস্তী বিনন্দিয়া মুক্তাচরণ ত্রিপুরা তাহার নিজ কার্যে অত্র এলাকাস্থ রাঙ্গামুড়া বৈজ্ঞান্য ত্রিপুরার বাড়ীতে যাইয়া উপরোক্ত ফুরাই প্রাপ্ত হইলে, তাহা এখানে উপস্থিত করার পর উক্ত শ্রামরায় চৌধুরী, বৈজ্ঞান্য ত্রিপুরা এবং আছাবদ্দীন কনষ্টেবলকে তলব দিয়া জবানবন্দী লইলে দেখা গেল যে, আছাবদ্দীন কনষ্টেবলের অমুমতিমতে উক্ত শ্রামরায় চৌধুরী তাহার নিজ বাড়ীস্থিত ধনীরাম ত্রিপুরা নামক জনৈক ব্যক্তিদ্বারা ঐ ফুরাই প্রস্তুত করাইয়া বৈজ্ঞান্য ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল ।

উপরোক্ত হেতুতে উক্ত আছাবদ্দীন কনষ্টেবল ও শ্রামরায় চৌধুরীকে রীতিমত ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করিয়া জওয়াব গ্রহণান্তে বিবাদীর সাক্ষী তলবে মোকদ্দমা শুনানির দিন আগামী ১লা আশ্বিন ধাৰ্য্য হইয়াছে ।

বর্তমান ফুরাই চালনাতে সম্প্রতি যদিচ কোন অশান্তি বা অনিষ্টের কারণ না ঘটয়া থাকুক, বাস্তবিক ফুরাই চালনা যে কতদূর ভয়ানক ব্যাপার ও তৎকর্তৃক যে কত অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য । কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আইনতঃ কোন বিধান দেখা যাইতেছে না ; এবং ফুরাই চালনা নিষেধ বলিয়া জানা আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিষেধ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ থাকাতঃ দৃষ্ট হয় না । এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপ প্রতিবিধান করা কর্তব্য, সম্বন্ধ তদ্বিষয়ের বিহিতামুমতি পাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্ত একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । সেমতে—

হুকুম হইল যে,—

উপরোক্ত বিষয়ের কিরূপ প্রতিবিধান করা যাইবেক, সম্বন্ধ বিহিতামুমতি পাওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্ত একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনায় অত্র মেমোর এক খণ্ড প্রতিলিপি যোগ

রাজধানী মাননীয় আপীল আদালতের বিচারপতি সদনে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ জিৎ, তাং ২৮ শা ভাদ্র ।

(Sd.) Kailash Chandra Sen,
Sheristadar.

(Sd.) Harimohan Das,
Deputy Magistrate.

ফুরাই একটা সাক্ষেতিক চিহ্ন, যুদ্ধ ইত্যাদিতে কুকিগণ প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সাক্ষেতিক চিহ্ন দর্শাইয়া পার্শ্বীয় প্রজাগণকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। খ্রীশ্রীযুতের সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত “ফুরাই” কেহ স্বেচ্ছাচারিতাক্রমে ব্যবহার করার নিয়ম নাই। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও সরকারী অনুমতি ভিন্ন উক্ত “ফুরাই” ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে। সুতরাং বিবাদীগণের দণ্ড হওয়া সঙ্গত। সেমতে—

এবিষয় বিহিতার্থে এই কাগজ মহামন্ত্র খাস আপীল আদালতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৫ জিৎ, ২১শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর) শ্রীকালীকমল সেন,
সেরেস্টাদার।

(স্বাক্ষর) শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব,
আপীলের বিচারপতি।

৯১ নং সেহা।

ফুরাই যদি কেহ অসদ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে, তবে রাজ বিদ্রোহিতা ও রাজাঙ্গা উল্লঙ্ঘন ও শাস্তিভঙ্গাদির অপরাধে অপরাধী হইবে। যখন এই ব্যক্তিগণ অসরলভাবে কার্য করে নাই বলিয়া জানা যায়, তখন তাহাদিগকে ভালমত সতর্ক ও ভবিষ্যতে কেহ এমত করিলে শাস্তিভঙ্গাদির দোষী হইবে বলিয়া মেমো প্রচার জ্ঞাত এই কাগজ আপীল আদালতের যোগে সোণামুড়া পাঠান যায়। ১২৯৫ জিৎ, তারিখ ২২শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর) শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস,
পেঙ্কার।

(Sd.) M. R. Ray,
(স্বাক্ষর) শ্রীব্রজমোহন দেব,
খাস আপীল আদালতের
বিচারপতিগণ।

রাজগণের কাল নির্ণয়।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন রাজার শাসনকালের স্থূল বিবরণ প্রাসঙ্গিকরূপে পূর্বে আলোচিত হইয়া থাকিলেও এ স্থলে তদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল লইয়া রাজমালা দ্বিতীয় লহরের রচনা আরম্ভ

ধর্ম্মমাণিক্যের হইয়াছে; কিন্তু রচয়িতা ইহার রাজ্য লাভের সময় কিম্বা শাসন-
শাসনকাল। কাল নির্ধারণ করেন নাই। রাজমালার সমালোচক লঙ

(Rev. James Long) সাহেবের মতে ধর্ম্মমাণিক্য ১৪০৭ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া,

বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন । * এই হিসাবে ১৪০৭ হইতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজের রাজত্বকাল নির্ণীত হয় । পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;—“১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন ।” † তাঁহার মতে মহারাজের রাজত্বকাল ১৩২৯ শক হইতে ১৪১২ শক পর্য্যন্ত তিরিশি বৎসর । চাক্লে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ কমিং সাহেব (J. G. Cumming, I. C. S.) কৈলাস বাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন । ‘History of Tripura’ গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ সেণ্ডিস সাহেব (E. F. Sandy’s) ১৪০৭ হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ বৎসর ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । দেখা যাইতেছে, মহারাজের রাজ্যলাভের শকাব্দ সম্বন্ধে পূর্বেবক্তব্য ব্যক্তিগণের মধ্যে মতানৈক্য না থাকিলেও, রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ সম্পর্কে তাঁহার পরস্পর ঐক্যমত হইতে পারেন নাই । লঙ্ সাহেবের মতে মহারাজের রাজ্যভোগের কাল ৩২ বৎসর, কৈলাস বাবু ও কমিং সাহেবের মতে ৮৩ বৎসর, এবং সেণ্ডিস সাহেবের মতে ৫১ বৎসর নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে । ইঁহারা কি সূত্র অবলম্বনে মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, এবং শাসনকাল নির্দ্ধারণোপলক্ষে এবন্দিধ মত বৈষম্য ঘটিবার কারণ কি, কেহই তদ্বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, অথবা আত্মমত সমর্থনের চেষ্টাও করেন নাই ।

রাজমালা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, উপরিউক্ত নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত এবং প্রমাণসহ নহে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্মমাণিক্য ১৩৮০ শকে তাম্র-শাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন । ‡ এবং তিনি বত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছেন । § লঙ্ সাহেব প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতাবলম্বনে ১৩২৯ শক (১৪০৭ খৃঃ অব্দ) ধর্ম্মমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের সময় ধরা হইলে, উক্ত শক হইতে ভূমিদানের কাল (১৩৮০ শক) পর্য্যন্ত একাল বৎসর হয় । সেণ্ডিস সাহেব

* He was appointed Raja, A. D. 1407, with the unanimous consent of the people. “He soon sought the road to heaven” by presenting lands to the Brahmans, the titles to which were registered on copper plates. After a peaceful reign of thirty two years he died.

J. A. S. B.—Vol. XIX.

† কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাঃ, ৩য় অঃ, ৩৮ পৃঃ ।

‡ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রদত্ত তাম্র-শাসনে নিম্নলিখিত সময় নির্দেশক বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে,—

“শাকে শূণ্যাষ্ট বিখাকে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ

ত্রয়োদশাং সিতে পক্ষে মেবে সূর্যাস্ত সংক্রমে ।” ইত্যাদি ।

§ “বত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ ছিল ।

সুমধুর বাক্যে রাজ্য প্রজাকে পালিল ॥”

রাজমালা—২য় লহর, ৬ পৃঃ ।

বোধ হয় এই সূত্রই অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু যিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছেন, এবং ১৩৮০ শকে যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেক ১৩২৯ শকে হইতে পারে না । অপিচ, লঙ্ সাহেব রাজমালার মতানুবর্তী হইয়া, ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল বত্রিশ বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিলেও তিনি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৬১ শক) রাজত্বকাল শেষ হইবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায়, পূর্বেবাক্ত কারণে এই নির্ব্বাচন প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না । এ বিষয়ে রাজমালা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই ; পূর্বেবাক্ত ব্যক্তিগণ রাজমালার মত উল্লঙ্ঘন করিয়া ভ্রমবস্ত্রে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।

পক্ষান্তরে, দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের রচিত ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ নামক হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছেন । এতদনুসারে তাঁহার রাজত্বকাল ১৩৫৩—১৩৮৪ শক (১৪৩১—১৪৬২ খৃঃ) স্থিরীকৃত হইতেছে । এই নির্দ্ধারণ রাজমালার উক্তির সমর্থক বিধায় বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; এতদ্বারা মহারাজের বত্রিশ বৎসর রাজ্যভোগ করা এবং ১৩৮০ শকে বিত্তমান থাকা,—এতদুভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতেছে । সুতরাং ধর্ম্মমাণিক্য ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ নির্দ্ধারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল ।

ধর্ম্মমাণিক্যের পরলোক গমনের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য,
 প্রতাপমাণিক্যের
 রাজত্বকাল ।
 সেনাপতিগণের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, ১৩৮৫ শকে (১৪৬৩ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করেন । পূর্ণ এক বৎসর কাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই ; রাজ্যাভ্যর্থের অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । *

প্রতাপমাণিক্যের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য সেনাপতিগণের
 ধন্যমাণিক্যের
 শাসনকাল ।
 অনুকম্পায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । রাজমালার ইহার রাজ্যারোহণের বা রাজত্বকালের উল্লেখ না থাকিলেও আনুসঙ্গিক প্রমাণদ্বারা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে । ইনি প্রতাপমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা । ১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খৃঃ) অবসানের পূর্বেই প্রতাপের শাসনকাল অতিবাহিত হইবার কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে । সুতরাং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শকে রাজ্যাভ্যর্থ করিয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইতেছে । ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ পুথির বাক্যদ্বারাও এই নির্ব্বাচন সমর্থিত হয় । উক্ত পুথিতে ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—“আষ্ট শ তিহন্তর সনে রাজত্ব পাইল ।” ত্রৈপুরী ৮৭৩ সন ও পূর্বেবাক্ত ১৩৮৫ শক অভিন্ন ;

* “মহাবলবস্ত্র দেখি দিনে না মারিছে ।

সেনাপতি সবে চক্রে রাজিতে বধিছে ॥”

সুতরাং ত্রিপুর বংশাবলীর নির্দারণ মতে মহারাজ ধন্যের রাজ্যাভ্যে এই শকাঙ্ক বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না । উক্ত পুথিতে তাঁহার শাসনকাল নির্ণয়োপযোগী কথাও পাওয়া যায় ;—

“ক্রমাঙ্কয়ে তিগ্নান্ন বৎসর রাজত্ব করিল ।
নয়শ পঁচিশ সনে পরলোক হৈল ॥”

ত্রৈপুরী ৯২৫ সনে এবং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে প্রভেদ নাই । সুতরাং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খৃঃ) হইতে ১৪৩৭ শক (১৫১৫ খৃঃ) পর্যন্ত ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ত্রিপুর বংশাবলীর বাক্যদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্য, ১৪২৩ শকে (১৫০১ খৃঃ) ত্রিপুরানুন্দরীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন ।* এবং ১৪৩৫ ও ১৪৩৭ শকে তিনি দুইবার চট্টগ্রামে মুসলমানগণের সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছিলেন ।† তাঁহার শাসনকালের ১৪১৩, ১৪২৯, ও ১৪২৮ শকের কতিপয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । পূর্বেবক্ত নির্দারণের সহিত এই সকল কার্যকালের সামঞ্জস্য থাকায়, উক্ত নির্দারণ উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না ।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে ধন্যমাণিক্য ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে (১৪১২ শক) সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব ধারণ করিয়াছিলেন । কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস সাহেব, কৈলাসবাবুর মতাবলম্বন করিয়া, ১৪৯০—১৫২০ খৃষ্টাব্দ (১৪১২—১৪৪২ শক) ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল নির্দারণ করিয়াছেন । এই নির্বাচন মহারাজের পূর্বেবক্ত কার্যাবলীর বিরোধী না হইলেও নির্বিবাদে গ্রহণীয় নহে ; কারণ, ইতিপূর্বে ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল নির্দারণোপলক্ষে ইঁহারা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা সংশোধন না হওয়ায়, ধন্যমাণিক্যের রাজ্যাভ্যে শকাঙ্ক ইঁহাদের মতে ১৩৮৫ স্থলে ১৪১২ শক (১৪৯০ খৃঃ) অবধারিত হইয়াছে । এই অবধারণ রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত সময় অপেক্ষা সাতাইশ বৎসর অগ্রবর্তী হওয়ায় এবং শাসনকাল অথবা ক্রম (৫৩ বৎসর স্থলে ৩০ বৎসর) করায় মহারাজের পূর্বে

* “শাকে বহুক্ষিবোধোমুখ ধরনীকূতে লোকমাজ্জেহঁকিয়ারে ।
প্রাণাৎ প্রাণান্ন রাজং গগনপরিগতং সেবিতারৈ স দেবৈঃ ॥”
দেবী মন্দিরের শিলালিপি ।

† (১) “চৌদশ পাঁচত্রিশ শাকে সময় জিনিল ।
চাট্টগ্রাম জয় করি মোহর মারিল ॥”
ধন্যমাণিক্য খণ্ড—২২ পৃঃ ।

(২) “চৌদশ সাত্ত্রিশ শকে চাট্টগ্রাম জিনিল ।
শুনিয়া হোসেন সাহা মহা ক্রোধ মনে ॥”
ধন্যমাণিক্য খণ্ড—২৫ পৃঃ ।

কথিত কার্যাবলীর সময় এই নির্দ্ধারণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে । কিঞ্চিদনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, ত্রিপুর বংশাবলীর সহিত তুলনায় কৈলাস বাবু প্রভৃতির অবধারিত রাজ্যাভ্যে শকাব্দ সাতাইশ বৎসর অগ্রবর্তী হইলেও মহারাজের স্বর্গারোহণের কাল উভয় মতে পরস্পর পাঁচ বৎসর মাত্র ব্যবধান, এই কারণেই মহারাজের কার্যাবলীর সহিত এই নির্দ্ধারণে সময়ের সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে । ইহারা কি সূত্র অবলম্বনে সময়ের এবশ্বিধ উলটপালট ঘটাইয়াছেন, তাহা কেহই বলেন নাই । ধন্যমাণিক্যের সময় অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে ; পরবর্তী রাজগণের শাসনকালের সহিত ইহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না । সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, সেগুন্স সাহেব অনবধানতা প্রযুক্ত অথবা পূর্ববর্তী-গণের মত-বিপ্লবে পতিত হইয়া, ধন্যমাণিক্য ও ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের পরস্পর ওদল বদল করিয়াছেন ; অর্থাৎ ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল বত্রিশ বৎসর স্থলে একাল বৎসর ও ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকাল তিগ্নান বৎসর স্থলে ত্রিশ বৎসর অবধারণ করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । কিন্তু কৈলাস বাবু প্রভৃতির মতের ভিত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুমান করাও অসাধ্য হইয়াছে । এবশ্বিধ মত-বিরোধ স্থলে, ভিত্তিবিহীন মত পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য সূত্রমূলক হইলেও সেই মত গ্রহণ করাই কর্তব্য বিধায়, ধন্যমাণিক্য ১৩৮৫ হইতে ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত (১৪৬৩—১৫১৫ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাই অবধারণ করা হইল ।

ধন্যমাণিক্যের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন ।

ধ্বজমাণিক্যের রাজমালা এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায় না । শাসনকাল । সেগুন্স সাহেবও এই নামটী বাদ দিয়াছেন । কৈলাসবাবু ধ্বজমাণিক্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় নির্দেশোপযোগী কোন কথা বলেন নাই । কমিং সাহেবের মতে ইনি এক বৎসরেরও কম সময় রাজত্ব করিয়াছেন । ত্রিপুর বংশাবলীর মত অন্তরূপ ; উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

“ক্রমাগত ছয় বৎসর রাজত্ব করিল ।

নয় শ একত্রিশ সনে স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল ॥”

এই বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের (১৪৩৭ শকের) পর, ১৪৩৮ শক হইতে ছয় বৎসরকাল (১৪৪৩ শক পর্য্যন্ত) ধ্বজমাণিক্য রাজত্ব ধারণ করিয়াছিলেন । ত্রৈপুরী ৯৩১ সন ও ১৪৩৮ শকাদ্য পার্থক্য নাই । অবস্থানুসারে ত্রিপুর বংশাবলীর মতাবলম্বন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে ।

ধ্বজমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবমাণিক্য

দেবমাণিক্যের রাজ্যাভ্য করেন । ইহার রাজ্যাভিষেকের সময় রাজমালায় শাসনকাল । পাওয়া যায় না । কৈলাস বাবুর মতে ইনি ১৪৪২ শকে

(১৫২০ খৃঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন ; সেগুন্স সাহেব এবং কমিং সাহেবেরও

ইহাই মত । ত্রিপুর বংশাবলীতে লিখিত আছে, দেবমাণিক্য ৯৩২ ত্রিপুরাদে (১৪৪৪ শক—১৫২২ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন । * এই নির্দ্ধারণ কৈলাস বাবু প্রভৃতির নির্দ্ধারণ অপেক্ষা দুই বৎসর পশ্চাৎবর্তী ; কিন্তু মহারাজের রাজত্বের শেষ সময় সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতবৈধ নাই । কৈলাস বাবু বলিয়াছেন,—“চস্তাই † দেবমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাদে গোপনে হত্যা করেন ।” কমিং সাহেবের মতে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে দেবমাণিক্যের শাসনকাল শেষ হইয়াছে । এতদুভয় মতে প্রভেদ নাই ; ত্রিপুর বংশাবলী লেখকও ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন । ‡

কৈলাস বাবু প্রভৃতি দেবমাণিক্যের রাজ্যলাভের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী রাজা ধ্বজমাণিক্যের রাজত্ব অবসানের সময়ের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতেছে না, সুতরাং এই নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে না । এ বিষয়ে ত্রিপুর বংশাবলীর নির্দিষ্ট কালই অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় । কিন্তু ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৫৭ শক) মহারাজের রাজত্ব শেষ হইবার কথা পূর্বেবক্ত ব্যক্তিগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলেও এই উক্তি নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না । কারণ, রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে, দেবমাণিক্যের পরবর্তী রাজা ইন্দ্রমাণিক্য এক বৎসর, তৎপরবর্তী বিজয়মাণিক্য বেয়াল্লিশ বৎসর এবং তদনন্তর অনন্তমাণিক্য দেড় বৎসর রাজ্যভোগ করিবার পর, চৌদ্দ শত চৌরানব্বই শকে উদয়মাণিক্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । উক্ত ১৪৯৪ হইতে পূর্বেবক্ত রাজাত্রয়ের (ইন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য ও অনন্তমাণিক্য) শাসনকাল ৪৫ বৎসর বাদ দিলে, ১৪৪৯ শকে দেবমাণিক্যের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হইবে । এই হিসাবে ১৫২২ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (১৪৪৪—১৪৪৯ শক) দেবমাণিক্যের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয় ।

দেবমাণিক্যের পর ইন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল । শিশু ইন্দ্রকে সিংহাসনে
ইন্দ্রমাণিক্যের বসাইয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজ্য
শাসনকাল। শাসন করিতেছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যায়, ইহার রাজত্ব
এক বৎসর কাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল । § সুতরাং ইন্দ্রমাণিক্য ১৪৪৯ হইতে

* “নয় শ বত্রিশ সনে অভিষিক্ত হৈল ।

মহাদর্পে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিল ॥”

ত্রিপুর বংশাবলী ।

† দেবমাণিক্যকে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মৈথিল ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছিলেন ; এ কথা রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে, এরূপ অবস্থায় এই হত্যা-অপবাদ চস্তাইর ষাড়ে চাপাইবার কারণ বুঝা যাইতেছে না ।

‡ “দেবমাণিক্যকে কাটির ফেলিল ।

নয় শ পঁয়তাল্লিশ সন ত্রিপুরা আছিল ॥”

ত্রিপুর বংশাবলী ।

§ “এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসন ।”

রাজমালা—২য় লহর, ৩৭ পৃঃ ।

১৪৫০ শকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত (১৫২৭—১৫২৮ খৃঃ) রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে ।

ইন্দ্রমাণিক্যের পর বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করেন । ইহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে রাজমালায় এক ভ্রমাত্মক উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এই ;—

“সাতচল্লিশ বর্ষ নৃপের বয়স হৈয়াছিল ॥

সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে ।

দৈবগতি বসন্ত নৃপের হইল শরীরে ॥” ইত্যাদি ।

রাজমালা—২য় লহর, ৬৩ পৃঃ ।

রাজার সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা প্রকৃত নহে, তিনি বেয়াল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন এবং সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; প্রাচীন রাজমালায় এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

“বেয়াল্লিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ কৈল ॥

সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হইল যবে ।

দৈবগতি রাজার শীতলা হৈল তবে ॥” ইত্যাদি ।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায়ও অবিকল এই সকল বাক্য লিখিত আছে । সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্বের কথা যে লিপিকার প্রমাদমূলক, ইহা অতি সহজবোধ্য । আর একটা কথার দ্বারাও পূর্বেবক্ত বাক্যের অমূলকতা প্রমাণিত হইবে । মহারাজ সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করিবার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে, তিনি জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ কথা প্রকৃত নহে । মহারাজ বিজয়, দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র । দেবমাণিক্যের স্বর্গ প্রাপ্তির পর, বিজয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য এক বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর বিজয় সিংহাসন লাভ করেন । সুতরাং তিনি জন্মকাল হইতেই রাজত্ব পাইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না । ইনি পাঁচ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া, ৪২ বৎসর রাজ্য শাসন করিবার পর, ৪৭ বৎসরের কালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা । লিপিকার প্রমাদে রাজত্বকাল ৪২ বৎসর স্থলে যে ৪৭ বৎসর লিখিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে ।

মহারাজ বিজয়, ভারত সম্রাট মহামতি আকবরের সমসাময়িক ; তাঁহার

মহারাজ বিজয়
সম্রাট আকবরের
সমসাময়িক ।

সুযোগ্য মন্ত্রী আবুল ফজলের লিখিত ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে বিজয়মাণিক্যের নাম পাওয়া যায়, এ কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করা হইয়াছে । * এতদ্ব্যতীত কাছাড়ের অধিপতি নির্ভয় নারায়ণ ও

জয়স্তিয়া-রাজ বিজয়মাণিক্য, বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন । † বঙ্গেশ্বর

* রাজমালা—২য় লহর, ১১৭ পৃষ্ঠা ।

† রাজমালা—২য় লহর, ৪৫ পৃষ্ঠা ।

দায়ুদ শাহের সহিত চট্টগ্রামের অধিকার লইয়া ইঁহার সংগ্রাম হইবার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে । মহারাজ বিজয়ের শাসনকালের ১৪৮১ শকে (১৫৫৯ খৃঃ) মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । *

উক্ত বিবরণ সমূহের সাহায্যে এবং রাজমালার উক্তিধারা অবধারিত হইতেছে, মহারাজ বিজয় ১৪৫০ শক (১৫২৮ খৃঃ) হইতে ১৪৯২ শক (১৫৭০ খৃঃ) পর্য্যন্ত ৪২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

‘History of Tripura’ গ্রন্থের প্রণেতা সেণ্ডিস সাহেব এবং সেটেলমেন্ট

বিভিন্ন মতের অফিসার কমিং সাহেবের মতে বিজয়মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৩
মীমাংসা। খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন । কৈলাস বাবু

বলেন—মহারাজের শাসনকাল ৯৪৫ হইতে ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর । পূর্বেবক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাস বাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন । ত্রিপুর বংশাবলীর রচয়িতাও এই মতেরই পক্ষপাতী । রেভারেণ্ড লড্ সাহেব, মহারাজের শাসন-কালের শকাঙ্কের উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা বলিয়াছেন । † ইঁহারা সম্ভবতঃ রাজমালার প্রমাদমূলক উক্তি (সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্বের কথা) ধরিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । ইঁহারা যে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মহারাজের রাজ্যাভ্যন্তরে সময় অবধারণ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী রাজার (ইন্দ্রমাণিক্যের) শাসনকালের সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে । বিশেষতঃ রাজত্বকাল ৪২ বৎসর স্থলে ৪৮ বৎসর ধরিয়া ইঁহারা আর একটা সাজঘাতিক ভুল করিয়াছেন । সুতরাং ইঁহাদের অবধারণ বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই ।

অতঃপর অনন্তমাণিক্য ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন ।

অনন্তমাণিক্যের রাজমালায় ইঁহার রাজ্যাভ্যন্তরে সময়ের উল্লেখ নাই ; রাজত্বকাল
শাসনকাল । সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

“বৎসর দেড়েক রাজা রাজ্যের শাসন ।

পরলোক গেল রাজা শশুর কারণ ॥”

ইনি দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার পর, শশুর (সেনাপতি গোপীপ্রসাদ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । সুতরাং ইঁহার শাসনকাল ১৪৯২ শকের (১৫৭০ খৃঃ) মধ্যভাগ হইতে দেড় বৎসরকাল অবধারিত হইতেছে ।

* বিজয়মাণিক্য হীরা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাম্রপত্রদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন । সেই তাম্র ফলকের সময় জ্ঞাপক অংশ বিলুপ্ত হওয়ার, তদ্বারা ইঁহার শাসনকাল নির্ধারণ পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে ।

† অনন্তমাণিক্য সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের প্রারম্ভে লড্ সাহেব বলিয়াছেন,—

“His father soon after died of small pox having reigned 47 years.”

J. A. S. B.—Vol. XIX.

পূর্বেবাক্ত ঐতিহাসিকগণ অন্যান্য রাজার শাসনকালের ম্যায় এ স্থলেও সময়ের গোলমাল ঘটাইয়াছেন। কৈলাস বাবু, সেণ্ডিস সাহেব এবং কমিং সাহেব একবাক্যে বলিয়াছেন, অনন্তমাণিক্য ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন, ত্রিপুর বংশাবলীর মতে মহারাজ অনন্ত ১৯৪ হইতে ১৯৫ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত (১৫৮৪—৮৫ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী রাজগণের সময় হইতে গণনার দেখা যাইবে, এই নির্ধারণ ভ্রমসঙ্কুল। অনন্তের পরবর্তী রাজা উদয়মাণিক্যের শাসনকালের সহিত তুলনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত তিষ্ঠনীয় হইবে না। লঙ্ সাহেব অনন্তমাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার কথা বলিয়া রাজমালার মত সমর্থন করিয়াছেন। *

অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রসাদ জামাতাকে বধ করিয়া, উদয়-
উদয়মাণিক্যের
শাসনকাল।
মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার
রাজ্য প্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;—

“গোড়েশ্বর শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ ।

চৌদ্দ শ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন ॥”

এতদ্বারা পাওয়া যাইতেছে, উদয়মাণিক্য ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অবসান কালও রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“চৌদ্দ শ আটানব্বই শকেতে তখন ।

পারার গুটিকা রাজা করিল ভক্ষণ ॥”

বাজীকরণোদ্দেশ্যে পারদঘটিত বটীকা ভক্ষণের দরুণ ১৪৯৮ শকে উদয়মাণিক্য পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শক (১৫৭২ খৃঃ) হইতে ১৪৯৮ শক (১৫৭৬ খৃঃ) পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন। †

কৈলাস বাবুর সংগৃহীত রাজমালায় উদয়মাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;—
“গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগপূর্বক উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।” অন্যত্র লিখিত

* “Ananta Manik succeeded to the throne by the help of his father-in-law the quondam cook, with whom Ananta always dined. After the king reigned 1½ years he was strangled at the instigation of his father-in-law.” J. A. S. B.—Vol. XIX.

† “পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন ।

এই মতে মরিল উদয়মাণিক্য রাজন ॥”

রাজমালা—উদয়মাণিক্য খণ্ড ।

আছে,—“উদয়মণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়মণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরাদ্ধে (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।” এতদ্বারা উদয়মণিক্যের রাজত্বকাল এগার বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস সাহেব অবিচারিতভাবে, কৈলাস বাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশাবলী মতে ইনি ৯৯৫ হইতে ১০০৪ ত্রিপুরাদ্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজগণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে রাজমালা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই ; সুতরাং রাজমালার মত উপেক্ষা করিয়া উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের উক্তি সমর্থন করা যাইতে পারে না। উদয়মণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও চেষ্টা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

উদয়মণিক্যের পুত্র জয়মণিক্য রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা।

জয়মণিক্যের
শাসনকাল। ইনি ১৪৯৮ শকে (১৫৭৬ খৃঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ১৪৯৯ শক
(১৫৭৭ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার শাসনকাল
দেড় বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। *

কৈলাস বাবুর মতে, জয়মণিক্য ১০০৬--১০০৭ ত্রিপুরাদ্ধে (১৫৯৬--১৫৯৭ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস সাহেব এই ধারণাই পোষণ করিয়াছেন। লঙ্ সাহেব এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ত্রিপুর বংশাবলী বলেন, জয়মণিক্য ১০০৪ ত্রিপুরাদ্ধে (১৫৯৪ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের কোন নির্ধারণই বিশুদ্ধ নহে। রাজমালা রচয়িতা উদয়মণিক্যের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, জয়মণিক্যের রাজ্য লাভের কাল ১৫৯৪ কিম্বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, জয়মণিক্যের পরবর্তী অমরমণিক্যের শাসনকালের দুইটি রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ লক্ষ্যস্থানীয় হইবে ; ইহার একটা ১৪৯৯ শকে—অপরটা ১৫০২ শকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। রাজ্যলাভ করিবার পূর্বে কাহারও নামের মুদ্রা প্রচলিত হইতে পারে না, এ কথা সর্ববাদীসম্মত ; সুতরাং অমরমণিক্য ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। এরূপ স্থলে অমরমণিক্যের উর্দ্ধতন ভূপতি জয়মণিক্যের শাসনকাল ১৫৯৪ কি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে জয়মণিক্য ১৫৭৬--১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না।

* “ক্রমাঘরে দেড় বৎসর রাজত্ব করিল।”

ত্রিপুর বংশাবলী।

উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভুক্ত রাজগণের (ধর্ম্মাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত) শাসনকাল যেরূপ নিরূপিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

নাম ।	শক ।	ত্রিপুরাক ।	খৃষ্টাব্দ ।
ধর্ম্মাণিক্য . . .	১৩৫৩—১৩৮৪	৮৪১—৮৭২	১৪৩১—১৪৬২
প্রতাপমাণিক্য ...	১৩৮৫—১৩৮৫	৮৭৩—৮৭৩	১৪৬৩—১৪৬৩
ধনুমাণিক্য ...	১৩৮৫—১৪৩৭	৮৭৩—৯২৫	১৪৬৩—১৫১৫
ধ্বজমাণিক্য . . .	১৪৩৮—১৪৪৩	৯২৬—৯৩১	১৫১৬—১৫২১
দেবমাণিক্য . . .	১৪৪৪—১৪৪৯	৯৩১—৯৩৭	১৫২২—১৫২৭
ইন্দ্রমাণিক্য . . .	১৪৪৯—১৪৫০	৯৩৭—৯৩৮	১৫২৭—১৫২৮
বিজয়মাণিক্য ...	১৪৫০—১৪৯২	৯৩৮—৯৮০	১৫২৮—১৫৭০
অনন্তমাণিক্য ...	১৪৯২—১৪৯৪	৯৮০—৯৮২	১৫৭০—১৫৭২
উদয়মাণিক্য . . .	১৪৯৪—১৪৯৮	৯৮২—৯৮৬	১৫৭২—১৫৭৬
জয়মাণিক্য . . .	১৪৯৮—১৪৯৯	৯৮৬—৯৮৭	১৫৭৬—১৫৭৭

উদয়মাণিক্য . . . জয়মাণিক্য . . . শাসনকাল . . .

আছে। আগরতলাস্থিত উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে কতিপয় রাজার রাজত্বকাল নির্দেশক একখানা প্রাচীন তালিকা পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তালিকায় উদয়মাণিক্য হইতে তৎপরবর্ত্তী রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল লিখিত আছে; উদয়মাণিক্যের পূর্ববর্ত্তী রাজগণের নাম নাই। সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র কাগজে তাহাও লিখিত ছিল, কোন কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। এই তালিকার নির্দেশমতে উদয়মাণিক্য ১৪৯২ হইতে ১৪৯৭ শক পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং জয়মাণিক্য ১৪৯৭ হইতে ১৪৯৮ শক পর্য্যন্ত দেড় বৎসর রাজত্ব করা প্রকাশ পাইতেছে। সময় সম্বন্ধে রাজমালার সহিত এই তালিকার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, এরূপ পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করিবার উপায় নাই। যে কারণেই ঘটয়া থাকুক, এবস্থিধ সামান্য বৈষম্য ধর্তব্যের মধ্যে নহে। উক্ত তালিকা দ্বারাও পূর্বকথিত ঐতিহাসিকগণের নির্ধারণ অপ্রকৃত বলিয়া জানা যাইতেছে। এ স্থলে উক্ত তালিকার প্রতিকৃতি প্রদান করা হইল।

রাজগণের সময় নির্ণয় উপলক্ষে স্পর্শই বুঝা গিয়াছে, কৈলাস বাবু তাঁহাদের শাসনকাল যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণ তাহাই নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এতদ্বিষয়ে কোনরূপ অনসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন, এমন বুঝা যায় না।



ত্রিপুরেশ্বরগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন লিপি।

তাম্র-শাসনের তথ্যানুসন্ধান ।

রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে, ভূমিদান সম্বন্ধীয় দানপত্র তাম্র-ফলকে সম্পাদনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । পরবর্তী লহর সমূহেও ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে । এই প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদনের প্রথা কতকালের প্রাচীন এবং পরবর্তী কালে তাহার অবস্থা কি রকম দাঁড়াইয়াছিল, এ স্থলে তদ্বিষয়ক আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

পুরাকালে ধর্ম-প্রাণ নরপতিগণ ধর্মবুদ্ধি-প্রযুক্ত হইয়া, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভূমিদান করিতেন । তাঁহাদের সম্পাদিত দানপত্র তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ হইবার প্রথা ছিল । দানকৃত ভূমির পরিমাণ ও তাহার পরিচয়সূচক বিবরণ, দাতার নাম, গোত্রাদি সহ দান-গ্রহীতার নাম ইত্যাদি লিপি করিবার পর, দাতাগণ আপন আপন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া উক্ত ফলক প্রদান করিতেন । এই প্রণালীতে সম্পাদিত দানপত্র সাধারণতঃ 'তাম্র-শাসন' নামে অভিহিত হইত ।

এই প্রথা কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই । রাজ চক্রবর্তী সগর প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ ভারত-সম্রাটগণের শাসনকালে কি প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদিত হইত, তাহাও বর্তমানকালের অগোচর ।

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় এই মাত্র জানা যায় যে, ত্রেতাযুগে দাশরথি রামচন্দ্র ধর্মারণ্যে জীর্ণোদ্ধার ও যজ্ঞ সম্পাদনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে তাম্র-শাসনদ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন । তৎপূর্ববর্তী কালের শাসনের বিবরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য । উক্ত ফলকে যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“আক্ষোটিরস্তি পিতরঃ কথয়ন্তি পিতামহঃ ।

ভূমিদোহস্বংকুলে জাতঃ সোহস্মান্ সস্তারয়িষ্যতি ॥

বহুভিবহুধা দত্তা রাজভিঃ পৃথিবীত্বয়ম্ ।

ষশ্চ যশ্চ যদাত্মমিস্তশ্চ তশ্চ তদাকলম্ ॥

ষষ্টিবর্ষ সহস্রানি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ ।

আচ্ছেত্তাচামুসস্তা চ তাগ্বেব নরকং ব্রজেৎ ॥

সন্মং শৈস্তত্ত্বমানস্ত মুদগরৈর্বিবনিহত্য চ ।

পাটশঃ স্তুবধ্যমানস্ত রোরবীতি মহাস্বরম্ ॥

তাদ্যমানঃ শিরে দশৈঃ সমালিঙ্গ্য বিভাবস্তুম্ ।

স্কুরিকয়াচ্ছিত্ত্বমানো রোরবীতি মহস্বনম্ ॥

যমহুতৈর্নহাঘোরৈব্রহ্ম বৃত্তি বিলোপকঃ ।
 এবংবিধৈর্নহা হুষ্ঠৈঃ পীড্যন্তে তে মহাগণৈঃ ॥
 ততস্তিষ্ঠ্যক্তুমাপ্নোতি যোনিং বা রাক্ষসীং শুনীম্ ।
 ব্যালীং শৃগালীং পৈশাচীং মহাত্ত ভয়ঙ্করীম্ ॥
 ভূমেরঙ্গুল হর্তা হি স কথং পাপমাচরেৎ ।
 ভূমেরঙ্গুল দাতা চ স কথং পুণ্যমাচরেৎ ॥
 অশ্বমেধ সহস্রাণাং রাজস্য শতশ্চ চ ।
 কণ্ঠা শত প্রদানশ্চ ফলং প্রাপ্নোতি ভূমিদঃ ॥
 আয়ু যশঃ সুখং প্রজ্ঞা ধর্মো ধাত্তং ধনং জয়ঃ ॥
 সন্তানং বর্ধতে নিত্যং ভূমিদঃ সুখমশ্নুতে ॥
 ভূমেরঙ্গুল মেকস্ত যে হরস্তি খলা নরাঃ ।
 বিক্র্যাটবীঘতোয়াসু শুক কোটর বাসিনঃ ।
 কৃষ্ণসর্পাঃ প্রজায়ন্তে দত্ত দায়াপহারকাঃ ॥
 তড়াগাণাং সহস্রাণ অশ্বমেধ শতেন বা ।
 গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্তা বিশুদ্ধ্যতি ॥
 যানীহ দত্তানি পুনর্ধনানি দানানি ধর্মার্থ যশঙ্করাণি ।
 ঔদার্যাতো বিপ্রানিবেদিতানি কো নাম সাধুঃ পুনরাদদীত ॥
 চলদলদললীলা চঞ্চলে জীবলোকে তুণলবলঘুসারে সর্ব সংসার সৌখ্যে ।
 অপহরতি হরাশঃ শাসনং ব্রাহ্মণানাং নরক গহন গর্তাবর্ত পাতোৎসুকো ষঃ ॥
 যে পশুস্তি মহীভূজঃ ক্ষিত্তিমিমাং যশুস্তি ভুক্তাখিলাং নো যাতা ন তু
 যাতি যশুস্তি ন বা কেনাপি সার্কং ধরা ।
 যৎকিঞ্চিদ্ভুবি তদ্বিনাশি সকলং কীর্ত্তিঃ পরং স্থায়িনী, ত্বেবং বৈ
 বসুধাপি যৈরুপকৃত্য লোপ্যা ন সংকীর্ত্তয়ঃ ॥
 এতৈকব ভগিনী লোকে সর্কেষামেব ভুভুজাম্ ।
 ন ভোজ্যা ন করগ্রাহা বিপ্রদত্তা বসুধরা ॥
 নত্বা ভূমিং ভারিনঃ পার্থিবেশান্ ভূয়োভূয়ো যাচতে রামচন্দ্রঃ ।
 লামাত্তোহয়ং ধর্ম সেতুর্নৃপাণাং শ্বে শ্বে কালে পালনীয়ো ভবন্তিঃ ॥
 অগ্নিন্ বংশে কিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি ।
 তস্তাহং করলগ্নোহগ্নি মদত্তং যদি পাল্যতে ॥”

স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড, ৩৪ অঃ, ২৪—৪১ শ্লোকঃ ।

মর্শ্ব ;—“পিতৃ পিতামহগণ সাপেক্ষে বলিয়া থাকেন, আমাদের কুলে যদি কোন
 ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আমাদেরিগকে উদ্ধার করিবে। বহু রাজা বহু প্রকারে এই
 পৃথিবী দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যিনি যখন ভূস্বামী হইয়াছেন, তাঁহারই তখন দানফল
 হইয়াছে। ভূমিদাতা যষ্টি সহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। প্রদত্ত ভূমির আহর্তা এবং আহরণে
 অনুমোদন কর্তা উভয়েরই নরকে বাস হয়। সেখানে ব্রহ্মবৃত্তি লোপকারী ব্যক্তিকে যমহুতের
 সন্দংশদ্বারা চ্যাবিত, মুদগরদ্বারা নিহত এবং পাশদ্বারা নিরস্ত্রিত করে। তদবস্থায় সে উচ্চৈঃস্বরে
 রোদন করিতে থাকে। যমহুতেরা তাহাকে বহ্নি মধ্যে পাতিত করে, দাগুদ্বারা তাহার মস্তকে

প্রহার করে, এবং ক্ষুরদ্বারা অঙ্গ কৰ্ত্তন করিতে থাকে। এই অবস্থায় পতিত হইয়া, তাহাকে কেবল উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিতে হয়। এইরূপে মহাছষ্ট মহাগণ কর্তৃক ভূমিহর্তা পীড়িত হইয়া থাকে। পরে তিৰ্য্যক যোনি, রাক্ষসী যোনি এবং শুনী যোনি প্রাপ্ত হয়। অপিচ ব্যালী, শৃগালী ও মহাভূত ভয়ঙ্করী পৈশাচী যোনি পর্য্যন্ত তাহার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাাত্র স্থান হরণ করে, সে আর কিরূপে কি পাপ আচরণ করিবে? অর্থাৎ তার আর পাপ করিবার বাকী কিছুই থাকে না; আর যিনি অঙ্গুলিমাাত্র ভূমিও দান করেন, তিনি আর কিরূপে পুণ্যাচরণ করিবেন? অর্থাৎ পুণ্যানুষ্ঠানের তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয় এবং শত কণ্ঠা দানের ফল—ভূমিদাতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভূমিদাতার আয়ু, ষশ, সুখ, প্রজ্ঞা, ধর্ম, ধাতু, ধন, জয়, সম্ভান সকলই বর্দ্ধিত হয়, তিনি নিত্যসুখ লাভ করিয়া থাকেন। প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাাত্রও যে সকল খল স্বভাব নর হরণ করে, নির্জ্জন বিক্র্যাটবীর শুক কোটরে তাহারা কুম্ভসর্প হইয়া বাস করিয়া থাকে। ঋহারা দান করিয়া আবার হরণ করিয়া লয়, তাহাদেরও ঐ অবস্থা ঘটয়া থাকে। ভূমিহর্তা লোক সহস্র তড়াগ, শত অশ্বমেধ এবং কোটি গো প্রদান করিয়া বিগুহ্ণ হয়। ধর্ম, অর্থ ও ষশের নিমিত্ত যে সকল ধন ও অত্যাগ্ৰ দানদ্রব্য উদারতার সহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা হয়, কোন্ সাধু ব্যক্তি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই জীবলোক চলপত্রের পত্র-লীলার স্তায় চঞ্চল এবং এই সংসারের সর্বসুখ তৃণখণ্ডের স্তায় অসার; এ অবস্থায় নরক-গহন গর্তের আবর্তে পতনোৎসুক দুর্ভুক্তি লোকই ব্রাহ্মণ শাসন অপহরণ করিয়া থাকে। যে সকল মহীপাল এই ক্ষিতি পালন করেন, তাঁহারা ইহা ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কাহারও সহিতই এই ধরা যায় নাই, যায় না, বা যাইবে না। এই ভূতলে ঋহা কিছু আছে, সকলই যায় না বা যাইবে না। এই ভূতলে ঋহা কিছু আছে, সকলই বিনশ্বর, একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী; সুতরাং বসুধাপতিগণ কদাচ সংকীর্ত্তি লোপ করিবেন না। বিপ্রসাৎকৃত বসুধারাই এ জগতে মহীপতিগণের ভগিনী; সুতরাং তাহা কখনই তাঁহাদের ভোগযোগ্য বা করগ্রাহ্য নহে। আমি রামচন্দ্র ভূমিদান করিয়া ভাবী ভূপতিগণের নিকট ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন স্ব স্ব অধিকার কালে এই সাধারণ ধর্ম সেতু পালন করেন। এই বংশে যদি কেহ ক্ষিতিপতি হন, আর তিনি যদি এই মৎপ্রদত্ত শাসন পালন করেন, তবে আমি তাঁহার করতলগত হইয়া থাকিব।”

(বঙ্গবাসীর অমুবাদ।)

এই শাসন প্রদানকালে দাশরথি রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম চতুশ্চত্বারিংশত বর্ষ ছিল।

উদ্ধৃত লিপিতে, ভূমিদানের অক্ষয় ফল লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। দাতার

তাত্র-শাসন সম্বন্ধে
শাস্ত্রীয় মত।

ন্যায়, দাতার উর্দ্ধতন পুরুষগণও এই পুণ্যের অংশ লাভ করিয়া থাকেন। এবং পরবর্তী ভূপতিগণও সেই ফলে বর্দ্ধিত হন না।

আবার, স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি যে ভূম্যধিকারী হরণ করেন, তাঁহার পাপের অন্ত নাই। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থেই এতদ্বিষয়ক নানাবিধ ব্যবস্থা পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে স্বয়ং ভূমিদান করা অপেক্ষা পরদত্ত দান রক্ষা করা অধিক পুণ্যপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন;—

“দত্ত্বাভূমিং নিবন্ধং বা কৃৎস্বা লেখ্যং কারয়েৎ।

আগামি ভদ্র নৃপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥

পটে বা তাম্রপটে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্ননং ।
 অতি লেখ্যান্নোবংশানাঅনঞ্চ মহীপতিঃ ॥
 প্রতিগ্রহ পরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণনং ।
 স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং ॥”
 (যাজ্ঞবল্ক্য) ।

বৃহদ্বিশ্বকামপুরাণ উত্তর খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্য গ্রন্থে ভূমিদান এবং ব্রহ্মবৃষ্টি সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায় । নিজের কিস্তি অন্যের প্রদত্ত ভূমি হরণকারীর গুরুতর পাপের কথাও বিস্তর আছে ; তাহার একটীমাত্র এ স্থলে দেওয়া গেল ;—

“স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ ।
 ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কুমিঃ ॥
 ভূমেঃ স্বপদত্তায়া হরণান্নাধিকং কচিৎ ।
 পাপমস্তি মহারৌদ্ৰং নস্বীকুর্য়ঃ পুনাস্ততাম্ ॥”

ব্রহ্মপুরাণ—১৫৫ অঃ, ৬—৭ শ্লোক ।

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যে আস্থাবান ছিলেন বলিয়াই প্রাচীনকালের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি ভূপতিগণ অকাতরে ভূমি দান করিতেন, এবং তাঁহাদের স্থল-বিশ্বাস । বর্ত্তীগণও সেই দান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন । অধিকাংশ তাম্র-শাসনেই শ্রীরামচন্দ্রের সম্পাদিত শাসনের অংশবিশেষ উৎকীর্ণ হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । দৃষ্টান্ত স্থলে বল্লাল সেনের, ভোজবর্মা দেবের, হরিবর্মা দেবের, ধর্ম্মমাণিক্যের, লক্ষ্মণ সেনের ও শ্যামল বর্ম্মের সম্পাদিত শাসন এবং অন্যান্য অনেক তাম্র-শাসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায়, রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী ভূস্বামীগণ তাঁহারই পুণ্য আদর্শের অনুসরণ করিতেছিলেন । কোন কোন শাসনে রামচন্দ্রের অনুরোধের উল্লেখ থাকায়, এই ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইতেছে । রাজা দেবখড়গ তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাক্ষের ২৫শে পৌষ তারিখে আসরফপুরের তাম্র-শাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন । সেই শাসনে উৎকীর্ণ বাক্যাবলী এ স্থলে উল্লেখযোগ্য ।

“ইতি কমলদলাধু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মহুচিস্ত্য মনুষ্য
 জীবিতঃ চ সকলমিদমুদাহৃতং চবুধ্য নহি পুরুষৈঃ
 পরকীর্ত্তয়ো বিলো— ॥ এতাত্তেতাং ভাবিনঃ
 পার্থিবেষ্জাং ভূমোভূমো প্রার্থয়তোষ রামঃ ।”

মর্শ্ব ;—শ্রী এবং মানব জীবন পদ্যদলস্থিত জলবিন্দুর মত চঞ্চল, ইহা মনে করিয়া এবং পূর্বেবক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া, কেহ অন্যের কীর্ত্তি লোপ করিবে না । ভবিষ্যৎ রাজগণের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করিয়াছেন ।

সে কালের ভূস্বামীগণ এত ধর্মভীরু ছিলেন যে, পরদত্ত ভূমি হরণ করা শাস্ত্র ভূমিদাতাগণের ধর্মভীরুতার নিদর্শন। অতিপ্রায়ে ভাবী অধীশ্বরদিগকে প্রদত্ত ভূমির উপর হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইতে বিস্মৃত হইতেন না। স্বয়ং রামচন্দ্রও তাঁহার তাম্র-শাসনে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন ;—

“অগ্নিন বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি ।

তস্তাহং করলগ্নোহস্মি মদত্তং যদি পাল্যতে ॥”

এই আদর্শও পরবর্তী দাতাগণের মধ্যে অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

ধর্মমাণিক্যের
তাম্র-শাসন ।

রামচন্দ্র, দানরক্ষাকারী ভবিষ্য পুরুষের করতলগত থাকিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরবর্তীকালে এই অঙ্গীকার আরও দৃঢ় করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ ধর্মমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর বক্ষঃস্থিত সুবিশাল ধর্মসাগর প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাম্র-শাসন দ্বারা যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই দানপত্রে লিখিত আছে ;—

“মম বংশ পরিক্ষীণে ষঃ কশ্চিদ্ভূপতি ভবেৎ ।

তস্ত দাসস্ত দাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লজ্জয়েৎ ॥”

হলায়ুধ মিশ্রের ‘সেক শুভোদয়’ নামক পুথিতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের

লক্ষ্মণ সেনের
তাম্র-শাসন ।

সম্পাদিত যে দানপত্রের লিপি সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যায় ;—

“ময়ি মৃত্যে সতি কশ্চিদ্রাজা ষে ভবেৎ ।

তস্ত দাসস্ত দাসোহং যো ষে কীর্ত্তিং ন লজ্জয়েৎ ॥”

বিক্রমপুরের সামন্ত রাজা শ্যামল বর্মা ১৯৪ শকে সেন রাজগণের করদরূপে

শ্যামল বর্মার
তাম্র-শাসন ।

উক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদিশূরের শ্যায় পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সমাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে শৌনকগোত্রীয় যশোধর শর্ম্মাকে তাম্র-শাসনদ্বারা সামন্তসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং ।

তস্ত দাসস্ত দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥”

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাম্র-শাসনদ্বারা ভূমিদানের প্রথা রামচন্দ্রের

তাম্র-শাসন প্রদানের
প্রথা আধুনিক নহে ।

পরবর্তী সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রবর্তিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সন্ধানে ভারতের নানাস্থান হইতে প্রতিনিয়ত তাম্র-ফলক আবিষ্কৃত হইতেছে। একমাত্র ত্রিপুর রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে শত শত তাম্র-শাসন পাওয়া

যাইবে । তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ত্রিপুর ভূপতিরন্দ কেবল সামরিক-বীর ছিলেন না—দান-বীরও ছিলেন । রাজমালার প্রতি লহরেই তাম্র-পট্টের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায় । এই অবস্থা কেবল ত্রিপুরায় নহে—সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে । সমগ্র ভারতে এখনও বহু সংখ্যক তাম্র-শাসন অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, কত কালে তাহার সম্যক উদ্ধার হইবে, সে বিষয় মনুষ্য-ধারণার অগোচর ।

তাম্র-শাসনের ক্রমিক বিবরণ আলোচনা করিলে জানা যাইবে, সমাজে এমন ধর্মের সহিত শৌর্যের একটা সময় আসিয়াছিল, যে কালে ধর্মের মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে মর্যাদা রক্ষা । শৌর্যের গৌরবও পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত । সে কালে দাতাগণ ধর্ম্যভাব প্রণোদিত হইয়া দানপত্র সম্পাদন কালেও বীর্যের গরিমা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । দানপত্রে দাতার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপ ঘোষণা উপলক্ষে যে সকল গর্বিত বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা শূরত্বের পূজা ভিন্ন আর কিছু নহে । কিন্তু তাম্র-শাসনের প্রথম যুগে দাতাগণের হৃদয়ে এবন্ধিধ ভাব পোষণের দৃষ্টান্ত নাই ; পূর্বেবাক্ত রামচন্দ্রের দানপত্রেও এরূপ আভাস পাওয়া যায় না । বৌদ্ধমতাবলম্বী অনেক রাজাও এরূপ গর্বেবর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীচন্দ্র দেবের শাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে । পরবর্তীকালে এই ভাবের ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছিল । তদরূপ ধর্ম্যভাব কত ম্লান হইতেছিল, দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে ।

রাজা দেবখড়্গের আসরফপুর লিপির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই রাজা দেবখড়্গের শাসনে উৎকীর্ণ বাক্যাবলীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ;—
তাম্র-শাসন ।

“জয়ন্ত্যশেষ ক্ষিতিপাল মূলিমালা মণিদ্যোতিত পাদপীঠ * * প্রণতোক্তমাগং
শ্রীদেবখড়্গো নৃপতিজ্জিতারিঃ ।”

অর্থাৎ—রাজা দেবখড়্গ, ঐহার পাদপীঠ অশেষ ক্ষিতিপালগণের মৌলিস্থিত মণিরাজিদ্বারা সমুদ্ভাসিত * * যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, তাঁহার জয় ।

কেশবসেন দেবের ইদিলপুর তাম্র-শাসনের চতুর্থ শ্লোকে যে সকল বাক্য কেশবসেনের উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাও পূর্বেবাক্ত ভাবাপন্ন । শ্লোকটা এই ;—
তাম্র শাসন ।

“অবাতরদথান্নয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধা কিরণ শেখরো বিজয়সেন ইত্যাত্ময়া ।
যদঙম্বিনখধোরণিফুরিতমৌলয়ঃ স্নাত্তুলো,
দশাস্ত্রনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥”

মর্শ্ব ;—সুধাকিরণ শেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক নরপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিজিত নৃপতিগণ যখন নত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইতেন, তখন সেই সকল ভূপতিরন্দের মুকুটমণির জ্যোতিঃ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইত, যেন দশাস্ত্র রাবণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে ।

১১৬৫ শকে রাজা দামোদর দেবের সম্পাদিত চট্টলের তাম্র-শাসনে পাওয়া
দামোদর দেবের যায় ;—
তাম্র-শাসন ।

“দেবঃ শ্রীমধুসূদনাথ্য নৃপতির্যেনাপি সেবানমৎ ভূমিপাল ললাটঘৃষ্টচরণঃ শ্রীবাসুদেবোহজনি ॥”
ইত্যাদি ।

রাজা ঈশান দেবের প্রদত্ত ভাটেরার শাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে,—

ঈশান দেবের
তাম্র-শাসন ।

“স্বা পাল চূড়ামণি মণ্ডিতাজিষ্ণুঃ পুত্রোহভবৎ কেশব দেবদেবঃ ॥” ইত্যাদি ।

কালের এই উত্তাল তরঙ্গ ত্রিপুর সিংহাসনের পাদমূল পর্য্যন্ত চুম্বন
বিজয়মণিক্যের করিয়াছিল । মহারাজ বিজয়মণিক্য, উদয়পুরে জগন্নাথ বিগ্রহ
তাম্র-শাসন । স্থাপনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন । সেই
দানের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“রাজারাজ শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাঘুজঃ ।

শ্রীশ্রীবিজয়মণিক্যে রাজা রাজতি রাজতে ॥”

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে । উৎকল রাজ নরসিংহ দেবের
তাম্র-শাসনে অঙ্কিত প্রশস্তিতেও এবন্নিধ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে । ইহা সাময়িক
শৌধ্য ভাবের কথা । স্রোতের একটানা গতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?
বিজয়মণিক্যের পূর্ব কি পরবর্তীকালে সম্পাদিত ত্রিপুরার যে সকল তাম্র-শাসন
এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীতেই এবন্নিধ উক্তি নাই । বিজয়মণিক্য কিম্বা
রাষ্ট্র-বিজয়ী অন্যান্য রাজগণের এরূপ উক্তি গর্ব-দৃষ্ট হইলেও নিতান্ত নিরর্থক বলা
যাইতে পারে না । কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে, কাল মাহাত্ম্যের বশবর্তী
হইয়া অনেক করদ-রাজাও আত্ম অবস্থা ভুলিয়া দানপত্র সম্পাদনকালে, রাজ-
চক্রবর্তীর গ্যার, রাজগণের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণকারী বলিয়া অমূলক শ্লাঘা করিতে
ছাড়েন নাই ; চাটুকর পারিষদগণও তাহা অগ্নানচিত্তে রচনা ও তাম্রফলকে খোদাই
করিয়া প্রভুকে কৃতার্থ করিয়াছেন ! এই সকল কার্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই
প্রতীয়মান হইবে, তৎকালে ধর্ম্মভাবে বিদলিত করিয়া, যশোলিপ্সা সমাজে
মস্তকোত্তোলন করিতেছিল ।

কোন কোন শাসন আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমাজের রুচি ক্রমশঃ

তাম্র-শাসনে অঙ্কিত
বাক্যস্বারা রুচির
পরিচয় ।

নিম্নগামী হইতেছিল । বিলাসিতা এবং ব্যভিচারিতার প্রসারের
যুগে এই সকল শাসন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে
বলা যাইতে পারে । এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেশব সেনের

তাম্র-শাসনের কথা উল্লেখযোগ্য । এই প্রশস্তির ৯ম শ্লোকে দাতা স্বীয় পিতা
লক্ষ্মণ সেনের কীর্তি বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছেন ;—

“প্রত্যাষে নিগড়স্বরৈর্নির্ম্মিত প্রত্যর্থে পৃথ্বীভূজাং ,

মধ্যাহ্নে জলপান মুক্ত করত প্রোঙ্গাল ঘণ্টারবৈঃ ।

সাম্রং বেষ বিলাসিনী জনরগনঞ্জীর মঞ্জুস্বনৈ
যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটন বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥”

মর্শ্ব ;—(লক্ষ্মণ সেন) প্রত্যুষে নরঘাতী বন্দীবৃন্দের বন্ধন-শৃঙ্খল রবে, মধ্যাহ্নে জলপানার্থ সমাগত করভ ও উষ্ট্র যুথের গলঘণ্টা শব্দে এবং সায়ংকালে রাজপথ বাহিনী বারবিলাসিনীগণের সুমধুর নূপুর নিক্রমে আকাশপথ ধ্বনিত করিতেন ।

পূর্বে যে লক্ষ্মণ সেনের প্রশস্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঠিক এই ভাষায়ই আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন, কেশব সেন পিতার সেই অতুলকীর্ত্তি পুনর্ববার ঝালাইয়া দিয়াছেন মাত্র । অতঃপর পিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, শাসনের ১৮ শ শ্লোকে কেশব আত্মকীর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন । তাহা আরও কদর্য্য । এস্থলে সেই শ্লোক প্রদান করা যাইতেছে ।

“আকর্ণাঙ্কলমেলকারবিশিথক্ষেপৈঃ সমাজেদ্বিবাং
দানাস্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং ।
নীবীবন্ধবিসরণেঃ পরিষদিত্রস্তং কুরঙ্গীদৃশাং
অব্যাপারসুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতিনৈতৎকরঃ ॥”

মর্শ্ব ;—তাহার (কেশব সেনের) হস্তদ্বয় কখনও বিশ্রাম সুখ লাভ করিত না, আকর্ণ আকর্ষিত বাণদ্বারা বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্যগর্ভদান এবং লজ্জাশীলা কুরঙ্গনয়না সুন্দরীগণের কটিবন্ধন বস্ত্র শ্লথ করা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার হস্তদ্বয় সর্বদা নিযুক্ত থাকিত ।

ইহাই শেষ নহে । উক্ত শাসনের ২৩শ শ্লোকও উল্লেখযোগ্য । তাহা এই ;—

“আক্রহাত্রং লিহগৃহশিখামস্ত সৌন্দর্য্য লেখাং,
পশুস্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পোরসীমস্তিনীভিঃ ।
বার্ত্তাকূটনয়নচনিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্তোয়া,
দৃষ্টাঃ সখাঃ ক্ষণাবিধটিত প্রেমদৈক্কেঃ কটাক্ষৈঃ ॥”

মর্শ্ব ;—পুরী বিহার কালীন সুন্দরীগণ অভ্রভেদী গৃহচূড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে (রাজাকে) দেখিতেন, তিনি এই সমস্ত চলিত নয়না কামিনীগণের প্রতি ক্ষণমাত্র প্রেম কটাক্ষ করিতেন ।

ধর্ম্ম-প্রণোদিত চিত্তে দানপত্র সম্পাদন করিতে যাইয়া, যে কালে সায়ংকালীয় রাজপথ বাহিনী বারবিলাসিনীর নূপুরধ্বনি হৃদয়ে জাগ্রত হইত, পথে চলিবার কালে গৃহচূড়াস্থিতা সুন্দরীগণের সহিত কটাক্ষ বিনিময় মনে পড়িত, সুন্দরীগণের কটিবন্ধন বস্ত্র লইয়া টানাটানির কথা হৃদয়ে উদিত হইত, বিশেষতঃ যে কালে সেই সকল কীর্ত্তি কাহিনী দানপত্রে উৎকীর্ণ করা রাজা এবং রাজপণ্ডিতগণ গৌরবজনক মনে করিতেন, সেই কালের রুচির বিষয়—ধর্ম্ম ভাবের বিষয় চিন্তনীয় নহে কি ? কেবল তাত্রফলকে নহে—শিলালিপিতে এবং সাহিত্যেও সেই রুচির অল্প বিস্তর ছাপ পড়িয়াছিল । কিন্তু ত্রিপুরার কোন শাসনে এবন্নিধ কুরুচি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই ।

এ স্থলে আর একটা কথা বলিবার আছে। ভূমিদাতাগণ তাম্র-শাসনদ্বারা আপনাদিগকে রাষ্ট্র-বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবার একটা সহজ ভাষা-শাসনে অথবা বাধ্য। স্মরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজা এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বিজয়-শ্রী লাভের সামর্থ্য ছিল কি না, হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়। এতদ্বিষয়ক একটা সন্দিক্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) সম্পাদিত রাজা দামোদর দেবের চট্টল-শাসনে তাঁহাকে 'ত্রিপুর জয়িনং' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে।* এই বাক্যের যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ, দামোদরের রাজত্ব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শেষ হইয়াছিল। ইহা বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তারের পূর্ববর্তী সময়ের কথা। তৎকালে ত্রিপুরার সামরিক বল অসাধারণ ছিল। চট্টগ্রামে, মঘ ব্যতীত ত্রিপুরার প্রতিযোগী অণু কোন প্রবল শক্তি থাকিবার প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, দামোদর দেব নিজকে ত্রিপুর বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিলেও ত্রিপুরায় কিম্বা চট্টগ্রামে তাঁহার কোনরূপ প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তিনি চট্টগ্রামে খণ্ড রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন সত্য, কিন্তু ত্রিপুর-শক্তির সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত ক্ষমতামালী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, বর্তমানকালে তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ত্রিপুরা বিজয়ের উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইলে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে বিস্মৃতির আঁধারে বিসর্জন করিতে পারিতাম না। নিশ্চয়ই তাঁহার পরিচয়সূচক কোন নিদর্শন বিদ্যমান থাকিত।

পূর্বেবক্ত সমগ্র বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাম্র-শাসনের প্রবর্তনকালে সমাজের ছোট বড় সকলেই সরল, সমাজের অবস্থা বিপর্যয়ের কথা। ধর্ম্মভীরু এবং সত্যনিষ্ঠ ছিল। দানপত্রের স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্ত দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল; তদুদ্দেশ্যেই এই কার্যে তাম্রফলক ব্যবহৃত হইত। অধিকস্থায়ী এবং পবিত্র বলিয়াই বোধ হয় এই ধাতুর ব্যবহার চলিয়াছিল। এই পস্থা যে কৃত্রিম দানপত্র প্রস্তুত পক্ষে নিতান্ত সহজ, দাতা বা গ্রহীতা কোন পক্ষের মনেই সেই চিন্তা স্থান পাইত না। অনেক শাসন, বিশেষতঃ ত্রিপুরার তাম্র-শাসন সমূহ আলোচনায় জানা যাইতেছে, শকের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত দানপত্রে, প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা লিপি করিবারও প্রয়োজন বোধ হয় নাই, পরিমাণ লিপি করিলেই যথেষ্ট হইত। ভূমির চতুঃসীমা দাতা এবং দান গ্রহীতার জানা থাকিত মাত্র। কিন্তু এমন প্রশস্ত স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গ্রহীতা সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসী হইতেন না। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাম্রপত্রে ভূমির চতুঃসীমা উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। সমাজের রুচি

* "আন্তাজ শ্রীমুষণ পিণ্ডনঃ প্রেমভূঃ কৈরবাণাং চূড়ারত্নং ত্রিপুর জয়িনং কেলিকারো নিশায়াঃ।"

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দান গ্রহীতাগণের আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকিবে। কাল প্রভাবে সর্বত্রই ক্রমশঃ তাম্র-শাসনের প্রচলন একবারে রহিত করিতে হইয়াছে ; ইহাও সমাজের অবনতির ফল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সময়ে যে কোন নিদর্শনপত্র (দলিল) সম্পাদনকালে সাক্ষী উপস্থিত রাখিয়া এবং রেজিস্ট্রী করাইয়াও অনেকস্থলে নিরাপদ হওয়া যায় না। অধিকাংশ দলিলের পেছনে বিবাদ বিষম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে। সুতরাং ইহা যে তাম্র-শাসন প্রচলিত রাখিবার যুগ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য এবং লোক চরিত্রই সেই প্রথা রহিতের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। আইনের মার পেঁচ, আর আইন ব্যবসায়ীর কূট বুদ্ধি এবম্বিধ পরিবর্তনের পথ প্রদর্শক বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

ত্রিপুরার তাম্র-শাসনই এই আলোচনার মূলীভূত বিষয়। কিন্তু বর্তমানকালে অনেক শাসন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং আবিষ্কৃত অনেক শাসনের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হৃদয়ে দ্বিধাভাব উপস্থিত হওয়ায়, বিষয়টি যথাযথ আলোচনার সুবিধা ঘটিল না।

সৈন্যাদ্যক্ষের উপাধি ।

ত্রিপুরার সামরিক বিভাগের প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় জানা যায়, এই রাজ্যে সৈন্যাদ্যক্ষগণের উপাধি সময় সময় পরিবর্তিত হইয়াছে। মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্বে ইহাদের কি উপাধি ছিল জানিবার সুবিধা নাই। তৎপরবর্তীকালের যে বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল।

সেনা ।

মহারাজ ত্রিলোচনের কিয়ৎকাল পূর্ব হইতে সৈন্যাদ্যক্ষগণের ‘সেনা’ উপাধি সৈন্যাদ্যক্ষের ‘সেনা’ থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর যোদ্ধাগণ ‘সৈন্য’ উপাধি। এবং তাহাদের অধ্যক্ষগণ ‘সেনা’ পদবী বাচ্য ছিল। ত্রিলোচনের শাসনকালেও এই প্রথা প্রচলিত থাকা জানা যাইতেছে। ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যিক।

মহারাজ ত্রিলোচন ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ শ্রবণে রাজ্যময় আনন্দ-কোলাহল উথিত হইয়াছিল। তৎকালে—

“আনন্দ হৃদয় হৈল সৈন্য সেনাগণ ॥
মনুষ্য শরীরে দেখে শোভা ত্রিনয়ন ।
পাত্র মঞ্জী সৈন্য সেনা সবে তুষ্ট মন ॥”

মহারাজ ত্রিলোচন কর্তৃক চতুর্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠাকালের বিবরণ আলোচনা করিলে পাওয়া যায় ;—

“পাত্র মন্ত্রী সৈন্ত সেনা লইয়া রাজায় ।

নমস্কার করিলেন সর্ব দেব পায় ॥”

প্রথম লহর, ত্রিলোচন খণ্ড—৩১ পৃঃ ।

মহারাজ দাক্ষিণ, হেড়ম্বপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, খলংমা নামক স্থানে গমনোপলক্ষে রাজমালা বলেন ;—

“সৈন্ত সেনা সনে রাজা স্থানান্তরে গেল ।

বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল ॥”

প্রথম লহর, দাক্ষিণ খণ্ড—৩৭ পৃঃ ।

মহারাজ শিঙ্গরাজের বনগমনকালে ‘সেনা’গণ রাজার সঙ্গে কিয়দূর অগ্রসর হইবার উল্লেখ আছে ;—

“পুত্র আদি সেনাগণ কান্দিত্তে কান্দিত্তে ।

আ গুবাড়ি দিল নিয়া কতদূর পাথে ॥”

প্রথম লহর, ত্রৈদাক্ষিণ খণ্ড—৪২ পৃঃ ।

মহারাজ যুঝারু ফাএর লিকা অভিযান উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে ;—

“ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া ।

যুদ্ধ হেতু সৈন্ত সেনা গেলেক চলিয়া ॥”

প্রথম লহর, যুঝারু ফা খণ্ড—৫০ পৃঃ ।

এই সময় পর্য্যন্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণের ‘সেনা’ উপাধি পাওয়া যায় । সম্যক বিবরণ আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুর হইতে যুঝারু ফা পর্য্যন্ত ৭২ জন রাজার শাসন সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষগণের ‘সেনা’ উপাধি ছিল ।

পরবর্তীকালে (মহারাজ প্রতীত ও মহারাজ যুঝারু ফাএর সময়ে) ‘সেনা’ উপাধির সঙ্গে ক্ৰটিং ‘সেনাপতি’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় । ইহাতে অনুমিত হয়, এই সময়ই সৈন্যাধ্যক্ষগণের ‘সেনাপতি’ উপাধির সূত্রপাত হইয়াছিল ।

জাঙ্গে ফা হইতে ছেঙ্কাছাগ পর্য্যন্ত ২১ জন রাজার নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, তাঁহাদের শাসনকালের কোন বিবরণই উক্ত গ্রন্থে নাই । সুতরাং ইহাদের কালে সৈন্যাধ্যক্ষগণের কি উপাধি ছিল, জানিবার উপায় নাই ।

সেনাপতি ।

মহারাজ ছেঙ্কাছাগএর পুত্র ছেংথুম্ ফাএর সময়, সাধারণ সিপাহিগণের ‘সৈন্ত’ এবং তাহাদের অধিনায়কবৃন্দের ‘সেনাপতি’ উপাধি ছিল ।
সেনাপতি উপাধি ।
এই উপাধি সম্ভবতঃ ছেংথুম্ ফাএর পূর্বেই প্রবর্তিত হইয়া

থাকিবে । গোড়েশ্বরের সহিত মহারাজ ছেংথুম্ ফাএর যে যুদ্ধ হয় তাহার সূচনায় পাওয়া যাইতেছে ;—

(১) “সৈন্ত সেনাপতি সবে অমুমতি দিল ।
নৃপতিকে মহাদেবী অনেক ভৎসিল ॥”

(২) “এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আঞ্জা কৈল ।
যত সৈন্ত সেনাপতি সব সাজি আইল ॥”

প্রথম লহর, ছেংথুম্ ফা খণ্ড—৫৬ পৃঃ ।

ধর্মদেব সিংহাসন গ্রহণের নিমিত্ত কাশীধাম হইতে রাজ্যে প্রত্যাগমনকালে ;—

“কতদিনে আসিলেক দেশ সন্নিহিতে ।
সৈন্ত সেনাপতি আসে আশুবাড়ি নিতে ॥
পঞ্চ ভ্রাতৃ মিলিয়া করিল আলিঙ্গন ।
রাজ পদধূলি লৈল সেনাপতিগণ ॥”

দ্বিতীয় লহর, ধর্মমণিক্য খণ্ড—৪ পৃঃ ।

মহারাজ প্রতাপমণিক্যের শাসনকালেও সেনাপতি উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

“প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে ।
অধাঙ্গিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে ॥
মহা বলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে ।
সেনাপতি সবে চক্রে রাজিতে বধিছে ॥”

দ্বিতীয় লহর, প্রতাপমণিক্য খণ্ড—৬ পৃঃ ।

ধর্মমণিক্যের পূর্ব হইতেই দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । সামরিক বিভাগসহ শাসনভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । রাজমালা প্রথম লহরে এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় । দ্বিতীয় লহরের প্রথম রাজা ধর্মমণিক্যের সময়েও ‘সেনাপতি’ উপাধি প্রচলিত এবং দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত ছিল । রাজকুমার ধর্মদেব পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন । তিনি বারাণসীক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবেশে অবস্থানকালে, দেশ হইতে লোক যাইয়া তাঁহাকে জানাইল ;—

“তোমা পিতা মহামণিক্য শীতলা হইয়া ।
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চসুত রাখিয়া ॥
তোমা চারি ভাই আছে রণের মাঝার ।
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা হইবার ॥
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হৈতে চার ।
না মানে কাহারে কেহ মনে ভয় পায় ॥”

দ্বিতীয় লহর, ধর্মমণিক্য খণ্ড—৪ পৃঃ ।

মহারাজ প্রতাপমাণিক্যের শাসনকালে পাওয়া যায় ;—

“রত্নমাণিক্য রাজা স্বর্গে হৈল গতি ।
অধাৰ্শিক প্রতাপমাণিক্য হৈল খ্যাতি ॥
তাহানে মারিল রাত্রে দশ সেনাপতি ।”

প্রথম লহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড—৭০ পৃঃ ।

প্রতাপমাণিক্যের নিধন সাধনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ধনুমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সেনাপতিগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এই সময় কুমার ধনু, সেনাপতিগণের ভয়ে বিশ্বস্ত পুরোহিতের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে-
ছিলেন । সেনাপতিগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়া ;—

“পরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি ।
পুরোহিত গৃহে গেল হস্তী অশ্বে চড়ি ॥”

দ্বিতীয় লহর, প্রতাপমাণিক্য খণ্ড—৭ পৃঃ ।

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে ;—

“নৃপতি দেখিতে চলে দশ সেনাপতি ।
পুরোহিত লৈয়া গেল অতি শীঘ্র গতি ॥

দ্বিতীয় লহর, ধনুমাণিক্য খণ্ড—১২ পৃঃ ।

ছেংখুম্ ফাএর সময় হইতে ধনুমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ‘সেনাপতি’ উপাধির অস্তিত্ব পাওয়া যায় । মহারাজ ধনু, দুর্দান্ত সেনাপতিদিগকে বধ করিয়া নূতন সৈন্যদল গঠনকালে, সৈন্যাধ্যক্ষগণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া, সরদার, হাজারী ও বড়ুয়া উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । * এই সময় প্রধান সেনাপতিদিগকে ‘নারায়ণ’ উপাধি প্রদান করা হয় । এই সকল উপাধির মূল বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে ।

সরদার ।

ইহা সৈন্যগণের অব্যবহিত উপরের পদ ছিল । সরদারগণের কি রকম ক্ষমতা
সরদার উপাধি । ছিল এবং কত সংখ্যক সৈন্যের উপর এক এক জন সরদার
থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, জানিবার সূত্র পাওয়া যাইতেছে না ।
পার্বত্য সৈন্যের নায়কগণের সরদার উপাধি ছিল । সম্ভবতঃ লাঠিয়াল শ্রেণীর

* “সরদার করিলেক অর্ধ সৈন্য দিয়া ।

হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া ॥

* * * *

শ্রীধনুমাণিক্য রাজা তদবধি সেনা ।

বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড—১২ পৃঃ ।

যোদ্ধবৃন্দের অধিনায়কদিগকেও সরদার উপাধি দেওয়া হইত । সে কালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে লাঠিয়াল সৈন্য থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায় । প্রয়োজন হইলে ইহারা মৃত্তিকা খননের কার্যও করিত । ত্রিপুর রাজ্যে যে স্ববৃহৎ দীর্ঘিকার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশ সৈনিক বিভাগের কর্মচারী দ্বারা খনিত হইয়াছে । লাঠিয়াল শ্রেণীর সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রাকালে অন্যান্য অস্ত্রের সহিত কোদাল সঙ্গে লইত, ত্রিপুর বাহিনীর জয়ন্তিয়া অভিযান কালে দেখা গিয়াছে,—

“দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া ।

হাড়িয়ে ডগর বাঘ চলে বাজাইয়া ॥”

বিজয়নগিক্য খণ্ড—৪৪ পৃঃ ।

হাজারী ।

ইহা সরদারের উপরিস্থ কর্মচারীগণের পদবী । এক হাজার পদাতিকের হাজারী উপাধি । অধিনায়কগণ হাজারী উপাধি লাভ করিতেন । রাজমালায় ‘হাজরা’ উপাধির উল্লেখও বিরল নহে । ‘হাজারী’ এবং ‘হাজরা’ অভিন্ন উপাধি বলিয়াই মনে হয় ।

বড়ুয়া ।

ইহা হাজারীর উপরিস্থ পদ । ‘বড়’ শব্দ হইতে বড়ুয়া পদবী সৃষ্টি হইয়াছিল । এই পদবী অতীত কোন কোন পার্বত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । এখন আর সৈনিক বিভাগের সহিত এই পদবীর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই ।

নারায়ণ ।

মহারাজ ধন্যমানিক্য রণদক্ষ প্রধান সেনাপতিদিগকে ‘নারায়ণ’ উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেন । রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, নারায়ণ উপাধি । রসাজ (আরাকান) বিজয়ী সৈন্যদক্ষ ‘রসাজমর্দন’ ও ‘নারায়ণ’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন । এই সেনানীর নাম জানা যাইতেছে না । ইহার পূর্বে কোন সেনাপতির ‘নারায়ণ’ উপাধি লাভের প্রমাণ নাই । পূর্বেবক্ত ব্যক্তির ‘নারায়ণ’ উপাধির নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

“চাটগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌর সেনা ।

রসাজমর্দন নারায়ণকে বসাইল থানা ॥”

ধন্যমানিক্য খণ্ড—২৪ পৃঃ ।

দেবমানিক্যের সময় সেনাপতির কি উপাধি ছিল, রাজমালায় তদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার পরবর্তী ইন্দ্রমানিক্যের শাসনকালে ‘নারায়ণ’ উপাধি পাওয়া

সাইতেছে । এতদ্বারা বুঝা যায়, দেবমাণিক্যের সময়েও ঐ উপাধি প্রচলিত ছিল । ইন্দ্রমাণিক্যের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

“দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি ।

ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি ॥”

ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড—৩৬ পৃঃ ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালেও এই দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি ছিলেন, যথা ;—

“দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান ।

জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্মাণ ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৩৯ পৃঃ ।

দৈত্য নারায়ণ ক্ষমতাগর্বে উন্মত্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অশান্তি উৎপাদন এবং রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায়, মহারাজ বিজয় তাঁহাকে বধ করিয়া গোপীপ্রসাদ নামক সেনাপতিকে ‘নারায়ণ’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা ;—

“রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভালা ।

আজি হইতে তুমি আমার বেহাই হইলা ॥

* * * *

তার পরে মহলদ্বারে রাখিল সম্মুখে ।

পরে গোপীপ্রসাদ নারায়ণ করিলাম তোকে ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৬২-৬৩ পৃঃ ।

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের শাসনকালেও নারায়ণ পদবী প্রচলিত ছিল । রাজমালায় উল্লেখ আছে ;—

“তাহার ভাগিনা বীরমর্দিন নারায়ণ ।

তাহাকে শিখায়ে যক্ষ্মী বধিতে রাজন ॥”

অনন্তমাণিক্য খণ্ড—৬৬ পৃঃ ।

উদয়মাণিক্যের শাসনকালে অনেক সেনাপতির ‘নারায়ণ’ উপাধি ছিল । তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করায়, মহারাজ উদয় বিপাক্ষের বিরুদ্ধে ;—

“রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল হরিতে ॥

রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ ।

সেনাপতি করে তাকে সৈন্তের রক্ষণ ॥

উদয়মাণিক্য খণ্ড—৬৯ পৃঃ ।

এই যুদ্ধে নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট যে সকল সেনাপতি রণাগণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, রাজমালায় তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় ;—

“চন্দ্রদর্প নাম চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ।

উড়িয়া নারায়ণ ছিল অরিভীম তখন ॥

আগুয়ান নারায়ণ আর গজভীম ।

চলিল এসব সৈন্য পরাক্রমে সীম ॥”

উদয়মাণিক্য খণ্ড—৫২ পৃঃ ।

রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে এই পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায় । পরবর্তী লহর সমূহেও ‘নারায়ণ’ উপাধির বিস্তর উল্লেখ আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

‘নারায়ণ’ উপাধিধারী সেনাপতিগণের হস্তে রাজ্যের শাসনভার গৃহ্য থাকায়, তাঁহাদের প্রভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল । তদ্ব্যতীত ইহাদের সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন । সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল বলিয়াছেন,—

“Bordering upon Bhattya is a very extensive country subject to the King of Tipperah. * * * him they style Yeyah Manik (Bijoy Manikya) and whoever are possessed of Rajship bear the title of Manik at the end of their names and all the nobility are called Narayan. Their Military force consists of a thousand elephants, two hundred thousands infantry, but they have few or on cavalry.”—Translation of Ayin-i-Akbari by Francis Gladwin P. 298.

মর্শ্বা;—ভাটী অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজার অধীনে এক বিস্তৃত রাজ্য আছে । বিজয়মাণিক ইহার রাজা । যে কেহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের নামের সঙ্গে ‘মাণিক’ উপাধি সংযুক্ত হয় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ‘নারায়ণ’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । একসহস্র হস্তী ও দুই লক্ষ পদাতিক তাঁহাদের সামরিকবল, কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্য বিরল ।

‘রিয়াজ-উস্-সলাতিন’ গ্রন্থেও নারায়ণের বিবরণ পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা রাজমালার পরবর্তী লহরে আলোচিত হইবে ।

চতুর্দশ দেবতার পূজক শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পূজকের (চম্ভাইর) নিম্নবর্তী চতুর্দশ দেবতার পূজক নারায়ণ । ব্যক্তি ‘নারায়ণ’ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন । এই উপাধি কি কারণে এবং কোন্ সময় পূজকের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বর্তমানকালে অসাধ্য হইয়াছে ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে সৈনিক বিভাগের পুনর্ব্বার সংস্কার হয় । এই সময়ও প্রধান সেনাপতিগণের ‘নারায়ণ’ উপাধি স্থিরতর থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত পাঠান সৈন্য দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন এবং ‘খাড়াইত’ উপাধিধারী নূতন সৈনিক-বল গ্রহণ দ্বারা মহারাজ বিজয় সৈনিক বিভাগকে স্ফূট করিয়াছিলেন । খাড়াইত সম্বন্ধীয় বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল ।

খাড়াইত বা খাড়াতিয়া ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য খাড়াইত সম্প্রদায় নিযুক্ত দ্বারা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ খাড়াইত উপাধি । বিশিষ্টরূপে পুষ্ট করিয়াছিলেন । রাজপুরী রক্ষা করা ইহাদের প্রধান কার্য হইলেও, প্রয়োজন মতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াও কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল । বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযানকালে তাঁহার সঙ্গে দুই

সহস্র খাড়াইত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । রাজমালায় খাড়াইতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ;—

“খড়্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক ॥
সাতবার ধনুসাগর ফিরিতে যে পারে ।
সেই জনা তার নাম খাড়াইতইয়া ধরে ॥
দিবা রাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী ।
বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৮ পৃঃ ।

ধনুসাগর দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ । এই সাগর সাত বার প্রদক্ষিণ করা যে বলশালী ব্যক্তির কার্য্য, তাহা সহজবোধ্য । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ খাড়াইত পদলাভের অধিকারী হইত না । বিশাল বপু এবং বিক্রমশালী ব্যক্তিগণ খাড়াইত বিভাগে স্থান পাইত, রাজমালার বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে ।

খড়্গ চর্ম্মধারী যোদ্ধাদল প্রাচীনকাল হইতেই খড়্গধারী বা খাড়াইত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল । ইহা মহারাজ বিজয়মাণিক্যের নব উদ্ভাবিত নহে । পুরাণ গ্রন্থেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা ;—

“সুরপস্তুরুণঃ প্রাংগুর্দৃঢ় ভক্তিঃ কুলোচিতঃ ।

শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়্গধারী প্রকীর্তিতঃ ॥”

মৎস্যপুরাণ—২১৫ অঃ, ১৮ শ্লোক ।

মর্ম্ম ;—সুন্দর দর্শন, তরুণ বয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, সংকুল সম্ভূত, শূর এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিকে খড়্গধারী পদে নিযুক্ত করিতে হয় ।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, খড়্গধারী বা খাড়াইত পৌরাণিক যুগের প্রবর্তিত সম্প্রদায় । পরবর্তীকালে অনেক স্থানেই সৈনিক বিভাগে এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল । বেহারের ইতিবৃত্ত ‘রাজাবলী’ পুথিতে পাওয়া যায়, তথাকার সৈনিকগণের মধ্যে ‘খাড়াধরা’ নামক এক শ্রেণীর যোদ্ধা ছিল ; ইহা খড়্গধারীর নামান্তর মাত্র । ময়নামতির গানে পাওয়া যায়, গোপীচাঁদ মায়ের নিকট বলিতেছেন ;—

“আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া ।

আর বিভা করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া ॥”

ভবানীদাসের ময়নামতীর গান ।

‘খাণ্ডা’ শব্দের অর্থ ‘খাড়া’ । উড়িষ্যা প্রদেশে এক শ্রেণীর যোদ্ধাবর্গের ‘খণ্ডাইত’ উপাধি ছিল । ‘খাণ্ডাএ জিনিয়া’ বাক্যদ্বারা বুঝা যায়, রাজা মাণিকচন্দ্রের ‘খণ্ডাইত’ সৈন্য ছিল । খণ্ডাইত ও খাড়াইত অভিন্ন বাক্য । উড়িষ্যাবাসী কোন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত কবিতায় ‘উরুয়া রাজা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে । শ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মনে করেন, 'উরুয়া রাজা' শব্দ রাজেন্দ্র চোলের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় নির্ভর করিবার উপায় নাই, অথচ উপেক্ষা করিবার যোগ্য প্রমাণও দেখা যায় না।

উড়িষ্যা প্রদেশে এক সময় খণ্ডাইত সম্প্রদায়ের সংখ্যা এবং প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানাজাতীয় লোকের সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকিলেও প্রাধান্যহেতু ইহারা ত্রিপুরার 'কাঠিছোঁয়া' সম্প্রদায়ের স্থায় একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে খড়্গধারী সৈন্যদল খণ্ডাইত নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ছোটনাগপুরেও এই জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহারা বলিয়া থাকে, ইহাদের পূর্ব-পুরুষগণ উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল।

খণ্ডাইতগণের উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে মোক্ষপুরুষ বলিয়াই বুঝা যায়। উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণের মধ্যে উত্তর কবাট, দক্ষিণ কবাট, গড় নায়েক, সিংহ, দৌবারিক, নায়েক, বাঘা, বাছবলেন্দ্র, মহারথী, মল্ল, রণসিংহ, সামন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ বড় ঘরি ও ছোট ঘরি, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের আবার অনেকগুলি উপবিভাগ আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উচ্চ-নীচতা আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের অন্ত অন্ত সম্প্রদায় গ্রহণ করে না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সকল সম্প্রদায়েরই জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জাতির অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহারা বর্তমানকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী না হইলেও তরবারীর প্রতি উপাস্ত্র দেবতার স্থায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহা অতীত শৌর্যের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়।

নাজির।

এই উপাধি মহারাজ বিজয়মণিক্যের শাসনকালে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল।

এবং এই উপাধিধারী কাল নাজিরের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ;—

“ত্রিপুর রাজার থানা শ্রীহট্টে বৈসাইল।

কাল নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল ॥

বিজয়মণিক্য খণ্ড—২৫ পৃঃ।

পার্বত্য সিপাহীদ্বারা সংস্থাপিত গারদ এবং পর্বত-বাসী সৈনিকবৃন্দের পরিচালন ভার যাঁহার হস্তে অর্পিত হইত তিনি নাজির উপাধি লাভ করিতেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণ এই পদের অধিকারী ছিলেন।

সতী-দাহ ।

ত্রিপুর রাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সতী-দাহ প্রথা প্রবর্তিত হইয়া, সুদীর্ঘ
 ত্রিপুরায় সতী-দাহের
 প্রচলন । সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল । রাজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়,
 মহারাজ ধনুমাণিক্যের পটুমহিষী মহারানী কমলা দেবী পতির
 চিতারোহণ করিয়াছিলেন । * দেবমাণিক্যের মহিষী এবং বিজয়মাণিক্যের মহিষীবৃন্দ
 পতির সহগামিনী হইয়াছেন । † অনন্তমাণিক্যের সহধর্ম্মিণী মহারানী জয়াবতী
 সহমরণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন ; তাঁহার পিতা, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ
 (পরে উদয়মাণিক্য) বাধা প্রদান করায় তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই । ‡ রাজমালার
 পরবর্তী লহরসমূহেও এই প্রথার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যাইবে ।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, বৈদিককাল হইতেই ভারতে
 সতী-দাহ প্রথার
 প্রাচীনত্ব । সতী-দাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল । § কেহ কেহ আবার সায়ণ
 ভাষ্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া বৈদিক বাক্যের অন্তরূপ ব্যাখ্যা
 করিয়া থাকেন । এ স্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ।

বৈদিককালের পরে রুহম্পতি, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, ব্যাস ও হারীত প্রভৃতি পুরাণ এবং
 সংহিতাকার মহর্ষিগণ সতী-দাহের সমর্থন করিয়াছেন । মহাভারতেও এ বিষয়ের
 প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;—

“ভত্রাহুমরণং কালে যাঃ কুর্কৃষ্ণি তথাবিধাঃ ।

কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্নোহাৎ সর্বাঃ পুত্রা ভবন্তি তাঃ ॥”

মর্শ্ব ;—কামনা, ক্রোধ, ভয় কিম্বা মোহ, যে কারণেই হউক, যে সকল রমণী
 মৃত পতির সহগামিনী হইবে, তাঁহারা সকলেই পবিত্র হইবে ।

শাস্ত্রসমূহের বাক্য পথ-প্রদর্শক মাত্র । ভারতের সাধ্বী রমণী সমাজ পতিপ্রাণা—
 পতি ব্যতীত তাঁহাদের জীবনে অন্য লক্ষ্য নাই । সুতরাং জ্বলন্ত চিতায় পতি পার্শ্বে
 শয়ন করিয়া আত্মাহুতি দান করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে । বরং পতির
 সহগামিনী হওয়া ধর্ম্মপত্নীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই রমণীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ।
 মহাভারতে পাওয়া যায়, পাণ্ডুরাজার সহধর্ম্মিণী কুন্তি, পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়
 সপত্নী মাদ্রিকে বলিয়াছেন ;—

“অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম ।

অবশ্যস্তাবিনো ভাবান্না মাং মাদ্রি নিবর্তয় ॥

* ধনুমাণিক্য খণ্ড,—৩৩ পৃঃ ।

† দেবমাণিক্য খণ্ড,—৩৮ পৃঃ ।

‡ বিজয়মাণিক্য খণ্ড,—৬৪ পৃঃ ও অনন্তমাণিক্য খণ্ড,—৬৭ পৃঃ ।

§ “ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানং নিপশ্যত উপত্না মর্ত্য্যপ্রেতং ।

বিশ্বং পুরাণমমুপালয়ন্তী তশ্চে প্রজাং দ্রবিনঞ্চেষু ধেহি ॥” ১৩

তৈত্তিরীয় আরণ্যক—৬।১।১৩ ।

অশ্রাম্যমীহ ভর্তারমহং প্রেতবশং গতম্ ।

উত্তিষ্ঠ স্বং বিশ্বজৈনমিমান্ পালয় দারকাম্ ॥”

মর্শ্ব ;—মাদ্রি, আমি পতির জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী । ধর্মফল লাভের আমিই প্রধ্বন অধিকারিণী । তুমি আমাকে অবশ্যস্তুাবী বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিও না । আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি পতির মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া উথিতা হও এবং সম্মানদিগকে রক্ষা কর ।

কিন্তু মাদ্রির আগ্রহাতিশয্য বশতঃ, কুস্তী আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । মাদ্রিই পতির মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করিলেন । মহাভারতে সহমরণের নিদর্শন আরও অনেক আছে ।

সতীর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারাও সতী-দাহের সমর্থক সতী-দাহ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় । তাহার একটা বাক্য এই ;—
শাস্ত্রীয় মত ।

“আর্তার্ভে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা ।

মৃতে মৃতে বা পত্যৌ সাধ্বীজ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥”

কল্পতরু ।

মর্শ্ব ;—যে স্ত্রী পতির ব্যথায় ব্যথিতা, পতির হর্ষে হৃষ্টা, পতি বিদেশে গমন করিলে মলিনা ও কৃশা এবং পতি বিয়োগে মৃত্যু হন, তিনিই সতী ।

অবস্থাভেদে আবার সহমরণ নিষিদ্ধ বলিয়াও শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে । তাহার একটা বচন নিম্নে দেওয়া গেল ;—

“বালাপত্যাক্‌গর্ভিণ্যো হৃদৃষ্ট ঋতবস্তথা ।

রজস্বলা রাজস্মতে নারোহস্তি চিতাং শুভে ॥”

মর্শ্ব ;—গর্ভবতী, শিশুসন্তানের জননী ও রজস্বলা রমণী চিতারোহণ করিবে না ।

শুক্লিতত্ত্ব এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই ;—

“বালাপত্যাস্চ গর্ভিণ্যো হৃদৃষ্ট ঋতবস্তথা ।

রজস্বলা রাজস্মতে নারো হস্তি চিতাং শুভে ॥”

বৃহন্নারদীয়পুরাণ ।

মর্শ্ব ;—বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, অদৃষ্ট ঋতু (যাহার রজস্বলা হয় নাই) রমণীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ ।

মৃতদেহ বাসি করিয়া রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, কিন্তু অবস্থা বিশেষে এক রাত্রি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, যথা ;—

“তৃতীয়েহহ্নি উদক্যামা মৃতে ভর্তরি বৈ দ্বিজাঃ ।

তশ্চামুন্নরণার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রকম্ ॥”

ভবিষ্যপুরাণ ।

মর্শ্ব ;—স্ত্রী ঋতুমতী হইবার তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে, সেই নারী পতির অনুগমন করিবার নিমিত্ত এক রাত্রি মৃত দেহ রক্ষা করিতে পারিবে ।

সহমরণে অসমর্থী রমণীর পক্ষে অনুমৃত্যু হইবার ব্যবস্থা আছে । কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে সহমরণ ও অনুমরণ একার্থ জ্ঞাপক হইলেও এতদুভয়ের প্রভেদও শাস্ত্র-বাক্য দ্বারাই জানা যায় । ব্রহ্মপুরাণের মতে ;—

“দেশান্তরমৃতে পত্যা সাধ্বী তৎপাদুকাধরম্ ।
নিধায়োরসি সংগৃহী প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥”

মর্শ্ম ;—দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া, শুদ্ধা হইয়া অনলে প্রবেশ করিবে ।

সহমরণের সমর্থক এতদধিক শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন । এবার সহমরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা হইবে ।

মৃত পতির সৎকারার্থ চিতা প্রস্তুত হইবার পর, সহমরণে সঙ্কল্পিতা স্ত্রী স্নানান্তে
সহমরণ বিধি ।
বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবে । এবং কুশ লইয়া পূর্ব মুখে উপবিষ্টা হইয়া, মাস, পক্ষ, তিথি, স্বীয় গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্বক সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিবে । ইহার পর লোকপালগণ, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া তিন বার কিস্বা সাত্‌ বার চিতা প্রদক্ষিণান্তে তদুপরি আরোহণ করিবে । তৎকালে ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন ;—

“ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাজনেন সর্পিষা সংবিশন্ত ।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরভা আরোহন্ত জনরো যোনিমগ্নে ॥”

“ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো বা যাঃ স্মশোভনাঃ ।
সহ ভর্তৃশরীরেণ সংবিশন্ত বিভাবস্মু ॥”

ব্রহ্ম পুরাণ ।

শুদ্ধিত্বাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে সহমরণ সংস্ফট অনেক বিষয় পাওয়া যাইবে । এ স্থলে সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব ।

মৃত পতির সহগামিনী হওয়াই স্ত্রীর পক্ষে প্রশস্ত কর্তব্য বলিয়া সংহিতা ও পুরাণসমূহ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন । যে স্ত্রী পতির সহগামিনী না হইবে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মচার্য্যাবলম্বন বিধেয় । ব্রহ্মচারিণী স্মরণ, কীর্তন, কেলি প্রভৃতি অমৃতাঙ্গ-মৈথুন ও তাম্বুল বর্জ্জন করিবেন এবং দিনে একবার মাত্র আহার ও মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন । পুত্র বা পৌত্র বিচ্যমান না থাকিলে, প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবেন ।

ইহা গেল সহমরণের অনুকূল মত । এই প্রথার বিরুদ্ধ মতও শাস্ত্রে পাওয়া যায় । উভয় মতের বিচার করিতে গেলে অনুকূল মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয় । কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের সমাজ সেই শ্রেষ্ঠ ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই ।

সতীগণ কেমন কায়মনোবাক্যে পতিপরায়ণা ছিলেন এবং পতির মৃত্যুর সঙ্গে সতীর আন্তরিক সঙ্গের তাঁহাদের জীবন কত ব্যর্থ মনে করিতেন, এ স্থলে তাহার দৃঢ়তা । একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে । ইহা ইংরেজ রাজপুরুষ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ।

বঙ্গের ভূতপূর্ব লেপটেনেন্ট গবর্নর স্যার হ্যালিডে হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকা কালে একটা সতী-দাহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন,—তাঁহার বাসার কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-দাহের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া, ডাক্তার ওয়াইজ্ ও চাপলেনকে সহ তথায় উপস্থিত হইলেন । তাঁহারা সহমরণ-সঙ্কল্পা সতীর নিকট যাইয়া আত্মহত্যায় বিরত করিবার নিমিত্ত অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, সতী বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না । কিছুকাল পরে সতী চিতারোহণের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া সকলের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিলেন । কিন্তু ধর্ম্মযাজক পাদরী সাহেব তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না । শ্মশান-শয্যায় যে কত যাতনা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন । সতী তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া একটা প্রদীপ আনিতে বলিলেন এবং তাহা স্বহস্তে জ্বালিয়া, তদুপরি একটা অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন । তিনি তীব্র দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাহিয়া যেন নীরব ভাষায় জানাইতেছিলেন,—“তোমরা যে যাতনার কথা বলিতেছ, তাহা কিছুই নহে ।” তাঁহার প্রদীপে বিঘ্নস্ত অঙ্গুলী ক্রমশঃ ফোস্কা পড়িয়া, দগ্ন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল । পরিশেষে অঙ্গুলীটা পুড়িতে পুড়িতে সরু ও বক্র হইয়া গেল । এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্তের তরেও রমণী হস্ত সঞ্চালন করিলেন না ; এবং তাহার বাক্যে বা অবয়বে কোন প্রকার যাতনা কিম্বা অনুভূতির লক্ষণ দেখা গেল না । তখন সতী জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা প্রবোধ পাইলেন কি ?” ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—“যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি ।” তখন সতী বলিলেন,—“আগি তবে চিতায় প্রবেশ করিতে পারি ।” ম্যাজিষ্ট্রেট মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলেন । তখন সতী আগ্রহের সহিত শ্মশান-শয্যায় পতির পাশে শয়ন করিলেন । উপস্থিত ইংরেজগণ সতীর আগ্রহাতিশয্য এবং নীরব নিম্পন্দ ভাবে আত্মাহুতিদান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন ।

এই বিবরণ বক্লাম্বে সাহেবের লিখিত ‘Bengal, under Lieutenant Governors’ নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ও বিশ্বকোষ সম্পাদক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ।

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । ত্রিপুর রাজ্যেও ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়া যাইবে । দৃষ্টান্তের বাড়াবাড়ি করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে বিষয়ে নিরস্ত থাকি গেল ।

সহমরণ-প্রথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল । সে কালে পূর্বেবক্ত ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথার বিস্তৃতি । দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখা যাইত । মুসলমান প্রভাবের কালে, যুদ্ধে নিহত বীর পুরুষগণের মহিলাবন্দ বিপক্ষ হস্তে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় জহর-ত্রত অবলম্বন করিতেন । তাঁহারা পতির জলন্ত চিতায় কিম্বা

অগ্নিকুণ্ডে অগ্নানচিত্তে দলে দলে আত্মদান করিয়াছেন । অনেকস্থলে সতীর শ্মশান-ক্ষেত্রে কীর্তিস্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া, অতীতের সতীত্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে ।

সহমরণ-প্রথা কেবল ভারতেই ছিল এমন নহে । শাকদ্বীপ, জবদ্বীপ, ভারতের বাহিরে লম্বকদ্বীপ, চীন, থেশ্, গ্রীশ্, রোম ও উত্তর ইউরোপ প্রভৃতি সহমরণ-প্রথা । অনেক দেশেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন দেশে এখনও বিদ্যমান আছে । তবে, সেই সকল দেশের প্রথা অন্তরূপ । অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীকে কোন না কোন প্রকারে বধ করিয়া পতির সহিত একসঙ্গে সমাহিত করা হয় । কোন কোন দেশে রাজার মৃত দেহের সঙ্গে বহুসংখ্যক দাসদাসী ও রাজার প্রিয় ব্যক্তিগণ সহগামী হইয়া থাকে । কুকিদের মৃত রাজার সঙ্গে যত অধিক সংখ্যক মস্তক প্রদান করা বাইতে পারিত, ততই গৌরব বৃদ্ধি হইত । এইসূত্রে তাহাদের সান্নিধ্যবাসী শত শত আসামী ও বাঙ্গালীর মুণ্ডপাত হইবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে । কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর শ্মশান জীবন্ত দেহ দগ্ধ করিবার প্রথা অন্য দেশে বা জাতিতে নাই । এই প্রথার অনুকূলে ও প্রতিকূলে বিদেশীয় অনেক ভ্রমণকারী ও পণ্ডিত সমাজ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রফেসর এইচ্, এইচ্, উইলসন্, গ্রীক পণ্ডিত প্রপারটীয়স্, সিসিরো, ইউরোপীয় পণ্ডিত বয়শেশ্, ঐতিহাসিক হেরোদোডস্, স্মর হ্যালিডে, বক্লাম্, ভ্রমণকারী এল্ফিন্‌ষ্টোন্, আবিদুবই, মার্কোপলো, ওডরিক, গ্যাসপারো, জে, পি, ভিন্সেজো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ।

পতির সহিত সহমৃত্যু হওয়া স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য, সকল শাস্ত্রের একরূপ অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না ; যদি তাহাই হইবে, তবে প্রতিকূল মত ব্রহ্মচর্যা-ব্রত । শাস্ত্রগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইত না । যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহার পক্ষেই সহমরণ ব্যবস্থেয় । যে রমণী সহমৃত্যু হইতে অনিচ্ছুক, তিনি ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেন । প্রাচীনকালে পতিপ্রাণা মহিলাগণের মধ্যে পতির সহগমনে পরাঙ্মুখ স্ত্রীর সংখ্যা বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না ।

সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমশঃ মানুষের মানসিক ভাব এবং বিশ্বাস অন্য প্রকার হইয়াছিল । সেই সঙ্গে সহমরণেরও ভাবান্তর দেখা গেল । অনেক স্থলে লোকগণনার ভয়ে, কিস্তি সমাজে গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায়, অনেক স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকে জোর-জবরদস্তী করিয়া পতির শবের সঙ্গে দগ্ধ করা হইত । অনেক স্থলে আবার স্বার্থক স্ত্রীতিবর্গ সম্পত্তির অংশ গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে, সন্ত বিধবাকে পতির শবের সঙ্গে বাঁধিয়া, শ্মশানে কাষ্ঠ চাপা দিয়া দগ্ধ করিয়া মারিত । এই সময় বিধবাগণের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল । ইহা মুসলমান রাজত্বকালের কথা ।

ভারত-সম্রাট মহামতি আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর রাজ-পরিবারে একটা সহমরণের সংবাদ পাইয়া তিনি তাহা নিবারণের নিমিত্ত অশ্বারোহণে এক শত মাইল দূরবর্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যে সকল সতী স্বেচ্ছায় পতির সহগামিনী হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে, কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও উপর জোর-জবরদস্তী করা অন্যায্য। সম্রাটের এবশ্বিধ অভিমত সত্ত্বেও মুসলমান শাসনকালে সতী-দাহ প্রথা অবাধে চলিয়াছিল; তৎকালে বলপ্রয়োগও যে না হইত এমন নহে।

ইংরেজ শাসনকালেও সতী-দাহ দীর্ঘকাল চলিয়াছে, প্রথমতঃ জোন্স সাহেব ইংরেজ শাসনকালে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই অপরাধে তিনি সহমরণ-প্রথা। ভারতবর্ষ পরিত্যাপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮০৫ খৃঃ অব্দে সতী-দাহ বন্ধ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চেষ্টা করা হয়, হিন্দুগণের ভুল আন্দোলনের ফলে সেইবারও গবর্নমেন্টকে নিরস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহার পর রাজা রামমোহন রায় সতী-দাহ নিবারণকল্পে বন্ধপরিষ্কার হইলেন। তিনি ১৮১৭ ও ১৮১৯ খৃঃ অব্দে সহমরণের বিরুদ্ধে দুইখানা পুস্তক প্রচার করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ১৮২৭ খৃঃ অব্দে আর একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশীয় সম্রাস্ত ব্যক্তিদিগকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া, এই প্রথা নিবারণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং ১৮২৯ খৃঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের প্রচারিত আইন (Regulation—XVII of 1829) দ্বারা সতী-দাহ বন্ধ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেও সহমরণ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। অনেক স্থানেই গবর্নমেন্টের আইন অমান্য করিয়া সতী-দাহ চলিতেছিল, তৎকাল অনেক অভিযুক্ত এবং দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধ্বী স্ত্রী, লোকের বাধা না মানিয়া অথবা তাহাদের অলঙ্কিতভাবে অকস্মাৎ পতির জ্বলন্ত চিতায় বস্প্রদান করিবার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। পতিপ্রাণার হৃদয় আইনের অধীন নহে এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করা রাজ-বিধির সাধ্যাত্তও নহে। বর্তমানকালে প্রচ্ছলিত শ্মশানে আত্মদান করিবার উপায় না থাকিলেও অনেক সাধ্বী নানা উপায়ে পতির অনুগামিনী হইতেছেন। তবে, পূর্বকালের তুলনায় এই উপায়ে মৃত্যুর সংখ্যা ধর্তব্য নহে।

বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য সমূহেও উক্ত আইন কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন প্রচারের পরেও ক্রমান্বয়ে ৬০ বৎসর কাল ত্রিপুর রাজ্যে সতী-দাহ প্রথা নির্বিবাদে চলিয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এ বিষয়ে বৃটিশ গবর্নমেন্টের দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময় চট্টগ্রামের

কমিশনার লায়েল সাহেব (Mr. D. R. Lyall) বেঙ্গল গবর্নমেন্টের অনুরোধে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্টকে এতদ্বিষয়ে যে পত্র লেখেন, তদুপলক্ষে তদানীন্তন এসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট স্বর্গীয় রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ১৮৮৮ সনের ১১ই জুন তারিখে ত্রিপুর রাজ্যের পররাষ্ট্র বিভাগে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাই সতী-দাহ নিবারণকল্পে গবর্নমেন্ট পক্ষের প্রথম পত্র । * সেই পত্রের দ্বিতীয় দফায় লিখিত ছিল ;—

“2. During my recent movements in the Sonamura Division in March last, I heard of three cases of the kind having occurred amongst Jamatyas in the course of the last two or three years. These cases are noted in the margin **. If any more have taken place within the last 4 or 5 years anywhere in the State, this office may be supplied with a list of them.”

মর্ম্ম ;—গত মার্চ মাসে আমি যখন সোণামুড়া অঞ্চলে গিয়াছিলাম, তখন শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ২।৩ বৎসর পূর্বে এইরূপ তিনটি (সতী-দাহ) ঘটনা ঘটিয়াছিল । পার্শ্বে তাহা উল্লেখ করা হইল । যদি ৪।৫ বৎসরের মধ্যে এই রাজ্যে আরও এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এক তালিকা এ আফিসে প্রেরিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

অতঃপর গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে সতী-দাহ নিবারণ জন্য বারম্বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুর দরবার এ বিষয়ের শেষ উত্তর প্রদান না করায়, কমিশনার সাহেব পুনর্ববার পলিটিক্যাল এজেন্টকে আর একখানা পত্র লেখেন । ১৮৮৮ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দরবার হইতে এতদ্বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার মূল মর্ম্ম এ স্থলে দেওয়া যাইতেছে ;—

“সতী-দাহ এ রাজ্যের বহু প্রাচীন কালের প্রচলিত প্রথা এবং প্রজামাধারণ এই প্রথাকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে । যে সকল পার্শ্বত্য জাতীর মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত, তাহারা এখনও অশিক্ষিত, সুতরাং রাজ-দরবার হইতে এই প্রথার প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ হইলে রাজ্যে অসন্তোষভাব এবং তজ্জনিত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে । বিশেষতঃ বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রথা স্বতঃই উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে । এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে,

* Letter No. 276: From Babu Umakanta Das Assistant Political Agent of Hill Tippera, To Babu Banga Charan Bhattacharjee B. A. Officer-in-charge of His Highness the Maharaja's English Office, Dated Agartala the 11th June 1888.

** 1. Wife of Charan Senapati of Burma Cherra about three years ago.

2. Wife of Ganga Mohan Senapati, named Beni Lakshmi of Falilong Cherra in about Baisak before last.

3. Wife of Milaram Burma of Hantarai Choudhury's para on Tuiruppa Cherra, in about Magh last.

ব্রিটিশ রাজ্যে যেকোন উৎপীড়ন বা প্ররোচনা প্রভৃতি দ্বারা সতীকে দণ্ড করা হইত, এ রাজ্যে তাহা হয় না। সতী স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে।

“এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দরবার এতদ্বিষয়ে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আবশ্যিকতা অনুভব করেন না। কিন্তু যাহাতে কেহ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা দ্বারা সতী-দাহ না করে এবং ক্রমশঃ আপনা হইতে যাহাতে এই প্রথা উঠিয়া যায়, দরবার সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।”

ইহার উত্তরে পলিটিক্যাল এজেন্ট বরাবরে চট্টগ্রামের কমিশনার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

FROM

D. R. Lyall Esquire,
Commissioner of the Chittagong.

To

The Political Agent,
Hill Tippera.

No 687
IX-21 H. T.

Dated, Chittagong, the 2nd Oct. 1888;

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your No. $\frac{1993}{XVI-27}$ dated 3rd September forwarding reply of the Hill Tipperah Durbar on the subject of Sati.

2. The reply is excessively unsatisfactory and not what I should have expected from a ruler so enlightened as the Maharaja, nor can I admit that the facts are correctly stated.

The custom of Sati is certainly not indogenous, and is, to the best of my belief, practised by none of the Hill Tribes except as an innovation. It is only the Hindooized portion of the Hill men who practise the custom, and they are not a class likely to become disaffected nor would their disaffection be of the faintest consequence.

3. The practice has clearly declined because it was believed to be forbidden, the Koylasher case which took place in February last proves this—and if it is now publicly admitted by the Maharaja that it is forbidden, the custom will very soon revive as it is quite clear that what is not forbidden is allowed, or in otherwords, tacitly encouraged.

4. I request that you will place the matter again before the Maharaja strongly advising him to pass a law to the same effect as Regulation XVII of 1829 and to see that it is enforced.

5. I cannot too strongly impress on the Maharaja the fact that his present action amounts to a direct encouragement of an act which has for nearly 60 years been declared illegal in India and which the whole civilized world unites in holding to be absolute barbarism.

I should be very unwilling to have to lay this question at length before the Government and trust that the Maharaja will take such action as will not necessitate my pushing the matter further.

I have etc.
(Sd.) D. R. Lyall,
Commissioner.

Memo No. $\frac{2289}{XVI-27}$ Dated Comillah, the 22nd Oct. 1888.

Copy forwarded to the Political Agent.

Agent of Hill Tipperah with reference to his No. 3/c dated 28th August /88. He is requested to place the matter again before the Maharaja and report after 3 months that a law for suppressing the custom of Sati has been passed and is enforced in Hill Tipperah.

(Sd.) Gouri Sankar Biswas,
for Pl. Agent.

অনুবাদ ।

নং $\frac{৬৮৭}{IX-২১}$

চট্টগ্রাম ২রা অক্টোবর
১৮৮৮

“মহাশয়,

সতী-দাহ সম্বন্ধে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর সম্বলিত আপনার ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের $\frac{১২২৩}{XVI-২৭}$ নং পত্র পাইয়াছি ।

রাজ-দরবারের লিখিত উত্তর সন্তোষজনক নহে । মহারাজের শ্রায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই । ঐ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না ।

সতী-দাহ পার্বত্য ত্রিপুরার আদিম প্রথা নহে, আমার বিশ্বাস পার্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা নূতন প্রবর্তিত । যে সকল পার্বত্য লোক হিন্দু ধর্মোচিত আচার অবলম্বন করে তাহারা সতী-দাহ প্রথার অনুসরণ করে । এই সমস্ত ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিবার লোক নহে এবং ইহাদের অসন্তুষ্টি আশঙ্কাজনকও নহে ।

এই প্রথা নিষিদ্ধ বলিয়াই সম্প্রতি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে । কৈলাসহরের গত ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনাই তৎপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ । যদি মহারাজের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, এ বিষয়ে কোনরূপ রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা নাই, তবে এই প্রথা পুনর্ব্যবহার প্রবল হইবে । কারণ, ইহা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহাই অনুমোদিত । সুতরাং ইহাতে এই প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হইবে ।

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই বিষয় পুনর্ব্যবহার মহারাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন ; এবং যাহাতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেসনের শ্রায় একটা আইন জারী হয় ও তদনুসারে কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দিবেন । আমি বিশেষরূপে মহারাজের গোচর করিতে চাই যে, যে প্রথা ৬০ বৎসর হইল

আইন বিরুদ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করা হইয়াছে এবং যাহা সমস্ত সুসভ্য জাতি অসভ্য ব্যবহার বলিয়া মনে করেন, মহারাজের বর্তমান কার্য্য দ্বারা সেই প্রথায় উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে ।

বিষয়টী বিস্তৃতরূপে গবর্ণমেন্টে উপস্থিত করা আমার অভিপ্রেত নহে । ভরসা করি, মহারাজ এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, যাহাতে আমাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু করিতে না হয় ।”

(স্বাঃ) ডি, আর, লায়েল

কমিশনার ।

নং ২২৮৯
XVI-২৭

কুমিল্লা—২২ অক্টোবর ।

পলিটিক্যাল এজেন্টের ২৮ আগষ্ট তারিখের ৩/০ নং পত্রের প্রত্যুত্তরের প্রতিলিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল । তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি এই বিষয় পুনরায় মহারাজের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং তিন মাস পরে রিপোর্ট করেন যে, সতী-দাহ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধীয় আইন প্রচারিত হইয়াছে । এবং ত্রিপুর রাজ্যে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইবে ।

(স্বাঃ) গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস

for Pl. Agent.

অতঃপর স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আদেশমূলে সতী-দাহ প্রথা ত্রিপুর রাজ্যে চিরকালের তরে বন্ধ হইয়াছে ।

সতী-দাহ সম্বন্ধীয় বিবরণ নিতান্ত সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল । এ বিষয়ে সহস্রগণ-প্রথা সম্বন্ধে সত্যতা জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, এবং ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক অনেক কথা বলিয়াছেন । এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব । বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, ব্যাস, হারিত ও বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যাইবে । এই প্রথা ভালই হউক, বা মন্দই হউক, ইহা পবিত্র এবং পুণ্যজনক বলিয়া হিন্দুসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । ত্রিপুরা হিন্দুরাজ্য, ত্রিপুরেশ্বরগণ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক এবং সংরক্ষক । এই কারণেই বৃটিশ ভারতে সতী-দাহ বন্ধ হইবার পরেও ষাট বৎসর কাল ত্রিপুরায় তাহা অবাধে চলিয়াছিল । কিন্তু বৃটিশ রাজ্যের ঞ্চায় এই রাজ্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা, প্ররোচনার বাধ্য করিয়া, কিস্বা স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে কোন সতীকে পতির সহগামিনী করিবার কথা কখনও শুনা যায় নাই । সতীগণ স্বৈচ্ছায় এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত চিত্তারোহণ করিতেন ।

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে আইন দ্বারা সতী-দাহ নিবারণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সহস্রগণ-প্রথা নিবারক প্রদান করিয়া এতদ্বিষয়ক আলোচনার পরিসমাপ্তি করা যাইতেছে । আইন ।

REGULATION—XVII. OF 1829.

I. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of Justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindars, talukdars and other proprietors of land, whether malguzari or lakhiraj all sardar farmers and under-renters of land of every description, all dependent talukdars, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemimdar or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months,

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamader accompanied by one or more barkandazes of the Hindu religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

অতীত রাজ্যে যে কার্য সাধনের নিমিত্ত আইন বা রেগুলেশনের প্রয়োজন হয়, ত্রিপুরার একমাত্র রাজার বাক্যেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে সতীদাহ নিবারণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান কিম্বা আইন প্রণয়ন করিতে হয় নাই। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মণিক্যের এক ক্ষুদ্র রোবকারী মূলেই সেই প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। উক্ত রোবকারী নিম্নে প্রদান করা হইল।

(Sd.) B. C. Deb.

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মণিক্য বাহাদুর
সন ১২৯৯ খ্রিঃ, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্শ্বতীর প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অতীত সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যিক। সেমতে—

হুকুম হইল যে,—

এতদ্বারা উল্লিখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উত্থোগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন রায়,

মুন্সী।

হস্তী-বিজ্ঞান ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অনেকস্থলেই হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায় । বিশেষতঃ শ্বেত হস্তীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । বন্য হস্তী ত্রিপুরার বিপুল সম্পদ । একমাত্র হস্তীর নিমিত্তই এই রাজ্যের উপর মুসলমানগণের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, এবং তৎকালেই তাঁহারা বারম্বার রাজ্য আক্রমণ ও নানাবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন ।

হস্তী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । প্রাচীন ঋষিগণ এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এতদ্বিষয়ক অনেক তথ্য অবগত আছেন । তৎসমুদয় অবলম্বনে এস্থলে স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে ।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার জঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল । বর্তমানকালেও রাজ্যের প্রায় সকল অঞ্চলেই হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্বেবর তুলনায় সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে । পার্বত্য প্রদেশে লোকালয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেকস্থলে হস্তীর গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে । হস্তীযুথ জনতার সন্নিহিতে বিচরণ করিতে চাহে না । এই কারণে অনেক হস্তী দূরবর্তী গভীর অরণ্যে, কিম্বা রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । হস্তী সংখ্যা হ্রাস হইবার ইহা একটা প্রধান কারণ । এতদ্ব্যতীত কুকি, চাখমা ও মঘ প্রভৃতি অনেক পার্বত্য জাতি গজদন্ত চুরি করিবার উদ্দেশ্যে এবং মাংস সংগ্রহের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় পাইলেই বড় বড় গুণ্ডা (পুং হস্তী) বধ করিয়া থাকে । পুং হস্তীর সংখ্যা সাধারণতঃই কম, তাহা আবার মনুষ্য কর্তৃক নিহত হওয়ায়, দিন দিনই সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে । ইহা হস্তীবংশ বৃদ্ধির আর এক অন্তরায় ।

ভারতের অনেক প্রদেশেই বন্য হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরা পর্বতের গায় সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হস্তী অশ্রুত দুর্লভ । রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের হস্তী অপেক্ষা উত্তরভাগের হস্তী দীর্ঘজীবী এবং অধিক বলশালী ।

হস্তীর স্বভাব অনেক পরিমাণে মানুষের স্বভাবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । এই কারণেই প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্য সমাজের গায় হস্তীদিগকেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন । শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি দ্বারা তাহা বাছিয়া লইতে হয় । এই চারি জাতীয় হস্তীকে আবার প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্বিবরণ পরে দেওয়া হইবে ।

হস্তী সমূহ যুথবদ্ধ হইয়া অবস্থান ও বিচরণ করে । একটা বয়ঃজ্যেষ্ঠা কুনকী (হস্তিনী) দলের নেত্রী হয়, তাহার ইঙ্গিত মতে সমগ্র দল পরিচালিত হইয়া থাকে । স্থানীয় ভাষায় এই কুনকীকে 'পালমাই' বা 'চরাল কুনকী' বলা হয় । গুণ্ডাগুলি অধিক বলশালী এবং সাহসী হইলেও অসতর্ক এবং অধিকাংশ সময় মদমস্ত অবস্থায় থাকে । বিশেষতঃ দলমাধ্য নতন বাচ্চা জন্মিলে তাহাকে বধ করিবার

নিমিত্ত সর্বদা চেষ্টিত থাকাই ইহাদের স্বভাব । এই সকল কারণে প্রায়ই গুণ্ডাকে দলপতি করা হয় না । একদল হইতে অপসারিত হস্তী অন্য দলে সহজে মিলিতে পারে না । সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয় ।

হস্তীযুথ সর্বদা একস্থানে থাকে না । যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে তৃণ পল্লবাদি পাওয়া যায়, অথচ নিকটে জল আছে, সেইস্থানে কিয়ৎকাল বিচরণ করে । সমস্ত দিন আপন আপন ইচ্ছানুরূপ বেড়াইয়া আহার করে, তখন প্রায়ই দল ছাড়িয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে । রাত্রিতে কোনও শৃঙ্গদেশে একত্রিত হইয়া, ছোট ছোট বাচ্চা-গুলিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহাদের চতুর্পার্শ্বে বড় হস্তীগুলি শয়ন করে । ইহারা এত সতর্ক যে, নিদ্রিতাবস্থায় সামান্য শব্দ পাইলেই হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় ।

অনেক সময় ইহারা পার্বত্য নদী, ছড়া বা হ্রদে দলবদ্ধভাবে নামিয়া স্নান ও জলক্রীড়া করে । তাহাদের বিশাল বপুর অবরোধে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় নদীর বেগ মৃদু হয়, তখন উপরিভাগের (উজানের) জল স্ফীত হইয়া উঠে এবং উহাদের আলোড়নে নিম্নভাগের (তাঁটির) জল কর্দমময় হইয়া যায় । অধিক উত্তাপের সময় ইহারা প্রায়ই জলমগ্নাবস্থায় কিম্বা শীতল গুহাস্থিত নীবিড় অরণ্য-ছায়ায় অবস্থান করে । গ্রীষ্মকালে ইহারা দূরবর্তী গভীর পর্বতে চলিয়া যায় এবং শীতের সমাগমে পুনর্ববার নামিয়া আইসে ।

হস্তীযুথ যে স্থানে আট দশ দিবস অবস্থান করে, সেই স্থান বনজঙ্গল শূন্য হইয়া পড়ে । এক স্থানের আহাৰ্য্য ফুরাইয়া গেলে, তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া যায় । স্থান পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে ‘পালমাই’এর ইঙ্গিত মতে সকলে একস্থানে মিলিত হয় এবং পর পর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পালমাইএর পশ্চাদানুসরণ করে । দলের প্রধান গুণ্ডাটী প্রায়ই সকলের পেছনে থাকে । স্থানত্যাগের কালে, সত্ব-প্রসূত বাচ্চা লইয়া কোন হস্তিনী দলের অনুসরণে অসমর্থ হইলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রহরীরূপে তিন চারিটী হস্তিনী পেছনে রাখিয়া অবশিষ্ট দল সুবিধাজনক স্থানে চলিয়া যায় । পেছনের দল, বাচ্চা সহ ধীরে ধীরে চলিয়া দুই তিন দিন পরে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় ।

রামকলা, তারা, ডুমুরগাছ এবং মুলিবাঁশের করুল (কচিবাঁশ) হস্তীর প্রিয় খাদ্য । এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল জাতীয় তৃণ পল্লবই ইহারা আহার করে । পদ্মের মৃগাল এবং কৎবেল ইহাদের উপাদেয় খাদ্য ।

হস্তীযুথ সাধারণতঃ এক পথেই সর্বদা যাতায়াত করে । তাহাদের গমনা-গমনের পথ পঁচিশ ত্রিশ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট এবং রেলপথের স্থায় সোজা হয় । স্থানীয় ভাষায় এই রাস্তাকে ‘দোয়াল’ বলে । জন-মানব শূন্য নীবিড় অরণ্যে হস্তীর দোয়াল ব্যতীত অন্য পথ নাই । সেখানে মনুষ্য গমন করিলে এই পথ অবলম্বনেই চলাফিরা করিতে হয় । ইহাতে প্রতি পাদক্ষেপে হস্তীযুথের সম্মুখে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে ।

হস্তীর আশক্তিও কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যেরই অনুরূপ । দলস্থ কতিপয় নির্দিষ্ট কুনকীর প্রতি এক একটি গুণ্ডা আশঙ্ক থাকে । এবং তাহাদের সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করিতে ভালবাসে । অন্য কুনকীকে বড় পছন্দ করে না । হস্তিনী ঋতুমতী না হইলে কখনও গুণ্ডার সহিত সঙ্গতা হয় না ।

হস্তিনী প্রতিবারে এক একটি বাচ্চা প্রসব করে, কদাচিত্ যমজ সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায় । ইহারা সাধারণতঃ ২৪ মাস গর্ভধারণের পর পুং বাচ্চা এবং ১৮ মাসের পর স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে । কোন কোন স্থলে এই নিয়মের সামান্য ব্যত্যয় ঘটিতেও দেখা যায় । হস্তিনী একবার প্রসব করিবার পর একবৎসর মধ্যেই পুনর্ববার গর্ভধারণ করে । হস্তিনীগণ সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথম গর্ভধারণের যোগ্য হয় । হস্তিনীর গর্ভ ও স্তন ঠিক মানুষের মত । পশু মধ্যে হস্তীর সন্তান বাৎসল্য অতুলনীয় । কোন দলে এক বা একাধিক নূতন বাচ্চা প্রসূত হইলে, তাহারা গুণ্ডা কর্তৃক বিনষ্ট না হয়, দলস্থ সমস্ত হস্তিনীর সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকে । শাবকের আশঙ্কাজনক সময় অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ঘট প্রকৃতির গুণ্ডাগুলিকে দলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না । প্রবেশ করিতে চাহিলেই সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয় । এতদবস্থাপন্ন গুণ্ডাগুলি কিছু দূরে দূরে থাকিয়া দলের অনুসরণ করে ।

সন্তান মরিলে কিম্বা কোন কারণে যুথভ্রষ্ট হইলে মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া উন্মাদিনীর স্থায় চীৎকার করে এবং অরণ্যময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় । সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহারা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে । এরূপ সংগ্রামকালে বাচ্চাটিকে বকের নীচে রাখে এবং হিংস্র জন্তুটী ঘুরিয়া ফিরিয়া যে দিক হইতে আক্রমণ করে, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া শুণ্ড, দস্ত এবং পদ সাহায্যে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করে, এই সময় হস্তিনী মুহুমূহুঃ চীৎকার করিতে থাকে । প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ পাইলে তাহাতেও ত্রুটি করে না । এই সময় হস্তী-শিশু জননীর বন্ধতল ত্যাগ করিয়া কিছুতেই বাহির হয় না । দলের অন্যান্য হস্তী নিকটে থাকিলে তাহারাও আসিয়া সাহায্য করে । একাধিক হস্তী দেখিলে ব্যাঘ্র আপনা হইতেই পলায়ন করে । অনেক সময় বাচ্চার লোভ ব্যতীতও ব্যাঘ্রগণ হস্তীকে আক্রমণ করে এবং কোন কোন অবস্থায় হস্তী কর্তৃক নিহতও হয় ।

দৈবাৎ কোন শাবক দল ছাড়া হইলে তাহা ধরিয়া খাইবার আশায় বৃহদাকারের দুই একটি ব্যাঘ্র প্রায়ই হস্তীযুথের পশ্চাদনুসরণ করে । গুণ্ডারেরা হস্তীর মল ভক্ষণ করিতে ভালবাসে, এজন্য কোন কোন সময় হস্তী দলের সঙ্গে দুই একটি গুণ্ডার থাকিতেও দেখা যায় ।

এক কুনকীর বাচ্চা অন্য কুনকী কর্তৃক পালিত হইতে সচরাচরই দেখা যায় । উহারা পালিত বাচ্চাকে আপন সন্তানের স্থায় ভালবাসে এবং সর্বদা সযত্নে রক্ষা করে । বাচ্চাও মায়ের সঙ্গ ছাড়িয়া সর্বদা পালনকর্ত্রীর সঙ্গেই থাকে, দুগ্ধপানের

সময় ব্যতীত মায়ের কাছে যায় না। বাচ্চাটী পালয়ত্রীর দৃষ্টির অন্তরালে গেলে, সে মায়ের মত ব্যস্তভাবে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা ঠিক মানব সমাজের ধাবীর অনুরূপ কার্য্য বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক কুনকী আপন আপন বংশবল্লী লইয়া একত্রে থাকে। মানব সমাজ যেমন এক বাড়ীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে পরিবারস্থ পুত্র কন্যাাদি লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে বাস করে, ইহারাও তক্রূপ এক দলের মধ্যেই আপন আপন সম্মান-সম্মতি লইয়া একটু স্বতন্ত্রভাবে থাকে। এই অবস্থা অতি সহজ দৃষ্টিতেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

হস্তীর প্রত্যেক দলে বিশ পঁচিশটি হইতে, শতাধিক পর্য্যন্ত সংখ্যা দৃষ্ট হয়। দলের মধ্যে একাধিক দুর্ঘট প্রকৃতির গুণ্ডা থাকিলে সর্বদাই তাহাদের পরস্পরে কলহ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীত্বের মধ্যে যে হস্তীটী অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সে অনবরত মাইর খাইয়া দল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর বিতাড়িত কতিপয় গুণ্ডা একত্রিত হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র দল গঠন করে। স্থানীয় ভাষায় এই দলকে 'ফাটুয়া দল' বলে।

হস্তী সমূহের উচ্চতানুসারে দেশভেদে নানাবিধ আখ্যা প্রদান করা হয়। ত্রিপুর রাজ্যে ইহার যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুং হস্তী সম্বন্ধে ;—দুগ্ধ পানের অবস্থা পর্য্যন্ত 'বাচ্চা' বলা হয়। দুগ্ধ ছাড়িবার পর, ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী 'মিয়ানা' এবং তদূর্দ্ধ উচ্চতা বিশিষ্ট হস্তী 'গুণ্ডা' বা 'দাঁতাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুং হস্তীর মধ্যে যে হস্তীর দস্তদ্বয় বাহির হয় না, তাহাকে 'মকনা' বলে।

হস্তিনী সম্বন্ধে ;—বাচ্চা অবস্থা উত্তীর্ণের পর ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তিনী 'মিয়ানী' এবং তদূর্দ্ধ উচ্চ হস্তিনীকে 'কুনকী' বলে। সাধারণতঃ হস্তিনীগণ প্রথম গর্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত মিয়ানী শ্রেণীভুক্ত।

প্রাদেশীক প্রথানুসারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, গুণ্ডা, দস্ত, নখ ও পুচ্ছ ইত্যাদির লক্ষণানুসারে হস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত তাহা নির্ণয় করা হয়। প্রাচীন ঋষিগণও হস্তীর লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

হস্তীর দস্ত বিশেষ মূল্যবান এবং তদ্বারা নানাবিধ বিলাস দ্রব্য, খেলনা, উপবেশনের আসন এবং পাটী নির্মিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে গজদস্তদ্বারা অনেক বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে। হস্তীর অস্থিও কাজে লাগে, কিন্তু তাহা দস্তের স্থায় মূল্যবান বা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে।

ত্রিপুরার গজদস্তে একমাত্র রাজার অধিকার, তাহা অণ্ডে গ্রহণ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডাৰ্হ হয়। এরূপ আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অনেকে নীবিড় অরণ্য মধ্যে গোপনে হস্তী বধ করিয়া দস্ত চুরি করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

গজমুক্তা নিতাস্ত দুর্লভ এবং মূল্যবান বস্তু । পুং হস্তীর শুণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া যে দুইটা বৃহৎ দন্ত নির্গত হয়, তাহার কোন কোন দস্তের অভ্যন্তরে মুক্তা জন্মিয়া থাকে । দন্ত চিড়িলে তাহা পাওয়া যায় । হস্তিনীর দস্তে মুক্তা জন্মে না ।

হস্তী সম্বন্ধীয় প্রাদেশীক বিবরণ মোটামুটিভাবে প্রদান করা গেল । এতদ্বিষয়ে বলিবার আরও অনেক কথা থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে তাহা বর্জন করিতে হইল ।

প্রাচীন ঋষিগণ হস্তী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে । সাধারণতঃ অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নন্দি পুরাণ, কালিকা পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, হরিবংশ, পরাশর সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, গার্গ্য সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, বসন্তরাজ শাকুন, যুক্তিকল্পতরু, কবিকল্পলতা, বিষ্ণু ধর্মোত্তর, শুদ্ধিতত্ত্বম্, রাজ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থেই অল্পাধিক পরিমাণে হস্তী সম্বন্ধীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ পাওয়া যায় । তাহার সম্যক আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ; মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা হইবে মাত্র ।

ঋষিগণ হস্তীদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত করিবার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তেষাং ভেদ চতুর্বিধঃ ।
বিশালাঙ্গাঃ পবিত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ স্বল্প ভোজিনঃ ।
শূরা বিশালা বহ্বাশাঃ ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥”

পরাশর ।

যে হস্তী বিশাল দেহ, পবিত্র এবং অল্পভোজী, সে ব্রাহ্মণ জাতীয় । ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তী বলিষ্ঠ, বিশালকায় এবং ক্রুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে । বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় হস্তী মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত হয় । এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হস্তী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়া থাকে ; যথা,—

“এক জাতি সমুৎপন্নো গজঃ শুদ্ধ ইতিস্মৃতঃ ।
লক্ষণঞ্চ যথা প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চতত্র দৃশ্যতে ॥
শুদ্ধ দ্বিজাতি সম্ভূতস্তলক্ষণ সমন্বিতঃ ।
জারজো নাম বিখ্যাতো যথাস্বং বলবীৰ্য্যবান্ ॥
দ্বিজাতিষয় জাতো যঃ স শূর ইতি কথ্যতে ।
দ্বিজাতি জারজোৎপন্ন উদ্ভাস্ত ইতি কথ্যতে ॥
এবং সংযোগ ভেদেন গজ জাতিরনেকধা ।
তাং যো জানাতি তন্বেন স রাজঃ পাত্মমর্হতি ॥”

পরাশর ।

এক জাতীয় পিতা ও মাতা হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে । শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট লক্ষণ সমূহ শুদ্ধ হস্তীতে বিদ্যমান থাকিবে । শূদ্র ও ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন, অথচ ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত ও বীৰ্য্যবান্ হস্তীকে জারজ বলে । দুইটা দ্বিজাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন হস্তী শূর বলিয়া কথিত হয় । ব্রাহ্মণ

জাতীয় ও জারজ হইতে সমুদ্ভূত হস্তীকে উদ্ভাস্ত বলে । এইরূপ পরস্পরের সংমিশ্রণে অনেক জাতীয় হস্তীর উৎপত্তি হয় । যিনি হস্তী জাতির এই সকল ভেদ সম্যকভাবে অবগত আছেন, তিনি রাজার অমাত্য পদ লাভের যোগ্য ।

গজসমূহ অষ্টদিগ্গজের বংশধর বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক ঘোষিত এবং তদ্ব্যক্তে ইহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । যথা,—

“গজানামষ্টধাভেদাঃ সংক্ষেপেন প্রকাশ্যতে ।

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোহঞ্জনঃ ॥

পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্গজাঃ ।

এষাং বংশ প্রসূতত্বাৎ গজানামষ্টজাতয়ঃ ॥”

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক, ইহারা দিগ্গজ নামে বিখ্যাত । ইহাদের বংশপ্রসূত গজসমূহ আট জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে । শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে পূর্বেবক্ত অষ্টদিগ্গজের লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

“যে কুঞ্জরাঃ পাণ্ডুর সর্কদেহাঃ সুদীর্ঘ দস্তাঃ সিতপুষ্পদস্তা ।

অলোমশা অল্পভুজো বলাঢ্যা মহাপ্রমাণা লঘুপৃষ্ঠ লিঙ্গাঃ ॥

ক্রুদ্ধাঃ সমীকে মৃদবোহন্যকালে লঘুশ্বপানা বহুলো প্রদানাঃ ।

বিস্তীর্ণ দানান্তমূলোমপুচ্ছা ঐরাবতশ্চাভিজন প্রসূতাঃ ॥

তেষেব সর্কেষু বিশুদ্ধবর্ণা অতীব বৃত্তাঃ প্রভবন্তি মুক্তাঃ ।

নান্নেন পুণ্যেন মহীপতিনাং স্পৃশন্তি ভূমণ্ডল-মধ্যমেতে ।

দস্তা বিভগ্না অপিশুদ্ধরজে পুনঃ প্ররোহন্তি পুরৈব তেষাম্ ॥”

যে হস্তী শুভ্রবর্ণ, সুদীর্ঘ ও পুষ্পদস্তা, লোমশূন্য, অল্পভোজী, বলবান, বৃহৎ অবয়ব, ক্ষুদ্র অথচ পৃষ্ঠ লিঙ্গ বিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপন স্বভাব এবং অন্য সময়ে নম্র, অল্প জলপায়ী, শরীর ও পুচ্ছ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, যাহার শরীর হইতে প্রভূত মদস্রাব হয়, সেই হস্তীই ঐরাবত বংশীয় । এতজাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত এবং সুগোল মুক্তা উৎপন্ন হয় । ইহারা রাজগণের অল্পপুণ্যে ভূমণ্ডল স্পর্শ করে না । যুদ্ধ হেতু ইহাদের দস্ত ভগ্ন হইলেও পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এতজাতীয় হস্তীকেই সাধারণতঃ খেত হস্তী বলা হয় ।

“যে কুঞ্জরাঃ কোমল সর্কদেহাঃ পুচ্ছা ন দণ্ডাঃ খর গণ্ডদেশাঃ ।

অবন্নদাঃ সন্ততরোষ ভাজোহমর প্রিয়াঃ সর্কভুজো বলাঢ্যাঃ ॥

সুতীক্ষ্ণদস্তা রসনা গজানাং তে পুণ্ডরীকঃ প্রবর প্রসূতাঃ ।

তে পদ্মগন্ধং বিশ্ৰজন্তি রেতো দানঞ্চ নৈষাং বমথুঃ প্রভূতা ॥

ন তোর পানেহভ্যাধিকা স্পৃহা চ শ্রমেহপি নৈতে বল মুৎস্বজন্তি ।

অমীতু যেষাং নিবসন্তি রাজাং তে বৈ সমস্ত ক্রিতি শাসনার্হাঃ ॥”

যে হস্তীর সর্কবাজ কোমল, পুচ্ছ দণ্ডাকৃতি নহে, গণ্ডদেশ খর, সতত মদস্রাবী ও ক্রুদ্ধ, দেবপ্রিয়, সর্কভুক, বলবান এবং যাহার দস্ত ও জিহ্বা অতিশয় তীক্ষ্ণ, সেই

হস্তী পুণ্ডরীকের বংশোদ্ভব । ইহাদের রোত পদ্মগন্ধ বিশিষ্ট এবং মদস্রাব ও বমন অধিক হয় না । ইহাদের জলপানের স্পৃহা অধিক নহে, এবং ইহারা শ্রমে ক্লান্ত হয় না । এই হস্তী যে রাজার গৃহে থাকে, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসনের যোগ্য হন ।

“বে কুঞ্জরাঃ কৰ্কশ খৰ্বদেহাঃ কদাপি মাণ্ডন্তি গলয়দাশ্চ ।

আহার যোগাঙ্কলবীৰ্য্য ভাজোনাত্যধুকামা বহু লোম গণ্ডাঃ ।

বিরূপদস্তান্তনু পুচ্ছ কৰ্ণা জ্জেরা বুধৈৰ্ব্বামন বংশ জাতাঃ ॥”

যে হস্তীর দেহ কৰ্কশ ও খৰ্ব্ব, যাহারা কখন কখন উন্মত্ত হয়, সৰ্ব্বদা মদস্রাব করে, আহারের দ্বারা বল ও বীৰ্য্যবান হয়, যাহারা অধিক জলপানে ইচ্ছুক নহে, যাহার গণ্ডস্থল অধিক লোমযুক্ত, দস্তদ্বয় কুৎসিত, দেহ, পুচ্ছ এবং কৰ্ণ বিরূপ, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বামন বংশজাত বলিয়া নির্দেশ করেন ।

“বে দীৰ্ঘ দেহান্তনু দীৰ্ঘ গুণ্ডাঃ কুদন্ত ভাজো মলপূৰ্ণ দেহাঃ ।

স্থবিষ্ঠ গণ্ডাঃ কলহপ্রিয়াশ্চ তে কুঞ্জরা স্যুঃ কুমুদন্ত বংশাঃ ।

অগ্ৰদ্বিপান দর্শনমাত্র তন্ত নিম্নস্তিতে হর্গমনাশ্চ পুং সাম্ ॥”

যাহার দেহ ও গুণ্ড দীৰ্ঘ, দস্তদ্বয় কুৎসিত, শরীর সতত মলযুক্ত, গণ্ডদ্বয় স্থূল, যাহারা কলহ প্রিয়, তাহারা কুমুদবংশজাত । ইহারা অগ্ৰ হস্তী দেখিলেই বধ করে । ইহাদের নিকট মনুষ্য সহজে অগ্রসর হইতে পারে না ।

“বে স্নিগ্ধ দেহাঃ সলিলাভিলাষা মহা প্রমাণান্তনু গুণ্ড দস্তাঃ ।

স্থবিষ্ঠ দস্তাঃ শ্রমহঃসহাশ্চ তে কুঞ্জরাশ্চাজ্ঞন বংশ জাতাঃ ॥”

যে হস্তীর স্নিগ্ধ দেহ, জলপানে অত্যন্ত অভিলাষী, যাহার দেহ সুবৃহৎ, যাহার দস্ত ও গুণ্ড ছোট, দস্তদ্বয় স্থূল এবং শ্রমকর্ম সহ করিতে পটু, তাহারা অজ্ঞন বংশসম্ভূত ।

“রোতশ্চ দানঞ্চ সৃজন্তি শব্দদানুপদেশে প্রভবন্তি যে তু ।

তে পুষ্পদস্তাভিজন প্রসূতা মহা জবাস্তে তনু পুচ্ছ ভাগাঃ ॥”

যে হস্তী সৰ্বদা মদজল ও রোতঃ পরিত্যাগ করে, যাহার অনুপদেশে উৎপন্ন, যাহাদের পুচ্ছ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বেগ অতি তীব্র, সেই হস্তী পুষ্পদস্ত বংশজাত ।

“সুদীৰ্ঘ দস্তা বহু লোমভাজো মহাপ্রমাণাশ্চ সুকৰ্কশাঙ্গাঃ ।

ভ্রাম্যন্তি নাথ্ব ভ্রমণাভিবোগান্নাহার পানাदिषু চাতি শক্তিঃ ॥

মরু প্রদেশে বিচরন্তি তে বৈ মুক্তা ফলানামিহ জন্ম মধ্যে ।

মহাশরীরাতিনুকৰ্কশাঙ্গা নারিষ্ঠ দস্তা মূহ গুরু দস্তাঃ ॥

মহাশনাঃ ক্ষীণ পুরীষমূত্র বিস্তীর্ণ কৰ্ণান্তনু রোমগণ্ডা ।

তে সার্কভৌমাভিজন প্রসূতা বিপুল মুক্তাঃ প্রভবন্তি চেষু ॥”

যাহার দস্ত সুদীৰ্ঘ, যে হস্তী বহু লোমযুক্ত, বৃহদাকার, কৰ্কশ অঙ্গবিশিষ্ট, ভ্রমণে অক্লান্ত, আহার ও পানে অতিশয় পটু, মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক, যাহার দেহ কৰ্কশ ও সুবৃহৎ, দস্তদ্বয় দীৰ্ঘ, কোমল ও গুরুবর্ণ, অধিক ভোজী, কিন্তু

অল ও মূত্র অল্প ত্যাগ করে, কর্ণ বিস্তীর্ণ, গণ্ডদেশ ও রোমাবলী ক্ষীণ, তাহারাই সার্বভৌম দিগ্গজের বংশ । এতজ্জাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ মুক্তা উৎপন্ন হয় ।

“যে দীর্ঘশুণ্ডাঃ স্ফুবিভক্ত দেহাঃ মহাজবাঃ ক্রোধ পরীতকাশ ।
বিস্তককর্ণাস্তনুপুচ্ছদস্তাঃ সদাশনশৈব বশাপ্রিয়াশ্চ ॥
প্রবৃদ্ধ গণ্ডাস্তনু লোমযুক্তাঃ স্তে স্ফপ্রতীক প্রবর প্রসূতাঃ ।
মহাপ্রমাণামিতমৌক্তিকানি ভবন্তি চৈতন্নিজগদ কাপাঃ ॥”

যাহাদের শুণ্ড দীর্ঘ, দেহ স্ফুবিভক্ত, বেগ প্রচণ্ড, যাহারা ক্রোধী, যে হস্তীর কর্ণদ্বয় সর্বদা স্তক থাকে, পুচ্ছ ও দস্ত ক্ষীণ, সর্বদা ভঙ্কণাভিলাষী, হস্তিনীপ্রিয়, গণ্ডদেশ বৃহৎ, গাত্র অধিক লোমযুক্ত, তাহারাই স্ফপ্রতীক বংশসম্ভূত । এই সকল হস্তীতে বৃহদাকারের মুক্তা পাওয়া যায় ।

এই গেল অষ্টদিগ্গজের বংশ বিবরণ । বৃহৎ সংহিতা প্রণেতা বরাহমিহির আবার হস্তীদিগকে মোটামুটীভাবে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন,—ভদ্র, মন্দ, মৃগ ও মিশ্র । হেমচন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন,—

“ভদ্রোমন্দ্রোমৃগোমিশ্রশ্চতস্রোগজ জায়তঃ ।”

যে হস্তীর দস্ত মধুর শ্রায় বর্ণ বিশিষ্ট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফুবিভক্ত, দেহ নাতিস্থূল ও নাতিকৃশ, অথচ অতিশয় বলশালী, মেরুদণ্ড ধনুকের শ্রায় বাঁকা, জঘনভাগ শূকর সদৃশ, তাহাই ভদ্র জাতীয় হস্তী ।

যাহার বক্ষঃস্থল ও কক্ষদেশ শিথিল, উদর দীর্ঘ, গলদেশ বৃহৎ, চর্ম্ম পুরু, পেট ও পুচ্ছমূল স্থূল, চক্ষুদ্বয় সিংহের অনুরূপ, তাহাকে মন্দ হস্তী বলে ।

যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ খর্ব্বাকৃতি, গলদেশ, দস্ত, শুণ্ড, কর্ণ ও পদচতুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং চক্ষুদ্বয় স্থূল, তাহা মৃগ জাতীয় হস্তী ।

যে সকল হস্তী মিশ্রলক্ষণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দুই জাতীয় হস্তীর লক্ষণ যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগকে সক্ষীর্ণ বা সঞ্চয় জাতীয় হস্তী বলা হয় ।

ইহার প্রত্যেক জাতীয় হস্তীর উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, শরীরের পরিধি এবং মদ-জলের বর্ণ ইত্যাদি নির্দেশ করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করা হইল ।

বরাহমিহির, পরাশর, গার্গ্য এবং ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থে হস্তীর লক্ষণাদি পরীক্ষা সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিবরণ পাওয়া যায় । তন্মধ্যে ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুর মতই অধিকতর প্রশস্ত । প্রয়োজন বোধে তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ।

উত্তম হস্তী ।

“রম্যো ভীমো ধ্বজোহধীরো বীরঃ শূরোহষ্টমঙ্গলঃ ।

সুন্দরঃ সর্বতোভদ্রঃ স্থিরো গভীর বেতুপি ।

বরারোহ ইতিপ্রোক্তা গজা দ্বাদশ সপ্তমাঃ ॥”

রম্য, ভীম, ধ্বজ, অধীর, বীর, শূর, অষ্টমঙ্গল, সুন্দর, সর্বতোভদ্র, স্থির,

গস্তীরবেদী ও বরারোহ, এই দ্বাদশবিধ হস্তীকে আৰ্য্য ঋষিগণ উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ।

“বিভক্তাবয়বঃ পৃষ্ঠঃ সুদন্তঃ সুমহানপি ।
তেজস্বী রম্য ইত্যুক্তো গজঃ সম্পত্তিবর্দ্ধক ॥”

যে হস্তীর অঙ্গ সুবিভক্ত এবং পৃষ্ঠ, দন্ত সুন্দর, দেহ বৃহৎ এবং তেজস্বীত পূর্ণ তাহা রম্য হস্তী । এই সকল হস্তী প্রভুর সম্পত্তি বর্দ্ধক ।

“অকুশাদি প্রহারেণ যশ্চ ভীতিনর্জায়তে ।
স ভীমোহয়ং গজঃ শুদ্ধো রাজ্ঞঃ সর্বার্থসাধনঃ ॥”

যে হস্তী অকুশাদির প্রহারে ভীত হয় না এবং শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত তাহাকে ভীম বলে । ইহারা রাজার সর্বার্থ সিদ্ধি করে ।

“শুভ্রাগ্রাৎ পুচ্ছপর্যাস্তং রেখা যশ্চৈব দৃশ্যতে ।
ধ্বজঃ শুদ্ধো গজো নাম সাম্রাজ্য প্রাণ দায়কঃ ॥”

যে হস্তীর শুঁড় হইতে লাল্পুল পর্যাস্ত একটা রেখা লক্ষিত হয়, সেই শুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত হস্তীকে ধ্বজ বলে । ইহারা সাম্রাজ্য ও দীর্ঘায়ু দায়ক ।

“সর্মো কুস্তৌ খরাকারৌ আবর্তৌ তত্র চোচ্ছ্রৌ ।
অধীরোহয়ং গজো নামা রাজ্ঞাং নিপ্র বিনাশনঃ ॥”

যাহার কুস্তদ্বয় পরস্পর সমান, দেখিতে খর্বাকৃতি, দেহ আবর্তবিশিষ্ট এবং আবর্ত স্থান উন্নত, তাহাকে অধীর বলে । এই হস্তী রাজগণের অমঙ্গলকারী ।

“আবর্তঃ প্রষ্ঠতো যশ্চ স্বনাভিগভিবিন্দতি ।
পুষ্ঠাঙ্গো বলবান্ বীরো রাজ্ঞামভিমত প্রদঃ ॥”

যে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নাভি পর্যাস্ত আবর্ত থাকে, দেহ পৃষ্ঠ এবং বলশালী তাহাকে বীর বলে । এই হস্তী রাজগণের অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করে ।

“মহাপ্রমাণঃ পুষ্ঠাঙ্গঃ সুদন্তশ্চারুগণ্ডকঃ ।
ভক্ষণে ভক্ষণে শ্রান্তঃ শুরো লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনঃ ॥”

যে হস্তী বৃহদাকার বিশিষ্ট, দেহ পৃষ্ঠ, দন্ত ও গণ্ডস্থল সুন্দর, আহার করিলে পরিশ্রান্ত হয়, সেই হস্তীকে শূর বলে । এই হস্তীর দ্বারা রাজলক্ষীর বৃদ্ধি হয় ।

“সিতৌ দন্তৌ সিতঃ পুচ্ছঃ সিতারেখা সিতানথাঃ ।
রক্ত কুস্তাক্ষিবীর্য্যগ্গৈ বিজ্ঞেয়ঃ সোহষ্টমঙ্গলঃ ॥
অয়ং গজেচ্ছ্রো যশ্চাস্তে তশ্চ স্মাৎ সকলা মহী ।
নারিষ্টানীতয়স্তত্র যত্রাস্তেহয়ং গজেশ্বরঃ ॥
আযোজনশতং যাবদনর্থং কুরুতে ক্ষয়ম্ ।
নাম্ন পুণ্যায়ং প্রাপ্যো মনুজৈঃ কলৌযুগে ॥”

যাহার দন্তদ্বয়, পুচ্ছ এবং নখ শুভ্রবর্ণ এবং শরীর শ্বেতবর্ণ রেখাবিশিষ্ট, যাহার কুস্ত, চক্ষু ও পুং চিহ্ন রক্তবর্ণ, সেই হস্তী অষ্টমল । এই হস্তী যাহার গৃহে

থাকে, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন । এই হস্তীর বাসস্থানে অরিষ্ট বা অনীতি থাকে না এবং সেই স্থান হইতে শত যোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল নষ্ট করে । কলিযুগে রাজগণের পুণ্যের অল্পতাহেতু অষ্টমঙ্গল হস্তী দেখা যায় না ।

অন্য পাঁচ জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তীর লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে । রাজ্য-বর্গের সুখকর হস্তীর লক্ষণ এই,—

“শুভৌ দন্তৌ শুভঃ শুভঃ শুভৌ কুন্তৌ শুভস্তনুঃ ।

গণ্ডরোগগণ্ডরোর্মধ্যে আবর্তঃ শুভলক্ষণঃ ॥

শখন্মদক্রতি পরিপ্লুত গণ্ডদেশাস্তীক্ষ্মাক্ষুশেন বিনিবারয়িতুং ন শক্যাঃ ।

জ্ঞাতিষিষো নবপয়োদরবা গভীরাঃ পৃথীভূজাঃ সকলসৌখ্যকরা ভবন্তি ॥”

যে হস্তীর দন্তদ্বয়, শুণ্ড, কুন্তদ্বয়, দেহ ও গণ্ড মধ্যে বা গণ্ডদ্বয়ে আবর্ত থাকে, সেই হস্তী শুভলক্ষণাক্রান্ত । যে হস্তীর গণ্ডদেশ সর্বদা মদশ্রাবে আপ্লুত থাকে, তীক্ষ্ণ অক্ষুশ প্রহারেও যাহাকে নিবারণ করা কষ্টসাধ্য, যাহারা অপর হস্তী দেখিলে ক্রুদ্ধ হয়, যাহাদের রব জলদগস্তীর, সেই সকল হস্তী রাজাদিগের সুখকর হইয়া থাকে ।

দুঃস্থ হস্তী ।

দোষযুক্ত হস্তীদিগকে শাস্ত্রকারগণ বিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ;—

“দীনঃক্ষীগোহথ বিষমো বিরূপো বিকলঃ খরঃ ।

বিমদো ধ্যাপকঃ কাকো ধূত্রো জটিল ইত্যপি ॥

অজিনী মণ্ডলী শ্বিত্রী হতাবর্তো মহাভয়ঃ ।

রাষ্ট্রহা মুষলীভালী নিঃসঙ্ঘ ইতিবিংশতি ॥

মহাদোষাঃ সমাখ্যাতা গজানাং ভোজভূভূজা ॥”

(১) দীন, (২) ক্ষীগ, (৩) বিষম, (৪) বিরূপ, (৫) বিকল, (৬) খর, (৭) বিমদ, (৮) ধ্যাপক, (৯) কাক, (১০) ধূত্র, (১১) জটিল, (১২) অজিনী, (১৩) মণ্ডলী, (১৪) শ্বিত্রী, (১৫) হতাবর্ত, (১৬) মহাভয়, (১৭) রাষ্ট্রহা, (১৮) মুষলী, (১৯) ভালী, (২০) নিঃসঙ্ঘ এই বিংশতি প্রকারের হস্তী মহা দোষযুক্ত ।

ইহার প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ ও দোষ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ।

“অতিক্ষীগতরঃ ক্ষীগতনু দন্তোহতি নিপ্রভঃ ।

দীনাখ্যঃ কুরুতে দীনং ভূভূজং নাত্র সংশয়ঃ ॥১”

যাহার দেহ অতিশয় ক্ষীগ, দন্তদ্বয় ক্ষীগ এবং নিপ্রভ, সেই হস্তীকে দীন বলে । এই হস্তী গৃহে রাখিলে রাজাকে দরিদ্র হইতে হয় ।

“ধর্ষশুণ্ডো মহাপুচ্ছো নিখাসো বেগবর্জিতঃ ।

ক্ষীগোহয়ং কুরুতে ক্ষীগং স্বামিনং ধন সম্পদা ॥২”

যাহার শুণ্ড ধর্ষ, পুচ্ছ বৃহৎ, নিখাসের বেগ মুক্ত, তাহাকে ক্ষীগ বলে । এই হস্তী স্বামীর ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করে ।

“কুন্তে দন্তেহক্ষিকর্ণে চ বৈষম্যং পার্শ্বয়োস্তথা ।
যস্যায়ং বিষমো নাগো নাগবৎ কুরুতে ক্ষয়ম্ ॥৩”

যাহার কুন্ত, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ কিম্বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান, তাহাকে বিষমহস্তী বলে । ইহা সর্পবৎ ক্ষয়কারী ।

“আক্ষদ্ধাতু শিরঃ ক্লীণং পশ্চাঙ্গাগস্ত পুষ্টতা ।
বিরূপ ইতি নাগোহয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্ ॥৪”

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্লীণ এবং পশ্চাৎভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী বলে । এই হস্তী দ্বারা রাজার রাজ্য ও ধনক্ষয় হয় ।

“নানাভোগৈরপি কৃতৈর্ষস্ত নো জায়তে মদঃ ।
যুদ্ধায় নোপক্রমতে বিকলং তং বিবর্জয়েৎ ॥৫”

বহুবিধ ভোগেও যাহার মদক্ষরণ হয় না, যে হস্তী যুদ্ধকালে বল প্রকাশ করে না, সেই হস্তীকে বিকল বলে । এষাধি হস্তীকে বর্জন করা উচিত ।

“খরতা সহজা ক্ষু শরীরেহস্তীতি লক্ষ্যতে ।
তনু দন্ত করো হস্তী খরঃ কুলবিনাশনঃ ॥৬”

যে হস্তীর শরীর স্বভাবতঃ খরতা বলিয়া বোধ হয়, যাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাকে খর হস্তী বলে । এই হস্তী দ্বারা পালকের কুলক্ষয় হয় ।

“ন জায়তে মদো যস্ত স্বকালে জায়তেহথবা ।
বিরূপো বিবশো বাপি বিমদং দূরতস্ত্যজেৎ ॥৭”

যে হস্তীর মদশ্রাব হয় না, হইলেও অকালে হয়, যে হস্তী নিতান্ত কুৎসিত ও অবশ, তাহাকে বিমদ বলে । এই জাতীয় হস্তীকে ত্যাগ করা বিধেয় ।

“লঘু প্রমাণঃ ক্লীণান্ধস্তমুণ্ডো শিরোদরঃ ।
অশ্রান্তং ঋসিতি ব্যগ্রঃ পতেদৈ নেত্রয়োর্মলম্ ॥
ত্রিকে পুচ্ছাগ্রতো বাপি আবর্তো মণ্ডলোহথবা ।
বহিঃ প্রকুরুতে লিঙ্গং সর্বথা গতচেষ্টবৎ ॥
ভূভুজা নহিবীকোহয়ং ধ্যাপকাখ্যেণ গজাধমঃ ।
যদীচ্ছেক্ষাশ্বতীং ভূতিং শরীরারোগ্যমেব বা ॥৮”

যে হস্তীর প্রমাণ লঘু, অঙ্গ ক্লীণ, শুণ্ড, শির ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, যে হস্তী ব্যগ্রভাবে অবিশ্রান্ত শ্বাস ত্যাগ করে, চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরত মল নির্গত হয়, যাহার কটিদেশে ও পুচ্ছাগ্রে আবর্ত কিম্বা মণ্ডল চিহ্ন থাকে, যাহার লিঙ্গ সর্বদা বাহির হইয়া থাকে অথচ নিশ্চেষ্ট ভাবাপন্ন, সেই অধম হস্তীকে ধ্যাপক বলে । যিনি শ্রীবৃদ্ধি এবং আরোগ্য অভিলাষী, সেই নরপতি এতজাতীয় হস্তীকে দর্শনও করিবেন না ।

“শঙ্খ দেশো যশ্চ ভগ্নো স্বক দেশোহিতি গুচ্ছকঃ ।

কাকোহয়ং কুরুতে মৃত্যুং স্বামিনো নাত্র সংশয়ঃ ॥৯৯॥”

যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলক ভগ্ন এবং স্বক অতিশয় উচ্চ, তাহাকে কাক বলে । এই জাতীয় হস্তী প্রভুর মৃত্যু কারক ।

“বিষমো শঙ্খগো দন্তো যশ্চ শুণ্ড বিরোধিনো ।

ভিত্তেতে বা বিদীর্ঘ্যতাং স্বয়ং শূণ্ডান্তরাবুভো ।

কুরুতে ব্যাধিতং নাথং ধূম্র নামা গজাধমঃ ॥১০০॥”

যে হস্তীর ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় এবং দন্তদ্বয় বিষম, যাহার শুণ্ড শরীরের বিরোধী, স্বয়ং ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূণ্ডান্তর, সেই অধম গজকে ধূম্র বলে । ইহার প্রভুকে ব্যাধিযুক্ত করিয়া থাকে ।

“মূর্দ্ধজাঃ কর্কশা কক্ষা জটাকুপানুবন্ধিনঃ ।

যশ্চায়ং জটিলো নাগঃ কুরুতে ধনসংক্ষয়ম্ ॥১০১॥”

যে হস্তীর মস্তকের কেশ কর্কশ, কক্ষ এবং জটার অনুরূপ, তাহাকে জটিল হস্তী বলে । ইহার দ্বারা স্বামীর ধনক্ষয় হয় ।

“কন্ধে বা গাত্রদেশে বা লগ্নং চর্ম্মেহবলক্ষ্যতে ।

অজিনী নাম নাগোহয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্ ।

নৈনং স্পৃশ্যেয়বীক্ষেত যদিচ্ছেদাঅনঃ শ্রিয়ম্ ॥১০২॥”

যাহার স্বক বা গাত্রচর্ম্ম লগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী বলে । ইহার দ্বারা স্বামীর ভূমি ও ধনক্ষয় হয় । যিনি শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এই হস্তীকে স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না ।

“মণ্ডলানি প্রদৃশ্যন্তে একং দ্বৈ বা বহুনি বা ।

বিরূপাণ্যাদগতানীব মণ্ডলী কুল নাশনঃ ॥১০৩॥”

যে হস্তীর অঙ্গে এক, দুই বা বহুসংখ্যক মণ্ডল থাকে এবং সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী বলে । ইহা প্রভুর কুলবিনাশকারী ।

“তানি শ্বেতানি যশ্চ স্যাঃ শ্বিত্রী স ধন নাশনঃ ॥১০৪॥”

যে হস্তীর পূর্বেবাক্ত মণ্ডলগুলি শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী বলে । এই জাতীয় হস্তী স্বামীর ধন বিনাশকারী ।

“হৃদয়ে উদরে চৈব ত্রিকৈ পুচ্ছস্ত মূলতঃ ।

শুদে মেত্রে পদে চৈব আবর্তেন হতশ্রিয়ম্ ।

যোগিনং কুরুতে ভূপং প্রবাসিনমুপক্রতম্ ॥১০৫॥”

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে), পুচ্ছমূলে, শুদ্রদেশে, লিঙ্গে বা পাদদেশের আবর্তগুলি শ্রীহীন হয়, তাহাকে হতাবর্ত কহে । ইহার রাজাদিগকে যোগী, প্রবাসী বা উপক্রত করিয়া থাকে ।

“গচ্ছতো যশ্চ গুল্ফাভ্যাং ভবেৎ সংঘর্ষণং মুহুঃ ।
অপি সর্বগুণৈযুক্তস্ত্যাজাশ্চ স মহাভয়ঃ ॥
রাষ্ট্রং ধনং কুলং সৈন্যং মৈত্রং দারান্ তথা প্রজাঃ ।
ক্ষপয়ত্য শুভো নাগো দৃষ্ট মাত্রো ন সংশয়ঃ ॥
তত্রাপন্নিস্তে লোকস্তত্র বজ্র ভয়ং ভবেৎ ।
ব্যাধি বহি ভয়ং বাত্র যত্রাস্তে স মহাভয়ঃ ॥১৬॥”

যে হস্তীর গমনকালে গুল্ফদ্বয়ের (পায়ের গোড়ালী) মুহুমুহুঃ পরস্পর সংঘর্ষণ হয়, তাহাকে মহাভয় বলে । এই হস্তী সর্বগুণান্বিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ । রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মিত্র, পত্নী এবং প্রজা ইহার দৃষ্টি মাত্রেই বিনষ্ট হয়, এই হস্তী যে দেশে থাকে, সেই দেশের লোকও ক্রমশঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দেশে বজ্রভয়, ব্যাধিভয় এবং অগ্নিভয় জন্মিয়া থাকে ।

“ভৃশং সস্তাদ্যমানস্ত পাদৈকং যো ন গচ্ছতি ।
পৃষ্ঠোদরং সমাবৃত্তা রেণা রক্তসনা যদি ।
শুস্তাগ্রিম পদস্থানে পশ্চাৎপাতঃ পদে যদি ।
অপি সর্বগুণৈযুক্তো রাষ্ট্রহায়ং গজাধমঃ ॥
রাষ্ট্রাদপা ক্রিয়তেহয়ং ভূভূজা শ্রিয়নিচ্ছতা ।
রাষ্ট্রাস্তে রক্ষিতো মোহাৎ কুরুতে রাষ্ট্র সংক্ষয়ম্ ॥১৭॥”

যে হস্তী বিশেষ ভাবে তাড়িত হইয়াও এক পা চলিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠদেশে হইতে উদর পর্যন্ত গোলাকার রেখা পরিদৃষ্ট হয়, চলিবার কালে অগ্রপদের স্থানে পশ্চাতের পদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে । এই হস্তী সর্বগুণযুক্ত হইলেও হস্তীর মধ্যে অধম । যে রাজা নিজ শ্রীবুদ্ধির অভিলাষী, তিনি এতজ্জাতীয় হস্তীকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন । এই হস্তী যে রাজ্যে বা প্রদেশে থাকে, অল্পকালের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হয় ।

“পাদাশ্চাত্যস্ত বিযমা দন্তৌ চাশ্লেগ্না বৈষমৌ ।
পঞ্জরো দৃশ্যতে ভগ্ন একোবার্ণৌ হ্রয়োহথবা ॥
দন্তৌ বা চলতো যশ্চ কিমু বা ন প্ররোহতঃ ।
কুর্ভৌ বা বিষদৌ যশ্চ মুষলী স গজাধমঃ ।
রাষ্ট্র দুর্গ বলামাত্যক্ষয়কৃত্তং পরিত্যজেৎ ॥১৮॥”

যে হস্তীর পদ পরস্পর অসমান, দন্তদ্বয় বিষম, পঞ্জর সমূহের মধ্যে একটা, দুইটা কিম্বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্বয় নড়ে, বা রহে না, যাহার কুন্ত দুইটা শ্বেতবর্ণ, সেই অধম হস্তীকে মুষলী বলে । ইহার দ্বারা রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যপণ বিনষ্ট হয় । এবশ্বিধ দুষ্ক হস্তীকে পরিত্যাগ করা একান্ত উচিত ।

“চর্ম্ম খণ্ড ইবাভাতি ভালে যশ্চাতি কর্কশঃ ।
ভালী স কুরুতে নাগো ভর্ষুঃ কুলধনক্ষয়ম্ ॥১৯॥”

যে হস্তীর ললাটের চর্ম্ম অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ভালী বলে । ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয়কারী ।

“পুষ্টো বিশালঃ সন্দস্তঃ সংকারোহপি শুভোহপি সন্ ।
 ন রণে সাহসো যশ্চ স নিঃ সঙ্ঘো গজাধমঃ ॥
 সর্কেষাং গজ দোষণামুক্ত এব মহানঘম্ ।
 যেনৈকেন গুণাঃ সর্কেষ তুণায়ন্তে স্ননিশ্চিতম্ ॥২০॥”

যে হস্তীর দেহ পুষ্ট এবং বিশাল, দস্তদ্বয় সুন্দর, যে হস্তী রণে সাহসহীন, সেই অধম হস্তীকে নিঃসত্ত্ব বলে । হস্তীর যত প্রকারের দোষ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহার দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ।

বিংশতি প্রকার দুর্ঘট হস্তীর লক্ষণ ও দোষ মোটামুটী ভাবে বর্ণিত হইল । গার্গ্য প্রভৃতি ঋষিগণের মতে আরও নানাবিধ লক্ষণযুক্ত দুর্ঘট হস্তী আছে, এ স্থলে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব । রাজগণের পক্ষে দুর্ঘট হস্তী দর্শন করাও নিষিদ্ধ । দৈবাৎ দর্শন করিলে, সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হোম ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় । এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ।

“দৌষেহৃষ্টান্ গজান্নাজান বীক্ষেত কদাচন ।
 ত্রসেদ্বা পররাষ্ট্রেষু নগরাং ক্রিয়তে বহিঃ ॥
 দত্ত্বাং দ্বিজৈভ্যঃ শুদ্ধেভ্যো গণাকারাত্বা নৃপঃ ।
 দৃষ্ট্বা যদি গজান্ হৃষ্টান্ দত্ত্বাচ্ছৃষ্টি শতং দ্বিজৈ ।
 পুরং নিরাজয়েদ্বাপি আঅনন্বাত্বা স্নতম্ ।
 দেব সৃজেন জুহুয়াদযুত্বাতি তৎপরঃ ॥
 তিলান্ বা জুহুয়াদঘৌ তৎপ্রতীকার হেতবে ।”

রাজগণ দুর্ঘট হস্তী কদাচ দর্শন করিবেন না । এই প্রকারের হস্তীকে পররাজ্যে গচ্ছিত রাখিবেন, অথবা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন । অথবা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কিম্বা গণককে দান করিবেন । যদি কোন কারণে দুর্ঘট হস্তী রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে ব্রাহ্মণকে শত গো দান এবং নগরীকে, নিজকে কিম্বা পুত্রকে নীরাজিত * করিবেন । দেবসূক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম কিম্বা তাহার প্রতিকারার্থ অগ্নিতে তিল হোম করিবেন ।

হস্তীর যে সকল লক্ষণ বলা হইল, হস্তিনীর প্রতিও তাহা প্রযোজ্য । পরাশর সংহিতায় হস্তীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রায় ভোজরাজের বর্ণনারই অনুরূপ । বাহুল্য ভয়ে তাহা এই আখ্যায়িকায় সন্নিবেশ করা হইল না ।

দেশ ও অরণ্য ভেদে হস্তীর আকার ও বর্ণগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । সেই বিস্তৃত বিবরণ অল্প কথায় বলিবার উপায় নাই ।

হস্তীর পরমাযু মনুষ্যের সমান, অর্থাৎ ১২০ বৎসর । পূর্বের উৎকৃষ্ট হস্তীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার এক একটী লক্ষণের অভাবে হস্তীর

* নীরাজন—ইহা হোম বিশেষ । এই হোমের বিধি, সম্পাদন প্রণালী এবং তজ্জাত ফল ইত্যাদি বিষয় কালিকাপুরাণ—৮৬ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ—১০৭ অধ্যায়, স্বন্দপুরাণ, কালোত্তরতন্ত্র এবং হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় । দেবতার আরতি কার্য্যকেও নীরাজন বলা হয় ।

১০ বৎসর হিসাবে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ৬০ বৎসর বয়সে হস্তীর এবং ৩০ বৎসর বয়সে হস্তিনীর সমস্ত অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

হস্তী, মনুষ্য সমাজের বিশেষ উপকারী । এই বৃহৎ জন্তুকে ধৃত করিবার প্রণালী, পোষ মানাইবার উপায়, পালন ও ব্যবহারের নিয়ম, ব্যাধি এবং চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা রাজমালার তৃতীয় লহরে বর্ণিত হইবে ।

প্রচলিত কিম্বদন্তী ।

দোয়াপাথর ও শ্বেত হস্তী ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে ‘দৌচাপাথর’ নাম পাওয়া যায় । মহারাজ ধনুমাণিক্য

দৌচাপাথর বা
দোয়াপাথর ।

কর্তৃক নরবলির সংখ্যা সঙ্কোচনের বিবরণ উপলক্ষে বর্ণিত
হইয়াছে,—

“পূর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত ।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥
শ্রীধনুমাণিক্য মানা তাহাকে করিল ।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশ দেবে ।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥
দৌচাপাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয় ।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময় ॥”

ধনুমাণিক্য খণ্ড—২৯ পৃঃ ।

‘দৌচাপাথর’ একটা স্থানের নাম ; সাধারণতঃ এই স্থান ‘দোয়াপাথর’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ত্রিপুরগণ ইহাকে “নানাগোমতী দোয়াপাথর” বলে । ইহা একটা দেবস্থান, ত্রিপুরেশ্বরগণ এই স্থানে সময় সময় বাস্তুব্য করিতেন । এই স্থানে দেবার্চনোপলক্ষে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক নরবলি হইত । মহারাজ ধনুমাণিক্য সেই নিয়ম রহিত করিয়া, সমরক্ষেত্রে ধৃত শত্রুগণের মধ্যে দুইটি মাত্র বলি প্রদানের ব্যবস্থা করেন ।

‘দোয়াপাথর’ সম্বন্ধীয় একটা প্রাচীন আখ্যান ত্রিপুরা জাতির মধ্যে প্রচলিত

আছে । তৎসঙ্গে শ্বেত হস্তীর জন্মবৃত্তান্তও সংযোজিত হইয়াছে ।

শ্বেত হস্তীর কথা ।

ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিল, ত্রিপুরায়ও এই জাতীয় হস্তী কচিৎ দেখা যাইত । * যে বস্ত্র বা প্রাণী দুস্প্রাপ্য, প্রাচীন সমাজে তৎসম্বন্ধে

* “থানাংচিতে একহস্তী ধবল আছিল ।

হেরষ রাজ্যে তাকে চাহিয়া পাঠাইল ॥” ইত্যাদি ।

ধনুমাণিক্য খণ্ড—১৭ পৃঃ ।

নানাবিধ সংস্কারমূলক উপাখ্যান রচিত হইত, অসভ্য সমাজে তাহার বাড়াবাড়ি খুব বেশী ছিল। পার্বত্য সমাজে প্রচলিত দোয়াপাথর এবং শ্বেত হস্তী সম্বন্ধীয় আখ্যানও সংস্কারমূলক। এই আখ্যান ত্রিপুরাগণ তাহাদের নিজ ভাষায় বলিয়া থাকে। ত্রিপুর ভাষায় ইহার নাম ‘কেরাং কথমা’। আখ্যানটী ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

দোয়াপাথরের বিবরণ ও শ্বেত হস্তীর জন্ম কথা ।

যে স্থান হইতে গোমতী ও খোয়াই নদী উদ্ভূত হইয়াছে, সাধারণে তাহাকে রঘুনন্দন পর্বত বলে। গোমতীর উৎপত্তি স্থানের পূর্বদিকের অনতিদূরবর্তী স্থান “নানাগোমতী দোয়াপাথর” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এই স্থান ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের বিহার ভূমি ছিল।

এই স্থানের অনতিদূরবর্তী পার্বত্য পল্লীর এক গৃহস্থের টংগৃহে একজন পূর্ণ গর্ভবতী যুবতী বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার বংশমণ্ডের নিম্নদেশে একটা পূর্ণ গর্ভবতী গাভী শায়িতাবস্থায় অলসভাবে রোমন্থন করিতেছিল। অসতর্কতা বশতঃ যুবতীর চালিত থুরি (মাকু) হস্তচ্যুত হইয়া সেই মণ্ডের নীচে পতিত হইল। গর্ভভার পীড়িতা যুবতী টং হইতে নামিয়া মাকুটী তুলিয়া লইতে বড়ই আলস্য বোধ করিলেন ; এবং মাচার নীচে শায়িতা গাভীটীকে বলিলেন,— “তুমি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার মাকুটী তুলিয়া দাও।” উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, সে কালে মনুষ্য ও পশু পক্ষীর মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ চলিত। যুবতী দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গাভী বলিল,— “যদি তুমি একটা বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তবে তোমার মাকুটী তুলিয়া দিতে পারি।”— “কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ?” যুবতী-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গাভী বলিল,— “আমরা উভয়েই গর্ভবতী। আমাদের মধ্যে যদি একের পুত্র ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে আমি মাকুটী উঠাইয়া দিতে পারি।”

যুবতী ভাবিলেন, পশুর সহিত মনুষ্যের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। পুত্রাং ইহাতে সন্মতি দান করা না করা একই কথা। বিশেষতঃ তিনি আলস্য বশতঃ গাভীদ্বারা কার্যোদ্ধার করিয়া লইতে আগ্রহান্বিতা ছিলেন। তাই বলিলেন— “আমি নিতান্ত আলস্য বোধ করিতেছি, তুমি মাকুটী তুলিয়া দাও। আমি তোমার প্রস্তাবে সন্মত আছি এবং সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম।” এই প্রতিজ্ঞা নিতান্তই অযথা মনে করিয়া রমণী ঈষদ্ হাসিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ঠিক একই সময়ে গর্ভবতী রমণীর একটা কন্যা এবং গাভীর একটা বৃষ বৎস ভূমিষ্ঠ হইল। নবপ্রসূতা কন্যা এবং বৎস উভয়েই মাতৃস্নেহে উত্তরোত্তর বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল। মেয়েটী যখন সমবয়স্কা বালিকাগণের

সঙ্গে খেলায় ব্যাপ্তা থাকিত, তখন বৎসটী মাতৃস্তু পরিত্যাগ করিয়া বালিকার অনুসরণ করিত এবং তাহার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত । সে মুহূর্তের জন্মও বালিকার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না । প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে অনেকই গাভী এবং যুবতীর প্রতিজ্ঞার কথা অবগত ছিল । তাহারা স্মিতমুখে বালিকা ও বৎসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিত এবং বৎসটীর ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত হইত ।

বালিকা ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল । সে মাতার প্রতিজ্ঞার কথা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিল এবং গো-বৎসের কার্য্যও লক্ষ্য করিতেছিল । জননীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা ক্রমশঃ বৃদ্ধ দলের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল, যুবক-বৃন্দ সেই কথা লইয়া হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করিল । বালিকা এখন সমস্তই বুঝিতেছিল, সে এই ব্যাপারে লজ্জিতা ও মর্শ্বপীড়িতাবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল । একদিকে লোকগল্পনা, অন্যদিকে গো-বৎসের ঐকান্তিক ভালবাসা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল । বালিকা একদিন ব্যথিতচিত্তে মায়ের নিকট অবস্থা জানিতে চাহিলে, মা সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—“লোকের কথা তুমি কখনও কাণে তুলিওনা, ইহা অসম্ভব কথা, মানুষের সহিত কি পশুর বিবাহ হইতে পারে ? ”

কালক্রমে বালিকা যৌবন-সীমায় উপনীতা হইল ; গো-বৎসও পূর্ণাবয়ব বৃষে পরিণত হইল । এখন বৃষটী মুহূর্তের জন্মও তাহার সঙ্গ ছাড়া হইতে চাহে না, এবং এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে । আর যুবতী মায়ের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায় । ইহার উপর আবার লোকের পরিহাস তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল ।

যুবতী বুঝিল আত্মহত্যা ব্যতীত এই দুর্বিবসহ যাতনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই । একদিন সে গোপনে কোনও নির্জন স্থানে যাইয়া একটা আমলকী বৃক্ষে ঝুলিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল । এই ঘটনায় বৃষটী উন্মত্তের স্থায় ছুটিয়া যাইয়া, সেই আমলকী বৃক্ষে বারম্বার শিরাঘাত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল ।

ইহার কিয়ৎকাল পরে তদদেশীয় রাজা মৃগয়া উপলক্ষে হস্তী পৃষ্ঠারূঢ় হইয়া বন গমন করিলেন । তিনি পর্বতভ্যন্তরে কিয়দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, পথপার্শ্বে একটা পত্রবিহীন আমলকী বৃক্ষে একবৃন্তে দুইটীমাত্র আমলকী ঝুলিতেছে । এমন বৃহৎ এবং সুন্দর আমলকী, রাজা আর কখনও দেখেন নাই ; দুইটী একবৃন্তাবলম্বী হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল । রাজা আশ্চর্যের সহিত সহচরবর্গকে বলিলেন, “এমন আমলকী কখনও দেখি নাই, ফল দুইটী আমায় পাড়িয়া দাও ।” এক ব্যক্তি ব্যস্তভাবে ফল পাড়িতে গেল, দৈবাৎ একটা ফল তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, রাজার বাহন হস্তিনী তৎক্ষণাৎ তাহা শুঁওঁয়া তুলিয়া মুখে দিল । অপরটী রাজার হস্তে প্রদান করা হইল ।

রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংগৃহীত আমলকীটা রাণীর হস্তে দিয়া বলিলেন—“এমন বৃহৎ এবং সুন্দর আমলকী আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই । একটা বৃক্ষে একবৃক্ষে দুইটা মাত্র ফল ছিল, তাহা পাড়িবার কালে একটা ভূপতিত হওয়ায় আমার হস্তিনী ভক্ষণ করিয়াছে, অপরটা তোমার জন্ত আনিয়াছি । রাণী অতিশয় আঙ্কাদের সহিত রাজদত্ত সেই ফলটা ভক্ষণ করিলেন ।

রাণী নিঃসন্তান ছিলেন । আমলকী ভক্ষণের অল্পকাল পরে তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার হইল । এই ঘটনায় রাজা এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের আনন্দের সীমা রহিল না । কাল পূর্ণ হইলে, রাণী অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিলেন । রাজ্যময় আনন্দ কোলাহল উথিত হইল ।

রাজার হস্তিনীটাও রাণীর সমসাময়িক কালে গর্ভবতী হইয়াছিল । তাহার গর্ভকাল পূর্ণ হইবার পর, সর্বশুলক্ষণাক্রান্ত একটা শ্বেত করভ ভূমিষ্ঠ হইল । সুদুল্লভ শ্বেত হস্তী রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করায়, সকলেই ইহা শুভ লক্ষণ এবং সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছিল ।

রাজনন্দিনী এবং হস্তী শাবক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । হস্তী শাবকটা সর্বদা রাজকুমারীর কাছে কাছে থাকিত, সঙ্গ ছাড়া হইতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিল । করভের এবশ্বিধ অনুরক্তি দর্শনে সকলেই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইত ।

এখন রাজকুমারী কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন । তিনি সহচরীবর্গের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত সময় সময় অস্তঃপুরের বাহিরে বিচরণ করিতেন । সেই সময় শ্বেত হস্তীটাও তাঁহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিত । একদিন রাজকুমারী একাকিনী বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে হস্তীটা ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহাকে শুঁড়দ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল এবং নানাগোমতী দোয়াপাথরে যাইয়া উপনীত হইল । বন্য লতাপত্রের সাহায্যে এক কুটির নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজকুমারীকে রাখিল । প্রতিদিন সযত্নে ফলমূলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিত ; রাজকুমারী তদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে রাজকুমারীর নিরুদ্দেশ হেতু রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, চতুর্দিকে অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক ছুটিল, কিন্তু কোথাও কুমারীর সন্ধান পাওয়া গেল না । জনৈক প্রধান ব্যক্তির উপদেশমতে খুঁজিয়া দেখা গেল, শ্বেত হস্তীটা হস্তীশালায় নাই । বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না । রাজকুমারীর প্রতি এই হস্তীর প্রবল অনুরাগের কথা কাহারও অবিদিত ছিল না, সকলেই বুঝিল, ইহা হস্তীরই কার্য ; সে রাজকুমারীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে ।

তখন পুনর্ব্বার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল । উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রেরিত লোকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও রাজকুমারী কিম্বা শ্বেতহস্তীর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল । পূর্বদিকে প্রেরিত লোকগণ আসিয়া জানাইল, তাহারা হস্তীর পদচিহ্ন পাইয়াছে এবং সেই চিহ্ন ধরিয়া অনেকদূর অগ্রসর

হইয়াছিল, কিন্তু হস্তী কিম্বা রাজকুমারীকে পায় নাই। তাহারা অনুমান করে, রাজকুমারীকে সহ হস্তী নানাগোমতী দোয়াপাথরে গিয়াছে ; কিন্তু সেই স্থান নিতান্ত দুর্গম বিধায় অগ্রসরে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর রাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি শ্বেতহস্তী বধ করিয়া রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন করিতে পারিবে, রাজার বাণপ্রস্থ অবলম্বনের পূর্ব কালের নিমিত্ত অর্দ্ধ রাজ্য ও রাজকুমারীকে তাহার হস্তে অর্পণ করা হইবে। আর, রাজার বাণপ্রস্থাত্ম অবলম্বনের পর, সেই ব্যক্তি সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। এই ঘোষণার পর অনেক দিন চলিয়া গেল ; কিন্তু রাজ্য বা রাজকুমারী লাভের লালসায় কেহই এহেন দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইল না। তখন রাজা এবং রাণী কন্যাকে পুনঃ প্রাপ্তির উপায় না দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে ভগবানের নিকট মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন।

রাজার উদ্বিগ্নচিত্ত কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে না। দিন আসে—দিন যায়, দুঃখময়ী শর্বরী সমগ্র জগৎ তমসাবৃত করিয়া কতবার আসিল—কতবার গেল ; কিন্তু রাজকুমারীর সন্ধান মিলিল না। রাণীর অশ্রুধারার বিরাম নাই, রাজপুরীর সকলেই শোকবিহ্বল, গভীর শোক-ছায়া রাজ্যময় ছাইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র রাজকুমারীর অভাবে সমগ্র রাজ্য যেন নির্জীব হইয়া পড়িল।

এহেন দুঃসময়ে একদা ভূতুয়া ও রাজিয়া নামক দুই ব্যক্তি রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া জানাইল,—“আমরা শ্বেতহস্তী বধ করিয়া রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন করিব ; কিন্তু আমাদের নিমিত্ত ছয় মাসের রসদ রাজ সরকার হইতে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।” রাজা হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন, রসদ সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর প্রতি আদেশ হইল। তখন ভূতুয়া ও রাজিয়া পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া বহু লোকজনসহ দোয়াপাথর অভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহারা কিয়দূর অগ্রসর হইবার পর ক্ষুদ্র আকারের হস্তীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। যতই চিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পদচিহ্নের আকার ক্রমশঃ বৃহৎ দেখা যাইতেছিল। তদর্শনে তাহারা বুঝিল, হস্তী কুমারীকে লইয়া যাইবার কালে পূর্ণবয়স্ক হয় নাই। নানাগোমতী দোয়াপাথরের পথেই তাহার বয়স পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই কারণে পদচিহ্ন ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্বারা ইহাও বুঝা গেল, দোয়াপাথরে পৌঁছিতে হস্তীর দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। তাহারা বহু কষ্ট ভোগ করিয়া, অনেককালের পর দোয়াপাথরে উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকজন ফিরাইয়া দিল। কেবল ভূতুয়া ও রাজিয়া একটী টং প্রস্তুত করিয়া সেখানে রহিল।

ইহাদের মধ্যে রাজিয়াই বুদ্ধিমান এবং কার্যক্ষম। ভূতুয়া তাহার নির্জন প্রবাসের সঙ্গীমাত্র। রাজিয়া প্রতিদিন শ্বেতহস্তী ও কুমারীর সন্ধানে বাহির হইত, ভূতুয়া প্রহরী ভাবে বাসায় থাকিত। রাজিয়া বাহির হইবার সময় ভূতুয়াকে বিশেষ

সতর্ক করিয়া বলিয়া যাইত,—“যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে ‘কট কট জাঙ্গে’ তবে তুমি বলিও—রাজিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।” রাজিয়া প্রত্যহ বাহির হইবার সময় ভূতুয়াকে এরূপ বলিয়া যাইত। এক দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাজিয়ার অনুপস্থিতিকালে অকস্মাৎ এক ভীষণ দর্শন রাক্ষসী ভূতুয়ার টং গৃহের সম্মুখে আসিয়া বিকটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“কট কট জাঙ্গে ?” ভূতুয়া পূর্ব উপদেশ মতে উত্তর করিল—“রাজিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।” ইহা শুনা মাত্রই রাক্ষসী ভয়ে পলায়ন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার সে চুপি চুপি আসিয়া, পূর্বের স্থায় জিজ্ঞাসা করিল—“কট কট জাঙ্গে ?” এবারও উত্তর হইল—“রাজিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।” রাক্ষসী ভয়বিহ্বল চিত্তে বিকট চীৎকার করিয়া অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইল।

এবার ভূতুয়া মনে ভাবিল, রাজিয়া আমার ছোট ভাই। তাহার নাম অগ্রে বলায় রাক্ষসী ভয়ে পলায়ন করিতেছে, আমার নাম আগে বলিলে আরও ভয় পাইবে। যদি রাক্ষসী পুনর্বার আসে, তবে আমার নামই অগ্রে বলিব। রাক্ষসীর চরিত্র সম্বন্ধে ভূতুয়ার কিছুই জানা ছিল না; এবং রাজিয়া যে দেবতার ঔরসজাত, সে কথাও তাহার অজ্ঞাত ছিল। এই কারণেই সে নিজের নাম অগ্রে বলিবার কল্পনা করিতে ছিল। সে এই সকল কথা ভাবিতেছে, এমন সময় আবার রাক্ষসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কট কট জাঙ্গে ?” অমনি ভূতুয়া উত্তর করিল—“ভূতুয়া রাজিয়া জাঙ্গে।” ইহা শুনা মাত্র রাক্ষসী গর্জন করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধভরে ভূতুয়াকে টংঘর হইতে বাহির করিয়া তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল। ভূতুয়া ভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, তাহাকে একটা ঝোপের মধ্যে উড়াইয়া ফেলিয়া রাক্ষসী পাতাল পুরীতে চলিয়া গেল।

এদিকে রাজিয়া বহু অনুসন্ধানের পর একটা হ্রদের মধ্যে শ্বেতহস্তীর দেখা পাইল। হস্তীটা হ্রদের স্নিগ্ধবারি শুঁওঁদ্বারা সর্বদা সঞ্চন এবং কোমল মৃগাল তুলিয়া হৃদচিত্তে ভক্ষণ করিতেছিল। সে রাজিয়াকে দেখা মাত্রই বুঝিল, তাহার প্রবলরিপু উপস্থিত। তখন হস্তী শুঁড় শুঁটাইয়া, পুচ্ছ উন্নত করিয়া এবং দাঁত পাতিয়া চীৎকার সহকারে রাজিয়াকে আক্রমণ করিল। রাজিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, সে হস্তীর সম্মুখীন হইয়া অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ভাবে সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর শ্বেতহস্তী নিহত হইল। রাজিয়া তাহার দস্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া, তৎসহ টংগৃহে ফিরিয়া আসিল।

রাজিয়া কিয়দূর হইতে টংগৃহের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া বুঝিল, নিশ্চয়ই কোনরূপ অনর্থ ঘটিয়াছে। সে টংগৃহের নিকট আসিয়া দেখিল ভূতুয়া নাই। সেই বন্ধে রাক্ষসীর গতিবিধির কথা তাহার পূর্ব হইতেই জানা ছিল। ভূতুয়া রাক্ষসীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে কিম্বা রাক্ষসী তাহাকে ধরিয়া নিয়াছে, ইহা বুঝিতে রাজিয়ার বিলম্ব ঘটিল না। সে অনেক চিন্তার পর এক স্থানে একটা গর্ত খনন করিয়া গজ-দস্তদ্বয় প্রোথিত করিল।

অতঃপর রাজিয়া ভূতুয়ার সন্ধানে বহির্গত হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর একস্থানে দেখিতে পাইল একটী গর্ত হইতে পিপীলিকা প্রবাহ উথিত হইতেছে এবং গর্তের পার্শ্ববর্তী শুষ্ক পত্রের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত রহিয়াছে । তদর্শনে তাহার সন্দেহ হওয়ায় সেই স্থান খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল । দুই হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত খননের পর তন্মধ্যে এক খণ্ড জিহ্বা পাওয়া গেল । রাজিয়া বুঝিল, ইহা ভূতুয়ার জিহ্বা, রাক্ষসী কর্তন করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছে । অনেক অনুসন্ধানের পর ঝোপের ভিতর ভূতুয়াকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেল । এবং সযত্ন শুশ্রুতায় ভূতুয়া সচেতন হইল । কিন্তু তাহার বাক্য উচ্চারণের শক্তি নাই । তখন রাজিয়া কর্তিত জিহ্বা খণ্ড হস্তে লইয়া বলিল,—“যদি সত্য সত্যই আমি দেব ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে কখনও আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না । ভূতুয়ার কর্তিত জিহ্বা নিশ্চয়ই পূর্ববৎ জোড়া লাগিবে । আর এই উপাখ্যান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে । রুগ্ন, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি এই উপাখ্যান বলিয়া দেবতার পূজা করিলে, সে নিশ্চই আরোগ্য লাভ করিবে ।” এই বলিয়া সে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া ভূতুয়ার জিহ্বা তাহার মুখস্থিত অংশের সহিত সংযোগ করিল, অমনি সেই খণ্ডিত জিহ্বা জোড়া লাগিয়া পূর্বের স্থায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল । ভূতুয়া তাহার দুর্গতির সমগ্র বিবরণ রাজিয়ার নিকট ব্যক্ত করিল এবং একটী খাঁগড়া ঝোপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিল,—“এই ঝোপের ভিতর একটী সুরঙ্গ আছে, রাক্ষসীকে সেই সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি দেখিয়াছি ।” তখন রাজিয়া ভূতুয়াকে বলিল,—“আমাকে রাজকুমারীর সন্ধানে যাইতে হইবে । তুমি এইস্থানে আমার প্রতীক্ষায় থাক, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাইও না । এখন আর তোমার কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই ।”

অতঃপর রাজিয়া খাঁগড়া ঝোপ উৎপাটন করিয়া দেখিল একটা বৃহৎ সুরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে । এবং পাতাল হইতে একটা ঘিলালতা উঠিয়া সুরঙ্গের পার্শ্ববর্তী একটী বৃক্ষকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াছে । ঐ লতা অবলম্বন করিয়াই রাক্ষসী সুরঙ্গ শথে যাতায়াত করিত । রাজিয়া সেই লতা ধরিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিল । কিয়দূর নিম্ন গমনের পর সে দেখিতে পাইল, অট্টালিকাময় এক সমৃদ্ধ পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে । সুসজ্জিত উদ্যান, স্বচ্ছসলিলা সরোবর, গগনস্পর্শী অট্টালিকা দর্শনে সে বুঝিল ইহা একটী সুবৃহৎ রাজপুরী । রাজিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেড়াইল, কোথাও মনুষ্যের দর্শন পাইল না । পরিশেষে একটী প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখিল এক পরমাসুন্দরী যুবতী একাকিনী পালঙ্কে বসিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছে । তখন রাজিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “সরলে, তুমি কে ? এবং কেনই বা এই জন মানব হীন পাতাল পুরীতে একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছ ?” অকস্মাৎ মনুষ্যের আগমন দর্শনে যুবতী চমকিতা ও আশস্তা হইল । সে দুইহাতে অশ্রু মার্জনা করিয়া বীণা-মধুর

স্বরে উত্তর করিল—“আমি অতিশয় দুর্ভাগিনী, রাজকন্যা হইয়াও মনুষ্যের অসহনীয় দ্বারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যুবতীর আনুপূর্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজিয়া বুলিল, ইনিই তাহার অনুসন্ধান রাজকুমারী। তখন সে আশ্বাস বাক্যে বলিল, “তোমার ভয় নাই, আমি রাক্ষসীকে বধ করিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিব। রাক্ষসী কোন্ সময় আসিবে আশ্বাস বল।” কুমারী বলিল, “রাক্ষসী আসিবার আর বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু সেই ভীষণ মূর্তি রাক্ষসীকে কি তুমি বধ করিতে পারিবে?” ইহা বলিয়া রাজকুমারী রাজিয়ার চক্ষুর উপর স্বীয় কাতর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক ব্যথিত প্রাণে পলকবিহীন নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নৈরাশ্য-দৃষ্টি রাজিয়ার হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে প্রবোধ বাক্যে কুমারীর ভয় ভাবনা নিরাশন জগু বিস্তর চেষ্টা করিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় রাক্ষসী গভীর গর্জন করিয়া আসিতে লাগিল। তাহার অঙ্গের বাতাসে প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। রাজিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত ছিল, রাক্ষসী পুরীতে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিল। উভয়ের অনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর রাক্ষসীর পরাজয় ঘটিল, রাজিয়া স্ত্রীক্স অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিল।

অতঃপর রাজিয়া রাজকুমারীকে সহ আসিয়া ভূতুয়ার সহিত মিলিত হইল। এবং অবিলম্বে দোয়াপাথর পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমারী ও ভূতুয়াকে সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। শ্বেতহস্তীর দস্তদ্বয় মৃত্তিকা গর্ভ হইতে উঠাইয়া সঙ্গে লইল।

অনেক গিরিকন্দর, হ্রদ, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালের পর তাহারা রাজধানীতে পৌঁছিল। রাজা ও রাণী, হারানিধি রাজকুমারীকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। রাণী, কন্যাকে কোলে বসাইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাজ্যময় আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, ঘরে ঘরে মাজলিক কার্য্য এবং আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান চলিল।

রাজিয়া, রাজাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া শ্বেতহস্তীর দস্তদ্বয় উপঢৌকন প্রদান করিল। রাজা হৃষ্টচিত্তে রাজিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে পুনর্জীবিত করিয়াছ। তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমার প্রাণতুল্যা দুহিতাসহ অর্দ্ধ রাজ্য তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি।” ইহার পর বিপুল সমারোহে রাজিয়ার সহিত রাজকুমারীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভূতুয়া রাজার পারিষদ শ্রেণীতে স্থান পাইল। রাজারানী, কন্যা এবং জামাতাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতীত হইবার পর, রাজা ভোগবাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি জামাতার হস্তে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, ভগবদারাধনার নিমিত্ত সত্ৰীক বনগমন করিলেন। রাজিয়া, রাজকুমারীকে সহ সুখে রাজত্ব করিতে থাকিল।

ইহাই উপাখ্যানের স্থূল মর্ম্ম । পার্বত্য ত্রিপুরাগণের মধ্যে কেহ রুগ্ন, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ বা চলচ্ছক্তি বিহীন হইলে, তাহার কল্যাণ কামনায় এই আখ্যান বলিয়া পূজা দেওয়া হয় । পার্বত্য অরণ্যস্থিত ঘিলালতা বিজরিত যে কোন বৃক্ষগূলে পূজা হইয়া থাকে । পূজার স্থানে দুইজনের অধিক লোক যাওয়া নিষিদ্ধ । পূজা সমাপনান্তে ফিরিবার সময় বৃক্ষে জড়িত ঘিলালতাটা সাত টুকড়া করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয় । সরল বিশ্বাসী রোগীগণকে এই পূজা দ্বারা অনেক সময় উৎকট ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায় । অত্য়াপি ত্রিপুর জাতির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় এই পূজার প্রচলন আছে ।

প্রাচীন আখ্যান সমূহ পল্লবিত হইলেও, চিন্তা করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । এই আখ্যায়িকায় জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্যে এক সময় শ্বেতহস্তীর অস্তিত্ব ছিল । এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী । ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ শ্বেতহস্তীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, এরূপ স্থলে ত্রিপুরায় তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নহে । বিশেষতঃ রাজমালার উক্তিদ্বারাও এবিষয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ।

পৌরাণিক অনেক গ্রন্থে হস্তী সম্বন্ধীয় অল্লাধিক বিবরণ পাওয়া যায় । কোন শ্বেতহস্তী সম্বন্ধে পৌরাণিক মত । কোন গ্রন্থে হস্তী বিজ্ঞান বিস্তৃত ভাবে প্রদান করা হইয়াছে । প্রাচীন পণ্ডিতগণ হস্তীকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । তন্মধ্যে শ্বেতহস্তীকে ‘ঐরাবত’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত ধবলবর্ণ ছিল, সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্বেতহস্তী উক্তরূপ আখ্যা লাভ করিয়াছে । এতদ্বিষয়ক প্রাচীন মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“গজানামষ্টধাতৈঃ সংক্ষেপেণ প্রকাশ্যতে ।
ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোহঙ্গনঃ ॥
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগগজাঃ ।
এষাংবংশ প্রসূতত্বাং গজানামষ্টজাতয়ঃ ॥”
পরশর সংহিতা ।

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঙ্গন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক এই অষ্টবিধ হস্তী দিগগজ নামে বিখ্যাত ।

ইহা গেল হস্তীর শ্রেণী বা জাতি বিভাগ ; অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে । তন্মধ্যে ঐরাবতই সর্বশ্রেষ্ঠ । ঐরাবতের লক্ষণ সম্বন্ধে পাওয়া যায় ;—

“বেকুঞ্জরাঃ পাণ্ডুর সর্বদেহাঃ সূদীর্ঘদন্তাঃ সিতপুষ্পদন্তাঃ ।
অলোমশা অন্নভূজো বলাঢ্যা মহাপ্রমাণা লঘু পুষ্ট লিঙ্গাঃ ॥
ক্রুৎস্বাং সমীকে মৃদবোহস্তকালে লঘু পানা বহুলো প্রদানাঃ ।
বিস্তীর্ণ দানান্তমু লোমপুচ্ছা ঐরাবতস্তাভিজন প্রসূতাঃ ॥” ইত্যাদি ।

যে হস্তী ধবলবর্ণ, লোমশূন্য, অল্পভোজী অথচ বলশালী, সুরহৎ, ক্ষুদ্র অথচ শূললিঙ্গ বিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপন স্বভাব এবং অশ্রু সময়ে নম্র, অল্প জলপায়ী অথচ অধিক মদশ্রাবী, পুচ্ছের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, তাহাই ঐরাবত জাতীয় হস্তী ।

এতদ্বারা জানা যাইবে, ধবল হস্তীকেই ঐরাবত শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে । শ্বেতহস্তী স্তূর্ভূত । ইহা দেবতার স্তায় পূজার্ত এবং সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ । রাজগণও ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন না । শ্বেতহস্তী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচনা নিম্প্রয়োজন ।

রাজা রামগতির আখ্যান । *

ইতিপূর্বে ১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় রাজা রামগতির আখ্যান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । রাজা রামগতির লীলা-ক্ষেত্র খণ্ডল পরগণা । এই পরগণা পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, কালপ্রভাবে তাহা মোগল সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত এবং পরে বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে । এই লহরের ধন্যমানিক্য খণ্ডে খণ্ডলবাসিগণের যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্বারা তাহাদিগকে কুচক্রী এবং কুটবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়াই জানা যায় । পক্ষান্তরে, ইহারা যে নিতান্ত সরল এবং অন্ধবিশ্বাসী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রামগতির আখ্যান প্রদান করিতে হইল ।

খণ্ডল, দক্ষিণশিক ও চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক স্থানে অত্য়পি একটা সুদীর্ঘ গ্রাম্য ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা রাজা রামগতির কথা লইয়া রচিত । কবিতাটা নিম্নে প্রদান করা হইল ।

“রামগতি রাম সিদ্ধাবালা,
গোরা কামার তার চেলা,
তারা করে ওনা পেনা,
প্রভু আনি বাড়ী ॥

যখন প্রভু আনিয়া ছিল,
রাধাকান্ত ঠাকুর ছিল,
তান বাড়ী প্রভুরে নিল,

বসতে দিল গো-শালা ঘরে ॥

* এই আখ্যান, বিলনীয়া বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রদ্ধের স্মৃতি শ্রীযুক্ত কামিনী-কুমার সিংহ মহাশয়, খণ্ডল পরগণাস্থ কাগীনগর নিবাসী, ৭৪ বৎসর বয়স্ক পূর্ণচন্দ্র বৈষ্ণব মহাশয়ে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । উক্ত বৈষ্ণব বলে, তাহার পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়সের কালে রাজা রামগতির ঘটনা সজ্ঞাচিত হইয়াছিল ।

বিষপত্র নাহি ছিল,
 যজ্ঞ-কাষ্ঠ আনি দিল,
 তারা সবে করে যজ্ঞ-ধুনী ॥
 প্রভু বলে সতী আনি দেও মোরে,
 সতী আনি নাহি দিলে প্রভু বাবে পাতালে,
 ভক্ত সবে করে হার রে হার !
 ধনীরাম পাটারী (১) ছিল,
 সতী আনতে লড় দিল,
 সতীর পায়ে ধরি
 ভক্ত সবে করে গড়াগড়ী ॥
 'আরনী' রে পাইল ভূতে,
 গাঙ্গ্ ফিরার (২) উত্তর পাড়ে,
 তিনশত মানুষের
 জাত মারল সুরা কাণার পুতে ॥
 এক পাতিল সিন্নি রাক্কে,
 রাঁড়ি বুড়ি বসি কান্দে,
 প্রভু মোরে সিন্নি না দেখাইল ।
 খোয়াজের পুত যায়,
 হিলাল গাজি নাম তায়,
 খেজুড়িয়া গ্রাম শালার বাড়ী ॥”

এই কবিতা হইতে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, নূনাধিক সম্ভব
 বৎসর পূর্বে, খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে রামগতির এবং করলীয়া
 টিলায় তাহার পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরের বাড়ী ছিল। এই সকল স্থান পূর্বে
 ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালী জেলাস্থিত ফেণী মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে।
 স্থানটি ত্রিপুরা রাজ্যের বিলনীয়া বিভাগীয় আফিসের পশ্চিমোত্তর কোণে এক
 মাইলের মধ্যে অবস্থিত। রামগতি জাতিতে কায়স্থ ছিল। তাহার পিতার নাম
 সুরা কাণা। সম্ভবতঃ এক চক্ষু হীন ছিল বলিয়া সে 'কাণা' উপাধি লাভ করিয়াছে,
 তাহার নাম ছিল সুরমণি কিম্বা সুরচন্দ্র।

কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপর রামগতির বিশেষ প্রভাব ছিল।
 'গৌরা কামার' নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রধান চেলা ছিল, উক্ত কবিতা আলোচনার
 ইহা জানা যাইতেছে। 'সিদ্ধাবালা' এবং 'চেলা' শব্দদ্বারা মনে হয়, রামগতি কোন
 প্রকারের ধর্মভাবের দরুণ এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্তমান কালেও কোন

(১) পাটারী—গ্রাম্য তহশীল গোমস্তা।

(২) গাঙ্গ্ ফিরা—নদী একপথ ছাড়িয়া অন্য পথে প্রবাহিত হইলে, পূর্বে যে তটপ্রায়
 ঋত থাকে, তাহাকে গাঙ্গ্ ফিরা বলে।

কোন গ্রামে যেমন ত্রিনাথেরমেলা, কিশোরী ভজন প্রভৃতি উপলক্ষে সম্প্রদায় গঠিত হইয়া থাকে, রামগতিও তদ্রূপ একটা দল গঠন করিয়াছিল, অবস্থা আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় ।

রামগতির গুরুর নাম এবং ভজন-প্রণালীর বিষয় বর্তমান কালের অগোচর । গুরুর আগমনোপলক্ষে রামগতির বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার ঘটয়াছিল । তাহার পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি প্রভুকে নিজের বাড়ীতে নেওয়ার কথাও কবিতায় পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে বাড়ীতে যাইয়া গুরু ঠাকুরের বসিবার স্থান হইল গো-শালায় ! এই উক্তি দ্বারা প্রভুর জাতি ও মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় । যাহা হউক, রামগতির ভক্তবৃন্দ প্রভুকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল । তাঁহার পূজোপচার সংগ্রহ, যজ্ঞধুনী প্রজ্জ্বালন, সমস্তই হইল, তখন প্রভু বলিলেন—“আমাকে সতী, আনিয়া দাও, নতুবা আমি পাতালে প্রবেশ করিব ।”

প্রভুর আজ্ঞা পালনের উপায় না দেখিয়া, তাঁহার পাতাল প্রবেশের ভয়ে ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইল । তখন ধনীরাম পাটারী, সতী আনয়নের নিমিত্ত দৌড়িয়া ছুটিল । পাটারীগণ যে কোন্ শ্রেণীর জীব এবং নিম্ন সমাজে তাহাদের আধিপত্য কত বেশী ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন বর্তমান কালেও পাওয়া যায় ; তাহাদের অসাধ্য কার্য ছিল না । এজন্যই ধনীরাম, সতী সংগ্রহ কার্যে সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া থাকিবে । ‘আয়নীরে পাইল ভূতে’ এই উক্তি দ্বারা এবং পরবর্তী বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়, ধনীরাম এই আয়নীকেই ‘সতী’র সূহৃৎ আশ্রয় প্রদান দ্বারা ধন্য করিয়াছিল ।

গুরুজী ভক্তগণের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন,—“আমি আবার আসিব ; কিন্তু তখন অন্তরূপধারণ করিয়া আবিভূত হইব । অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না ।”

রামগতি কাঠুরিয়া ছিল । পার্বত্য অরণ্য হইতে প্রতিদিন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করিত । সে একদিন কাষ্ঠভার বহন করিয়া ক্লাস্ত হওয়ার বনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতেছিল । তৎকালে কোনও দুর্ঘট লোক জঙ্গলের অন্তরাল হইতে ডাকিয়া বলিল,—“রামগতি, তোর দুঃখের অবসান হইয়াছে, তুই শীঘ্রই রাজা হইবি ।” এই বাক্যকে রামগতি ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিল এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌরা কামারের নিকট সমস্ত কথা বলিল । এই কৰ্ম্মকারের দ্বারা কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল ।

এদিকে রামগতির দল ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । দেবতার প্রত্যাদেশমূলে অবস্থা এতদূর গড়াইল যে, রামগতির ভক্তেরা তাহাকে ‘রাজা রামগতি’ আখ্যা প্রদান করিল এবং বাঁশের দ্বারা

নির্নিহিত সিংহাসনে সঙ্গীক বসাইয়া, তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করাইল। শ্রেষ্ঠ চেলা, গৌরা কামার প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিল, ধনীরাম রাজস্ব সচিব হইল। কালিকাপুরে তাহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধনীরাম গ্রাম্য পাটারী ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গৌরা কামারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বে যে আয়নীর কথা বলা হইয়াছে, ইতিমধ্যে সেই যুবতী ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সে অবিবাহিতা থাকিবে; গুরুজী (রামগতির গুরু) আবিভূত হইলে তাহাকে সে পতিত্বে বরণ করিবে।

এরূপভাবে ভক্তবৃন্দের মধ্যে কিছুকাল রাজা রামগতির রাজত্ব চলিবার পর, জনৈক ভিক্ষাজীবী ফকির ভিক্ষায় বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা রামগতির বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। এই ফকিরের নাম ছিল হিলাল গাজি। সে ছাগলনাইয়া খানার অন্তর্গত খাজুড়িয়া গ্রাম নিবাসী খোয়াজ মোল্লার পুত্র। হিলাল গাজি পঙ্গু ছিল এবং অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় ভিক্ষাবৃত্তিই তাহার একমাত্র উপজীবিকা হইয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করিল, গুরুজী (রামগতির গুরু) চাতুরী করিবার অভিপ্রায়ে এই মূর্তিতে আবিভূত হইয়াছেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ গ্রামময় রূপ্ত হইয়া পড়িল। ফকির বেচারা আর যায় কোথায়! রাজা রামগতি ও তাহার ভক্তবৃন্দ দল বাঁধিয়া যাইয়া ফকিরকে ধরিল এবং যত্ন সহকারে তাহাকে বাড়ীতে আনিল। কেহ তাহার পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছে, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে, তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। বিপন্ন হিলাল গাজি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া বারম্বার আত্ম পরিচয় প্রদান করিল। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিমিত্ত কত সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। সে যতই প্রকৃত পরিচয় বলিয়া অব্যাহতি পাইতে চায়, ভক্ত-সমাজ ততই আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল। তাহারা মনে করিল, গুরুদেব ছলনা করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী। হিলাল গাজি অনেক চেষ্টা করিয়াও মুক্তি না পাওয়ায় মনে করিল, ইহা নিয়তির নির্বন্ধ, খোদাতাল্লার ইচ্ছায় এরূপ ঘটতেছে। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুকে স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইল। এবং আসনে বসাইয়া অর্চনা করিতে লাগিল। গুরুপদে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা আয়নীকে আনিয়া তাহার বামপার্শ্বে বসান হইল। এক হাঁড়ি সিন্ধি রাখিয়া গুরুর ভোগ হইল, ভক্তবৃন্দ ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া জীবন সার্থক করিল।

রাজত্বের সীমা ভক্ত সমাজে নিবন্ধ রাখিয়া রামগতির তৃপ্তি হইতে ছিল না, ক্রমশঃ চতুর্দিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। তাহার দলবলের আত্যাচারে পার্শ্ববর্তী জনসমাজ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। অল্পকালের মধ্যেই রামগতির রাজত্ব কাহিনী রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হইল।

গুরু হিলাল গাজি রামগতির বাড়ীতে অবস্থান কালে, অকস্মাৎ একদল পুলিশ আসিয়া গুরুজীকেসহ রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। রামগতির সাধের রাজত্বের এইখানেই অবসান হইল। পুলিশ, ধর্ম্মধবজী রামগতিকে সপারিষদ ধর্ম্মাধিকরণে প্রেরণ করিল।

এই সংবাদ পাইয়া হিলাল গাজির ভ্রাতা, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আসিল, এবং বহু চেষ্টার ফলে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় হিলাল গাজি মুক্তি লাভ করিল। রামগতি ও তাহার প্রধান চেলাগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করে, ইহারা রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল।

রামগতি এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ হিলাল গাজির প্রসাদী সিদ্ধি ভক্ষণ করিবার দরুণ সমাজচ্যুত হইয়াছিল। ভক্ত সমাজ ব্যতীত আরও নানাধিক তিন শত লোক এই কারণে সমাজ বর্জিত হয়। এই সুযোগে কুমিল্লা হইতে জনৈক পাত্র আসিয়া, তাহাদের মধ্যে অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও কুমিল্লানগরীতে বাস করিতেছে। যাহারা হুজুগে পড়িয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সমাজভুক্ত হইল, কেহ বা সমাজচ্যুত অবস্থায়ই রহিল।

রাজা রামগতির শেষ পরিণতির কথা কেহই বলিতে পারে না ; সুতরাং সেই বিবরণ প্রদান করিবার উপায় নাই।

বিষ লতার উৎপত্তি ।

রাজমালায় ধনুমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

“হুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীঘী ।

না খায় গোমতী জল বিষ দিছে লাগি ॥”

(২য় লহর—২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।)

পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণোপলক্ষে গোমতী নদীর তীরে ছাউনী করায়, তাহার সৈন্যবল ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিপুর সেনানী, নদীর জলে বিষলতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিষলতা ত্রিপুর পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। পার্ব্বত্যজাতি সমূহ, এই লতা খেঁতলাইয়া নদীতে কিম্বা পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ ঢেপায় (হ্রদ বা বিলে) নিক্ষেপ করে। কিয়ৎকাল পরে, ছোট বড় সর্ব্ববিধ মৎস্য বিষাক্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে, এবং এই সুযোগে বিষদাতাগণ তাহা ধরিয়া লয়। এই লতা এত বিষাক্ত যে, ইহার রস উদরস্থ অথবা অন্ত্র প্রকারে শরীরে প্রবিষ্ট

হইলে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটে । যে কালে সমরক্ষেত্রে ধনুর্বাণের ব্যবহার ছিল, তৎসময় কুকি প্রভৃতি পার্বত্য যোদ্ধাগণ এই লতার রস তীরের ফলকে মাখাইয়া শত্রু পক্ষের উপর প্রয়োগ করিত । বর্তমান কালেও মৎস্য মারিবার নিমিত্ত এই লতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

যুবরাজ কৃষ্ণমণি, খুচুং কুকিগণের সহিত সমরকালে এই বিষতরা তীরের আঘাতে মৃতকল্প হইয়াছিলেন । তৎকালে জয়ন্ত চস্তাই বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যে কিম্বদন্তী বর্ণন করিয়াছেন, “কৃষ্ণমালা” গ্রন্থ হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল । এস্থলে অণু কথা না বলিয়া কৃষ্ণমালার ভাষা অবিকল প্রদান করাই সর্বতোভাবে সঙ্গত মনে করিতেছি ; তাহা এই ;—

“শুনিয়া বিশ্বয় মনে হইল রাজার ।
 জয়ন্ত চস্তাই পাশে (১) পুছে (২) আরবার ॥
 কিঞ্চিৎ হইয়া যাও যুবরাজ পায় ।
 মূর্চ্ছিত হইল কেনে বিষের জালায় ॥
 বল এই হলাহল জন্মে কোন খানে ।
 খুচুং কুকিয়ে তাহা পাইল কেমনে ॥
 শুনিয়া চস্তাই বলে শুন নরপতি ।
 ইতিহাসরূপে কহি বিষের উৎপত্তি ॥
 খুচুংয়ের রাজা ছিল নামে শুভরায় ।
 ‘মলাল’ রাজাকে কহে কুকির ভাষায় ॥
 তাঁহার তনয়া এক রূপবতী হৈল ॥
 শ্রেষ্ঠ এক কুকি তাকে বিবাহ করিল ॥
 বিবাহ রাত্রিতে হৈল জামাতা নিধন ।
 তাহার কনিষ্ঠ ভাই ছিল ছয় জন ॥
 স্নেহ জাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম কভু জানে নাই ।
 সে কণ্ঠাকে সংগ্রহ করিল তার ভাই ॥
 সেও সেই রাত্রিতে গেলেন ঘর ঘর ।
 আর ভাই সংগ্রহ করিল তার পর ॥
 এইরূপে ছয় ভাই সকল মরিল ।
 সর্ব্বের কনিষ্ঠ অবশিষ্ট এক রৈল ॥
 ভাই সব মৈল দেখি ভাবে মনে মন ।
 বুঝিতে না পারে কিছু মরণ কারণ ॥
 সে বলে একক আমি বাঁচি কার্য্য নাই ।
 আমি যাব যেই পথে গেল ছয় ভাই ॥

ই বলিয়া সেহ তারে সংগ্রহ করিয়া ।
সে নারীর সঙ্গে এক ঘরে রহে গিয়া ॥
শয্যা হ'তে অন্তর হৈয়া ভিন্ন স্থানে ।
অগ্নি জ্বালি জাগিয়া রহিল সাবধানে ॥

নিদ্রায় সে নারী যদি অচেতন হৈল ।
দেখে নাক হ'তে এক সর্প নিকলিল (১) ॥
সর্প নিকলিয়া শয্যা বিচারিয়া চায় ।
মম্বুয় না পাইয়া পুনি (২) নাকেতে সামান (৩) ॥
তা দেখিয়া সেই কুকি ভাবে মনে মন ।
বুঝি এই সর্পে মারিয়াছে ভাইগণ ॥
এই নারী মারিয়াছে মোর ছয় ভাই ।
ইহাকে মারিব আমি যে করে গোসাই ॥
এখানে থাকিলে সাপে খাইব আসিয়া ।
ইহা ভাবি'ঘর হনে (৪) গেল নিকলিয়া ॥

রজনী প্রভাতে সেই ভাবে মনে মনে ।
এই ত নাগিনী কহা মারিব কেমনে ॥
তবে বিহারের ছলে বনিতা লইয়া ।
নির্জন অরণ্য মধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
বনে গিয়া লগুড় প্রহার দিয়া মারি ।
থুইল (৫) খাদাই (৬) তথা গর্ভ এক করি ॥
ঘরে আসি কান্দিয়া কহিল লোক ঠাই ।
পত্নী মোর কোথা গেল উদ্দেশ না পাই ॥

শুনিয়া কহা'র পিতা খুচুনের রাজা ।
কহাকে বিচারি চাহে সঙ্গে লৈয়া প্রজা ॥
কহা না পাইয়া সদা করয়ে ক্রন্দন ।
একদিনে রজনীতে দেখিল স্বপন ॥
কহা আসি কহে পিতার শিরে বসিয়া ।
না কান্দ না কান্দ বাপু আমার লাগিয়া ॥
সর্প আমি কহ্যারূপে হৈয়া অবতার ।
আসিহিলাম ছয় জন কুকি বধিবার ॥
তা সবার ছোট ভাই আমাকে মারিয়া ।
নদীকূলে বটমূলে রাখিছে গাড়িয়া (৭) ॥

-
- (১) নিকলিল—বাহির হইল । (২) পুনি—পুনর্বার ।
(৩) সামান—প্রবেশ করে । (৪) ঘর হনে—গৃহ হইতে ।
(৫) থুইল—রাখিল । (৬) খাদাই—প্রোথিত করিয়া ।
(৭) গাড়িয়া—প্রোথিত করিয়া ।

নাভি ভেদি এক লতা উঠিছে আমার ।
 ইহা হ'তে হবে তোমার সব উপকার ॥ :
 সর্পের গরল আছে ই লতার কসে (১) ।
 তাতে মাথা তীর যার শরীরে প্রবেশে ॥
 বিষ জ্বলে বিকল হইবে সেইজন ।
 অন্ন খাও হইলেও ত্যজিবে জীবন ॥
 কিন্তু এক কথা মাত্র আছয়ে বিশেষ ।
 চাথেঙ্গ নদী (২) দক্ষিণেতে যত সব দেশ ॥
 সে সকল দেশে এই বিষ না লাগিব ।
 এই বন ভরি এই বিষতলা হইব (৩) ॥
 স্বপ্ন দেখি খুচুঙ্গের নৃপতি জাগিয়া ।
 প্রভাতে পর্বতে গেল কুকিগণ লইয়া ॥
 মাটি খনি সেই কটার পাইল উদ্দেশ ।
 সেথ লতা হইছে ভেদিয়া নাভি-দেশ ॥

(১) কসে—রসে, লতা ছিন্ন করিলে যে তরল পদার্থ নির্গত হয় ।

(২) চাথেঙ্গ নদী—এই নদী বরবক্র নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, বর্তমান কালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে । কোন্ নদীকে চাথেঙ্গ বলা হইত, তাহাও জানিবার উপায় নাই । কৃষ্ণমালায় এই নদীর সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

“হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী ।
 বরবক্র নাম তার ঘোষে অস্ত্রাবধি ॥
 খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে ।
 কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে ॥
 কুকনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ ।
 তথাতে বসতি করয়ে কুকিগণ ॥
 * * * * *
 মনোগত কার্য সিদ্ধি সে নদী করয়ে ।
 তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছয়ে ॥
 কান্দংলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ ।
 তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥”

কৃষ্ণমালা—২য় সর্গ ।

উক্ত অংশে যে সকল নদী ও পর্বতের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বরবক্র (বরাক) নদীর নাম অত্যাধিক অপরিবর্তিত রহিয়াছে ; অথচ কোন নাম বর্তমান কালে প্রচলিত নাই ।

(৩) সেকালে সম্ভবতঃ চাথেঙ্গ নদীর দক্ষিণ ভাগে বিষলতা ছিল না, অথবা উক্ত নদীর দক্ষিণদিকস্থ স্থান সমূহে উক্ত লতার বিষ-ক্রিয়া থাকিবে না, প্রাচীনকালে সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল ।

তার পরে স্বপ্ন কুকি সব কাছে কয় ।
 দেখিয়া শুনিয়া সবে পাইল প্রত্যয় ॥
 বিষলতা সেই বনে প্রচুর হইল ।
 খুচুর কুকিয়ে বিষ ই কারণে পাইল ॥” ইত্যাদি ।

কুম্ভমালা—৪র্থ সর্গ ।

বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদ বাক্য কাঙ্ক্ষনিক হইলেও বিষলতা কিন্তু কাঙ্ক্ষনিক পদার্থ নহে । ত্রিপুর পর্বতের সর্বত্র এই লতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । আমরা এই লতা দেখিয়াছি এবং ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।

প্রাচীন সংস্কার ।

ডাইনের কথা ।

ত্রিপুর রাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সাধারণের মধ্যে, ডাইন বা ডাইনী সম্বন্ধে একটি সংস্কার বন্ধমূল রহিয়াছে । এই শব্দটি “ডাকিনী” শব্দের অপভ্রংশ । প্রাচীন কালে রাজা, প্রজা সকলেই ডাইনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন । মুসলমান সেনানায়ক হৈতন খাঁকে বধ করিবার নিমিত্ত ধন্যমণিক্য ‘ধলাগমা’ নাম্নী ডাকিনীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক ।

এখন না খাও কেন হৈতন খাঁ সম্মুখ ॥”

ধন্যমণিক্য ঋণ্ড—২৬ পৃঃ ।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর প্রতিই ‘ডাইন’ শব্দের আরোপ হইয়া থাকে । ত্রিপুর ভাষায় ডাইনকে ‘ছেকাল’ বলে । লোকে মনে করে, ইহারা মনুষ্যের অসাধ্য সকল কার্যই করিতে পারে । নদীর স্রোত স্তম্ভন, শূন্যপথে গমনাগমন, মন্ত্রবলে মনুষ্যের জীবন সংহার করা ইত্যাদি ইহাদের পক্ষে অতি সহজ কার্য । ইহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল রোগ ষন্ত্রণা ভোগ করাইতে পারে এবং দৃষ্টি-মাত্রেও বধ করিতে পারে । ভোজন কালে ইহাদের দৃষ্টিপাত হইলে, ভোক্তার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়া অনিবার্য্য । ডাইনের প্রতি লোকের এই সকল বিশ্বাস ত আছেই, তন্নিম্ন আরও অনেক অদ্ভুত ধারণা দ্বারা ইহাদিগকে অধিকতর ভয়াবহ করা হইয়াছে । তদ্রূপ দুই একটি বন্ধমূল সংস্কারের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

(১) রজনীযোগে ডাইনের মাড়ির দস্ত মুখ হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে । সেই দস্ত হইতে নীলাভ অগ্নি প্রস্ফলিত হইয়া থাকে । যদি কোন

স্বযোগে এই দস্ত কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেই গৃহস্থের নানাবিধ বিপদ সঙ্ঘটন অনিবার্য্য । *

(২) ইহার নরখাদক । মন্ত্রবলে মনুষ্যকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে ।

(৩) ইহাদের দৃষ্টি এত সাজ্বাতিক যে, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র মনুষ্যের সত্ত্ব মৃত্যু ঘটে, বৃক্ষের পত্র ঝড়িয়া যায়, ইত্যাদি ।

কোন ব্যক্তি প্রকৃত ডাইন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ প্রক্রিয়ার কথাও প্রচলিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল ।

এই দৃঢ় বিশ্বাস, অনেক স্থলে গুরুতর অনিষ্টপাতের কারণ হইয়া দাঁড়ায় । ১২৯১ ত্রিপুরাঙ্গে (১৮৮১ খঃ) এইরূপ ধারণামূলে সোণামুড়া বিভাগে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল । উক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জিহাম রায় নামক রিয়াং সরদারের পল্লীস্থ কপি রায় নামক এক ব্যক্তি তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা ব্যবসা করিত । চিরপোষিত বিশ্বাসমূলে কালাতা রিয়াং প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি কপি রায়কে ডাইন বলিয়া স্থির করিল । কপি রায়ের স্ত্রী খিচিমাকে ইহার সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তাহার স্বামীকে বধ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায়, খিচিমা বলিল— “যদি সে ডাইন হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বধ করিতে পার ।” অতঃপর দিবা দুই প্রহরে, পর্বতাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অরণ্যে, দুর্ভাগ্য কপি রায়কে বলি প্রদান দ্বারা মহা সমারোহে কালিকা দেবীর অর্চনা করা হয় ।

এই সময় স্বনামধন্য স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর সোণামুড়া বিভাগের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন । তাহার প্রযত্নে অপরাধিগণ ধৃত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল ; কিন্তু তদ্বারা লোকের অন্ধ বিশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই । ইহার পরেও উক্তরূপ হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে ।

বর্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ হইতে ডাইনের আতঙ্ক বিদূরিত হইয়া থাকিলেও রমণী সমাজে এবং অশিক্ষিতদিগের হৃদয়ে প্রাচীন বিশ্বাস অত্যাধিক অটুট রহিয়াছে । ডাইনের নাম শুনিলে এখনও তাহাদের মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্ত মধ্যে দারুণ ভীতির ছায়াপাত হইতে দেখা যায় ।

ডাইন বা ডাকিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কেবল ত্রিপুরায়ই পোষিত হইতেছে এমন নহে, ভারতের প্রায় সর্বত্রই কি সত্য কি অসত্য, সকল সমাজেই ডাকিনী বিষয়ক বিশ্বাস বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায় । এমন কি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ এবং অর্চনার বিধি সংযোজিত আছে । ব্রহ্মপুরাণের মতে—

“সর্দক্ষ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ ।”

* আলোর আলোর সহিত এই দস্ত সমস্তর সম্বন্ধ থাকি বিচিত্র নহে ।

কাশীখণ্ডের ৩০শ অধ্যায়ে পাওয়া যাইতেছে,—

“ডাকিনী শাকিনী ভূত প্রেত বেতাল রাক্ষসঃ।”

ইহারা শিব ও শক্তির অমুচর । ইহাদিগকে সংহারক শক্তির অংশবিশেষ বলা হইয়াছে । ইহারা সর্বদাই মানবের অমঙ্গলদায়ক ।

কোন কোন মানব বা মানবীর প্রতি উপরিউক্তরূপ দোষারোপ অস্বাভিক পরিমাণে সকল দেশেই হইয়া থাকে । শিশুগণের পীড়া হইলে ‘ডাকিনী খাইয়াছে’ বলিয়া অনেক স্থলে মনে করা হয় । অনেকে বলে—ইহারা মারণ ও বশীকরণ ইত্যাদি মন্ত্রের সাধক-সাধিকা । বর্তমান কালে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস অনেক পরিমাণে অস্তহিত হইয়া থাকিলেও কুকি, ত্রিপুরা, মঘ, কোল, ভিল প্রভৃতি পার্বত্য সমাজে এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে । এই বিশ্বাসের দ্বারা নানাবিধ অনিষ্টপাতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

খোজার বিবরণ ।

রাজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্তমানিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে খোজাদিগকে গ্রহণ করা হইত । গোড়েশ্বর হোসেন শাহের সেনাপতি গোড়মল্লিক ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে, জনৈক খোজা যে কৃতীত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“খোজাছিল একজন মঙ্গলা পরিপাটী ।
গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভাটী ॥
নদীকূলে বৈসে ত্রিপুর রাজ্যমাটী রাজ ।
নদী বান্ধি ডুবাইয়া মারিব সমাজ ॥
এই যুক্তি করিয়া সেনাকে আজ্ঞা দিল ।
সোণামুড়ার ভাটী দিয়া গোমতী বান্ধিল ॥
তিন দিন রাখিলেক বান্ধিয়া গোমতী ।
পরদিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী ॥”

ধন্তমানিক্য খণ্ড—২৩ পৃষ্ঠা ।

পাঠান বাহিনীর সহিত উপর্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ত্রিপুর সৈন্যদল খোজার পরামর্শানুসারে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল । ইহার ফলে, নদীর বাঁধের উপরে (উজানে) বিস্তার জল জমা হইয়া, নিম্নদেশের (ভাটির) জল শুকাইয়া গেল । মুসলমানগণ শুষ্ক নদীপথে আরামের সহিত পাড় হইবার কালে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তিন দিবসের অধিক জলরাশি হঠাৎ আসিয়া তাহাদের উপরে পতিত হইল । সেই

প্রবলবেগে অনেকে ডুবিয়া মরিল, অনেকে আশ্রয় বিহীন অবস্থায় ভাসিয়া গেল । সেনাপতি গোড়মল্লিক সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । পূর্বেবাক্ত খোজার বুদ্ধি-প্রার্থ্যের কথা এবং তাঁহার আদেশে সৈনিক বিভাগ পরিচালিত হইবার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি এই বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন । ইহার নাম বা পদবী রাজমালায় লিখিত হয় নাই ।

মুসলমান শাসনেও অনেক খোজার বিশেষ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের কথা শুনা যায় । খোজা মুসলমান রাজত্ব কালেরই আমদানী । তৎকালে বাদশাহ ও নবাবগণের সৈনিক বিভাগে খোজা সৈন্য নিযুক্ত থাকিত । অন্দরখণ্ডের প্রহরীর কার্য্য নির্বাহ এবং বেগম মহলে যাতায়াত করা ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল ।

স্বাভাবিক নপুংসকগণ খোজা নামে অভিহিত ছিল । এতদ্ব্যতীত সে কালে নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা অনেকের পুরুষত্ব বিলোপ করা হইত । ছান্দলী বা আতলুছি, বাদামী ও কাফুরী এই তিন শ্রেণীর খোজার বিবরণ পাওয়া যায় । শিশুকালে যাহাদের উপস্থ ও মুক ছেদন করা হইত তাহারা আতলুছি বা ছান্দলী, যাহাদের কেবল মাত্র মুক কর্তন করা হইত, তাহারা বাদামী এবং যাহাদের কেবল উপস্থ ছেদিত হইত, তাহারা কাফুরী আখ্যা লাভ করিত । *

অতিরিক্ত অর্থ লালসায় অনেকে আপন সন্তানদিগকে শৈশবকালেই খোজা করিত । ইহাদিগকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া বাদশাহ ও নবাবগণ ক্রয় করিতেন । বালক কিম্বা যুবকদিগকে ক্রয় করিয়া বলপূর্বক খোজা করিবার নৃশংস প্রথা সচরাচরই চলিতেছিল । অনেক স্থলে ইহারা ক্রীতদাস রূপে ব্যবহৃত ও লাঞ্চিত হইত । † ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন কালে এই অমানুষিক নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত সূদূত রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তৎকালে কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই ।

শ্রীহট্টে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খোজা পাওয়া যাইত । সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা মন্ত্রী আবুলকজল ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“শ্রীহট্টে অনেক খোজা ও ক্রীত দাস দাসী পাওয়া যায় ।” প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বালক-বালিকাদিগকে পণ্যস্বরের স্থায় উচ্চদরে বিক্রয় করা হইত । গেইট সাহেব তদীয় ‘History of Assam’ গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় তাহার উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া অনেক কথা লিখিয়াছিলেন । শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরায় খোজা সংগ্রহ করা অতি সহজ ছিল । সম্ভবতঃ এই কারণেই ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে খোজার অস্তিত্ব পাওয়া যায় ।

* আইন-ই-আকবরী—রুকমান, ৩৮৯ পৃঃ ।

† Yule's Marco Polo,—Vol. II, P. 79.

Wright's Marco Polo,—P. 280.

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

(বর্ণমালাভুক্তিক) ।

অনন্তমাণিক্য ;—(৬১ পৃঃ—১৪ পংক্তি) । ইনি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র । চন্দ্র হইতে গণনায় ১৫৫ এবং ত্রিপুরের অধস্তন ১১০ স্থানীয় । মহারাজ বিজয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুঙ্গুরকে পরিত্যাগ করিয়া, কনিষ্ঠ অনন্তকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনিই ত্রিপুর সিংহাসন লাভ করেন । ইনি বাল্যকালে নিতান্ত কুসম্মাখিত ছিলেন । রাজা বুঝিলেন, সেনাপতির অনুকূলতা ভিন্ন অনাবিষ্ট পুত্রের সিংহাসন লাভের পথ নিষ্ফল হইবে না । এজন্য তিনি প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত পুত্রের উদ্বাহ কার্য সম্পাদন করাইলেন, এবং প্রতিনিয়ত ভাবী রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত গোপীপ্রসাদকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন । কিন্তু অনন্তমাণিক্য রাজ্যলাভ করিবার অল্পকাল পরেই সেনাপতি রাজ্যভোগের লালসায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, জামাতাকে বধ করতঃ স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেড় বৎসর কাল মহারাজ অনন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছেন ।

অমরমাণিক্য ;—(১ পৃঃ—৮ পংক্তি) । ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । চন্দ্রের অধস্তন ১৫৮ ও ত্রিপুরের নিম্নবর্তী ১১৩ স্থানীয় । ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন । রাজমালা তৃতীয় লহরে ইঁহার বিশদ বিবরণ বিবৃত হইবে । ইনি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । ইঁহার রাজত্বকালে এবং ইঁহারই আদেশে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে । এজন্য মহারাজ অমর, ধর্মমাণিক্যের স্থায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ।

অরিভীম ;—(৬৮ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি মহারাজ উদয়মাণিক্যের অশ্রুতম সেনাপতি ছিলেন । অরিভীম প্রকৃত নাম নহে, অরাতি মর্দন জনিত উপাধি । তাঁহার নাম ছিল রামদাস । * সে কালে সেনাপতিগণের সাধারণ উপাধি 'নারায়ণ' ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে লিপ্ত ছিলেন, রাজমালায় এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । ইঁহার "উড়িয়া নারায়ণ" অন্য উপাধি ছিল । অতঃপর বর্ণিত ভাঙ্গিল কাণ্ড এই উপাধি পাইবার কথা জানা যায় । এরূপ উপাধি লাভের কারণ 'ভাঙ্গিল কা'এর বিবরণে পাওয়া যাইবে ।

* রামদাসের নাম অরিভীম নারায়ণ ।

আণ্ডয়ান নারায়ণ ;—(৬৯ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইনি উদয়মাণিক্যের সেনাপতিগণের মধ্যে একজন । চট্টগ্রামের সংগ্রামে প্রধান সেনাপতি রণাগণের সহকারীরূপে ইনি পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন । রণাগণের অনবধানতাপ্রযুক্ত এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটে ।

ইন্দ্রমাণিক্য ;—(৩৭ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইনি দেবমাণিক্যের পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । চন্দ্র হইতে ১৫৩ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ১০৮ স্থানীয় । দেবমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ, বিজয়মাণিক্যকে কারাগারে নিক্ষেপ, এবং শিশু ইন্দ্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইঁহার রাজত্ব এক বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই । দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণের অত্যাচারে সেনাপতিগণ উত্থিত হইয়া, ইন্দ্রমাণিক্য সহ তাঁহাকে হত্যা এবং মহারাজ বিজয়কে রাজা করিয়াছিলেন । ইঁহার শাসনকাল ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক বৎসর ।

উদয়মাণিক্য ;—(৬৭ পৃঃ—৩ পংক্তি) । ইতিপূর্বে অনন্তমাণিক্যের বিবরণে বলা হইয়াছে, তিনি স্বীয় খশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । সেই জামাতাঘাতী সেনাপতিই, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনারূঢ় হন । ইনি রাজধানী রাজমাটির নাম পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে “উদয়পুর” নামকরণ করিয়াছেন । ধর্মবিগর্হিত উপায় দ্বারা অভাবনীয় রাজপদ লাভ করিয়া, ইনি নিতান্ত বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন ; দুই শত চল্লিশটি বিবাহ করাই ইঁহার জাঙ্ঘল্যমান দৃষ্টান্ত । অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-ভোগের লালসায় পারদ ঘটিত বটিকা সেবন হেতু ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল । ইঁহার শাসনকালে চট্টগ্রামে মুসলমানগণের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায়, সেই সময়ে প্রধান সেনাপতি রণাগণের তদ্বাবধানে তিন হাজার সেনাপতি সহ বারান্ন হাজার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল । কিন্তু রণাগণের ওদ্ধত্য ও অপরিণামদর্শিতার ফলে চট্টগ্রামের পথেই পাঠানগণ কর্তৃক ত্রিপুরার বিপুল বাহিনী বিধ্বস্ত হয় । এই যুদ্ধে ত্রিপুরার চল্লিশ হাজার এবং পাঠানের পাঁচ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল । এবার চট্টগ্রাম মুসলমানগণের কুক্ষিগত হওয়ায় রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, উদয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার করিয়া বাইতে সমর্থ হন নাই । ইঁহার শাসন ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল ।

একাকবর ;—(৫৩ পৃঃ—৪ পংক্তি) । হুমায়ূনের পুত্র, ভারত-সম্রাট মহামতি আকবর সাধারণতঃ একাকবর বা আকাববর নামে পরিচিত ছিলেন । শেরসাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ূন, বেগম সহ রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন ; এই বিপদের সময় অমরকোটে আকবরের জন্ম হইয়াছিল । ইঁহার রাজত্বকাল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে । ইনি সদাচারী,

প্রজারঞ্জক, দয়ালু এবং পক্ষপাত শূন্য ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন, এজন্যই তাঁহার সুখ্যাতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কমলা ;—(৮ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । মহারাণী কমলা মহাদেবী । ইনি মহারাজ ধর্মমাণিক্যের পটু-মহিষী । দান ধর্ম ইহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল ; ইনি ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছেন । কসবা নগরের সম্মিহিত কমলাসাগর ইহার সমুদ্রল কীর্তি । উদয়পুরেও এই নামে সরোবর খনন করাইয়াছিলেন ।

করা খাঁ ;—(২৪ পৃঃ—২৭ পংক্তি) । ইনি পাঠান সেনাপতি ছিলেন । হোসেনশাহ ত্রিপুরেশ্বর ধর্মমাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দ্বিতীয় বারে হৈতন খাঁএর সঙ্গে ইহাকে ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন । এ যাত্রায়ও ইহার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন ।

কালী খাঁ ;—(৪ পৃঃ—২১ পংক্তি) । ইনি ধর্মমাণিক্যের অমাত্য এবং সেনাপতি ছিলেন । সে কালে সেনাপতিগণের হস্তে শাসনভার ছিল, এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে । ইনি রিয়াং জাতীয় । এই জাতির ভাবী রায় (রাজা) ‘চাপিয়া খাঁ’ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন । এই কারণেই ইহার ‘খাঁ’ উপাধি হইয়াছে ।

কালী নাজির ;—(৪৩ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইনি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন । ইহার অসাধারণ শৌর্য ও প্রতিভাবলে উত্তর দিকে রাজ্যের সীমা বহু বিস্তৃতি লাভ করে । ইনি চট্টগ্রামে পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁয়ের সহিত সংগ্রামে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, সমরশায়ী হইয়াছিলেন ।

কৌতুক ;—(৩ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইনি কাশুকুজ দেশীয় ব্রাহ্মণ । মহারাজ ধর্মমাণিক্য বারণসীধাম হইতে ইহাকে আনিয়া স্বীয় পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কুমিল্লার ধর্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে মহারাজ ধর্ম, আট জন ব্রাহ্মণকে কালিয়াজুড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভূমিদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৌতুকের নামও পাওয়া যায় । ইহার বংশ অনেক কাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে ।

খড়গ রায় ;—(২৫ পৃঃ—১২ পংক্তি) । ইনি ধর্মমাণিক্যের অন্ততম সেনাপতি । হৈতন খাঁ প্রমুখ প্রবল পাঠান বাহিনী ত্রিপুরা বিজয়ের নিমিত্ত আসিয়া জামির খাঁ গড় আক্রমণ করিবার কালে খড়গ রায় সেই গড়ের সেনানায়ক ছিলেন । ইনি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও গড় রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে হৈতন খাঁএর হস্তে পরাজিত হইয়া ছয়ঘরিয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন ।

গগন খাঁ ;—(৪ পৃঃ—২১ পংক্তি) । ইনি ধর্মমাণিক্যের অমাত্য ও সেনানায়ক । ধর্মমাণিক্যের সময়েও ইনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন । পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁএর ত্রিপুরা আক্রমণ কালে ছয়ঘরিয়া গড় গগন খাঁএর তত্ত্বাবধানে

ছিল । জামির খাঁ গড় জয় করিয়া হৈতন খাঁ ছয়ঘরিয়া গড় আক্রমণ করিলেন । এই সময় গগন খাঁ তিন প্রহর কাল প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে পরাজিত ও পলায়নপর হইয়াছিলেন । এই সেনানিবাস হৈতন খাঁ অধিকার করেন ।

গজভীম ;—(৪৮ পৃঃ—১৯ পংক্তি) । ইনি বিজয়মণিক্যের সেনাপতি । পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ মমারক খাঁএর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন । ত্রিপুর সেনাপতি কালা নাজির হত হইবার পর রাত্রিকালে পাঠানগণ নিশ্চিন্ত মনে গড়ের ভিতর রন্ধনাদি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকা কালে, সেনানায়ক গগন খাঁএর পরামর্শানুসারে ত্রিপুর সৈন্যগণ এক সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই পথে গড়ে প্রবিষ্ট হইয়া অকস্মাৎ পাঠানদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল । সেনাপতি মমারক খাঁকে ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় দরবারে উপস্থিত করিবার পর, তাঁহাকে চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয় । ‘গজভীম’ ইহার নাম নহে—উপাধি । বিশেষ পারদর্শিতার সহিত হস্তী খেদায় বহুসংখ্যক হস্তী ধৃত করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ।

গদাভীম ;—(৬৫ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইহার নাম ছিল ময়ূরধ্বজ । * ইনি অনন্তমণিক্যের মল্ল-গুরু ছিলেন । অনন্তের শশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ (পরে উদয়মণিক্য) রাজ্য লোভে জামাতাকে (রাজাকে) বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন । তিনি গদাভীমকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, রাজাকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা প্রদান কালে গলা টিপিয়া মারিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন । ধর্ম্মভীরু গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, গোপীপ্রসাদ স্বীয় ভাগিনেয় বীরমর্দন নারায়ণের দ্বারা সেই কার্য সাধন করিয়াছিলেন ।

গরুড়ধ্বজ ;—(৬৮ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি উদয়মণিক্যের সেনাপতি অরিভীমের পুত্র, † নিজেও সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন । ‘গরুড়ধ্বজ’ নাম নহে—উপাধি । গৌড়ের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া এই উপাধি পাইয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“গৌড় সৈন্ত সঙ্গে তার বহু ছিল রণ ।

গরুড়ধ্বজ ধ্যাতি তার হইল তখন ॥”

এই সেনাপতির নাম কি ছিল, জানা বাইতেছে না, রাজমালায় কেবল উপাধিরই উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে ।

* “গদাভীম নামগণ ময়ূরধ্বজ নাম ।”

রাজমালা—৩য় লহর, রত্নমণিক্য খণ্ড ।

† গরুড়ধ্বজ নাম অরিভীমের নন্দন ।

রাজমালা ।

গোপীপ্রসাদ নারায়ণ ;—(৬২ পৃঃ—২৩ পংক্তি) । ইনি বিজয়-মাণিক্যের ও তৎপর অনন্তমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন । ইঁহার কন্যাকে অনন্তমাণিক্য বিবাহ করেন । রাজা অল্প বয়স্ক ছিলেন, অশুর গোপীপ্রসাদই জামাতার পক্ষে রাজ কার্য সম্পাদন করিতেন । কিয়ৎকাল পরে ইনি রাজা লাভের লালসায় জামাতাকে গোপনে হত্যা করিয়া উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন । ইঁহার সময়ে রাজধানী রাজমাটার ‘উদয়পুর’ নামকরণ হইয়াছে ।

গোড়মল্লিক ;—(২২ পৃঃ—২১ পংক্তি) । ইনি গোড়েশ্বর হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন । খন্যমাণিক্যের শাসনকালে চট্টগ্রামের অধিকার মুসল-মানগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়ায়, হোসেনশাহ হতপ্রদেশ পুনরুদ্ধার ও ত্রিপুর রাজ্য হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে এই সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ত্রিপুর বাহিনী কৌশলক্রমে ইঁহার অধিকাংশ সৈন্য গোমতীর জলে ডুবাইয়া বধ করায়, ইনি বিশেষ বিপন্নাবস্থায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন ।

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ;—(৬৯ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইনি উদয়মাণিক্যের সেনাপতি । পাঠান বাহিনীর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি রণাগণের সঙ্গে ইনিও ছিলেন । ইঁহার উপাধি ছিল ‘চন্দ্রদর্প’ । কি উপলক্ষে এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই ।

ছামথম্ম খাঁ ;—(৪ পৃঃ—২১ পংক্তি) । রাজমালায় ইঁহার নাম ‘খাঁ ছামথুম্ম’ লিখিত হইয়াছে । ইঁনি রিয়াং জাতীয় । খন্যমাণিক্যের অন্ততম সেনাপতি ও অমাত্য ছিলেন ।

জয়মাণিক্য ;—(৭২ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র ; পিতার অভাবে ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন । ইঁহার শাসনকালে, সেনাপতি রণাগণ (রঙ্গ নারায়ণ) শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন । জয়মাণিক্য রাজবংশীয় নহেন । ইঁহার পিতা সেনাপতি ছিলেন, পরে অনন্তমাণিক্যকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন । জয়মাণিক্য পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিককাল ভোগ করিতে পারেন নাই । সেনাপতি অমর দেব (ইনি দেবমাণিক্যের পুত্র) ইঁহাকে বধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসন ভিন্নবংশীয় রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ইনি ১৫৭৬—১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেড় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

জয়া মহাদেবী ;—(৬৭ পৃঃ—২০ পংক্তি) । অনন্তমাণিক্যের মহিষী—নাম জয়াবতী । ইনি উদয়মাণিক্যের (সেনাপতি গোপীপ্রসাদের) দুহিতা ছিলেন । পিতা কর্তৃক পতি নিহত হইবার পর, ইনি সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পিতার বাধা অতিক্রম করিয়া সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারেন নাই । এই তেজস্বিনী রমণী পিতার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, “তুমি

স্বাক্ষকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছ, রাণীকে গ্রহণ করা বাকী থাকিবে কেন ?” ইহা বলিয়া তিনি পিতার বামপার্শ্বে সিংহাসনে বসিতে উচ্চতা হইয়াছিলেন । পিতা গোপীপ্রসাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, সিংহাসন হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক অবতরণ করিলেন । তিনি দুহিতার হাত এড়াইবার নিমিত্ত চন্দ্রপুর নামক স্থানে রাজপাট উঠাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

জামাল খাঁ পল্লি ;—(৭১ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । পাদশাহনামার মতে ইঁহার নাম জামাল খাঁ পোমারী । ইনি পাঠান সেনাপতি । উদয়মণিক্যের শাসনকালে চট্টগ্রামের অধিকার পাঠানের হস্তগত হইবার পরে, সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ইঁহাকে চট্টগ্রামে অবস্থান করিতে হইয়াছিল । ইনি রাজা বলদেবের সহিত কামরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

ডাঙ্গর ফা ;—(১৭ পৃঃ—৮ পংক্তি) । ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৪৩ সংখ্যক ভূপতি ; নামান্তর হরিরায় । রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় ইঁহার বিবরণ লিখিত হওয়ায়, এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না ।

ডুঙ্গুর ;—(৬১ পৃঃ—১৩ পংক্তি) । ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র । দৈবজ্ঞের গণনায় স্থির হয়, ইঁহার ছেদ যোগে জন্ম হইয়াছে ; সুতরাং অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটিবে । ইঁহার চরিত্রও অতিশয় মন্দ ছিল । এই সকল কারণে মহারাজ বিজয় ইঁহাকে তীর্থবাসের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যায় পাঠাইয়া দ্বিতীয় পুত্র অনন্তকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়াছিলেন ।

ত্রিলোচন ;—(১০ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইনি ত্রিপুরার ৪৭ সংখ্যক ভূপতি, ভারত-সম্রাট মুখিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন । ইঁহার বিবরণ প্রথম লহরে লিখিত হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন ।

দায়ুদ বাদশা ;—(৫৩ পৃঃ—৭ পংক্তি) । ইনি সুলেমান কররাণির পুত্র, পিতার পরলোকগমনের পরে, বঙ্গের তত্ত্ব লাভ করেন । ইনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন । বঙ্গের অধিকার প্রাপ্তির কয়েককাল পরে দায়ুদ, আকবরের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়া বিহার আক্রমণ করেন । কিন্তু সম্রাটের সেনাপতি মুনায়েম খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল কর্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । ইহা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা । এই সন্ধিদ্বারা দায়ুদের একমাত্র উড়িষ্যার অধিকার স্থিরতর রাখিয়াছিল । সৈন্যাধ্যক্ষ মুনায়েম খাঁ পরলোকগত হইবার পর, দায়ুদ সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্ববার বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন । এই ঘটনা হইতেই বঙ্গে পাঠান শাসন চিরকালের তরে বিলুপ্ত ও মোগল অধিকার প্রবর্তিত হইয়াছিল । দায়ুদ, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং ইঁহার সহিত চট্টগ্রামের অধিকারঘটিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন ।

দুর্ভ চন্ডাই ;—(৫০ পৃঃ—১৮ পংক্তি) । ইঁহার পূর্ণ নাম দুর্ভভৈন্দ্র চন্ডাই । মহারাজ ধর্মমণিক্যের সময় হইতে ইনি চতুর্দশদেবতার প্রধান পূজক

ছিলেন এবং ইহার বর্ণিত বিবরণ অবলম্বনে রাজমালা প্রথম লহর রচিত হইয়াছে । ইহারই প্ররোচনায়, সমরক্ষেত্রে ধৃত গোড়েশ্বর দায়ুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি মমারক খাঁকে চতুর্দশদেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল ; ইহা বিজয়মাণিক্যের শাসনকালের কথা । এই ঘটনার অল্পকাল পরেই প্রাচীন চম্ভাই পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় মহারাজ বিজয় স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া বিজয়দুর্লভ নারায়ণকে চম্ভাই পদে বরণ করিয়াছিলেন ।

দুর্লভ নারায়ণ ;—(৪০ পৃঃ—১২ পংক্তি) । ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর । বিজয়মাণিক্য অল্প বয়স্ক থাকায়, দৈত্য নারায়ণ রাজকার্য্য করিতেছিলেন । তিনি ক্ষমতা গর্বে উন্মত্ত হইয়া পদে পদে রাজাকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ভ্রাতার প্রাধান্যের সুযোগ অবলম্বনে দুর্লভ নারায়ণ নিতান্ত উচ্ছ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । প্রজাবর্গের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, পরদ্বীহরণ তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল । অতঃপর বিজয়মাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া, দৈত্য নারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা মাধবের দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়া, এই সকল উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন ।

দেবমাণিক্য ;—(২৫ পৃঃ—২৯ পংক্তি) । ইনি ধনুমাণিক্যের পুত্র । চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫২ ও ত্রিপুর হইতে ১০৭ স্থানীয় রাজা । মিথিলা-নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক তান্ত্রিক সাধক দেবমাণিক্যকে শিষ্য করিয়া, তাঁহার উপর অমিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । এই ধৃত ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় দেবমাণিক্য দেবীর দর্শন লাভের নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে শ্মশানক্ষেত্রে বলি প্রদান করিয়াছিলেন । পরিশেষে শ্মশান-সাধনকালে দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ রাজাকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই । এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহাকেও কিয়ৎকাল পরে সেনাপতিগণের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল । দেবমাণিক্যের শাসনকাল ১৫২২ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল ।

দৈত্য নারায়ণ ;—(৩৭ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি ছিলেন । দৈত্য নারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণ সমবেতভাবে ইন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন । এবং দৈত্য নারায়ণ স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়া, পদে পদে রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ আরম্ভ করেন । এই সময় দৈত্য নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা দুর্লভ নারায়ণ কর্তৃক রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল । মহারাজ বিজয় অনন্যোপায় হইয়া দৈত্য নারায়ণকে বধ করিয়া শ্মশানের পথ উন্মুক্ত করিতে বাধ্য হন । দৈত্য নারায়ণ উড়িয়া হইতে জগন্নাথ বিগ্রহ আনয়ন ও উদয়পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন ।

ধনুস্তরী নারায়ণ ;—(৬৩ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি চিকিৎসা ব্যবসারী ছিলেন । ইহার পুত্র বাহুরায় বা বাহুবৈষ্ঠ, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের অন্তিমকালের চিকিৎসক । ইনি ত্রিপুরা জাতীয় এবং “নারায়ণ” উপাধিধারী থাকা জানা যাইতেছে ।

ধন্যমাণিক্য ;—(৬ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ইনি মহারাজ ধর্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র । চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫১ ও ত্রিপুর হইতে ১০৬ স্থানীয় । পিতার পরলোকগমনের পর সেনাপতিগণ ইঁহাকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকে রাজা করিয়াছিলেন । কিয়ৎকাল পরে সেই সেনাপতিগণই প্রতাপমাণিক্যকে নিহত করিয়া, ধন্যমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন । ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, রাজার অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে সেনাপতিগণের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে । তিনি কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া, ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নিবারণ করিলেন । অতঃপর বিশ্বস্ত নূতন সেনাপতি নিযুক্ত ও সৈনিক বিভাগ সংগঠন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন । ইঁহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা বিস্তর প্রসারিত হইয়াছিল । ইনি চট্টগ্রামের অধিকার লইয়া পাঠানগণের সহিত বারম্বার আহবে লিপ্ত হইয়াছেন । বজেশ্বর হোসেনশাহ ইঁহার হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছিলেন । ইঁহার সময়ে দেবার্চনায় নরবলির সংখ্যা অনেক হ্রাস করা হয় । মহারাজ ধন্য বঙ্গভাষার পোষক ছিলেন ; তাঁহার প্রযত্নে উৎকলখণ্ড এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল ; সেই সকল গ্রন্থ বর্তমান কালে পাওয়া যাইতেছে না । ইনি ত্রিছত হইতে সঙ্গীতজ্ঞ লোক আনাইয়া, স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে ও প্রজা সমাজে নৃত্য গীতের প্রচলন করিয়াছিলেন । দেবালয় গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মহারাজ ধন্যের অগ্নান কীর্তি । তন্মধ্যে উদয়পুর পীঠস্থানে মন্দির নির্মাণ ও ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি স্থাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইতিপূর্বে তদ্বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । ইনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া, বসন্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন । ১৪৬৩ হইতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্বকাল ।

ধর্মমাণিক্য ;—(২ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইনি মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র । চন্দ্রের অধস্তন ১৪৯ ও ত্রিপুরের পরবর্তী ১০৪ স্থানীয় । মহারাজ ধর্ম পিতা বিচ্যুতানে সন্ন্যাসীবেশে তীর্থভ্রমণে রত ছিলেন । পিতৃ বিয়োগের পর রাজ্যে আগমন-পূর্বক সিংহাসনারোহণ করেন । কুমিল্লানগরীস্থিত ধর্মসাগর ইঁহার সমুজ্জ্বল কীর্তি । ইঁহার শাসনকালের বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধাদি অশান্তিদায়ক কোন ঘটনা সজ্জটিত হয় নাই এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সুখশান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে । মহারাজ ধর্ম ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন । ইঁহার দ্বারাই রাজমালা রচনার সূত্রপাত হইয়াছে ।

নির্ভয় নারায়ণ ;—(৪৫ পৃঃ—১০ পংক্তি) । ইনি হেড়ম্ব রাজ্যের অধীশ্বর এবং ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন । বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিরার বিরুদ্ধে হাঁড়ি সৈন্য প্রেরণ করিবার পর, জয়ন্তিরারাজ হেড়ম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । হেড়ম্বপতি নির্ভয় নারায়ণের মধ্যবর্তীতায় সেই বিবাদের মীমাংসা হইয়াছিল । নির্ভয় নারায়ণ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী ১৬০—১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পিরোজ খাঁ আন্নি ;—(৭১ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইনি সৌড়েখরের সেনাপতি ছিলেন । ত্রিপুরেশ্বর উদয়মণিক্যের শাসনকালে পাঠান-বাহিনী চট্টগ্রামের অধিকার ত্রিপুরার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ায়, সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বজেশ্বর, জামাল খাঁ পন্নির সহযোগে ইঁহাকে চট্টলে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

পুণ্যবতী ;—(৩৯ পৃঃ—৭ পংক্তি) । ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মণিক্যের মহিষী । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“বিজয়মণিক্য নাম হইল নরপতি ।

তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী ॥”

বিজয়মণিক্য খণ্ড ।

শ্রেণীমালা আলোচনার জানা যায়, ইঁহার অপরা নাম ছিল—লক্ষ্মীবালা । ইনি প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কন্যা ছিলেন । মহারাজ বিজয়, রাজক্ষমতা-গ্রাসী দৈত্য নারায়ণের নিধন দ্বারা শাসনের পথ নিকর্শক করেন । এতদুপলক্ষে মহারাণী পতিকে তীব্র ভৎসনা দ্বারা ব্যথিত এবং দৈত্য নারায়ণের হত্যাকারী মাধবকে রাজার অগোচরে নিহত করায়, মহারাজ ক্ষুব্ধ হইয়া ইঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

মহারাণী পুণ্যবতী, হোমনাবাদ ও তিষণ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন ।

প্রচণ্ড উজীর ;—(৪৫ পৃঃ—২৩ পংক্তি) । ইনি বিজয়মণিক্যের উজীর (মন্ত্রী) ছিলেন । * পাঠান সৈন্যগণের দুই মাসের বেতন প্রদান করিতে বিলম্ব

* উজীর পদ এবং আরও কতিপয় পদ মুসলমান শাসনের অধুিকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল । মহারাজ বিজয়মণিক্যের শাসনকালেই এই সকল উপাধি প্রচলিত হয় । ত্রিপুর বংশাবলী পুস্তিকার বিজয়মণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

“বিজয়মণিক্য রাজা বুদ্ধিমন্ত ছিল ।

কৌশল করিয়া রাজ্য শাসিতে লাগিল ॥

উজীর সুবাহু নাজির কবরা আর বে দেওয়ান ॥

বকরা হাজারী মুন্সী ঠাকুর হুদাখান ॥

এ সমস্ত আমলাসহ পরামর্শ করি ।

শাসিতে লাগিল রাজ্য করি বাহাছরী ॥” ইত্যাদি ।

ত্রিপুর রাজ্যে কিরূপ যোগ্যতর ব্যক্তিকে উজীর নিযুক্ত করা হইত, কুম্ভমালা গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়, যথা ;—

“বিমল কুলেতে জন্ম বে জনার হয় ।

দেবেতে দিকেতে ভক্তি বাহার থাকয় ॥

শাস্ত্রেতে পণ্ডিত হয়, হয়ে ধর্মের মতি ।

আজর পাগল জানে, জানে রাজনীতি ॥

হওয়ায়, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, ইঁহাকে মেহেরকুলে (কুমিল্লানগরীতে) বধ করিয়াছিল। বিদ্রোহী সৈন্যদল রাজাকে বধ করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্তও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, মহারাজ বিজয় স্বয়ং সমরক্ষেত্রে ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রতাপ ;—(৬ পৃঃ—১৫ পংক্তি)। (প্রতাপমাণিক্য)। ইনি ধর্ম-মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র ; পিতার পরলোকগমনের পর, সেনাপতিগণের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যকে অন্তরিত করিয়া, পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার রাজত্ব এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অধাৰ্ম্মিক ছিলেন বলিয়া সেনাপতিগণ রাত্রিকালে ইঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া, জ্যেষ্ঠ ধন্যমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং সেই সালেই নিহত হন। মহারাজ প্রতাপ, চন্দ্র হইতে ১৫০ ও ত্রিপুর হইতে গণনার ১০৫ স্থানীয় ছিলেন।

প্রতাপ ;—(১৩ পৃঃ—৮ পংক্তি)। ইনি গোড় রাজ্যের অধীনস্থ, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণার জমীদার ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্য বঙ্গরাজ্যের পূর্বাঞ্চল হস্তগত করিবার কালে, জমীদার প্রতাপ গোড়েশ্বরের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রতাপ নারায়ণ ;—(৪৫ পৃঃ—২৯ পংক্তি)। ইনি প্রচণ্ড উজীরের পুত্র এবং ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপ পিতার সঙ্গে মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) অবস্থান কালে, ত্রিপুরেশ্বরের বিদ্রোহী পাঠান সৈন্যগণ উজীরকে বধ করায়, প্রতাপ নারায়ণ নিরুপায় হইয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্বক স্বীয় জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলাগমা ;—(২৬ পৃঃ—১৬ পংক্তি)। বলাগমা একজন পার্বত্য রমণী। প্রাচীন রাজমালায় ইঁহার নাম বলাংমা লিখিত হইয়াছে। এই রমণী 'ডাইন' (ডাকিনী) বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত আগমন করায়, তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত মহারাজ

শিষ্টের রক্ষণ জানে দুষ্টের দমন ।
ইন্দিতে বুঝিতে পারে স্তম্ভন দুর্জন ॥
মভা উপবৃত্ত কথা কহিবারে জানে ।
কাব্যোতে রসিক হর, পরাক্রমী রণে ॥
প্রিয় বাণী কহে, হর প্রিয় দরশন ।
নাথরে প্রভুর কার্য্য করি প্রাণপণ ॥
বিপদে চঞ্চল নহে থাকরে স্থস্থির ।
হেন জন হইবারে উচিত উজীর ॥

ধর্মমাণিক্য বলাগমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'ডাইন' সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্ববর্তী ২৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাণেশ্বর ;—(৫ পৃঃ—৭ পংক্তি)। ইনি রাজপুরোহিত এবং সভাপণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় সহোদর শুক্রেশ্বরের সহযোগে ইনি রাজমালার প্রথম লহর রচনা করিয়াছেন। উক্ত লহরে বাণেশ্বরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। মহারাজ ধর্মমাণিক্য, ধর্মসাগর প্রতিষ্ঠা কালে অশ্বাশ্ব ত্রাঙ্কণের সহিত ইঁহাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বিজয়মাণিক্য ;—(৩৭ পৃঃ—৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৫৪ ও ত্রিপুর হইতে ১০৯ স্থানীয়। পিতৃবিয়োগের পর লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মৈথিল ত্রাঙ্কণের প্ররোচনায় বিজয়কে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। অল্পকাল পরে সেনাপতিগণ লক্ষ্মীনারায়ণ ও সমাতৃ ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া বিজয়কে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য রাজা হইলেন সত্য, তাঁহার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ রাজাকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ রাখিয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। এই সময় অবিচার অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ বিজয় উপায়াস্তর না দেখিয়া শ্বশুরকে বধ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঁহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গোড়ের সহিত ইঁহার বারম্বার যুদ্ধ হইয়াছে। ইনি বঙ্গ বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কেবল শূরত্বে নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের মধ্যে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মহারাজ বিজয় দিল্লীর সম্রাট মহামতি আকবরের সমসাময়িক রাজা। ইনি ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া, বসন্ত রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র ভদ্রারায়ণ ;—(৬১ পৃঃ—৬ পংক্তি)। চন্দ্রভৈরব চন্দ্রাইএর মৃত্যুর পর, বিজয়মাণিক্য কর্তৃক ইনি চন্দ্রাই পদে (চতুর্দশদেবতার প্রধান পূজক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজমালায় উল্লেখ আছে, মহারাজ চতুর্দশদেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইঁহাকে উক্ত পদ প্রদান করেন।

বীরমর্দন নারায়ণ ;—(৬৬ পৃঃ—১৪ পংক্তি)। ইনি অনন্তমাণিক্যের সেনাপতি এবং রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের ভাগিনের। গোপীপ্রসাদ, রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য লাভের প্রয়াসী হন ; এবং এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থ প্রথমতঃ রাজার মন্ত্র-গুরু গদাতীমকে অনুরোধ করেন। গদাতীম এই যুগিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, বীরমর্দনের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছিল। এই কৃতর বিশ্বাসঘাতক, আশ্রয়দাতা রাজাকে গুপ্তহত্যা করিয়া বীরমর্দন নাম কলঙ্কিত করিতে বিন্দুমাত্র কুঠাবোধ করে নাই। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

ভাঙ্গিল ফা ;—(৭১ পৃঃ—২৮ পংক্তি) । ইনি উদয়মণিক্যের অন্যতম সেনাপতি । ইঁহার উপাধি ছিল উড়িয়া নারায়ণ । কেহ কেহ মনে করেন, উড়িয়া বিজয় হেতু ইঁহার এই উপাধি লাভ হইয়াছিল ; এই অনুমান প্রকৃত নহে । রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমরমণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায় ;—

“রাধু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয় ।
দেয়াজ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয় ॥”

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মঘগণের অধিকৃত রাধু ও দেয়াজ প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে উড়িয়া রাজ্য ছিল । এই স্থান জয় করিয়াই “উড়িয়া নারায়ণ” উপাধি লাভ করিয়াছেন । * অধ্যাপক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, উড়িয়া দেশীয় কোন ব্যক্তিকর্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ভাঙ্গিল ফা গোড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তোপের মুখে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন ।

ভানু নারায়ণ ;—(৫৭ পৃঃ—১১ পংক্তি) । মহারাজ বিজয়মণিক্যের শাসনকালে ইনি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ইটা পরগণার জনৈক তালুকদার ছিলেন,— জাতিতে ব্রাহ্মণ । মহারাজ বিজয় দিখিজয় উপলক্ষে ইটায় গমনকালে ইঁহাকে বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিকর প্রদান করেন । অতঃপর গ্রহীতার প্রার্থনামুসারে উক্ত ভূমির এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্য হইয়াছিল ।

ভৃগুরাম ;—(৫৪ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইঁহার নামান্তর পরশুরাম ও ভার্গব । জমদগ্নির পুত্র বলিয়া ইঁহার অন্য নাম জামদগ্ন্য । ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন সাধন ও পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন । এই বীরপুরুষকর্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল । ইনি দশ অবতারের মধ্যে ৬ষ্ঠ অবতার বলিয়া পরিগণিত । মাতৃহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত ইনি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে যাইয়া, পরশুর সাহায্যে উক্ত কুণ্ডের তীর খননদ্বারা ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।

মমারক খাঁ ;—(৪৬ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । কেহ কেহ ইঁহাকে মহম্মদ খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু পাদশাহনামার মতে মমারক খাঁ নামই বিশুদ্ধ । ইনি গোড়েশ্বর দাযুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি ছিলেন । চট্টগ্রামের যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী কর্তৃক ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রাজদরবারে নীত হওয়ার পর, ইঁহাকে চতুর্দশদেবতার সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল । পাদশাহ নামার পাওয়া

* কবি ভবানী দাসের ময়নামতীর গানে উরুয়া (উড়িয়া) রাজ্যের নাম পাওয়া যায় । মেহেরকুল ও পাটিকারার রাজা গোবিন্দচন্দ্র (নামান্তর গোপীচাঁদ) উড়িয়া রাজ্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । চট্টগ্রামে গোবিন্দের আধিপত্য থাকিবার প্রমাণ ময়নামতীর গানে পাওয়া যায় । সুতরাং এই উড়িয়া রাজা রাজমালার লিখিত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, ইঁহাই বুঝা যাইতেছে ।

যায়, ইনি কামরূপের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া রাজমালাতে অবস্থানপূর্বক কিয়ৎকাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন ।

মহামাণিক্য ;—(১ পৃঃ—১৩ পংক্তি) । ইনি রাজমালা প্রথম লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা । প্রথম লহরে ইঁহার বিবরণ প্রদান করায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না ।

মাধব ;—(৪০ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যা-জামাতা । দৈত্য নারায়ণ ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন । তাঁহার ধন সম্পত্তি সমস্তই জামাতার হস্তে ছিল ; এমন কি, মাধব আহার্য প্রদান না করিলে দৈত্য নারায়ণ আহার করিতেন না ।

বিশ্বাসঘাতক মাধব, বিজয়মাণিক্যের প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া শ্বশুরকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন । দৈত্য নারায়ণের কন্যা (বিজয়মাণিক্যের মহিষী) পিতৃহত্যা মাধবকে গুপ্তচরদ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায় ।

মুকুন্দ ;—(৬১ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইনি উড়িষ্যার ভূপতি এবং বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন । মহারাজ বিজয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুঙ্গুর ফাএর কোষ্ঠীতে ছেদযোগ আছে, দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া এরূপ বলায়, মহারাজ সেই পুত্রকে পুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উড়িষ্যাপতি মুকুন্দদেবকে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন ।

বিশ্বকোষে (মাদলপঞ্জী নামক পুথি অনুসারে) উড়িষ্যার ভূপতিবৃন্দের যে বংশ-তালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে তিন জন মুকুন্দদেবের নাম পাওয়া যায় । তন্মধ্যে প্রথম মুকুন্দদেব, প্রখ্যাতনামা মহারাজ চোরগঙ্গার অধস্তন ২৮শ স্থানীয় । ইনি রাজা রঘুনাথ ছোটরার পুত্র, ১৪৭৩ শক হইতে ১৪৮১ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন । ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৫০—১৪৯২ শক । সুতরাং এই মুকুন্দদেবই মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক সাব্যস্ত হইতেছেন ।

যাতুবৈজ্ঞ ;—(৬৩ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি জাতিতে ত্রিপুরা এবং ধনুস্তরী নারায়ণের পুত্র । চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া 'বৈজ্ঞ' উপাধি লাভ করেন । মহারাজ বিজয়মাণিক্য বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এই ব্যক্তি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন । কিন্তু রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে তিনি রাজাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, এই রোগেই মহারাজ বিজয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন ।

রণচতুর নারায়ণ ;—(১ পৃঃ—১১ পংক্তি) । ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন । মহারাজের আদেশানুসারে রাজমালা দ্বিতীয় লহর এই সেনাপতি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে । এই লহরের লেখক কে ছিলেন, রাজমালায় উল্লেখ নাই, এবং বর্তমান কালে তাহা জানিবারও উপায় নাই ।

রণাগণ নারায়ণ ;—(৬৯ পৃঃ—১৭ পংক্তি) । ইনি উদয়মাণিক্যের ভগিনী-পতি ও সেনাপতি ছিলেন । ইঁহার প্রকৃত নাম রঙ্গ নারায়ণ । চট্টগ্রামের পথে ইনি পাঠান কর্তৃক আক্রান্ত ও বিধবস্ত হইয়া পলায়নপূর্বক জীবন রক্ষা করেন । এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বরের চল্লিশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, বিনষ্ট পাঠান সৈন্যের সংখ্যা মাত্র পঞ্চ সহস্র । ইনি প্রাচীন বয়স্ক ছিলেন বলিয়া সকলে ইঁহাকে “বুড়া” বা “বুড়িয়া” বলিত । উদয়পুরস্থ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের উত্তর দিকস্থ বুড়িয়ার দীঘী এই বুড়ার কীর্তি ।

উদয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর তৎপুত্র জয়মাণিক্যের সময়েও রণাগণ সেনাপতি ছিলেন । ইনি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন । পরিশেষে জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হইবার নিমিত্ত বৃদ্ধের চুরাশা জন্মিল । কিন্তু অন্যতর সেনাপতি (দেবমাণিক্যের পুত্র) অমরদেব দিন দিন পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া রণাগণ বুঝিলেন, এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিচ্যুতানে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে । এজন্য তিনি অমরদেবকে নিহত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । রাজকুমার অমর অশু ব্যক্তির ইচ্ছিতে ইহা জানিতে পাইয়া আত্মরক্ষা করেন । অতঃপর তিনি বৃদ্ধ রণাগণকে বধ করতঃ তাঁহার রাজ্যভার পিপাসা মিটাইয়াছিলেন ।

রসাক্ষমর্দন নারায়ণ ;—(২৪ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ইনি ধনুমাণিক্যের সেনাপতি । ইঁহার নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই । রসাক্ষের (আরাকান) কিয়দংশ জয় করিবার দরুণ ইঁহার “রসাক্ষমর্দন” উপাধি হইয়াছিল । জয়মাণিক্যের সময় পর্য্যন্ত ইনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । দুঃখের বিষয়, কোন স্থলেই ইঁহার নামোল্লেখ নাই, উপাধির উল্লেখ মাত্র আছে ।

রাজবল্লভ নারায়ণ ;—(৭৬ পৃঃ—৩০ পংক্তি) । ইনি অমরদেবের (পরে অমরমাণিক্য) জ্যেষ্ঠ পুত্র । জয়মাণিক্যের মল্লবিচার গুরু এবং সেনাপতি ছিলেন । অমরদেবের সহিত বিবাদ উপলক্ষে জয়মাণিক্য বিপদাপন্ন হইয়া পলায়ন করেন, তদবস্থায় রাজবল্লভ পথিমধ্যে তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিয়াছিলেন ।

রাম কবি ;—(৯ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহা নাম বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ ইনি রামায়ণ গান করিয়া “রাম কবি” হইয়াছিলেন । মহারাজ ধনুমাণিক্য রাজা হইবার অল্পকাল পরে ;—

“শ্রেত চতুর্দশী গান বর্ণিয়া শুনিলা ॥

রাম কবি স্বজিলেক সেই ত নৃপতি ।

ঐধনু মাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি ॥”

রাজমালা—ধনুমাণিক্য খণ্ড ।

এতদ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ ধনু রামায়ণের একটা দল স্বজন করিয়াছিলেন, এবং রাম কবি সেই দলের অধিকারী ছিলেন । এতদুপলক্ষে রাজদরবার হইতে

এই উপাধি লাভ করাও বিচিত্র নহে । যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইঁহার নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই ।

রামদাস ;—(৭৮ পৃঃ—৭ পংক্তি) । ইহা মহারাজ অমরমাণিক্যের বাল্যকালের নাম । রণচতুর নারায়ণ, অমরমাণিক্যের বাল্যকালের অবস্থা বর্ণন উপলক্ষে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

“রামদাস নাম তোমার আছিল তখন ।” *

রায় কছম ;—(২৪ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইনি ধনুমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন ; জাতিতে রিয়াং । সৈন্যাধ্যক্ষ রায় কাচাগের সহযোগে ইনি থানাংছি প্রভৃতি কুকি-প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন । ইঁহাদের শক্তি-সম্বন্ধে মহারাজ ধনু অনেকবার পাঠান বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন । কাহাঙ্গও কাহারও মতে রায় কাচাগ, রায় কছমের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন ।

রায় কাচাগ ;—(১৪ পৃঃ—১১ পংক্তি) । ইঁহাকে রায় চয়চাগও বলা হইত । ইনি রিয়াং জাতীয় । ধনুমাণিক্যের সেনাপতি এবং প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন । এককালে ইঁহার প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মেকেঞ্জি সাহেব ইঁহাকে ত্রিপুরেশ্বর জ্ঞানে “চয়চাগ মাণিক্য” লিখিয়াছেন । † ইঁহার বাহুবলে এবং রণকৌশলে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত এবং প্রতিপক্ষগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল । পাঠান শক্তি বারম্বার ইঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে । একমাত্র এই বীর্যশালী ও কৌশলী সেনানায়কের প্রভাবে মহারাজ ধনু সত্রাট পদবাচ্য হইয়াছিলেন ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ;—(৩৪ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইনি মিথিলাবাসী, জাতিতে ব্রাহ্মণ । এই তান্ত্রিক সাধক সন্ন্যাসীবশে ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । মহারাজ দেবমাণিক্য ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইঁহার উপদেশানুসারে তান্ত্রিকমতে শ্মশান সাধনাদি যোগ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন । দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজাকে দুর্বল করিয়া, স্বীয় প্রভুত্ব বন্ধমূল করিবার চুরাকাঙ্ক্ষায়, তাঁহাকে দেবীর দর্শন লাভের প্রলোভনে ডুলাইয়া, ক্রমাগত আটজন সেনাপতি শ্মশানে নিয়া বধ করাইলেন ; পরিশেষে রাজাকেও শ্মশান সাধনকালে বধ করিয়াছিলেন । দেবমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তাঁহার শিশু পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ এক বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । সেনাপতিগণ নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকেসহ ইন্দ্রমাণিক্যের হত্যা সাধন দ্বারা উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন ।

লক্ষ্মী মহাদেবী ;—(৪২ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইনি সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কন্যা এবং বিজয়মাণিক্যের প্রধানা মহিষী ছিলেন । বিজয়মাণিক্য

* রাজমালা—জয়মাণিক্য খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা ।

† North East Frontier of Bengal.—P. 270.

মাধব নামক ব্যক্তি দ্বারা দৈত্য নারায়ণকে বধ করায়, মহারাণী রাজার অগোচরে পিতৃহস্তা মাধবকে নিহত করিয়াছিলেন । এই কার্য মহারাজের বিরক্তিকর হওয়ায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত মহারাণী নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন । অমাত্যগণের অনুরোধে আবার তাঁহাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল ।

লোকতর কা ;—(৭২ পৃঃ—১৯ পংক্তি) । ইনি উদয়মণিক্যের পুত্র, পিতার পরলোকগমনের পর, জয়মণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন । ইহার অল্পকাল পরে সেনাপতি অমর, জয়মণিক্যের পিসা ও প্রধান সেনাপতি রণাগণকে হত্যা করেন ; এই সূত্রে রাজা ও সেনাপতির মধ্যে মনোমালিন্য সঞ্চিত হওয়ায়, অমরের পুত্র রাজবল্লভ জয়মণিক্যের নিধন সাধন দ্বারা সেই মনোমালিন্যের অবসান করিয়াছিলেন ।

সমরজিত নারায়ণ ;—(৭৫ পৃঃ—৬ পংক্তি) । ইনি রণাগণের ভ্রাতা এবং জয়মণিক্যের সেনাপতি । অমরদেবের সহিত রণাগণের সংগ্রামকালে অমর কৌশলক্রমে ইহার মস্তক ছেদন পূর্বক ছিন্নমস্তক রণাগণের গড়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । রণাগণ ভ্রাতার মস্তক দর্শনে ভীত হইয়া গড় পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন এবং কিয়দ্দিবস লুকায়িত অবস্থায় থাকিবার পর, অমরদেব কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন ।

সাহস নারায়ণ ;—(৭৬ পৃঃ—১৭ পংক্তি) । এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন । জয়মণিক্যের সেনাপতি অমরদেবের আদেশে প্রধান সেনাপতি রণাগণের মস্তক ছেদন করিয়া “সাহস নারায়ণ” উপাধি ও সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিলেন । ইহার নাম জানা যাইতে পারে নাই ।

সূর্য খাড়াইত ;—(৫৮ পৃঃ—২১ পংক্তি) । বিজয়মণিক্যের শাসনকালে ‘খাড়াইত’ বা ‘খাড়াতিয়া’ উপাধিধারী এক শ্রেণীর সৈন্য রাজার শরীর রক্ষক ছিল । সাতবার ধনুসাগর প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থবান ব্যক্তি ‘খাড়াইত’ উপাধির অধিকারী হইত । খড়্গ, চর্ম্ম এবং শূল ইহাদের ব্যবহার্য্য অস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল । খড়্গ (তরবারি) ব্যবহারের দরুণই ‘খাড়াইত’ উপাধি হইয়াছে ।

বিজয়মণিক্যের দিগ্বিজয় গমনকালে সূর্য খাড়াইত তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন । শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্বর্তী চৌয়াল্লিশ নামক স্থানে মহারাজের অবস্থানকালে সূর্য খাড়াইত প্রমুখ সৈন্যগণ রাজার অগোচরে নগর লুণ্ঠনে বহির্গত হয়, তৎকালে জনৈক নগরবাসী কর্তৃক সূর্য খাড়াইত হত হইয়াছিলেন ।

হাজারী ;—(৭৭ পৃঃ—২৩ পংক্তি) । ‘হাজারী’ নাম নহে—উপাধি । দেবমণিক্যের শাসনকালে এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগে হাজারী ছিলেন । পূর্বে একবার বলা হইয়াছে, যে সৈন্যধ্যক্ষের অধীনে এক হাজার সৈন্য থাকিত, তিনি “হাজারী” পদবাচ্য হইতেন । এই হাজারী মহারাজ অমরমণিক্যের মাতামহ এবং বাহাল জাতির ছিলেন । বাহালগণ জাতিগত হিসাবে কথঞ্চিৎ হীন হইলেও এই

সম্বন্ধ স্থাপনাবধি পার্বত্য সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল এবং সেই সম্মান অত্യാপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । এই হাজরা রসাজ্জমর্দন নারায়ণের সহকারীরূপে চট্টগ্রামের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ আছে ।

হৈতন খাঁ ;—(২৪ পৃঃ—২৭ পংক্তি) । ইনি গোড়েশ্বর হোসেনশাহের সেনাপতি । হোসেন, ধনুমাণিক্যের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত হৈতন খাঁ ও করা খাঁকে এক শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্বরোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন । এবারও ত্রিপুর সেনাপতির কৌশলে, হৈতনের প্রবলবাহিনীর অধিকাংশ গোমতী স্রোতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জন করে এবং হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন ।

হোপকলাউ ;—(৩১ পৃঃ—২২ পংক্তি) । ইনি ধনুমাণিক্যের জামাতা । রাজ আজায় কুকি-প্রদেশে স্বর্ণ খনির অনুসন্ধান গিয়াছিলেন । কুকিগণ মনে করিল, স্বর্ণের সন্ধান পাইলে, নিশ্চয়ই ত্রিপুরেশ্বর এখানে একটা থানা বসাইবেন এবং তদরূপ তাহাদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ ও স্বর্ণের খনিতে কার্য্য করিতে হইবে । এজন্য তাহারা হোপকলাউকে সাদরে গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত মতদ্বারা বিহ্বল করিয়া, তদবস্থায় নিহত করিয়াছিল ।

হোসেন শাহ ;—(২২ পৃঃ—২০ পংক্তি) । বঙ্গেশ্বর মজঃফর শাহ অত্যাচারী বলিয়া অমাত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইবার পর, হোসেন শাহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন । ইনি মজঃফরের মন্ত্রী ছিলেন । ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে ইঁহার জন্ম হয় । তিনি নিতান্ত দুর্বস্থায় পতিত হইয়া এ দেশে আগমন করেন, এবং রাজ সরকারে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । ইনি কামতাপুর রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন । ত্রিপুরেশ্বর ধনুমাণিক্যের সহিত ক্রমান্বয়ে দুইবার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুর রাজ্যের সামান্য অংশ হস্তগত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিককাল স্বীয় বশে রাখিতে সমর্থ হন নাই । হোসেন সদাশয় এবং বঙ্গসাহিত্যের পোষক ছিলেন । ইঁহার শাসন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল ।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত স্থান ইত্যাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

(বর্ণমালাত্বক্রমিক) ।

আত্রারাম ;—(৪৩ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । এই স্থান খাসিয়া পর্বতের অন্তর্গত । প্রাচীনকালে এখানে খাসিয়া রাজের সেনানিবাস (থানা) ছিল । ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয় কালে এই স্থান অধিকার এবং স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“আত্রারাম আদি যত খাসিয়া নৃপ থানা ।
ত্রিপুরে জিনিয়া করে আপন সীমানা ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৪৩ পৃষ্ঠা ।

আসাম ;—(২৪ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইহা বাঙ্গালা দেশের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত । এই স্থান অহম্ জাতির নামানুসারে আসাম নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ । পুরাকালে এই রাজ্যের বিস্তৃতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছিল । শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

“করতোয়াঃ সমাশ্রিত্য দিক্‌রবাসিনী ।
উত্তরস্থাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্নু পশ্চিমে ॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্কুনদী পূর্বাস্থাং গিরিকণ্ঠকে ।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্ত লক্ষ্যয়াঃ সঙ্গমাবধি ॥
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ।”

যোগিনী তন্ত্র ।

মর্শ্ম ;—করতোয়া অবধি দিক্‌রবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ । ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিম সীমায় করতোয়া নদী, পূর্ব সীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্কু নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যার সঙ্গমস্থান । এই সীমা সর্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহার অন্তর্গত স্থান কামরূপ নামে বিখ্যাত ।

এতদ্বারা সে কালে, বর্তমান আসাম, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর এবং কোচবিহার প্রভৃতি প্রদেশ আসাম বা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত থাকা সূচিত হইতেছে ।

শাস্ত্রানুসারে আসাম (কামরূপ) প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এখানে পীঠদেবী কামাখ্যা ব্যতীত আরও কতিপয় পীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে । কালিকাপুরাণ এবং যোগিনী তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে তীর্থক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে ।

আসাম বুরুঞ্জির মতে, মহীরঙ্গ নামক জনৈক দানব পুরাকালে আসামের অধিপতি ছিলেন । তৎশীঘ্র আরও চারি জন রাজা ক্রমান্বয়ে এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন । তৎপর নরকাসুর এই প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন । ইনি বিযুক্তকর্তৃক আসামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । * শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে নরকাসুর ঘটিত একটা আখ্যান প্রচলিত আছে । মহারাজ নরক রামায়ণের ঘটনার সমসাময়িক ব্যক্তি । † বর্তমান গোহাটী নগরে ইহার রাজধানী ছিল । নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত আসামের অধিপতি হন ; ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্গোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ভগদত্তের পর তৎশীঘ্র আরও পাঁচ জন রাজার নাম কামরূপ বুরুঞ্জিতে পাওয়া যায় ।

অতঃপর এখানে দেবেশ্বর নামক এক রাজা কয়েককাল রাজত্ব করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইনি ধীবর জাতির ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে । ইহার কয়েককাল পরে ব্রহ্মপুত্র বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশ কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হয় । চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়াংএর আসাম ভ্রমণকালে (৫৬০-৬১ শক) তিনি নারায়ণ-দেব বংশীয় বর্ষা উপাধিবিধিষ্ঠ ভাস্কর বর্ষাকে এখানে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছেন । উক্ত পরিব্রাজক এই রাজাকে ব্রাহ্মণ জাতির বলিয়াছেন, কিন্তু উপাধিবান ইহার ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । ‡ অতঃপর কলিন্দ বর্ষা নাম পাওয়া যায় । § অনেক অনুমান করেন, ইনি ভাস্কর বর্ষার বংশীয় ছিলেন । অতঃপর আসাম নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশ অধিকার করেন । প্রবাদানুসারে ইনি করভেয়া নদীর গার্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । এই বংশ ক্রমান্বয়ে ৪০০ বৎসর এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন । তৎপর ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আড়িমাও নামক রাজা এবং উত্তরকূলে ছুটিয়া জাতি আধিপত্য বিস্তার করে । আড়িমাও এর পুত্র জোঙ্গলবলহ রাজ্যলাভ করিলে পর, কাছাড় রাজের সহিত সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি হওয়ায়, নিজকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে এক দুর্গ নির্মাণ করেন । নগুগাঁয়ের শহরী পরগণায় বর্তমান কালেও সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে । কপিলি নদীর তীরবর্তী শেষ যুদ্ধে জোঙ্গলবলহ পরাজিত হইয়াছিলেন ।

* কালিকাপুরাণ—৩৬শ—৪০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

† সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত আসাম অঞ্চলে প্রেরিত বানরকে সূত্রী বলাইয়াছিলেন ;-

“যোজনানি চতুষষ্টি বরাহো নাম পর্বতঃ ।

সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুনহান গাবে বরুণালয়ে ॥

তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্ ।

তস্মিন বসতি ভৃষ্টাঙ্গা নরকো নাম দানবঃ ॥”

কিঙ্কিণ্যাকাণ্ড—৪২ সর্গ, ৩০-৩১ শ্লোক ।

‡ Beal's Buddhist Record—Vol. II, P. 96.

§ দশকুমার চরিত ।

আরও কোন কোন বংশ আসামে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবার পর ধর্মপালের আধিপত্য স্থাপিত হয় । ধর্মপাল বঙ্গের পালবংশীয় রাজা বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে । ইহা ১০৯৭ শকের কথা । এতদংশীয় পরবর্তী রাজগণের নাম আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইঁহারা পালবংশীয় রাজাই ছিলেন ।

পালবংশের পতনের পর, কামতাপুরের রাজবংশ এ স্থানে কিছুকাল রাজত্ব করেন । ইহার পর পর্যায়েক্রমে কোচ ও অহোম জাতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় । রাজা জয়ধ্বজ সিংহের সময় হইতে এই প্রদেশের প্রতি মুসলমানের হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল ।

সত্ৰাট-ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি গীরজুমলা আসাম জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আধিপত্য বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল ।

কিয়ৎকাল পরে আসামে অন্তর্নিপ্লব আবস্থ হয় । এই সময় ইংরেজগণ বণিকভাবে এই রাজ্যে প্রবেশিত হইয়াছিলেন ; দেশের সমৃদ্ধি ও শস্ত্র-সম্পদ দর্শনে ইঁহারা বিমুগ্ধ হইলেন এবং এই সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ হস্তগত করিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল । এই সময় আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরঙ্গের কোচরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন (১৭৯২ খৃঃ) । অতঃপর অন্তর্নিপ্লব, শাসন বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে ক্রমশঃ আসামের অবস্থা হীন হইতে চলিল । ব্রহ্মরাজ সুযোগ পাইয়া আসামের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আশ্রয় করিলেন । পরিশেষে (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) ব্রহ্ম ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ সজ্জিত হয় । এই যুদ্ধ উপলক্ষে ১৮২৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে আসামের সমগ্র নিম্ন প্রদেশ বৃটিশ রাজ্যের কুক্ষিগত হইল । তৎকালে রাজ্যের উত্তরাংশ পুরন্দর সিংহ নামক জনৈক সেনাপতির হস্তে ছিল । ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ইংরেজগণ তাহা আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন । তদবধি আসাম রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে ।

ইছামতী ;—(৫৫ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । ইহা একটা নদী ; ঢাকা জেলার বঙ্গের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই নদী সাহেবগঞ্জের সন্নিক্ত স্থানে ধলেশ্বরী হইতে নির্গত হইয়া, মদনগঞ্জের নিকটে পুনর্ববার ধলেশ্বরীতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে । নদীটা অতি প্রাচীন, ইহার পৌরাণিক নাম ইক্ষুনদী । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায় ;—

“ইক্ষু লোহিত ইত্যোতা হিমবৎ পাদনিষ্স্থতাঃ ।”

কথিত আছে, ইহার তীরবর্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইত, এজন্য ‘ইক্ষুনদী’ নাম হইয়াছে । এই নদী যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, রেনেল্ কৃত মানচিত্রের ১৬শ খণ্ডে তাহা পাওয়া যাইবে । এই নদীর তীরে বহু

সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যস্থান আছে। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযান কালে, এই নদীপথে গমন করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায় :—

“ইছামতী পথে পদ্মানদী গেল পরে ।”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—১৬ পৃঃ ।

বর্তমান কালে এই নদী পূর্বের ন্যায় খরসোতা নহে। এখন পথভ্রষ্টা এবং ক্ষীণতোয়া হইয়াছে।

ইটা ;—(৫৭ পৃঃ—১০ পংক্তি)। ইহা একটা খণ্ডরাজ্যে গণ্য হইয়াছিল। বর্তমান কালে এই ভূ-ভাগ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটা পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ স্বধর্ম্ম পা (রাজমালার মতে স্বধর্ম্মা বা স্বধর্ম্ম) কৈলাসহরের রাজপাটে রাজত্ব করিবার কালে, বাৎসরগোত্রীয় নিধিপতি নামক জনৈক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সভায় উপনীত হন। রাজা এই প্রভাবান্বিত বিপ্রেয় গুণে মুগ্ধ হইয়া, তদ্বারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * এই যজ্ঞান্তে নিধিপতি এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রহ্মোত্র স্বরূপ লাভ করেন। এই স্থান পূর্বে ‘মনুকুল’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে কালে, আধুনিক ঢৌয়ালিশ, বালিশিরা, সাতগাঁও, ছয়চিরি, ইন্দানগর, ভানুগাছ, ইন্দেশ্বর ও বরমচাল এই আটটা পরগণা লইয়া মনুকুল প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। নিধিপতি এই দানলব্ধ ভূমিতে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করেন, এবং তাঁহার অনুরোধে আরও কতিপয় ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, উক্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল, ব্রাহ্মণবর্গ বাসভবন নির্মাণের নিমিত্ত দূরবর্তী উচ্চস্থান হইতে ইটা (ডেলা) ছুড়িয়া স্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে স্থানের নাম ‘ইটা’ হইয়াছে। উত্তরোত্তর এই স্থানের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নিধিপতির অধস্তন অষ্টম স্থানীয় ভানুনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার স্থাপিত রাজধানীর ‘রাজনগর’ নামকরণ হইয়াছিল। অত্য়াপি তথায় প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এওলাতলি নামক নিধিপতির স্থাপিত বাসস্থানে অত্য়াপি তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভানু নারায়ণের পুত্র সুবিদ নারায়ণ ইটার পরবর্তী অধিকারী।

ইহা মুসলমান প্রভাবের কাল। সুবে বাঙ্গালার নিয়োজিত দেওয়ান, রায় উপাধিধারী বৈষ্ণবংশীয় আনন্দ নারায়ণ রায়ের সহিত রাজস্ববিষয়ক প্রশ্ন লইয়া সময় সময় ভানু নারায়ণের কলহ উপস্থিত হইত ; তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা বলিয়া বঙ্গের দেওয়ানকে অগ্রাহ করিতেছিলেন। বড়ুয়া পাহাড়স্থিত পাগড়ীয়াটিলায় এবং পর্বতপুরে সুবিদ নারায়ণ নির্মিত সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ অত্য়াপি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বেবাল্ল দেওয়ানের সহিত সামাজিক ঘটনা লইয়া রাজার আর এক নূতন কলহ

* এই যজ্ঞ বিবরণ এবং নিধিপতির পরিচয়, রাজমালা প্রথম লহরের ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহা ৬০৪ ত্রিপুরাঙ্কের (১১৯৪ খৃঃ) ঘটনা।

উপস্থিত হওয়ার, এই দেওয়ানের প্রয়োচনায় পাঠান সৈন্যকর্তৃক ইটা রাজ্য আক্রান্ত ও পাঁচ দিবস অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর তাহাদের হস্তগত হইল। রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, রাজমহিষী ও রাজকুমারী আত্ম-জীবন আত্মত্যাগে কুলমর্ঘাদা রক্ষা করিলেন। রাজভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ পলায়নপর হইলেন। রাজপুত্র চতুর্দশ বন্দীভাবে দিল্লীতে নীত ও তথায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, জ্যেষ্ঠানুক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও জিশা খাঁ নাম গ্রহণপূর্বক পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তদবধি হিন্দু শাসিত ইটা রাজ্য মুসলমান শাসনের কক্ষিগত হইল। ইটা সুগীর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা।

ইংরেজ শাসন কালে এই প্রদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণারূপে পরিণত হইয়াছে।

উৎকল ;—(৩৯ পৃঃ—১৯ পংক্তি)। প্রথম লহরের টিকায় (২৪১ পৃঃ) এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্চয়োজন।

উদয়পুর ;—(৩৮ পৃঃ—৯ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্বদিকে নরকেশ দূরবর্তী, গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' পীঠস্থান, এবং ত্রিপুরেশ বা নল নামক ভৈরব অবস্থিত। পীঠস্থান বলিয়া স্থানটী ভারত বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে সর্বদাই নানা দেশীয় তীর্থযাত্রী এবং সাধু সন্ন্যাসীর সন্মিলন হইয়া থাকে। প্রথম লহরের ১২২ পৃষ্ঠায় এই পীঠস্থানের বিবরণ পাওয়া যায়।

এই স্থানের প্রাচীন নাম রাজ্যমাটী ; উদয়গণিক্যের শাসন কালে উদয়পুর নাম হইয়াছিল। * ঐক্য সাম্রাজ্যের মঘ রাজাদ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইতেছিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ যুবাকর ফা (নামাস্তুর হিমতি) মঘ রাজাকে জয় করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে ইনি বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে একটী অক্ষর প্রচলন করেন, তাহা ত্রিপুরাক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম লহরের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই অক্ষর প্রচলনের বিবরণ প্রদান করা গিয়াছে। এখন ১৩৩৭ ত্রিপুরাক্ষ চলিতেছে, এই হিসাবে কিঞ্চিন্নান সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে এখানে ত্রিপুরার রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল।

মহারাজ যুবাকর ফা হইতে কল্যাণগণিক্য (২য়) পর্য্যন্ত ৫৫ জন নরপতি কিঞ্চিন্নান বার শত বৎসর কাল এই স্থানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। মহারাজ কুমণগণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাক্ষে তথাকার রাজপাট উঠাইয়া আগরতলায় নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব এড়াইবার অভিপ্রায়ে এই পরিবর্তন করা হইয়াছিল। তদবধি দেড় শত বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত এই স্থানের রাজপাট-

* রাজ্যমাটীর স্থল বিবরণ প্রথম লহরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

জনিত গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এই স্থান সর্বতোভাবে রাজধানীর উপযুক্ত ছিল ; বর্তমান রাজধানীকে তাহার ভুলনায় অনেক বিষয়েই অপকৃষ্ট বলিতে হইবে । স্থানটী সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্বারা সে কালের সামরিক জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । সমুদ্রত পর্বত মালার সুদৃঢ় বেষ্টিনে এই স্থান বহিঃশত্রুর দুর্ভাগ্যক্রমে হইয়াছে ।

রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্তর্বিপ্লব, আত্মবিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবে এখানে কত যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব । হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধগণের উত্তপ্ত শোণিতে এই স্থান বহুবার প্লাবিত হইয়াছে । কোন কোন পাষণ্ড ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় এই সুপবিত্র পীঠস্থান রাজরক্ত-কলুষিত হইবারও প্রমাণ পাওয়া যায় ।

এখানে বহুসংখ্যক সাগর, দাঁষি প্রভৃতি জলাশয়, রাজপ্রাসাদ, দেবালয়, সেনানিবাস প্রভৃতি মঠ ও মন্দির বর্তমান থাকিয়া ত্রিপুরার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে । এখন এই স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের একটা উপবিভাগ এবং উদয়পুরেই তাহার প্রশাসন কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । স্বর্গীয় মহারাজ বারেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, স্বীয় পিতার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে সহরটার ‘রাধাকিশোর-পুর’ নাম দিয়াছেন । *

উনকোটা ;—(৫৯ পৃঃ—৪ পংক্তি) । ইহা বর্তমান কৈলাসভর বিভাগের অন্তর্গত একটা তীর্থস্থান । এই লহরের ১০৭ পৃষ্ঠায় উক্ত তীর্থের বিবরণ পাওয়া যাইবে । প্রথম লহরের ৯৭ পৃষ্ঠায় যে ছান্দুমানগরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই তীর্থক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ।

কচুয়াছড়া ;—(৭৫ পৃঃ—৩ পংক্তি) । ইহার অপর নাম কলুয়াছড়া বা কালুয়াছড়া । এই স্থান উদয়পুরের পূর্বদিকে কলুয়াছড়ার তীরে অবস্থিত । কলুয়াছড়া গোমতী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । এই ছড়ার তীরবর্তী পার্বত্য পর্লীতে অমরমাণিক্যের জন্ম হইয়াছিল ।

কনোজ ;—(৩ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহার প্রাচীন নাম কান্যকুজ, কন্যকুজ, মহোদয়, কন্যাকুজ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল ;—

“কন্যকুজং মহোদয়ং কন্যাকুজং গাধিপুরং ।

কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ ॥” (হেম—৪।৩৯) ।

এই স্থান ফরুখাবাদ জেলায় কালীনদীর পশ্চিম তীরে, গঙ্গা ও কালীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত । রামায়ণে পাওয়া যায় ;—

“কুশ নাভস্ত ধর্ম্মাশ্রা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ।”

(বায়ীকি রামায়ণ—আদিকাঃ, ৩২।৬) ।

কুশের পুত্র কুশনাভ কর্তৃক এই নগরী স্থাপিত হইয়াছে । তৎপুত্র গাধি এই স্থানে রাজত্ব করিবার সময় হইতে স্থানের অপর নাম 'গাধিপুর' হইয়াছে । কন্যাকুজ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণের আদিকাণ্ড—৩২ ও ৩৩ সর্গে যে উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ;—

যুতাচি অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যা উৎপন্ন হয় । পূর্ণ যৌবনা সেই সকল আলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা একদা উত্তান ভ্রমণকালে, বায়ুর দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পাইবার ইচ্ছা জানাইলেন । কন্যাগণ বলিলেন—“আমরা স্বাধীন নহি, আমাদের পিতা আছেন, তিনি যাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন, তাঁহাকেই আমরা ভর্তা বলিয়া স্বীকার করিব । আপনার প্রস্তাবে সম্মতিদানের অধিকার আমাদের নাই ।” বায়ু, কন্যাগণের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন । কন্যাগণ এই ঘটনায় কুজা হওয়ায়, স্থানের নাম 'কন্যাকুজ' হইয়াছে । পরে তাহাদের কুজতা বিদূরিত হইয়াছিল ।

খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্-সিয়াং এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পূর্বেবক্ত বিবরণের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে । তাঁহার মতে বায়ুর পরিবর্তে, মহাবৃক্ষ ঋষি কন্যাদিগকে লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভিসম্পাতে তাহাদের কুজতা ঘটে ।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে কনোগিজ (Kanogiza) ও প্লিনি, কলিনিপাক (Calinipaka) নামে অভিহিত করিয়াছেন । কুশবংশের রাজত্বের পরে এই প্রদেশে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হয় । এই বংশের পর, প্রভাকর বর্দ্ধন হইতে হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) পর্য্যন্ত তিন জন রাজার নাম চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায় । ইহার পর কুলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করেন । ইহারা দেবশক্তি বংশীয় নৃপতিগণ হইতে এই প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন । তৎপর চন্দ্র রাজগণের প্রাধান্য হয় । এই বংশীয় জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদই কনোজের শেষ হিন্দুরাজা । আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এই স্থান হইতে পঞ্চ গোত্রীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ।

কলমিগড় ;—(৭৩ পৃঃ—৭ পংক্তি) । এই স্থানে ত্রিপুরার সেনানিবাস ছিল । উদয়পুর হইতে খণ্ডল অভিমুখীন রাস্তার উপর এই দুর্গ থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । বর্তমান সোণামুড়া সহরের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ অন্তরে 'দুধ পুষ্করিণী' নামক একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে । এই দীঘির পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মৃগায় প্রাচীর ও পরিখা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার প্রবাদ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু এই গড়ের নাম কি ছিল, তাহা

কেহ বলিতে পারে না । রাজমালার বর্ণনার সহিত মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, ইহাই কলমিগড়ের ভগ্নাবশেষ ।

কৈলা ;—(১৩ পৃঃ—৪ পংক্তি) । কৈলাসহর । এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার সীমান্ত প্রদেশে মনুদীর তীরে অবস্থিত । ইহার প্রাচীন নাম ছাম্বুলনগর । কৈলাসহর নাম কত কালের, এবং কি উপলক্ষে এই নামকরণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । বর্তমান কৈলাসহরের অনতিদূরে উনকোটা তীর্থ এবং মহাদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন । ত্রিপুরার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন—ইহা শিবাধিষ্ঠিত স্থান বলিয়াই ‘কৈলাস + হর = কৈলাসহর’ নাম হইয়াছে । স্থানীয় প্রবাদানুসারে ইহার প্রাচীন নাম ‘কলা-হাওর’ । শ্রীহট্ট অঞ্চলে জলাভূমি (বিল) কে হাওর বলে । এই জলময় স্থানে বিস্তর রামকলার বন ছিল, এই জন্য ‘কলা-হাওর’ নাম হইয়াছে । আবার কাহারও কাহারও মতে, এখানে কয়লার খনি ছিল বলিয়া স্থানের নাম ‘কয়লা-হাওর’ হইয়াছে । তাহাদের মতে কলা-হাওর বা কয়লা-হাওর নাম ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া, ‘কৈলাসহর’ হইয়াছে । ইহার কোনটা গ্রহণীয়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই । প্রচলিত একটা গ্রাম্য ছড়া দ্বারা জানা যাইতেছে, রাজধানী স্থাপনের পূর্বে কিস্বা রাজধানী উঠাইয়া লইবার পরে কোন এক সময়ে এই স্থানের রাস্তাঘাট নিতান্তই দুর্গম হইয়াছিল । ছড়াটা এই ;—

“হাতে লাঠি, বনে ধর ।

তবে যাবি কলাহর ॥”

এই স্থানে যাইতে এক হাতে লাঠি এবং অণু হাতে বন জঙ্গলের উপর ভর করিতে হইত । এখানে রাজধানী স্থাপনের পর হইতে বোধ হয় সাধারণের এই কষ্ট ক্রমে পরিমাণে দূর হইয়াছিল । অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা কুকি জাতির বসতি-স্থান ছিল, এখনও দূরে দূরে কুকিপল্লী আছে । এতদঞ্চলে বর্তমান কালে ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ চারি জন দারহুলা ও তিন জন লুসাই রাজা বাস করিতেছেন । এখানকার প্রচলিত ‘কাতাল ও কাকচাঁদ’ ঘটিত আখ্যায়িকা পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে । ত্রিপুর রাজ্যের সদর ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কৈলাসহর বিভাগে হিন্দু ও মুসলমান সম্ভ্রান্ত বংশীয় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, এখানে অর্থশালী লোকও অনেক আছে । বহুসংখ্যক কুকিরাজা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় তালুকদার, ধনশালী ব্যবসায়ী প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটা গণনীয় বিভাগে পরিণত হইয়াছে । পূর্বে এখানে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল, ত্রিপুরেশ্বরগণ বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনদ্বারা ইহাকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, উনকোটা মাহাত্ম্য অনুসারে এই স্থান সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত । এখানে প্রতি বৎসর অশোকার্ক্ষমীতে বিস্তর যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে ।

কৈলাসহর প্রধান বাণিজ্য স্থান । পর্বতজাত কার্পাস ও নানা জাতীয় কাষ্ঠ এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য । ইহার ব্যবসায় দ্বারা অনেকে ধনশালী হইয়াছে । প্রতি বৎসর হস্তীখেদাদ্বারাও বিস্তর অর্থাগম হইয়া থাকে ।

কৈলাগড় ;—(২৫ পৃঃ—৯ পংক্তি) । ইহা কসবার নামান্তর । কসবা পারসী শব্দ, ইহার অর্থ সহর বা জনপদ । মুসলমান শাসনকালে এই নাম হইয়াছে ।

এই স্থানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্রিপুরার রাজধানী ছিল । মহারাজ ধন্যমণিক্যের মহিষী মহারানী কমলাদেবী কর্তৃক খনিত কমলাসাগর এই স্থানে অবস্থিত । এই সাগরের পূর্বপাড়ে অল্পোন্নত টীলার উপর ; মহারাজ বিজয়মণিক্যের শাসনকালে শ্রীশ্রীকালিকাদেবী ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার পূর্বদিকে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে । এই স্থানে একাধিকবার মুসলমানের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ হইয়াছে । ধন্যমণিক্যের শাসনকালে হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খাঁ কর্তৃক এই দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, ইহা ১৪৩৭ শকের ঘটনা ।

কোচ ;—(২৪ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । কোচ জাতির অধিকৃত প্রদেশ । এই প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ রাজমালার প্রথম লহরে (২৪৯ পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না ।

খুচুং —(২০ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । এই স্থান খুচুং নামেও অভিহিত হইত । ইহা লুসাই পর্বতের সন্নিহিত উত্তরদিকে অবস্থিত । * এখানে খুচুং সম্প্রদায়ের কুকিগণ বাস করিত বলিয়া স্থানের নাম উক্তরূপ হইয়াছে । মহারাজ ইস্দ্ৰমণিক্যের শাসন সময়ে মুসলমানগণ কর্তৃক রাষ্ট্রবিপ্লব সজ্জাটিত হইবার ফলে ত্রিপুরায় বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । এই সময় লুসাই ও খুচুং সম্প্রদায়ের কুকিগণ রাজ্যের উত্তর পূর্ববাঞ্ছলে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করে । এই বিদ্রোহ দমন জন্ত যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে (পরে কৃষ্ণমণিক্য) বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল ।

এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণমালায় লিখিত আছে ;—

“হেন কালে উপদ্রব পূর্ষ কুলে + হৈল ।
বঙ্গপাড়া থাকি সবে সমাচার পাইল ॥

* “খুচুঙ্গ কিরাত বাস করয়ে যেখানে ।

লুচি দফা কুকি থাকে তাহার দক্ষিণে ॥”

কৃষ্ণমালা ।

+ বরবক্র নদী ও তাহার দক্ষিণ দিকস্থ চাথেঙ্গ নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে প্রাচীনকালে ‘পূর্ষকুল’ বলা হইত । কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায় ;—

“কঙ্গলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ ।

তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥

ই সব স্থানেতে বৈসে যত কুকিচয় ।

পূর্ষকলিয়া বলি তা সবার কয় ॥”

কৃষ্ণমালা ।

খুচু দফা এক কুকি লুচি দফা * আর ।
সে সব না থাকে অধিকারে ত্রিপুরার ॥
তারা আসি পূর্বকুলে দক্ষ্যবৃত্তি করি ।
মহুশ্য মারিয়া ধন লেয়া যায় হরি ॥”

রাজমালায় এতৎসম্বন্ধীয় যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“হেড়ম্ব ছাড়ি যুবরাজ গেল পূর্বকুল ।
খুছঙ্গ কুকির সঙ্গে যুদ্ধ যে বহুল ॥
* * * * *
চাথেঙ্গ নদী পূর্বকুল আসিল যখন ।
হেড়ম্ব খুছঙ্গ যুদ্ধে উত্থোগ করেন ॥
খুছঙ্গ মারিতে গেল কবরা গোবর্দ্ধন ।
খুছঙ্গ জিনিয়া জয় পাইল তখন ॥”

রাজমালা—কৃষ্ণমাণিকা খণ্ড ।

এই যুদ্ধে খুচুংদিগকে জয় করিয়া জনার্দন সেনাপতি “খুচুং দর্প নারায়ণ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । †

খুচুং সম্প্রদায়ের কোনও কুকি রাজার কন্যা হইতে বিষলতার উৎপত্তি হইবার একটা প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে । তাহা পূর্ববর্তী ২৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

খণ্ডল ;—(১৩ পৃঃ—১১ পংক্তি) । পূর্বের মণ্ডল শব্দের বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে (প্রথম লহর—২৩২ পৃষ্ঠা) । প্রাচীন মতে মণ্ডল শব্দের অর্থ— “দ্বাদশরাজকম্”—(মেদিনী) । “স চ দেশঃ সমস্তাদ্বিংশতিযোজনং চত্বারিংশদ্ যোজনং বা ।” (কেচিৎ) । মণ্ডল, দ্বাদশ রাজক নামে অভিহিত ছিল ; অর্থাৎ বার জন রাজার অধিকৃত স্থানকে মণ্ডল এবং তাহার অধিপতিকে মণ্ডলেশ্বর বলা হইত । মণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভূভাগ ‘খণ্ডল’ নামে অভিহিত ছিল ।

রাজমালায় বর্ণিত খণ্ডল, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান বিলনীয়া বিভাগের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত । ইহা কালপ্রভাবে ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিচ্যুত এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে । পূর্বের ‘বসিক’ উপাধিধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী দ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইত । ইহা একটা বিস্তীর্ণ পরগণা, পূর্বের ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালী জেলার অধীনে আছে ।

* লুসাইদিগকে লুচি দফা বলা হইয়াছে ।

† জনার্দন নামে এক ছিল সেনাপতি ।

খুচুং দর্প নারায়ণ হৈল তার খ্যাতি ॥

খামাচেব ;—(২০ পৃঃ—১৪ পংক্তি) । বড়বক্র নদীর দক্ষিণ ও চাথেং নদীর উত্তরস্থিত ভূভাগ প্রাচীন কালে ‘পূর্বকুল’ নামে অভিহিত হইত । লঙ্গাই উপত্যকাও এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল । ইহা কুকি প্রদেশ । খামাচেব সম্প্রদায়ের কুকিগণ এই প্রদেশের যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থান ‘খামাচেব’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । এই স্থান বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ।

খামারাখল ;—(২০ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । এই স্থান পূর্বকুলের অন্তর্নিবিষ্ট, ছাতাচুড়া পর্বতের পূর্বদিকে হিঙ্গলাছড়ার পূর্বপাড়ে অবস্থিত । বর্তমান কালেও এখানে রাজ্য সম্প্রদায়ের কুকি জাতি বাস করিতেছে ।

খাসিয়া ;—(৪৩ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইহা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । এই প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত । খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে এই প্রদেশের রাজা বিজয়মাণিক্যের অবিমূঢ়তার দরুণ ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য এই রাজ্য আক্রমণ করেন । হেড়ম্বেশ্বর নির্ভয়নারায়ণের মধ্যবর্তিতায় এই বিবাদের শান্তি হইয়াছিল ।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী পাইবার সময় হইতেই ইংরেজ কোম্পানীর শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় । ইহারা প্রথমতঃ চূণ ও কমলালেবুর ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং উত্তরোত্তর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করায় ১৮২৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে খাসিয়াগণ ইহাদিগকে আক্রমণ করে এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর খাসিয়া প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হস্তগত হয় । বর্তমান সময়ে পার্বত্য প্রদেশের কিয়দংশ খাসিয়া সরদারগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছে ।

গঙ্গানগর ;—(২৫ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী স্থানে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ।

গঙ্গামণ্ডল ;—(১৩ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহা ত্রিপুরা জেলার একটা সুবৃহৎ পরগণা । এই ভূ-ভাগ মুসলমান সাম্রাজ্য কালে ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিচ্যুত হইয়া, স্বতন্ত্র জমিদারী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে । প্রথমতঃ বরদাখাতের জমিদার আকাসাদেক ১৬,৩৮৯ টাকা রাজস্ব অবধারণে এই স্থানের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন । তৎপর শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর খরিদসূত্রে ইহার অধিকারী হইয়াছেন ।

গোমতী ;—(২২ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । ইহা একটা নদী । এই নদী, আঠারমুড়া পর্বতজাত ছাইমা নদী এবং লংতরাই পর্বতোৎপন্ন রাইমা নদীর সহযোগে উৎপন্ন হইয়া, ডুমুর নামক জলপ্রপাত হইতে নির্গত হইয়াছে । ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী অমরপুর ও উদয়পুর এবং সোণামুড়া ও কুমিল্লানগরী এই নদীর তীরে অবস্থিত ।

গোড় ;—(১৩ পৃঃ—৯ পংক্তি) । এই স্থানে দীর্ঘকাল বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । রাজমালা প্রথম লহরের ২৫২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন ।

ঘাটলা ;—(৭০ পৃঃ—৪ পংক্তি) । এই স্থান খণ্ডল ও দাঁড়রার সম্মিহিত । এই স্থানের উপর দিয়া চট্টগ্রামে যাইবার রাস্তা ছিল ।

চণ্ডিগড় ;—(২০ পৃঃ—২ পংক্তি) । সোণামুড়া সহরের পূর্বদিকস্থ তিন ক্রোশ দূরবর্তী একটি অল্পোন্নত পর্বতশৃঙ্গে এই গড় বা সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল । এই স্থান মেলাগড় বাজারের সম্মিহিত । শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বর্তমান চিফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, এম্., এ, বি, এল মহোদয় সোণামুড়া বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকাকালে, উক্ত পর্বতশৃঙ্গস্থ মৃত্তিকা গর্তে একটি প্রাচীন তোপ পাইয়াছিলেন, এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এই স্থানের ইচ্চক রাশি দেখিলে বুঝা যায় গড়টি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল । মহারাজ অনন্তমাণিক্যকে বধ করিয়া তাঁহার শশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক স্বীয় কন্যাকে (অনন্তমাণিক্যের বিধবা মহিষীকে) এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন ।*

চন্দ্রপুর ;—(৬৮ পৃঃ—৩ পংক্তি) । এই স্থান উদয়পুর সহর হইতে পূর্ব দক্ষিণ কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত । মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজপাট এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল । এখানে মহারাজ উদয় ‘চন্দ্রসাগর’ নামে এক দীর্ঘিকা খনন ও ‘চন্দ্র গোপীনাথ’ নামকরণে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“সিংহাসন তুলি নিল চন্দ্রপুর গ্রামে ॥

রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক ।

চন্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক ॥

* * * * *

বহুল করিয়া যত্ন এক মঠ দিল ।

চন্দ্র গোপীনাথ নাম শ্রীমূর্তি স্থাপিল ॥

উদয়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম ।

তাতে দীঘি দিল রাজা চন্দ্রসাগর নাম ॥”

উদয়মাণিক্য খণ্ড,—৬৮ পৃঃ ।

* “গোপীপ্রসাদ এই কথায় অস্বীকার হইয়া ।

নিজেই হইল রাজা অভিষিক্ত হইয়া ॥

কন্যা প্রতি গোপীপ্রসাদ আদেশ করিল ।

চণ্ডিগড় ভূমি কন্যায় জায়গীর দিল ॥”

ত্রিপুর বংশাবলী ।

এই চন্দ্রসাগরের বিস্তৃতি দীর্ঘে ৫০৫ গজ, প্রস্থে ২৬১ গজ । ৪১০ চারি দ্রোণ চারিকানি ভূমি জুড়িয়া এই সাগর খনিত হইয়াছিল । ইহার দক্ষিণ তীরে রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অত্യാপি বিদ্যমান রহিয়াছে ।

চাটিগ্রাম ;—(২২ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ইহার চটুল, চটুগ্রাম প্রভৃতি অনেক নাম আছে । এই সকল নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানা কথা বলিয়াছেন ; তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে বাক্য বাহুল্য ঘটবে । ব্রহ্ম-বাসিগণ হইতে এই স্থান ‘চিতাগাঁও’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । চিতা শব্দের অর্থ যুদ্ধ, গাঁও শব্দের অর্থ স্থান । চটুগ্রাম দীর্ঘকাল যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । মঘ, ত্রিপুরা, মুসলমান ও পর্তুগীজ জাতির উদ্ভুত শোণিতে এই স্থান বারম্বার প্লাবিত হইয়াছে, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে । সুতরাং এই স্থানের চিতাগাঁও নাম সুসঙ্গত হইয়াছে । অনেকে বলে, সমুদ্রযাত্রী পোতসমূহের দিক্ নির্ণয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই স্থানে ‘চাটি’ (আলো) জ্বালান হইত, সেই সূত্রে স্থানের নাম ‘চাটিগ্রাম’ হইয়াছে । ইহার কোনটী সত্য, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ “পোর্ট গ্রেন্ডো” নাম দিয়াছেন ।

এই প্রদেশ মঘ জাতির শাসনাধীন ছিল, পরে হিন্দুদের হস্তগত হয় । তৎকালে ত্রিপুরেশ্বরগণের শাসন দীর্ঘ সময় চলিয়াছিল । ইহার পর ত্রিপুর, মঘ, মুসলমান ও ওলন্দাজগণের মধ্যে চটুগ্রাম লইয়া বারম্বার শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে । এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে চটুগ্রাম কখনও ত্রিপুরার, কখনও মঘের, কখনও বা মুসলমানের হস্তগত হইতেছিল । এই বিপ্লবের দরুণ চটুলবাসীদিগকে সুদীর্ঘ-কাল যে অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছে, অন্য কোন দেশের পক্ষে তদ্রূপ ঘটিয়াছে কি না, জানা নাই । ত্রিপুরেশ্বর অমরমণিক্যের শাসনকালের পর হইতে বিজয়লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে মুসলমানের অধিকায়িনী হইয়াছিলেন ।

চৌয়াল্লিশ ;—(৫৮ পৃঃ—৪ পংক্তি) । ইহা বর্তমানকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত একটা পরগণা । বিজয়মণিক্যের শাসনকালে এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । মহারাজ বিজয় বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এই স্থানে শিকার ব্যপদেশে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ।

চৌহাটিয়া ;—(৭৪ পৃঃ—২৮ পংক্তি) । এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী, গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল । বর্তমানকালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে ।

ছকড়িয়া ঘাট ;—(২৮ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইহার অন্য নাম ছঘরিয়া গড় । এই স্থান সদর (আগরতলা) বিভাগের অন্তঃপাতী চড়িলাম মৌজার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । এখানে পূর্বে মুরছুম জাতীয় পার্বত্য প্রজার বাস ছিল । এবং প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান “ছঘরিয়া বাড়ী” নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । ইহার সন্নিহিত একটা উচ্চ টিলার উপর, চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং দীর্ঘাকারের তিনটা

গৃহ ভিত্তির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে । এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার কথা বর্তমানকালেও লোকে বলিয়া থাকে ।

ছনগাঙ্গ ;—(২৬ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহা একটা নদীর নাম । ইহা গোমতী নদীর পূর্বেবাস্তুর দিক হইতে আসিয়া সেই নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ।

ছত্রসিক ;—(২৪ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । এই স্থান আরাকানের অন্তর্গত এবং রামু বা রাশুনগরের সন্নিহিত । মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই স্থান পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ।

ছাইমার ;—(২০ পৃঃ—১৩ পংক্তি) । ইহা কুকি প্রদেশ এবং লুসাই পর্বতের অন্তর্নিবিষ্ট স্থান । এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রায়কাচাগ কর্তৃক ইহারা পরাজিত হইয়া ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ।

ছাইবেম ;—(২০ পৃঃ—১৩ পংক্তি) । ইহাও লুসাই পর্বতের অন্তর্গত কুকি প্রদেশ । ছাইমার প্রদেশের কুকিগণের শ্রায় এই স্থানের কুকি সম্প্রদায়ও ত্রিপুরার শাসন অমান্য করিতেছিল । মহারাজ ধন্যমাণিক্য ইহাদিগকে পুনর্ববার বশে আনয়ন করেন ।

ছাকাচেব ;—(২০ পৃঃ—১৪ পংক্তি) । ইহা হালামগণের আবাস ভূমি । ছাকাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণের আবাস স্থল বলিয়া স্থানের উক্তরূপ নাম হইয়াছে । বর্তমানকালে ছাকাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত কমলপুরের পাহাড়ে বাস করিতেছে ।

ছাকারাজল ;—(২০ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ছত্রচূড়ার (ছাতাচূড়া) পূর্ব দিকস্থ হিজলা ছড়ার পূর্ব পাড়ে প্রাচীনকাল হইতে রাজল সম্প্রদায় বাস করিয়া আসিতেছে । এই কারণে উক্ত প্রদেশের এক অংশের নাম ছাকারাজল ও অপর অংশের নাম খামারাজল হইয়াছে । এই স্থানে বর্তমানকালেও রাজলগণ বাস করিতেছে ।

ছাম্বুল ;—ছাম্বুলনগরের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন ।

জয়ন্ত্যা ;—(৪৪ পৃঃ—১১ পংক্তি) । এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে ।

জামিরখাঁ গড় ;—(২৫ পৃঃ—১০ পংক্তি) । এই স্থান ছঘরিয়া গড় হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত । বর্তমানকালে এই স্থান 'বাংমা' নামে পরিচিত । এখানে প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর ও পরিখা চিহ্ন অद्याপি বিদ্যমান আছে । এই ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর ৭ সাত হস্ত বেধ বিশিষ্ট । প্রাচীরের ইষ্টকে ১৪৪১ অঙ্কিত আছে, ইহা শকাব্দ । এই অক্ষুধারা জানা যাইতেছে, উক্ত দুর্গ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে নির্মিত হইয়াছিল । প্রাচীরের বাহিরে সুপ্রশস্ত

পরিখা বিচ্যমান, তাহার গভীরতা এখনও স্থানে স্থানে ২½ হাত, ৩ তিন হাত পাওয়া যায় । এই পরিখা হইতে উখিত মৃত্তিকাদ্বারা প্রাচীর আবৃত করিয়া তাহা অধিকতর দৃঢ় করা হইয়াছিল । বিশালগড় হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত নবনির্মিত রাজবর্জ এই গড় ভেদ করিয়া নেওয়া হইয়াছে ।

জাহ্নবী ;—(৫৫ পৃঃ—১০ পংক্তি) । গঙ্গা নদীর নামান্তর । ‘জাহ্নবী’ নামোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে ;—

“জাহ্নুদ্বারা পুরা দত্তা জহ্নুঃ সংপীয় কোপতঃ ।

তস্মকত্মান্বরূপা চ জাহ্নবী তেন কীর্তিতা ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড ।

এই পুণ্য সলিলা স্রোতস্বিনীতে তিথি বিশেষে স্নানের ফল নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে

“সামান্তদিবস স্নান সঙ্কল্পং শৃণু স্মন্দরি ।

পুণ্যং দশগুণকৈব মৌষলস্নানতঃ পরম্ ॥

ততস্ত্রিংশদগুণং পুণ্যং রবি সংক্রমণে দিনে ।

অমরাঞ্চাপি তত্তুল্যাং দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে ॥

ততো দশগুণং পুণ্যং নরানাঞ্চোত্তরায়ণে ।

চাতুর্দশাং পৌর্নমাস্তাং অনন্তং পুণ্যমেব চ ॥

অক্ষয়্যাঞ্চ তত্তুল্যাং নৈতদ্বেনিক্রুপিতম্ ।

অসংখ্যাপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকম্ ॥

সামান্তদিবসস্নানাং দানাং শতগুণং ভবেৎ ।

মহন্তরায়্যাং দেবেশি যুগাচ্ছায়াং তথৈব চ ॥

মাঘশ্রু সিতসপ্তম্যাং ভীষ্মাষ্টম্যাং তথৈব চ ।

ততোহপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়্যাং ভবত্বর্জভে ॥

দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাচ্ছাদিসমং ফলম্ ।

নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপূর্বে চতুর্গুণম্ ॥

ততচতুর্গুণং পুণ্যং দ্বিমহৎ পূর্বেকে সতি ।

পুণ্যং কোটিগুণকৈব সামান্তস্নানতোহিযৎ ॥

চক্রোপরাগ সময়ে সূর্যো দশগুণং ততঃ ।

পুণ্যোহপ্যর্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্ ॥

সর্বেষামেব সঙ্কল্পং বৈষ্ণবানাং বিপর্যয়ঃ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড ।

জিনারপুর ;—(৫৭ পৃঃ—৮ পংক্তি) । এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল, বর্তমানকালে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজার উপবিভাগের অন্তর্গত একটা পরগণায় পরিণত হইয়াছে । মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন

কালে এই স্থানে গমন করিয়া তথায় এক খাল খনন করাইয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“জিনারপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল ।

ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হৈল ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৭ পৃঃ ।

ডরানাম ;—(৬৯ পৃঃ—১৬ পংক্তি) । এই নাম বিশুদ্ধ নহে । রাজমালায় লিখিত আছে—“ডরানাম পথ হৈয়া গোড় সৈন্য যাইতে ।” কিন্তু প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়—“দাঁড়রার পথ দিয়া গোড় সৈন্য যাইতে ।” এই ‘দাঁড়রা’ শব্দই লিপিকার প্রমাদে ‘ডরানাম’ হইয়াছে ; এরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায় । দাঁড়রা বর্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ফেনী উপবিভাগের একটি ক্ষুদ্র পরগণা । এই স্থান ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ।

ডুমুরীতীর্থ ;—(৬১ পৃঃ—১৩ পংক্তি) । ইহার অপরা নাম ডম্বর । ইহা একটি মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত । প্রাচীন কালে এই স্থান তীর্থ মধ্যে পরিগণিত ছিল । এই লহরের ১১৫ পৃষ্ঠায় ডম্বরের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে ।

ডোমঘাট ;—(২৫ পৃঃ—২৪ পংক্তি) । এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । ইহার বর্তমান নাম তাপর ধুম বা তারপা ধুম । এই স্থানে প্রাচীন জলাশয় ইত্যাদি লোকালয়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে । এবং এখান হইতে খণ্ডল যাইবার একটি পুরাতন বাঁধান রাস্তা আছে । এই রাস্তা সমসের গাজির নির্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে ।

তমকান ;—(৫৯ পৃঃ—১০ পংক্তি) । ইহা খোয়াই নামক স্থানের প্রাচীন নাম । এই স্থানে মাহারাজ ডাঙ্গর ফাএর এক বাড়ী ছিল । ইহার অন্য নাম ‘বাল্লাঘাট’ । শ্রীহট্ট অঞ্চলে ‘বাধা’ শব্দকে ‘বাল্লা’ বলে । শত্রুপক্ষের আগমনে বাধা প্রদান জন্য এখানে একটি সৈন্যবাস ছিল, এই কারণে ‘বাল্লাঘাট’ নাম হইয়াছে । এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটি বিভাগে পরিণত, এবং বাল্লাঘাটে এই বিভাগের সদর কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ।

তরপ ;—(৫৭ পৃঃ—৬ পংক্তি) । এই শব্দ লিপিকার প্রমাদে বিকৃত হইয়াছে । রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“শ্রীহটে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর ॥

তার পরে জাঙ্গাল রাজা বাক্ষয়ে আজ্ঞাতে ।

ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে ॥”

অন্য গ্রন্থের পাঠ এইরূপ ;—

“শ্রীহটে ত গেলেন বিজয় মহাবীর ॥

তরপে জাঙ্গাল বাক্ষে রাজার আজ্ঞায়ে ।

ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি অত্মপি কহয়ে ॥”

এই স্থলে 'তরপে' স্থলে 'তার পরে' লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে ।

তরপ বর্তমানকালে শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণায় পরিণত হইয়া থাকিলেও প্রাচীন কালে ইহা একটা সামন্ত রাজ্য ছিল । তরপের শেষ হিন্দু রাজার নাম আচক নারায়ণ । ইনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা হইলেও অন্যান্য স্বাধীন ভূপতি অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব কম ছিল না । আচক নারায়ণ সম্বন্ধে তরপের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় ;—

“আচক নারায়ণ যে ত্রিপুরাধিপতির করদ কিম্বা সংস্ৰষ্ট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; তৎকালে যিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন ।”

তরপের ইতিহাস—৩২ পৃঃ ।

তরপ রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না । সরাইল, সতর খণ্ডল, জোয়ানশাহী প্রভৃতি পরগণা এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল । তথাকার রাজা আচক নারায়ণ ধর্মনিষ্ঠ, দয়ালু এবং প্রজাবৎসল ছিলেন । ইনি শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের সমসাময়িক (খৃঃ ১৪ শ শতাব্দী) ব্যক্তি । সম্ভবতঃ মহারাজ রত্নমাণিক্য এই সময় ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন ।

আচক নারায়ণের শাসনকালে পাঠানগণ শ্রীহট্টের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই । তাঁহার এলাকা মধ্যে কাজি মুরউদ্দীন নামক ব্যক্তি আপন পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গো-হত্যা করায় রাজ আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হয় । মুরউদ্দীনের ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইয়া দিল্লীর সম্রাট সদনে অভিযোগ উপস্থিত করায়, শ্রীহট্টে মুসলমান শাসন প্রবর্তনের অভিপ্রায়ে দিল্লী হইতে সৈয়দ নসিরউদ্দীনকে সসৈন্যে প্রেরণ করা হয় । তিনি প্রথমতঃ শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অকৃতকার্য হওয়ায় ব্রহ্মপুত্র তীরে শিবির স্থাপন করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । কিয়ৎকাল পরে শাহ জালাল নামক জনৈক সাধক ব্যক্তির সাহায্যে গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত করিয়া, তরপ আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । রাজা আচক নারায়ণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে সপরিবারে ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । ত্রিপুরাধিপতি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না । আচক নারায়ণ হতাশ হৃদয়ে মথুরা যাত্রা করিলেন, সেখানেই তাঁহার মানবলীলা শেষ হইয়াছিল । তদবধি তরপ দেশ মুসলমানের কুক্ষিগত হইয়াছে ।

তিষণা ;—(৩৯ পৃঃ—১১ পংক্তি) । ইহা ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী চাকলে রোশনাবাদের একটা সুবৃহৎ পরগণা ; চৌদ্দগ্রাম পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত । কুগিল্লা হইতে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ষ চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা এই

পরগণার পূর্ববাংশে পতিত হইয়াছে। বিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি তিষণা পরগণার বক্ষঃস্থিত কোম্প্তভমণি স্বরূপ। যে সময় চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অধিকারভুক্ত ছিল, তৎকালে এই পরগণার নানাস্থানে রাজন্যবর্গের বিশ্রাগাগার নির্মিত ও স্মৃহৎ জলাশয় খনিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরার খাল ;—(৫৭ পৃঃ—৯ পংক্তি)। এই খাল শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জিনারপুর নামক স্থানে মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“জিনারপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল ।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হইল ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৭ পৃষ্ঠা

ত্রিপুরার জাঙ্গাল ;—(৫৭ পৃঃ—৭ পংক্তি)। শ্রীহট্ট জেলাস্থিত তরপ পরগণায় মহারাজ বিজয়মাণিক্যের নির্মিত এক রাস্তা অত্যাধি বিদ্যমান আছে, তাহার নাম ত্রিপুরার জাঙ্গাল। এই রাস্তা বা জাঙ্গাল সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা মহাশয় বলিয়াছেন ;—

“রাজা আচক নারায়ণ (তরপের রাজা) সম্বন্ধে তরফ অঞ্চলে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদ তাঁহার রাজধানী হইতে অনেক দূরে থাকিলেও তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক সেই নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে স্থানে তিনি স্নান করিতেন, তাহা অত্যাধি স্নানঘাট নামে কথিত হয়। যে পথ দিয়া স্নানে যাইতেন, তাহা “ত্রিপুরার জাঙ্গাল” নামে অভিহিত হয়।”

ইহার পরেই বলিয়াছেন ;—

“রাজা আচক নারায়ণের বংশ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না ; তিনি ত্রৈপুর বংশীয় নৃপতি হইলেও হইতে পারেন। তন্নির্মিত পথ “ত্রিপুরার জাঙ্গাল” নামে অভিহিত হওয়ার ইহাই কারণ বলিয়া বোধ হয়।”

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাঃ, ২য় খঃ, ৫ম অধ্যায়।

কথিত ত্রিপুরার জাঙ্গাল রাজা আচক নারায়ণের নির্মিত নহে, এবং তদ্ব্যতীত রাস্তার পূর্বোক্ত নামকরণ হয় নাই। এই পথ ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের নির্মিত। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

“শ্রীহট্টে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর ॥
তরপে জাঙ্গাল রাজা বান্ধয়ে আজ্ঞাতে ।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৫৭ পৃঃ ।

রাজা আচক নারায়ণ কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। ত্রিপুর রাজ বংশীয় অনেক ব্যক্তি নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

স্থাপন করিয়াছিলেন, ইনিও সেই বংশীয় কি না, জানিবার উপায় নাই। ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন, এই মাত্র অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

ত্রিহৃত ;—(২৯ পৃঃ—১৬ পংক্তি)। ইহা সংস্কৃত তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ। ত্রিহৃতের অংশবিশেষ লইয়া মহারাজ নিমির পুত্র মিথি, মিথিলা রাজ্য স্থাপন করেন। ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায় ;—

“নিমেঃ পুত্রস্ত তত্রৈব মিথিনাম মহান্ স্মৃতঃ ।
প্রথমং ভূজবলৈর্ঘেন তৈরহুতস্ত পার্শ্বতঃ ॥
নির্মিতং স্বীয় নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমম্ ।
পুরীজনন সামর্থ্যাজ্জনকঃ স চ কীর্তিতঃ ॥”

মর্শ্ব ;—নিমির পুত্র মিথি, তীরহৃতের এক দেশে স্বনামে মিথিলাপুর নগরী নির্মাণ করেন। পুরীজননের সামর্থ্য হেতু তিনি জনক নামে কথিত হন।

তদবধি মিথিলার নৃপতিগণ সকলেই ‘জনক’ উপাধি গ্রহণ করিতেন। *

শাস্ত্রগ্রন্থদ্বারা তীরভুক্তি বা ত্রিহৃতের সীমা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;—

“গণ্ডকী তীরমারভ্য চম্পারণাস্তগং শিবে ।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতা তৈরভুক্তাভিধঃ স তু ॥”

অর্থাৎ—বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণের (চম্পারণ) শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই ত্রিহৃত বা মিথিলা রাজ্যে, নিমি হইতে অধস্তন ৫৬ পুরুষ মহারাজ কৃতি পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। জনক বংশের অবসানের পর নাগ দেব নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তীরহৃতের আধিপত্য লাভ করেন। নেপাল রাজ্যের সীমান্তবর্তী শিমরাওন্ গড় তাঁহার কীর্তি। অद्याপি এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। দুর্গগাত্রে সংযোজিত শিলালিপির পাঠ এইরূপ ;—

“নন্দেন্দু বিন্দু বিধুসম্বিত শাক বর্ষে ১০১৯
তৎ শ্রাবণে সিংহদলে মুনি সিদ্ধিতিথ্যাম্ ।
স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরি লগ্নে
শ্রীনাগদেব নৃপতি বিদধীতবাস্তম্ ॥”

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, নাগদেব ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃঃ) শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে সিংহ লগ্নে এই দুর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১০১১ শক হইতে ১২৪৫ শক পর্য্যন্ত এই বংশের ছয় জন রাজা ক্রমান্বয়ে ত্রিহৃত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর রাজা ভবসিংহের বংশ এই প্রদেশের অধিনায়ক

* ‘আইন-ই-তীরহৃত’ গ্রন্থের মতে ‘জনক’ শব্দের অপভ্রংশে জঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

হন। ভবসিংহ কামেশ্বর বাঁ এর পুত্র। ইঁহার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাজা শিবসিংহের আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর স্বীয় প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিলেন, শিবসিংহের ছয় পত্নীর মধ্যে পঞ্চম মহিষীর নাম ছিল লখিমা বা লছিমা দেবী। বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় ;—

“রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ—

লছিমা দেবী পরমাণ।” ইত্যাদি।

শিবসিংহের খুল্লতাত ভ্রাতা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে, তিনি বঙ্গের সুবাদার সুলতান গিয়াস্ উদ্দীনের হস্তে পরাজিত ও মুসলমানগণের করপ্রদ হইয়াছিলেন। ইহার পরেও এই বংশের কতিপয় ব্যক্তি ত্রিছতে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সর্বতোভাবে পাঠান-শাসনের অনুবর্তী ছিলেন। অতঃপর নানা হাত ঘুরিয়া এই প্রদেশ দ্বারবঙ্গের বর্তমান রাজবংশের হস্তে পতিত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের সময় হইতেই তদঞ্চলে মুসলমান-শাসন সুদৃঢ় হইয়াছিল।

ত্রিছত বা মিথিলা প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যাচর্চার নিমিত্ত ভারত বিখ্যাত ছিল। বর্তমান কালেও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী আদর্শ স্থানীয়। সঙ্গীত-কলার চর্চাও এ দেশে যথেষ্ট ছিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমণিক্য ত্রিছত হইতে নৃত্য-গীত নিপুণ ব্যক্তিদিগকে আনিয়া স্বরাজ্যে এই বিদ্যার প্রচলন করিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“ত্রিছত দেশ হইতে নৃত্য-গীত আনি।

রাজ্যেতে শিখায় গীত-নৃত্য নৃপমণি ॥”

ধন্যমণিক্য খণ্ড,—২৯ পৃঃ।

মহারাজের এই সদনুষ্ঠানজনিত ফল আজ পর্য্যন্তও ত্রিপুরাবাসিগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাজ্যের ঘরে ঘরে সঙ্গীত রসজ্ঞ লোক পাওয়া যাইবে। দুঃখের কথা, সাধারণের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

তৈকতান ;—(২৬ পৃঃ—৪ পংক্তি)। এই স্থান গোমতী নদীর তীরবর্তী ; দেবদ্বারের অল্প উজানে এবং ছনগাঙ্গের দুই বাঁক ভাটীতে অবস্থিত। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ কালে, এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

থানাংচি ;—(১৭ পৃঃ—১০ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৬ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

ধুণাইলামপাড়া ;—(৭৫ পৃঃ—৪ পংক্তি)। তৈকতানের অল্প উত্তরদিকে ছাইমা জাতীয় পার্বত্য প্রজাগণ বাস করিত। জনবসতির চিহ্নস্বরূপ একটি পুরাতন পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পার্বত্য পল্লীকে ‘ধুণাইলামপাড়া’ নামে অভিহিত করা হইত বলিয়া জানা যায়।

দক্ষিণ বাজু ;—(৪৩ পৃঃ—২০ পংক্তি) । রাজধানী রাজ্যমাটির উত্তর-দিকস্থ প্রদেশসমূহ (আসাম প্রভৃতি) দক্ষিণ বাজু এবং দক্ষিণদিকস্থ চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশ বাম বাজু নামে অভিহিত হইত ।

দেবদ্বারি ;—(২৬ পৃঃ—৪ পংক্তি) । যে স্থানে ছনগাঙ্গ গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে, তাহার ভাটিতে এই স্থান অবস্থিত । এখানে পর্বতের প্রস্তরময় গাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে । মাছিছা বা মারছা (দেবতামুড়া) নামক স্থানের অনুকরণে এই সকল মূর্তি খোদিত হইয়া থাকিবে । ইহার অনেক মূর্তি পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ এর সঙ্গীয় শিল্পীগণের খোদিত বলিয়া রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, যথা ;—

“গঙ্গানগর হৈতে রাজা ডোমঘাটি পথে ।

রহিল হৈতন খাঁ গড় করি তাথে ॥

* * * * *

ছনগাঙ্গ তৈকতান দেবদ্বার নাম ।

তার কত বাক উজান মাছিছড়া ধাম ॥

হৈতন খাঁ সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর ।

নির্মাইছে গড় পরে দেব বহুতর ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড,—২৫-২৬ পৃঃ ।

দৌচাপাথর ;—(২৯ পৃঃ—৮ পংক্তি) । সাধারণতঃ এই স্থানকে দোয়াপাথর বলে । এই স্থান বর্তমান কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের (Chittagong Hill tract) দীঘি নালা ধানার এলাকায় অবস্থিত । এই স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে । একালে এখানে ত্রিপুরেশ্বরগণের বিরাম ভবন ছিল । দেবস্থান বলিয়া সকলেই এই স্থানকে পবিত্র মনে করিত, এবং প্রতি বৎসর অসংখ্য বলিদ্বারা দেবতার অর্চনা করা হইত । এখানে নরবলিও অনেক হইয়াছে । মহারাজ ধনুমানিক্য সমস্ত দেবালয়েই নরবলির সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন । তখন নিয়ম করা হয়, শত্রু পাইলে তাহাদের দুইজনকে এই স্থানে বলি দেওয়া হইবে । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজা মরবলি দিত ।

সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥

শ্রীধনুমানিক্য মানা তাহাকে করিল ।

তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥

তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশদেবে ।

কালিকাতে এক নর পাইবেক হবে ॥

দৌচাপাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয় ।

গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময় ॥

ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা ।

তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড—২৯ পৃষ্ঠা ।

ত্রিপুরা ভাষায় দোয়াপাথর ও শ্বেত হস্তী সম্বন্ধীয় একটি আখ্যান প্রচলিত আছে । এই লহরের ২২৯ পৃষ্ঠায় তাহা পাওয়া যাইবে ।

ধ্বজঘাট ;—(৫৫ পৃঃ—৮ পংক্তি) । ইহা ঢাকা জেলাস্থিত সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের একটি তীর্থঘাট । পরশুরাম এই ঘাটে স্নান করিয়া ধ্বজ রোপণ ও তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম ধ্বজঘাট হইয়াছে । ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়া এই স্থানে সহস্র সুবর্ণধ্বজা স্থাপন ও তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করায় বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন । তৎকালে তিনি “ধ্বজঘাট বিজয়ী” বলিয়া স্বীয় নামে সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন ।

ধ্বজনগর ;—(৬০ পৃঃ—২০ পংক্তি) । মহারাজ বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী ধ্বজঘাট হইতে বণিক্য ও কাঁসারি প্রভৃতি নানাজাতীয় শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ী লোক স্বীয় রাজ্যে আনিয়া বিশালগড়ের সন্নিকটে সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ধ্বজঘাট হইতে আনীত ব্যক্তিগণের বসতিস্থান বলিয়া সেই গ্রামের নাম ধ্বজনগর রাখা হইয়াছিল ।

ধর্ম্মনগর ;—(৫৯ পৃঃ—৬ পংক্তি) । এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে ।

ধর্ম্মপুর ;—(৬২ পৃঃ—২৭ পংক্তি) । এই স্থান কোথায় ছিল, বর্তমান সময়ে নির্ণয় করিবার সুবিধা নাই ; সম্ভবতঃ স্থানের নাম পরিবর্তন হইয়াছে । ইহা যে উদয়পুর রাজধানীর সন্নিক্ত ছিল, তাহা বুঝা যায় ।

পঞ্চথণ্ডু ;—(৫৭ পৃঃ—১০ পংক্তি) । শ্রীহট্ট জেলার একটি পরগণা । ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ আদি ধর্ম্মপাএর যজ্ঞোপলক্ষে মিথিলা হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন । ইহারা যজ্ঞ সমাপনের পর, রাজার অনুরোধে তদ্দেশে বাস করিতে সম্মত হইলেন । ত্রিপুরেশ্বর এই পঞ্চ তপস্বীকে পাঁচ থণ্ডু বিভক্ত করিয়া যে ভূ-ভাগ প্রদান করেন, তাহাই পঞ্চথণ্ডু নামে অভিহিত হইয়াছে । তৎকালে এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, কালপ্রভাবে মুসলমানগণের হাত ঘুরিয়া পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে । পঞ্চথণ্ডু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রথম ভাগ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ এবং রাজমালা প্রথম লহর আলোচনা করিলে জানা যাইবে ।

পঞ্চদ্রোণা ;—(৫৫ পৃঃ—৭ পংক্তি) । সাধারণতঃ এই স্থান ‘পাঁচদোণা’ নামে অভিহিত । ইহা ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণাস্থিত একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ জনপদ । ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্য সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র স্নানাস্তে কোনও ব্রাহ্মণকে পাঁচদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে স্থানের নাম পঞ্চদ্রোণা বা পাঁচদোণা হইয়াছে । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন ।

পঞ্চদ্রোণ ভূমি ক্রয় করিল তখন ॥

সেই পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল ।
সেই হনে পঞ্চদ্রোণা গ্রাম নাম হৈল ॥
ধ্বজঘাট সমীপেতে পঞ্চদ্রোণ গ্রাম ।
বিজয়মণিক্য রাজা পুণ্যতর ধাম ॥”

বিজয়মণিক্য ঋগু—২৫ পৃঃ ।

এতৎসম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

“মহারাজ বিজয়মণিক্য ব্রহ্মপুত্রের স্থান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই স্থান অত্য়াপি “পাঁচদোণা” নামে পরিচিত হইয়াছে ।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৪ অঃ, ৫৮ পৃঃ ।

এই ‘পাঁচদোণা’ নাম অত্য়াপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । অতি অল্প পরিমাণ ভূমিদানের নিমিত্ত মহারাজ বিজয় যেরূপ স্মরণীয় হইয়াছেন, বিরাট যজ্ঞ বা দান করিয়াও অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটয়া উঠে নাই ।

পদ্মা ;—(৫২ পৃঃ—১০ পংক্তি) । ইহা নদীর নাম । এই নদী পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে প্রবাহিতা হইয়া ঢাকা জেলার পশ্চিম পার্শ্বে যমুনার সহিত সঙ্গত হইয়াছে । এই সঙ্গম স্থান গোয়ালন্দ্রের সন্নিহিত এবং “বাইশ কোদালিয়ার মোহনা” নামে অভিহিত । এখান হইতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়া মেঘনার সহিত মিলিতা হইয়া, বঙ্গোপসাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এই নদীর নাম পাওয়া যায় । ইহার বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অংশ “কীর্তিনাশা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্তিসমূহ ধ্বংসের দ্বারা এই নাম লাভ করিয়াছে । সলরজঙ্গ্ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়ার প্রসিদ্ধ কীর্তিকলাপ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাচীন কীর্তি কীর্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে ।

পাটিকারা ;—(১৩ পৃঃ—২ পংক্তি) । বর্তমানকালে ইহা কুমিল্লা সহরের পশ্চিমদিকস্থ ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটা পরগণা বিশেষ । এই প্রদেশ অনেক বংশের হাত ঘুরিয়া নানাবিধ অবস্থা পরিবর্তনের পর, ভূ-কৈলাসের রাজবংশের হস্তগত হইয়াছে ।

প্রাচীনকালে পাটিকারা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ; মেহেরকুলও এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায় । ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসনদ্বারা উক্ত প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য স্থাপনের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে । লোকনাথের প্রভুত্ব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং পাটিকারা প্রভৃতি জনপদ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই । কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি শূরবংশীয় রাজাগণের সামন্ত নরপতি ছিলেন, এই কথাও নির্ভরযোগ্য প্রমাণও নাই । উল্লিখিত তাম্রলিপির সময় নির্ণয় সম্বন্ধেও মত বৈষম্য

দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম্, এ, মহাশয় এই লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উৎকীর্ণ। * ডাক্তার বুলার এই লিপি দশম শতাব্দীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যে সময়েরই সম্পাদিত হউক, লোকনাথ যে বর্তমান ত্রিপুরার কিয়দংশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, আলোচ্য তাম্রফলকদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর এতদঞ্চলে খড়্গ রাজগণের আধিপত্য স্থাপনের নিদর্শন পাওয়া যায়। রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে প্রাপ্ত দেব খড়্গের তাম্রলিপি হইতে এই বংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্, এ মহাশয় নির্দেশ করেন, ইঁহারা সমতটের শাসনকর্তা ছিলেন, এবং কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত বড় কামতা বা করমস্তু নগরে ইঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। † তাঁহার মতে সমতট রাজ্যের অবস্থান মেঘনা নদের পূর্ব তীরে। এ বিষয়ে মত বিরোধ থাকিলেও অন্য এক অকাট্য প্রমাণদ্বারা নলিনীবাবুর মত সুদৃঢ় বলিয়া মনে হইতেছে। খড়্গ বংশোদ্ভব সমতটের অধীশ্বর খড়্গোত্তমের মহিষী রাণী প্রভাবতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণমণ্ডিত চতুর্ভুজা মূর্তিই ইঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ‡ এই মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির মর্ম্ম চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল। § উক্ত মূর্তি অপহৃত হওয়ায়, তাহা দেখিবার কিম্বা পাদ-লিপি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। পাদ-লিপিতে খড়্গোত্তম, জাত খড়্গ, দেব খড়্গ, খড়্গরাজ এবং রাণী প্রভাবতীর নাম পাওয়া যাইতেছে। আসরফপুরের তাম্রশাসনে যথাক্রমে খড়্গোত্তম, জাত খড়্গ, দেব খড়্গ ও রাজ রাজভট্টের নামের সহিত মহাদেবী প্রভাবতীর উল্লেখ আছে। স্মরণ্য উভয় লিপিতে অঙ্কিতনামা ব্যক্তিবর্গ যে অভিন্ন, তাহা নিতাস্ত্র সহজবোধ্য।

* সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সন।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal—March, 1914 এবং প্রতিভা—চৈত্র, ১৩২০ সন।

‡ এই মূর্তি ত্রিপুরা জেলার বগাসারি পরগণার অন্তর্গত দৌলবাড়ী (দেউল বাড়ী) নিবাসী বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে ছিল। চাঁদপুর গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ইহা চণ্ডীমুড়াস্থিত প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অল্পকাল পরে তাহা অপহৃত হইয়াছে। শুনা যায়, ইঁহার প্রতিকৃতি ঢাকার চিত্রশালায় আছে।

§ পাদলিপি ;—“স্বস্তি খড়্গোত্তমো নামক এক নরপতি ছিলেন, জাত খড়্গ নামক তাহার পুত্র ধরাধামে ছিলেন, তাহার পুত্র দাতা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতাপশালী শ্রীদেব খড়্গ ছিলেন। তৎপুত্র ভূপতি শ্রেষ্ঠ শক্রবিজয়ী খড়্গ রাজ। তাহার অভিষেক মহিষী প্রভাবতী, তিনি শ্রীতি এবং অস্তির সহিত সর্বাঙ্গী দেবীকে সুবর্ণ ভূষিতা করিয়াছিলেন।”

পালবংশীয় রাজাগণের এতদঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ বর্তমান কালেও ছুপ্রাপ্য নহে । রাজা মহীপাল সর্বজনবিদিত নরপতি ছিলেন । * তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঘাউড়ায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ । † এই বিগ্রহের পাদপীঠে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“ঔ সন্থত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭ (৭) শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে
কীর্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকিন্ন
কীয় পরম বৈষ্ণবশ্চ বণিকলোক দত্তশ্চ বসুদত্ত শ্চ ত
শ্চ মাতা পিত্রোরান্নশ্চ পুণ্য যশো অভিবৃদ্ধয়ে ॥” ‡

এতদ্বারা রাজা মহীপাল সমতটে রাজত্ব করা প্রমাণিত হইতেছে । এবং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হওয়ায়, তদঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ।

ইহার পর চন্দ্র-রাজাগণের আবির্ভাব কাল । ইঁহারা পালবংশের সামন্ত রাজা ছিলেন, § পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু কোন সময়ে কি সূত্রে ইঁহারা পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই । মহীপাল দেবের সাম্রাজ্য কালে চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত রাজা শ্রীচন্দ্র দেব, পূর্ববঙ্গে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ অনুমান করেন । ইঁহার রাজধানী বিক্রমপুরে সংস্থাপিত ছিল ।

ইদিলপুর ও রামপালের তাম্রশাসনদ্বয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গাধীপ শ্রীচন্দ্র দেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । এই সকল তাম্রপট্টের আলোচনা অল্প কথায়

* পালবংশের এবং রাজা মহীপালের বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইবে ;—

গৌর লেখমালা—৯৫ অঃ, ১০০ পৃঃ । Mass Pal Kings of Bengal—By R. D. Banerjee. প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩২১ ।

† শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, মহাশয় এই মূর্তির প্রথম সন্ধানকারী । তিনি, শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সাহায্যে এই মূর্তির পাদপীঠ লিপি উদ্ধার করেন । শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও এই মূর্তি দর্শন এবং বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । বর্তমানকালে মূর্তিটি ত্রিপুরার বড়ঠাকুর শ্রীশ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন বাহাদুরের অধিকারে আছে ।

‡ Dacca Review—May, 1914.

§ “শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাল রাজাগণের রাজমুদ্রা । সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্ররাজগণ পাল রাজাগণের সামন্ত রাজা ছিলেন ।”

ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮ম অঃ, ২৩২ পৃঃ ।

হইবার নহে । তৎসাহায্যে যে বংশ তালিকা পাওয়া গিয়াছে, প্রয়োজনীয় বোধে এ স্থলে কেবল তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে ।

(রামপাল লিপি অনুসারে) ।

পূর্ণচন্দ্র ।
সুবর্ণচন্দ্র ।
ত্রৈলোক্যচন্দ্র ।
শ্রীচন্দ্র দেব ।

(ইদিলপুর-লিপি অনুসারে) ।

*
সুবর্ণচন্দ্র ।
ত্রৈলোক্যচন্দ্র ।
শ্রীচন্দ্র দেব ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় রামপাল লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে বলিয়াছেন,—“বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল । ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা হইতে পারে । বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত ।”

এই সকল তাম্রশাসনের যথাযথ বিবরণ এবং কোন সময়ে কি সূত্রে শ্রীচন্দ্র দেব পূর্ববঙ্গে আধিপত্য স্থাপন এবং বিক্রমপুরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব । মিঃ, জে, টি, রেঙ্কিন্ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণ, * মিঃ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের লিখিত বিবরণ, † এবং ‘সাহিত্য’ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ‡ আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক অনেক কথা জানা যাইবে । ঢাকার ইতিহাসেও বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে । § এই চন্দ্র-রাজবংশের আধিপত্য কেবল বিক্রমপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল । তন্মধ্যে গোড়ের (রঙ্গপুর অঞ্চলের) নাম উল্লেখ যোগ্য । অন্যান্য স্থানের কথা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে ।

বঙ্গের চন্দ্র-রাজগণের সঙ্গে মেহের কুলের চন্দ্র-রাজগণের যে বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ ছিল, এ স্থলে তাহা প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য । দুর্লভ মল্লিকের রচিত ‘গোবিন্দ চন্দ্রের গান’ হইতে এবিষয়ের সূত্র পাওয়া যাইতেছে । উক্ত গাথায় লিখিত আছে ;—

“সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধারিচন্দ্র পিতা ।
তার পুত্র মণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥”

তাম্রফলকের সাহায্যে পূর্বের যে বংশতালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তদ্বারা জানা যায়, শ্রীচন্দ্র দেবের পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র । পূর্বোক্ত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ

* Dacca Review—Oct, 1922.

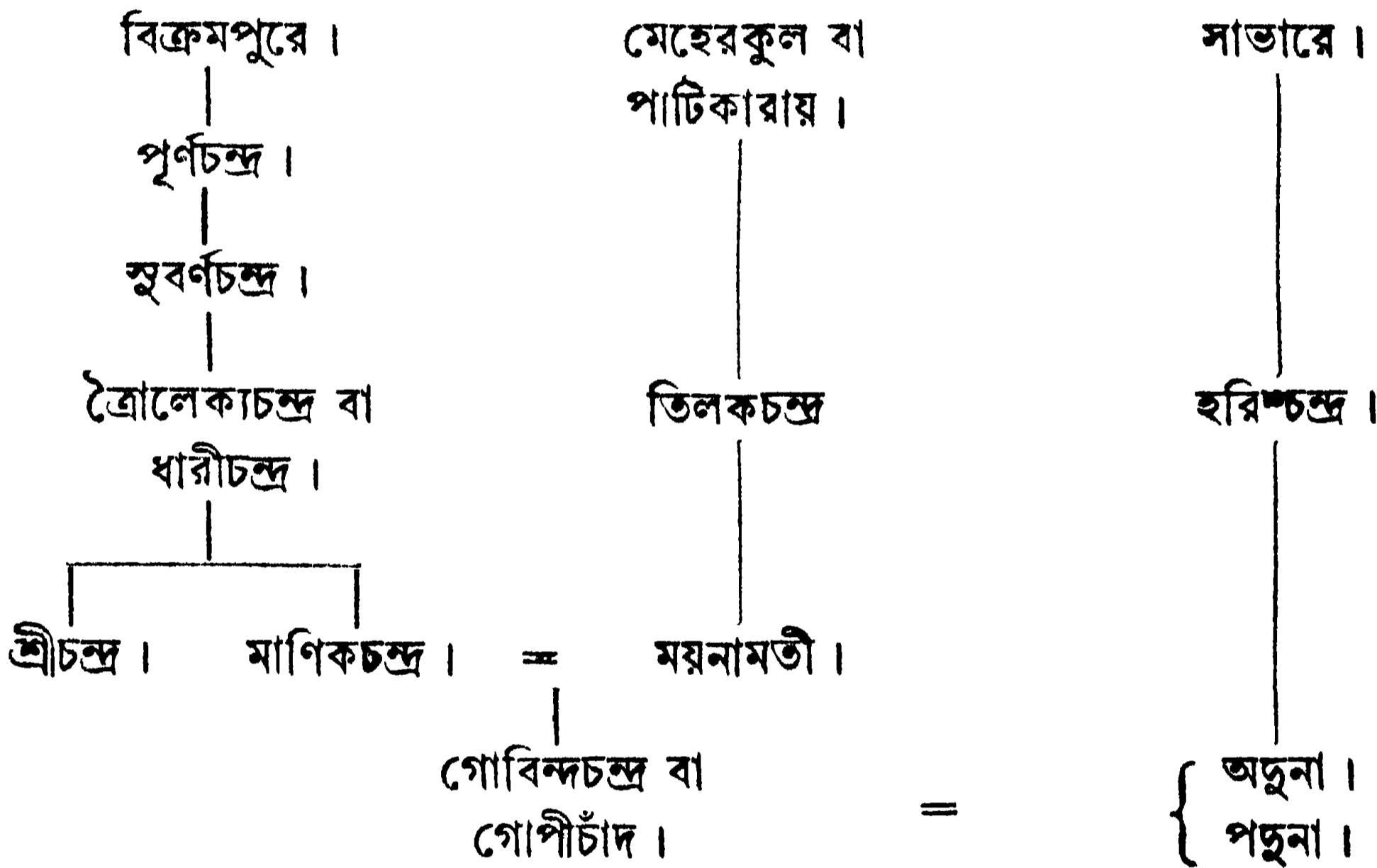
† Journal of Asiatic Society of Bengal—1878, Part I, Page 181,

‡ সাহিত্য (মাসিক পত্র)—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২০ ।

§ ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮ম অধ্যায় ।

সুবর্ণচন্দ্র ও দুর্লভ মল্লিকের গাথার লিখিত সুবর্ণচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন ; পশ্চাত্ত্ব বিবরণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইবে ।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত কবি ভবানী দাসের ‘ময়নামতীর গান’ * এবং পূর্ব কথিত দুর্লভ মল্লিক কৃত ‘গোবিন্দচন্দ্রের গান’ একই বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে । ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়, পূর্বেবক্ত সুবর্ণচন্দ্রের বংশধর মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র পাটিকারা এবং মেহেরকুলে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় দুহিতা অতুনা ও পত্নাকে গোবিন্দচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । উক্ত পুস্তিকা দ্বারা, বিক্রমপুর, মেহেরকুল (পাটিকারা সহ) এবং সাভারের সহিত চন্দ্র রাজগণের অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকা জানা যাইতেছে । নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল ;—



পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নামতী ব্যতীত অন্য সন্তান থাকিবার প্রমাণ নাই । এই কন্যাকে বঙ্গেশ্বর সুবর্ণচন্দ্রের পৌত্র (শ্রীচন্দ্র দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মাণিকচন্দ্র বিবাহ করেন । এই সূত্রে তিনি পৈতৃক রাজ্য বিক্রমপুর এবং স্বশুরের রাজ্য মেহেরকুল বা পাটিকারায় আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । এবং সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র স্বশুরের অধিকৃত সাভারসহ পূর্বেবক্ত পৈতৃক রাজ্যদ্বয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন । এই সময়ও পূর্বপুরুষার্জিত গোড়ের অধিকার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই ; রঙ্গপুরের ‘ময়নামতীরকোট’ ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তি দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের সূচনাকালে আক্ষেপের

* এই পুস্তিকা প্রকাশ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে ।

সহিত বলিয়াছিলেন,—“বাপের মিরাম এড়ি যাইমু গোড়র সহর ।” এতদ্বারাও গোড়ের সহিত সম্বন্ধসূচিত হইতেছে । গোবিন্দচন্দ্রের উক্তিতে পূর্বেবক্ত অস্ত্যস্থ স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকাও জানা যাইতেছে ;—

“বাপের মিরাম এড়ি যাইমু গোড়র সহর ।
দাদার মিরাম এড়ি যাবেক কমলাক নগড় * ॥
তুন্ধি মায়ের ষত বাড়ী পাটিকানগর † ।
আন্ধি বাড়ী বান্দিমাছি মেহেরকুল সহর ॥” ইত্যাদি ॥

উক্ত পুথির অন্য স্থানে পাওয়া যায়,—

“আত্ম মাটি আছে কিন্তু মেহেরকুল নগড় ।
নিজ মাটি আছে কিছু বিক্রমপুর সহর ॥
আর আছে আইধ্য মাটি তরপের দেশ ।
চাটীগাম পূর্ব মাটি জানিবা বিশেষ ॥”

উক্ত বাক্যদ্বারা গোড়, পাটিকারা বা মেহেরকুল, বিক্রমপুর, তরপ ‡ ও চাটীগামে গোবিন্দচন্দ্রের আধিপত্য থাকা প্রমাণিত হইতেছে ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ময়নামতী তিলকচন্দ্রের কন্যা ও মাণিকচন্দ্রের মহিষী ছিলেন । এবং মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সাতারের রাজকন্যা ছয়ের (অতুনা ও পতুনা) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । ময়নামতীর গানেও ঠিক এই সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে ;—

(১) ময়নামতী স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

“তোর বাপে বলিলেক, তিলকচাঁদের ঝি ।
তোর জ্ঞান লইলে আক্ষার হবে কি ॥”

এই বাক্য দ্বারা ময়নামতীকে তিলকচন্দ্রের কন্যা বলিয়া জানা যাইতেছে ।

(২) “মাণিকচন্দ্র রাজা ছিলেন ধর্মী বড় রাজা ।
ময়নাকে বিভা করিল তার নওবুড়ি ভারিষা ॥”

ময়নামতী যে মাণিকচন্দ্রের ভার্য্যা, উক্ত বাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে ।

(৩) গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় মাতাকে বলিয়াছিলেন ;—

“এক বিভা করাইলা অতুনা পতুনা ।
সে সব স্ত্রীরী জানে আমার বেদনা ॥”

* কমলাক বা কমলাঙ্ক, কুমিল্লার প্রাচীন নাম ।

† পাটিকা—পাটিকারা ।

‡ শ্রীযুক্ত নগিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন—“তরপের দেশ বোধ হয় রঙ্গপুর ।” শ্রীহর্টে ‘তরপ’ নামক এক ষড়রাজ্য ছিল । তথায় চন্দ্র-রাজগণের আধিপত্য বিস্তারের কোনও প্রমাণ নাই । ময়নামতী গানে সন্নিবিষ্ট তরপের অবস্থান নির্ণয় করা বর্তমান কালে দুঃসাধ্য ।

অন্যত্র পাওয়া যায়, গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া, পদুনা বলিতেছেন ;—

“ভূম্বি সাত আমি পাঁচ এমন কালের বিয়া ।
 হীরা-মনমাণিক্য মুক্তা লৈক্ষ দান দিয়া ॥
 মোর বৈন অহুনায়ে পাইলা বেভার । *
 ধন রত্ন মোর বাপের আছিল অপার ॥”

এই সকল বাক্যে গোবিন্দচন্দ্র সাত্তারের রাজকুমারীদ্বয়কে বিবাহ করিবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে ।

সমগ্র অবস্থা আলোচনায় জানা যাইতেছে, বিক্রমপুরের অধীশ্বর শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিকচন্দ্র, পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া শশুরালয়েই বাস করিতেছিলেন । তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ মাতামহের রাজ্য লাভ করিয়া, পাটিকারা এবং মেহেরকুলে রাজত্ব করিতেছিলেন । এতদ্বারা আরও জানা যাইতেছে, গোড়ে এবং বিক্রমপুরে চন্দ্র-রাজগণের যে শাখা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, পাটিকারার রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সেই শাখায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । গোবিন্দচন্দ্র ব্যতীত ময়নামতীর একটা কন্যা থাকিবার প্রবাদ প্রচলিত আছে । † কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের গীত আলোচনায় জানা যায়, ময়নামতী স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

“সেই হৈতে তোর পিতা না আইসে মোর পাশে ।
 মোর বাপে কন্যা রাজা গেল নিজ দেশে ॥
 তোর পিতা মোর তরে করয়ে তরাস ।
 মোর ভন্ন করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস ॥
 তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস ।
 সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ ॥”

হুল্লভ মল্লিক—৬৪ পৃঃ ।

* বিবাহ কালে, কন্যার সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কিম্বা সমবয়স্কা কতিপয় সখী বরকে ষোড়শ স্বরূপ প্রদান করা হইত, তাহাদিগকে পাত্র, স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিতেন । এ স্থলে গোবিন্দচন্দ্র পদুনাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভগ্নী অহুনাকে ষোড়শ পাইয়াছিলেন । এই প্রথা অনেককাল প্রচলিত ছিল । প্রভু নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস নন্দিনী বসুধা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, ষোড়শ স্বরূপ জাহ্নবী দেবীকে লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যথা ;—

“বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা ।
 ষোড়শ ছলে জাহ্নবাকে আত্মসাত কৈলা ॥”

অষ্টমত প্রকাশ—২০শ অধ্যায় ।

† প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্বতে বাস করিতেন । তাঁহার পত্নীর নাম ময়নামতী এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল । তদনুসারে এই পর্বতে লালময়ী-ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।

কৈলাস বাবুর রাজমালা—৪র্থ ভাগ, ২য় অঃ, ৪২০ পৃঃ ।

এই বাক্য আলোচনা করিলে, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মের পর ময়নামতী পতিসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবে, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্বে তাঁহার ভগ্নী জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব নহে। কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ ৬ মাইল দূরবর্তী পর্বতমালায় ইহাদের রাজধানী ছিল। এই পর্বতের উত্তরভাগ 'ময়নামতী' এবং দক্ষিণ ভাগ 'লালমাই' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং লালমতী বা লালময়ী নামে ময়নামতীর কথা থাকিবার কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বেবক্ত পর্বতমালার পূর্ব পার্শ্বস্থিত ভূ-ভাগ বর্তমানকালে 'মেহেরকুল' ও পশ্চিম পার্শ্বের ভূ-ভাগ 'পাটিকারা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনায় বুঝা যায়, পর্বতের উভয় পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ জনপদ লইয়া কমলাঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাই পরবর্তী কালে, পাটিকারা, মেহেরকুল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। পর্বতোপরি রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশ শাসন করা হইত। ময়নামতী পাহাড়ের সন্নিহিত নিশ্চিন্তপুর গ্রামে বর্তমানকালেও ইষ্টকস্তম্ভ দেখা যায়। উক্ত স্থানে মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল বলিয়া কাল পরম্পরা কিস্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। এখানে যে কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসভবন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উক্ত ইষ্টকস্তম্ভের উপর বর্তমানকালে নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছে। পাহাড়ের উত্তরাংশে (যে স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের বিরাম-ভবন প্রতিষ্ঠিত আছে) ময়নামতীর ভজনালয় ছিল। বর্তমান ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চ-শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই স্থানের কিয়দংশ খনন করাইয়াছিলেন, তখন মৃত্তিকাগর্ভে কতিপয় মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর খনন কার্য স্থগিত রাখায়, এই স্থানের প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের সুবিধা ঘটে নাই। আমাদের বিশ্বাস, স্থানটী সম্পূর্ণ খনন করা হইলে কোনও অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ময়নামতী পাহাড়ে আরও কয়েকটি প্রাচীনকীর্তির নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা ত্রিপুর রাজ্যের সম্পাদিত। সেই সকল কীর্তির বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশ করা হইবে।

চন্দ্র-রাজগণের বঙ্গদেশে আধিপত্য লাভের কালনির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে রাজা শ্রীচন্দ্র বঙ্গের শাসন দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথা নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। যাহা হউক, পাটিকারার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাল নির্ণয় করাই এ স্থলে আবশ্যিক। এ বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সুবিজ্ঞ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের কথা সর্ববাঞ্চে মনে পড়ে। তাঁহার মতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। * শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর

* Journal, Asiatic Society of Bengal—1878, Part 1, No. 3, P. 181.

নির্ধারণ করিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন । * গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের পরে পাটিকারা ও মেহেরকুলের আধিপত্য কি সূত্রে কাহার হাতে গিয়াছিল, জানিবার উপায় নাই । কবি ভবানী দাস বলিয়াছেন—“গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া ।” এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদই চন্দ্র রাজবংশের শেষ রাজা । ইহার পর সম্ভবতঃ এতদঞ্চলের প্রভুত্ব বর্ষ্মরাজগণের হাত ঘুরিয়া সেন বংশের হস্তগত হইয়াছিল । তৎপর (১২৪০ খৃষ্টাব্দে) এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিগত হয় । † তদবধি পাটিকারা ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল । কোন সময় কি সূত্রে এই রাজ্যের বিলোপ ঘটয়াছিল তাহা ইতিহাসের অগোচর । সেন বংশীয় রাজত্বের শেষ ভাগে ‘চৌধুরী’ উপাধিধারী হীরাবস্তু নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক এতদঞ্চল শাসিত হওয়া রাজমালা আলোচনায় জানা যাইতেছে ।

পাটিকারা সংশ্লিষ্ট আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য । ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ‘মহারাজোয়াং’ গ্রন্থে লিখিত আছে, ৯৭৯ শকে (১০৫৭ খৃঃ) ব্রহ্মরাজ ‘খ্যানশিস’ এর রাজত্ব কালে পাটিকারার এক রাজকুমার উক্ত রাজ্যে গমন করেন । ব্রহ্মরাজ, এই কুমারের হস্তে স্বীয় একমাত্র দুহিতাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করায়, অমাত্যবর্গ দেখিলেন, অপুত্রক রাজার দৌহিত্রই ব্রহ্মরাজ্যের অধীশ্বর হইবে ; সুতরাং বিদেশী রাজকুমারের সহিত নৃপ-দুহিতার বিবাহ হইলে, রাজ্য বিদেশীয় রাজার হস্তগত হইবে । এ জন্য তাঁহারা এই বিবাহে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন । ইতিমধ্যে প্রচারিত হইল, পাটিকারার রাজকুমারের সহযোগে রাজকুমারী গর্তুবতী হইয়াছেন । ইহার অল্পকাল পরেই কোনও অজ্ঞাত কারণে রাজকুমার আত্মহত্যা করেন । কালক্রমে রাজকুমারীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল— আলঙ শিশু । মাতামহের মৃত্যুর পর ইনিই ব্রহ্মরাজ্যের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । ইনি রাজ্য প্রাপ্তির পর, পিতৃ ভূমি দর্শনাভিলাষে পাটিকারায় আসিয়াছিলেন । এবং আরাকানের সহিত পিতৃকুলের সম্ভাব রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন ।

পূর্বকুল ;—(২০ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ইহা কুকি প্রদেশের অন্তর্ভূত স্থান । পূর্বকুলের অবস্থান বিষয়ে কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায় ;—

“ক্ষফনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ ।

তথাতেহু বসতি করয়ে কুকিগণ ॥

* “তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন । রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন ; গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্বে রাজত্ব করেন ।”

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৪র্থ অধ্যায়, ৬৯ পৃষ্ঠা ।

† রাজমালা—প্রথম লহর, ১৭৫—১৮৪ পৃষ্ঠা ।

সে নদীর প্রভাব আছে অতিশয় ।
তথা বহুলোকে পূজা তাহান করয় ॥
মনোগত কার্যসিদ্ধি সে নদী করয় ।
তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছে ॥
কাঙ্গলাই নামে এক পর্বতের শৃঙ্গ ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥
ই সব স্থানেতে বৈসে ষত কুকিচয় ।
পূর্ব কুলিয়া বলি তা সব্বারে কয় ॥”

পূর্বকুল সম্বন্ধে আনুসঙ্গিকভাবে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে ।
এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ।

ফলমতী তীর্থ ;—(৩৩ পৃঃ—১৫ পংক্তি) । ইহার অণ্ড নাম : ‘ছুরাশা’ ।
কোন কোন স্থলে ‘ফলমতীশ্বর’ নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । সংস্কৃত রাজমালায়
এই তীর্থকে ‘ক্রমদীশ্বর’ বলা হইয়াছে । মহারাজ ধন্যমাণিক্যের তীর্থপর্যটন
বর্ণনোপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;—

“ফলমতীশ্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য ॥
ফলমতীশ্বর তীর্থে জরব মারিয়া ।
চাটগ্রান আমল করে মোহর নির্মাইয়া ॥”

সংস্কৃত রাজমালায় ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;—

“নানা তীর্থং ততোগত্বা দদর্শ ক্রমদীশ্বরং ।”

পূর্বেবাক্ত ফলমতীশ্বর ও ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি চন্দ্রশেখর বা সীতাকুণ্ড তীর্থের
নামান্তর । চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য আলোচনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত
হইবে । উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে ;—

“ততঃপশ্চাৎ মহাদেবং জ্যোতির্লিঙ্গ মনোহরম্ ।
অষ্টমূর্ত্তি-সমায়ুক্তং সৌন্দর্য্যালিঙ্গিতং মহৎ ॥
অশ্বমেধ সহস্রশ্চ বাজপেয় শতশ্চ চ ।
ক্রমদীশ মুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥
সর্বপাপ বিনিশ্চুক্ত ধনধান্য স্নাতাশ্চিতঃ ।
শিবস্তং লভতে মর্ত্য্যঃ পুনর্জন্ম বিবর্জিতঃ ॥”

বারাহীতন্ত্র, ৬ষ্ঠ পটল—(চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্যধৃত) ।

মর্ম্ম ;—“তাহার পর মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দর্শন করিবে ।
সেই জ্যোতির্লিঙ্গ অষ্টমূর্ত্তি সংযুক্ত সৌন্দর্য্যময় অতি উৎকৃষ্ট । সেই জ্যোতির্লিঙ্গ-
রূপী ক্রমদীশ্বরের মুখ দর্শন করিলে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের
ফললাভ করিয়া থাকে । মানব তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া

ধনধান্য স্ত্রী পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগাবসানে শিবত্ব লাভ করতঃ আর জন্মগ্রহণ করে না ।”

সীতাকুণ্ড তীর্থ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং এই তীর্থের সহিত ত্রিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । মহারাজ ধন্যমাণিক্য শম্ভুনাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন । এবং সনন্দদ্বারা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন । চন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নির্মিত । তাহা বিনষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে । অধুনাও এই তীর্থের উন্নতিকল্পে ত্রিপুর রাজপরিবারের বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের মহিষী স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ব্যাসকুণ্ডে এক বিরাম ছত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহার নাম “তুলসীবতী বিরাম ছত্র ।” স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য স্বীয় জননী নামে উক্ত মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন । মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রধানা মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রত্নমঞ্জরী মহাদেবী সীতাকুণ্ড তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক এক সুশোভন মন্দির নির্মিত ও তাহাতে অন্নপূর্ণা মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে । স্বর্গীয় কুমার নবীনকিশোর দেববর্মা মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় জননী ও সহধর্মিণী এক যোগে কালভৈরবের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । ধর্মপ্রাণ রাজপরিবারের সহিত এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কোন কালেই বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না ।

বগাসারি ;—(১৩ পৃঃ—৩ পংক্তি) । ইহা ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত একটা পরগণা । পূর্বে এই স্থান রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, মুসলমানের শাসনকালে ত্রিপুরার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ববার তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন । পরিণামে উক্ত স্থান জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে । এই স্থান কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ দিকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত । কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রামাভিমুখীন প্রসারিত রাজবত্ন এই পরগণার বক্ষের উপর দিয়া গিয়াছে ।

বঙ্গদেশ ;—(১২ পৃঃ—২৭ পংক্তি) । বাঙ্গালা দেশ । বঙ্গদেশের সীমা সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যে পাওয়া যায় ;—

“রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রাস্তগং শিবে ।

বঙ্গদেশো মধ্য প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥”

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল ।

এতদ্বারা সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । বঙ্গদেশ নামটা বহু প্রাচীন । চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলির পুত্র বঙ্গকর্তৃক শাসিত প্রদেশ ‘বঙ্গ’ নামে অভিহিত হইয়াছে । মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, জ্যোতিষতন্ত্র, বৃহৎ সংহিতা, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ প্রভৃতি বহু পুরাণ ও কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । রঘুবংশে বঙ্গদেশের নাম

আছে (৪র্থ সর্গ—৩৫-৩৮ শ্লোক)। মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহার রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার কালেও এক ভাগ বঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। * মুসলমান রাজত্বকালে এতদেশ 'বঙ্গালা' নাম লাভ করে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, পূর্বকালের রাজগণ জলপ্লাবন নিবারণার্থ দশ হস্ত পরিমিত উচ্চ এবং বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটা আল বাঁধিয়াছিলেন। এই কারণে 'বঙ্গ-আল' শব্দদ্বয়ের যোগে 'বঙ্গাল' এবং বঙ্গাল হইতে 'বঙ্গালা' নাম হইয়াছে।

হিন্দু এবং মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশে রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যা এবং জ্ঞানের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চির প্রসিদ্ধ। প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধির ইয়ত্তা ছিল না। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যদ্বারা বঙ্গদেশ যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। সেই সকল বিবরণ অল্প কথায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে।

বরদাখাত ;—(১৩ পৃঃ—৫ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটা সুবৃহৎ পরগণা। পূর্বের ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। মোগল রাজত্বকালে ইহা নেজামত (সামরিক) বিভাগ ভুক্ত হয়। বরদাখাত ও সরাইল পরগণার জমিদারগণ সামরিক বিভাগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নৌকা প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত উভয় পরগণার সম্যক আয় সমরতরী বিভাগে ব্যয় হইত, এজন্য ইহা 'নাওরা মহাল' নামে অভিহিত হইত।

মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে বরদাখাত পরগণা ঈশা খাঁ মসনন্দ আলীর শাসনাধীন ছিল, তখন ইহার নাম ছিল বলদাখাল। দ্বিতীয় আলমগীরের (ঔরঙ্গজেব) শাসনকালে (৪৪ জলুসে—১৭০০ খৃঃ) বাঙ্গালার নবাব আজিম ওসমানের এক খণ্ড পরওয়ানা দ্বারা জানা গিয়াছে, তৎকালে এই পরগণা ঈশা খাঁ এর উত্তর পুরুষ দেওয়ান হয়বৎ মাহম্মদ খাঁ এর হস্তে ছিল।† ইহার পর নানা ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিমের হস্তগত হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী মির্জা হোশন আলী কালীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীত বর্তমানকালেও সচরাচর গীত হইয়া থাকে।

অতঃপর খরিদসূত্রে অনেকেই এই পরগণার অংশবিশেষের অধিকারী হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্যামগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় মহেশনারায়ণ রায়, ঢাকা নিবাসী আমিরদ্দীন দারোগা এবং ঢাকার নবাববংশের পূর্বপুরুষ খাজে আলী মিঞার নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালে উক্ত নবাব পরিবারই এই পরগণার অধিকাংশের অধিকারী।

ত্রিপুরেশ্বর ধনুমাণিক্যের শাসনকালে এই পরগণা গোড়েশ্বরের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। বরদাখাতের তদানীন্তন জমিদার প্রতাপ রায়

* Vide Buchanan Hamilton's Hindusthan—Vol. I, P. 114.

† J. A. S. B.—Vol. XLIII, Part I, P. 214.

গৌড়েশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করেন । ইহার অল্পকাল পরেই এই স্থান পুনর্ববার মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত এবং পূর্বোক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

শ্যামগ্রামের 'বরদেশ্বরী' বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা বলিঃ সাধারণের বিশ্বাস ।

বাম বাজু ;—(৪৩ পৃঃ—২০ পংক্তি) । উদয়পুর রাজধানীর দক্ষিণ (ডাইন) দিকস্থ প্রদেশ—শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ-বাজু এবং বাম দিকস্থ চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান বাম বাজু নামে অভিহিত ছিল । মহারাজ বিজয়মাণিক্য এই সকল প্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।

বারানসী ;—(২ পৃঃ—৫ পংক্তি) । ইহা কাশীধামের নামান্তর । কাশীক্ষেত্রের বিবরণ প্রথম লহরের ২৪৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে ।

বালিশিরা ;—(৫৯ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণা । ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য, স্বীয় অনুগত ভৃত্য রামহরি বিশ্বাস হইতে তপে বিষর্গাওস্থিত জমিদারীর স্বত্ব লাভ করিয়া, তথায় বাস করিবার সময় সাতর্গাঁও ও বালিশিরার জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“গোলাম আলী জমিদার ঢাকা অবস্থিতি ।
আলালক্ষী নামে সরিক তথায় বসতি ॥
সাতর্গাঁও বালিশিরা সাড়ে নয় আনি ।
জমিদারী হিসা বিক্রী করিল আপনি ॥
বত্রিশ হাজার টাকা তার মূল্য হয় ।
বার শ পঁচিশ সনে নূপ করে ক্রয় ॥”

রাজমালা—রামগঙ্গামাণিক্য খণ্ড ।

মহারাজ রামগঙ্গা, অনুরক্ত ভক্ত রামহরি বিশ্বাসের দান গ্রহণের কথা রাজমালায় উল্লেখ করা হয় নাই । স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

“রামগঙ্গা স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঙ্কর বোধে সপরিবারে বিশর্গাঁও গমন করেন । তিনি তাঁহার জন্ম একটা জমিদারী ক্রয় করিতে রামহরিকে আদেশ করেন । তখন অসাধারণ প্রভুভক্তি-পরায়ণ রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে সেই বিষর্গাঁও প্রদান করিয়া বলিলেন,—“মহারাজের কৃপাই আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি, আমি ইহা মহারাজের জন্মই ক্রয় করিয়াছি, মহারাজ তাহা গ্রহণ করুন ।” মহারাজ রামগঙ্গা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রিয় সহচরের দান গ্রহণ করিলেন ।”

কৈলাস বাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ১৩ অঃ, ১৪৯ পৃঃ ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতাও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । *

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ ।

এই সাতগাঁও ও বালিশিরা বর্তমানকালেও ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত আছে ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়কালে এই স্থানে যাইয়া বিজয়পুর নামে এক গ্রাম স্থাপন করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায় ।

বিক্রমপুর ;—(৫৬ পৃঃ—১২ পংক্তি) । ইহা একটা সুবহৎ পরগণা । বর্তমানকালে ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এই পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে । ইহার উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব সীমায় মেঘনা, পশ্চিমে পদ্মানদী এবং চন্দ্রপ্রতাপের অঙ্গাংশ, দক্ষিণে ইদিলপুর প্রভৃতি পরগণা ।

পদ্মানদীদ্বারা বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই বিচ্ছিন্ন উত্তরাংশের নাম উত্তর বিক্রমপুর এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতেছে । খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রদেশ ‘সমতট’ আখ্যায় পরিচিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় । সুবিজ্ঞ কানিংহাম, ফাণ্ডসন ও ওয়াটস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সমতটের অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ঢাকার ইতিহাস প্রণেতার মতে তন্মধ্যে ওয়াটসের উক্তিই সর্ববতোভাবে গ্রহণীয় । * তাঁহার মতে ঢাকার দক্ষিণ এবং ফরিদপুরের পূর্বদিকস্থ ভূ-ভাগ সমতট নামে আখ্যাত ছিল । মতান্তরে, মেঘনা নদের পূর্ব-তীরবর্তী ভূ-ভাগ সমতট নামে আখ্যাত ছিল । শেষোক্ত মতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় ।

উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই প্রদেশ বিক্রমপুর আখ্যা লাভ করিবার প্রবাদ আছে । দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়,—“বিক্রম ভূপ বাসহাৎ বিক্রমপুর মতোবিদুঃ” । ইহা পূর্বেবাক্ত প্রবাদমূলক উক্তি বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুরে আগমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না ।

বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থের মতে সেন বংশীয় বিক্রম সেন ‘বিক্রমপুর’ নামের প্রতিষ্ঠাতা । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

“তদ্বংশে বিক্রম সেনো জাতঃ পরম ধার্মিকঃ ।

কৃতবান বিক্রমপুরীং স্বনামাভিহিতাং সুধীঃ ॥”

বিপ্রকল্পলতিকা ।

গৌড়ের রাজশৃবর্গের মধ্যে বিক্রম সেনের নাম পাওয়া যায় । তদ্বিভূতি, বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী এবং কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ আছে । বিক্রমপুরে সেন রাজগণের আধিপত্য দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল । সুতরাং বিক্রম সেনের নামানুসারে ‘বিক্রমপুর’ নামকরণ হইবার সম্ভাবনাই অধিক ।

পাল বংশের শাসনকালে বিক্রমপুরের নানাস্থানে বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সকল স্থানের মধ্যে ব্রজযোগিনীর নাম বিশেষভাবে

* ঢাকার ইতিহাস—১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা ।

উল্লেখযোগ্য । বর্তমানকালে যে সকল নিদর্শন আবিক্ত হইতেছে, তাহা আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, পাল-রাজত্বকালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল ।

বিক্রমপুরের ভাগ্যে বঙ্গের রাজধানীজনিত গৌরব সুদীর্ঘকাল ঘটিয়াছে । সেই সৌভাগ্যের দিনে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি পুণ্য কার্যদ্বারা রামপাল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । * এই প্রদেশ বঙ্গীয়-বীর চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের লীলাক্ষেত্র । † সলরজঙ্গ্ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায়রাইয়া অতুলনীয় অটালিকাদি দ্বারা বিক্রমপুরের বক্ষঃ ভূষিত করিয়াছিলেন । ‡ বিক্রমপুরের সেই শোভা ও সৌভাগ্য অনেক কাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে । চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের শেষ চিহ্ন রাজাবাড়ীর মঠ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিগ্রাসিনী কীর্ত্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিক্রমপুরে গিয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যায়,—“বিক্রমপুরেতে যাইয়া আসিল ফিরিয়া ।” এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ বিক্রমপুরে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, অথচ বাধা প্রাপ্ত হইবারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । তবে, গোড়েশ্বরের গুপ্তচর তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, ইহা রাজমালায় পাওয়া যায় । তৎকালে মোগল ও পাঠানের পরস্পর বিবাদে মুসলমান শক্তি দিন দিন দুর্বল হইতেছিল, সুতরাং বিজয়মাণিক্যের গতিরোধ করিবার অবসর লাভ করা তাহাদের পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই মনে হয় ।

বিজয় নদী ;—(৫৭ পৃঃ—৪ পংক্তি) । ইহা একটা অল্প পরিসরবিশিষ্ট পার্বত্য নদী । সদর বিভাগস্থিত বিশালগড় থানার অন্তর্বর্তী স্থান দিয়া পশ্চিমাভিমুখী প্রবাহিত হইয়া তিতাস নদীতে মিশিয়াছে । এই নদীর গতি অতিশয় বক্র ; মহারাজ বিজয়মাণিক্য ইহার কতিপয় বাঁক কাটাইয়া গতি সরল করিয়া দেওয়ায় ‘বিজয় নদী’ নাম হইয়াছে । পার্বত্য জাতির মধ্যে অনেকে এই নদীকে ‘বিজয় নন্দী’ বলে । রাজমালাকার ইহার ‘বিজয় নন্দিনী’ নাম লিখিয়াছেন ।

বিজয়পুর ;—(৫৯ পৃঃ—৩ পংক্তি) । শ্রীহট্ট জেলাস্থিত বালিশিরা পরগণার অন্তর্গত একটা গ্রাম । মহারাজ বিজয়মাণিক্য এই গ্রামের স্থাপয়িতা ।

বিশালগড় ;—(২৫ পৃঃ—৯ পংক্তি) । ইহা আগরতলার দক্ষিণ দিকস্থ ছয় ক্রোশ দূরবর্তী একটা সমৃদ্ধ জনপদ । এই স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটা সেনা-নিবাস থাকায় ‘বিশালগড়’ নাম হইয়াছে । এই স্থানের বিবরণ প্রথম লহরের ২৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে ।

* গোড়ে ব্রাহ্মণ ।

† Akbarnama—(By Beveridge's), Part III.

‡ মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী ।

বিষ্ণাজুড়ি ;—(১৩ পৃঃ—৫ পংক্তি) । ইহাকে বিষ্ণাউড়ি নামেও অভিহিত করা হয় । এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত । মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সকল স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন ।

বেজুরা ;—(১৩ পৃঃ—৪ পংক্তি) । ইহার প্রকৃত নাম “বেযোড়া” । এই নামোৎপত্তির একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে । সৈয়দ মিকায়েল উক্ত প্রদেশের স্বত্বাধিকারী থাকাকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্বাছ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে প্রতিপত্তিসম্পন্ন হইয়া, তথাকার জনৈক ওমরাহের কন্যা বিবাহ করেন । এবং সম্রাটের কৃপায় শ্রীহট্টে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া সন্ত্রীক দেশে প্রত্যাগমনকালে, তাঁহার ঈর্ষাপরবশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির খাঁ কর্তৃক পথি মধ্যে নিহত হইলেন । এই দুর্ঘটনায় ওমরাহ-চুহিতা আর স্বামী ভবনে গমন না করিয়া, সেই স্থান হইতেই দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই স্থানে স্বামী হইতে স্ত্রী চিরকালের তরে বিযুক্ত হওয়ায়, স্থানের নাম ‘বেযোড়া’ হইয়াছে ।

বেযোড়া, শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণায় পরিণত হইয়াছে । এই স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইবার পর, মহারাজ বিজয়মাণিক্য পুনর্ববার তথায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন ।

বৈকুণ্ঠপুর ;—(৬৪ পৃঃ—২০ পংক্তি) । উদয়পুরে রাজপরিবারের শ্মশান-ক্ষেত্রের নিমিত্ত নির্ধারিত স্থান বৈকুণ্ঠপুর নামে অভিহিত হইত । বর্তমানকালেও সেই স্থানে অনেকগুলি সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে ।

ব্রহ্মপুত্র ;—(৫৪ পৃঃ—১৮ পংক্তি) । ইহা স্বনামখ্যাত নদবিশেষ । ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভব এবং নামোৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, এবং কুর্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে ; বিস্তার ভয়ে এ স্থলে উল্লেখ করা হইল না ।

ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া মিসমী জাতীয়গণের আবাস পর্বতের মধ্য দিয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে । তৎপর নওগাঁও, সাদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গোহাটা, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী প্রভৃতি আসাম প্রদেশস্থ জনপদসমূহ অতিক্রম করিয়া, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে । ইহার এক শ্রোত স্বর্ণগ্রামের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শীতল-লক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে । ব্রহ্মপুত্রের অন্ত নাম লোহিত্য ।

ব্রহ্মপুত্র পুণ্যপ্রদ নদ, তিথিবিশেষে এই নদের মাহাত্ম্য বর্ধিত হইয়া থাকে । শাস্ত্রে পাওয়া যায় ;—

“মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্ ।

পিবেশোক কলিকাঃ স্নান্যং লোহিত্য বারিণি ॥

পুনর্বসৌ বৃষে লগ্নে চৈত্রেমাসি সিতাষ্টমীম্ ।

লোহিত্য বিরজে স্নান্যং সর্বপাটৈঃ বিমুচ্যতে ॥”

স্কন্দপুরাণ ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই স্বর্ণগ্রাম অধিকার এবং এই তীর্থে স্নান দানাদি করিয়াছিলেন ।

ভানুগাছ ;—(১৩ পৃঃ—৪ পংক্তি) । ইহা বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণা । এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল । পরে ত্রিপুরার শাসন-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করায়, মহারাজ ধনুমাণিক্য পুনর্ব্বার তাহা স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন ।

ভুলুয়া ;—(৩৩ পৃঃ—১৪ পংক্তি) । ইহা বর্তমান নোয়াখালীর প্রাচীন নাম । এখন ‘ভুলুয়া’ নোয়াখালী জেলাস্থ একটা পরগণার নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে ।

ভুলুয়া ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ছিল । প্রবাদ এই যে, গোড়ের খ্যাত-নামা ভূপতি আদিশূরের বংশধর বিশ্বস্তরশূর এই রাজ্যের স্থাপয়িতা । তিনি চন্দ্রশেখর তীর্থ দর্শন মানসে জলপথে যাত্রা করিয়া, নাবিকগণের দিক্ভ্রম বশতঃ অনেক দিন ভ্রমণের পর একটা দ্বীপে উপনীত হইলেন । তথায় আসিয়া বুলিলেন, তাঁহারা পথ ভুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । তখন তিনি বলিয়াছিলেন— “ভুল ছয়া” । এই ‘ভুল ছয়া’ শব্দ হইতেই স্থানের নাম ‘ভুলুয়া’ হইয়াছে । স্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অন্তরূপ প্রবাদেও অনসন্ধান নাই ; তন্মধ্যে কোনটা সত্য, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ।

বিশ্বস্তর বারাহী দেবীর উপাসক ছিলেন । কথিত আছে, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশানুসারে সেই স্থানে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রস্তরময়ী বারাহী মূর্ত্তি স্থাপন করেন ; ইহা ৬১০ বঙ্গাব্দের ঘটনা । ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব এতৎসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“The exact date of this fiction is given as the 10th of Magh, 610 Bengali year or A. D. 1203, the same year in which the first Muhammadan invasion of Bengal under Bakhtyar Khilji took place.

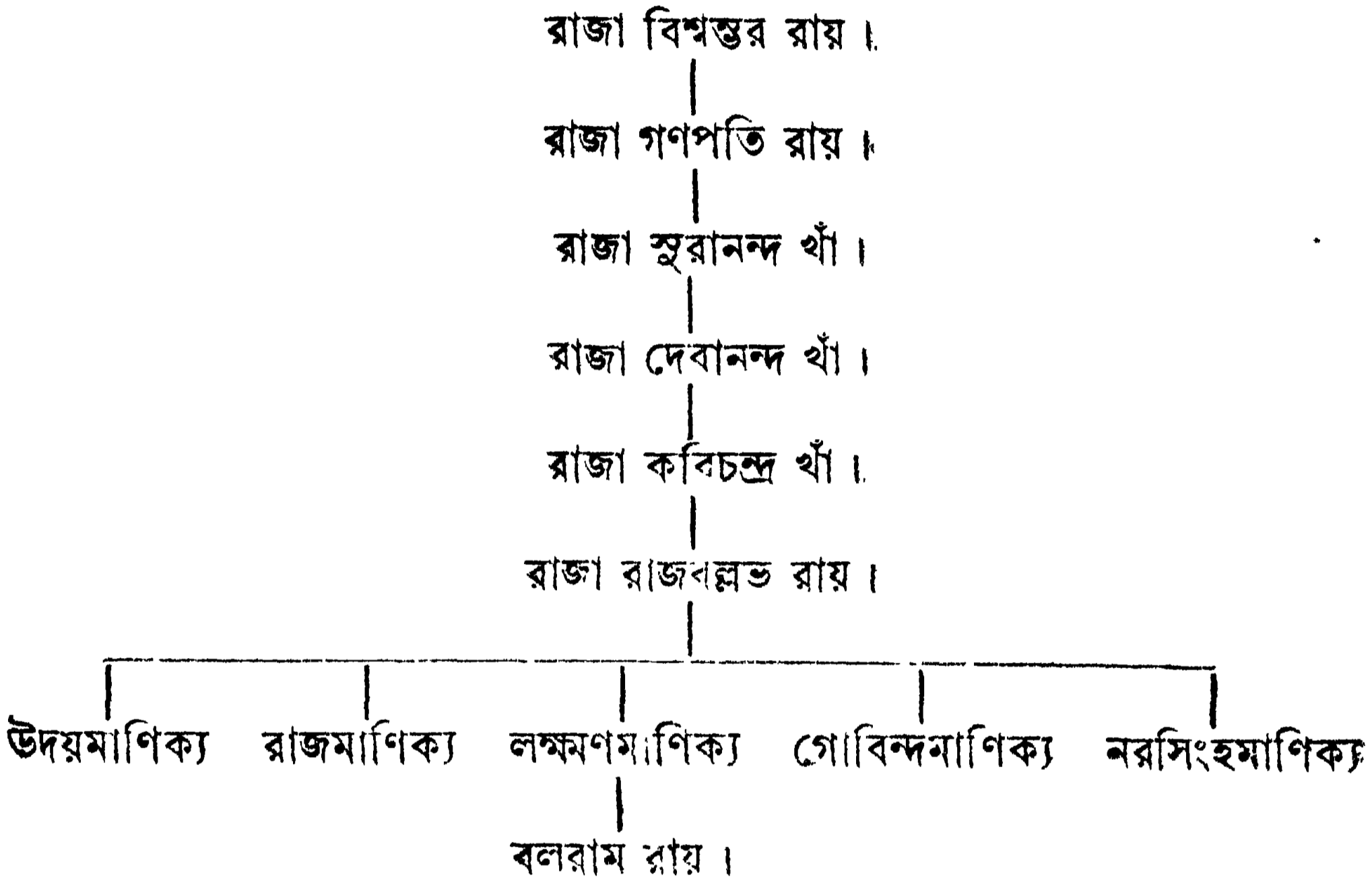
J. A. S. B.—Vol. XLIII, Part I., P. 203.

হাণ্টার সাহেব এতৎসম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আপত্তি হওয়ার এ স্থলে প্রদান করা হইল না । * ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলিবার উপায় নাই । রাজা বিশ্বস্তরের প্রতিষ্ঠিত বারাহী মূর্ত্তি অद्याপি বিচ্যমান আছেন ।

রাজা বিশ্বস্তরকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ বা কায়স্থ জাতীয় বলিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে তিনি ক্ষত্রিয় হইলেও ভুলুয়ায় আসিয়া কায়স্থ সমাজে মিশিয়াছিলেন । বিশ্বস্তরের আদি পুরুষ প্রখ্যাতনামা আদিশূরের জাতি নির্ণয় লইয়াই অद्याপি বাক্ বিতণ্ডার শেষ হইল না, এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্বস্তরের জাতি-বিচারে

প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক বলিয়া মনে হয় । তিনি যে জাতীয়ই হউন, ভুলুয়ায় আসিয়া যে কায়স্থ সমাজে মিশিয়াছিলেন, এ কথা সত্য ।

রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় রাজা বিশ্বস্তরের যে বংশ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ।* কিন্তু এই বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না । রাজমালায় পাওয়া যায়, ভুলুয়াপতি দুর্লভ রায়ের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল । কৈলাস বাবুর প্রদত্ত বংশ তালিকায় দুর্লভ রায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে না । আমরা বিশুদ্ধ বংশ তালিকা সংগ্রহ করিতেছি, তৃতীয় লহরে তাহা প্রদান করা হইবে ।



পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভুলুয়া ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ছিল । এই রাজ্যের রাজগণ প্রধান সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন । ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজ্যাভিষেক কালে ইঁহারা তাঁহাদের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিতেন, এবং সামন্ত রাজগণের মধ্যে সকলের অগ্রে নজর প্রদান করিতেন । প্রতি বৎসর পুণ্যাহের সময় রাজাকে নজর প্রদান করা ইঁহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল । মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে ভুলুয়ারাজ দুর্লভ রায় ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় সেই সূত্রে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, রাজমালা আলোচনায় ইহা পাওয়া যায় । এ বিষয়ে মত বৈষম্য আছে । রাজমালার তৃতীয় লহরে বিষয়টী বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল ।

ভুলুয়ার রাজগণ মধ্যে দুই ব্যক্তি মুসলমানগণের অনুকরণে 'খাঁ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে ত্রিপুরেশ্বরগণের উপাধি অনুসরণে 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন । এতদ্বারা বুঝা যায়, ইঁহারা নিতান্ত অনুকরণ প্রিয় ছিলেন ।

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—৪র্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯৪ পৃঃ ।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য অসাধারণ বীর এবং সুপণ্ডিত ছিলেন । ইনি রাজ-কার্যের সহিত সাহিত্য চর্চাও করিতেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় ‘বিখ্যাত বিজয়’ নামক একখানা নাটক রচনা করেন । ইহা অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে । গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগের কতিপয় পংক্তি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তুল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ

প্রাক্ সংপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা শ্রোতস্বতী ভূধরঃ ।

দৃপ্যাচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগলভ্য পুষ্পাকরঃ

শ্রীমল্লঙ্গ ভূপতে রত্নিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ ॥

আশ্রয়ো যশ্চ রাজানস্তশ্চ বীররসশ্চ চেৎ ।

প্রবন্ধো ভূভূজা বন্ধস্তম্মৌপয়িক শ্রমঃ ॥”

বিখ্যাত বিজয় ।

ইহার রচিত ‘কৌতুক রত্নাকর’ নামক আর এক খানা গ্রন্থ আগরতলায় রাজ-গ্রন্থাগারে আছে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায়ও ইহার একখণ্ড রক্ষিত হইতেছে ।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণ রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সমসাময়িক । ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না । এ বিষয় এবং ভুলুয়া রাজ্যের অন্যান্য বিবরণ তৃতীয় লহরে আলোচিত হইবে ।

মধ্যযুগে ভুলুয়া ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ দেবমাণিক্য উক্ত রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন । তৎকালে মহারাজ চট্টগ্রামে এক সেনানিবাস (খানা) স্থাপন করিয়া, চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ।

ভূষণা ;—(৪১ পৃঃ—২৩ পংক্তি) । ইহা মধ্যবঙ্গের একটা সমৃদ্ধ নগর ছিল । পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় প্রাচীন ভূষণার সীমা নিম্নলিখিত-ভাবে প্রদান করিয়াছেন,—“উত্তরে পদ্মা ও বেতরিরার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী ; পশ্চিমে মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর ; দক্ষিণে ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশবিশেষ ।” * অধুনা ভূষণার কিয়দংশ খুলনা ও যশোহর এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে ।

ভূষণা বঙ্গীয় বীর সীতারাম রায়ের বাল্য-লীলাক্ষেত্র । এখানে তিনি পিতৃ সকাশে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । সীতারাম জমিদারী লাভ করিবার পর ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় । এই বিবাদমূলে

ফৌজদার আবুতোরাপ বারাসিয়া নদীর তীরে সীতারামের হস্তে নিহত এবং ভূষণা দুর্গ সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল । *

আবুতোরাপের মৃত্যুর পর বঙ্গাধীপ মুর্শিদকুলি খাঁ, বক্সআলী খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে ভূষণার লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । অতঃপর মোগল বাহিনীর সহিত ভীষণ সংগ্রামে সীতারাম আহত অবস্থায় ধৃত ও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিলেন । তথায় সীতারাম পরলোকগমন করেন । তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে, মুসলমান ইতিহাস রেয়াজুস্-সলাতিনের মতে সীতারামকে শূলে চড়াইয়া, তাঁহার পরিবারবর্গকে কারারুদ্ধাবস্থায় রাখা হইয়াছিল । “তারিখে বাঙ্গালা” গ্রন্থের মতও তদনুরূপ । † স্কুয়ার্ট সাহেব, এই সকল ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু সীতারামের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার কথাও বলিয়াছেন, এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই । তাঁহার বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“Buksh Aly seized Sittaram, his women, children, and accomplices and sent them in irons to Moorshidabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive and the women and children sold as slaves”

Stewart's History of Bengal—P. 434.

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের “সীতারাম” পাঠে এতদ্বিষয়ক অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে । সীতারামের মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অद्याপি নিঃসংদিগ্ধভাবে কেহই বলিতে পারেন নাই । তাঁহার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিষ্কিন্তু কিস্বা বিক্রয় করিবার কথা যে মিথ্যা, এ কথা অনেকে বলিয়াছেন ।

ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে বঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছিল । শিল্প নৈপুণ্যের জ্ঞাত ও এই স্থানের বিস্তর খ্যাতি ছিল । ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতল পাটী প্রসিদ্ধ শিল্পজাত বস্ত্র ।

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান ও মোগলের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষের ফলে মুসলমান শাসন নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল । এই সুযোগে মহারাজ বিজয়, পূর্ব ও মধ্য বঙ্গের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করেন । তিনি তৎকালে মাধব নামক ব্যক্তিকে ভূষণার লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়া তদ্বারা স্থায়ী শস্তুর ও সেনাপতি দৈত্যনারায়ণকে বধ করাইয়াছিলেন । ‡ তৎপর কোন্ কালে কি সূত্রে এই সকল

* Stewart's History of Bengal.—P.433.

† বাঙ্গালার ইতিহাস—(নবাবী আমল), ৮০ পৃষ্ঠা ।

‡ মাধবের সহিত মহারাজ বিজয় সত্য-পাশে আবদ্ধ হইবার কথা প্রাচীন রাজমালার পাওয়া যায় ;—

“ই কথা শুনিয়া রাজা সত্য নির্বন্ধিল ।

ভূষণা রাজ্যে যে তোমা লস্কর করিল ॥”

প্রাচীন রাজমালা—দুর্ঘ্য ৭৩ ।

প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, জানা যায় না। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা উক্ত প্রদেশের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং ত্রিপুরার আধিপত্য অধিককাল স্থিরতর ছিল না, ইহা বুঝা যাইতেছে।

মনু নদী;—(৩১ পৃঃ—৩০ পংক্তি) । এই নদী ত্রিপুর রাজ্যস্থিত সংখলং পর্বতের খোইশিব নামক শৃঙ্গের সন্নিহিত স্থান হইতে নির্গত ও উত্তর পশ্চিমাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া, মনুমুখ নামক স্থানে কুশিয়ারা (বরবক্রের অংশশিেষ) নদীতে পতিত হইয়াছে। কৈলাসহর, উনকোটি তীর্থ প্রভৃতি এই নদীর তীরে অবস্থিত। যোগিনী তন্ত্র, উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য, এবং বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মনুনদীকে পুণ্য-নদী বলা হইয়াছে ; একটী মাত্র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“সমুদ্রশ্রোত্তর দেশে ভতো মনুনদী স্মৃতঃ ।
 ষংগত্বাপি মহারাজন্ পিত্বা পানীয়মুত্তমং ॥
 মনুনদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং ।
 তত্র স্নাত্বা নরোবাতি চন্দ্রলোকং মনুত্তমং ॥”

বায়ুপুরাণ ।

মাছি ছড়া ;—(২৬ পৃঃ—৫ পংক্তি) । গোমতী নদীর তীরবর্তী ছনগাঙ্গের কয়েক বাঁক উজানে অবস্থিত। ত্রিপুরা আক্রমণকারী পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ এই স্থানে স্নানার্থে স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গীয় ভাস্করগণ গোমতী নদীর তীরবর্তী প্রস্তরময় পর্বত গাত্রে অনেকগুলি দেব দেবীর মূর্তি খোদাই করিয়াছিল, তাঁহার অধিকাংশ অত্যাধি বিঘ্নমান রহিয়াছে, কতক ধ্বসিয়া গিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“ছনগাঙ্গ তৈকতান দেবদ্বার নাম ।
 তার কত বাঁক উজান মাছি ছড়া ধাম ॥
 তৈতন খাঁ সঙ্গে ছিল ষত শিল্পকর ।
 নিস্বাইছে গড় পরে দেব বহুতর ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড ।

ইহারা মাছি ছা (দেবতামুড়া) নামক স্থানের মূর্তিসমূহের অনুকরণে এই সকল মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিল, রাজমালার উক্তি আলোচনায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজমালায় হৈতন খাঁ এর সৈন্যগণের কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা গেল ;—

“আর দেখে নদী তীরে পাষণ প্রতিমা ।
 হিন্দু সবে পূজা করে জানিয়া মহিমা ॥
 সেই স্থানে নাম ছিল মাছি ছা বিখ্যাত ।
 পুনর্জন্ম নাহি বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত ॥”

ধনুমানিক্য খণ্ড ।

মাছি ছা ;—(২৭ পৃঃ—১৬ পংক্তি)। ত্রিপুরা ভাষায় এই স্থানকে ‘মাছিছল’ বলে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে রিয়াং জাতির বসতি ছিল। এই স্থানের অধিবাসীবৃন্দ ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায় মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রায় কাচাগ পুনর্ববার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। * বাঙ্গালী সমাজে এই স্থান ‘দেবতামুড়া’ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান উদয়পুর এবং অমরপুরের সীমান্তবর্তী। এখানে গোমতীর বামতীরস্থ উচ্চতম পাষণময় পর্বত গাত্রে নানাবিধ দেব দেবীর মূর্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে মহিষাসুর মর্দিনী দশভুজা মূর্তির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অঙ্কিত মূর্তির নির্মিতই স্থানের নাম ‘দেবতামুড়া’ হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্তিবিষয়ক রাজমালার বাক্য ‘মাছি ছা’র বিবরণে প্রদান করা হইয়াছে।

দেবতামুড়ার মূর্তিসমূহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীর্তি চিহ্ন। কোন সময়ে কি উদ্দেশ্যে নদীগর্ভ হইতে উত্থিত প্রস্তরময় উত্তুঙ্গ পর্বত গাত্রে এই সকল দেব দেবীর মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে কালে বৌদ্ধ ধর্ম-যাজকগণ ত্রিপুরা রাজ্যের চতুর্দিকস্থ হিন্দুদিগকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন, এবং রাজ্য মধ্যে হস্ত প্রসারণেরও চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় সাধারণকে হিন্দু-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ ত্রিপুরেশ্বরগণ পর্বতের শিলাময় গাত্রে এই সকল মূর্তি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয়। হিন্দু রাজবর্গের এবশ্বিধ চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের গঠন হইয়া থাকিবে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন।

খোদিত মূর্তিসমূহের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। সেকালে ত্রিপুরা রাজ্যে ভাস্কর-শিল্পীর অভাব ছিল না, এবং এতজ্জাতীয় শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিকৃতিসমূহ দর্শনে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। উনকোটা তীরে খোদিত মূর্তিসমূহের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় এই সকল মূর্তি তদপেক্ষা পরবর্তীকালের এবং সেকালে ভাস্কর-শিল্পের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

মাধবতলা ;—(৪০ পৃঃ—১৬ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত। রাজমালায় পাওয়া যায়, এখানে একটি হাট ছিল। কাল প্রভাবে স্থানের নাম পরিবর্তিত হওয়ায়, বর্তমান সময়ে মাধবতলার অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধা নাই।

মেহেরকুল ;—(১৩ পৃঃ—২ পংক্তি)। এই স্থানের স্থূল বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

যমুনা ;—(৫৫ পৃঃ—১১ পংক্তি)। নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। রাজমালাকার

* এই লহরের ২০ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

এই যমুনাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম প্রবাহও যমুনা নামে বিখ্যাত। এই নদী ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার মধ্যবর্তী সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের অল্প উপরে পদ্মা নদীতে পতিত হইয়াছে। রাজমালা রচয়িতা এই নদীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

যশপুর ;—(২৫ পৃঃ—২২ পংক্তি)। উদয়পুরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটা গ্রাম। এই স্থানের উপর দিয়া উদয়পুরে গমনের রাস্তা ছিল।

যাত্রাপুর ;—(৫২ পৃঃ—১০ পংক্তি)। এই স্থান ঢাকা হইতে পশ্চিম দিকে ১৫ পনর ক্রোশ দূরবর্তী ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে জলপথে আঁকা বাঁকা ইছামতী নদী ঘুরিয়া ঢাকায় পৌঁছিতে সময় বেশী লাগে। পরিত্রাজক টেভারনিয়ার স্বরচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে একটা সোজা পথের কথা বলিয়াছেন। * নবাব সাইস্তা খাঁ এই স্থানে কিয়দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার শাসন কালে যাত্রাপুর অঞ্চলে মঘের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায়, নবাব সেই অত্যাচার নিবারণোদ্দেশ্যে রুকুনউদ্দিন নামক সৈন্যাধক্ষের অধিনায়কহে এক দল নৌ-সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। মঘেরা পলায়নপর হওয়ায় সে যাত্রায় উপদ্রব নিবারিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য, পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁকে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ধৃত ও কারারুদ্ধ করায়, গোড়েশ্বর সুলতান সুলেমান মহারাজকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধ সেনাপতি মমারক খাঁকে ছাড়িয়া দিলে, যাত্রাপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এই পত্র পাইবার পূর্বেই সেনাপতিকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল, সুতরাং গোড়েশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করিবার সুবিধা ঘটে নাই। ইহার কিয়ৎকাল পরে মহারাজ বিজয় দ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই অধিকার স্থায়ী হইবার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি মধ্যবঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠনদ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রত্নপুর ;—(৫০ পৃঃ—২৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর সহরের অংশবিশেষ। এই স্থানে চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পীঠদেবীর ভৈরব। প্রবাদ আছে, এই শিবলিঙ্গটা আগরতলায় উঠাইয়া নেওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমন কি, হস্তীদ্বারা পর্য্যন্ত টানা হইয়াছে, তথাপি মৃত্তিকা গর্ত্তে প্রোথিত অংশ তোলা যাইতে পারে নাই। এই টানাটানির দরুণ বিগ্রহটা উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিয়াছেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসন কালে খনিত বিজয়সাগর রত্নপুর মৌজায় অবস্থিত । মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, স্বীয় পিতার স্মৃতি রক্ষা করলে এই স্থানের 'রাধাকিশোরপুর' নাম দিয়াছেন ।

রসাজ ;—(২৪ পৃঃ—১৭ পংক্তি) । ইহা আরাকানের নামান্তর । 'রসাজ' মুসলমানগণের প্রদত্ত নাম । পারস্য ভাষায় আরাকানকে 'আরাখজ' 'রোখাম' ও 'রোশাং' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । প্রাচীন ঘটককারিকা এবং আওয়ালের পদ্মাবতী গ্রন্থে রোশাং নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

রসাজ বা আরাকান প্রাচীন কাল হইতেই একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । আরাকানের ইতিহাস 'রাজোয়াং' গ্রন্থের মতে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য মেঘনার তীর হইতে পেশুরাজ্যের সীমা পর্যন্ত ৩৫০ মাইলেরও অধিক ছিল ।

রাজোয়াং গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুপ্রাচীন কালে কাশীর রাজবংশের কোনও ব্যক্তি আসিয়া এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন । তাহার পরলোকগমনের পর তৎপুত্র কোমি সিংহ এই রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন । বর্তমান চাঁদা সহরের সমীপস্থ রামাবতী বা রামরী নামক স্থানে তিনি রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বংশীয় পরবর্তী কোনও রাজার দশজন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার পতিত হওয়ায়, তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করেন । প্রজাগণ ইহাদের দৌরাণ্ড্যে বিরক্ত হইয়া কয়েকজনকে বধ, এবং অবশিষ্ট ভ্রাতাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল । অতঃপর তাঁহাদের এক ভগ্নী সিংহাসন লাভ করিলেন । তিনি রামাবতী হইতে রাজপাট উঠাইয়া আরাকানে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন ।

এই স্থানে মৌরিয় বংশীয়গণ এবং চন্দ্র সূর্য্য নামক রাজার অধস্তন বংশ কতিপয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন । ইহাদের পর শান বংশের অভ্যুদয় কাল । শানগণের পর পুগান দেশীয় অনুরথ নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশ অধিকার করেন ।

অনুরথ চন্দ্রবংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে করদ রাজ্যরূপে আরাকানে স্থাপন করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন । এই চন্দ্রবংশীয় রাজা পিংসা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । উক্ত করদ রাজ্যের শেষ রাজা মেণ্ডবিলু, স্বীয় মন্ত্রী কর্তৃক নিহত এবং তদ্বারা রাজ্য অধিকৃত হওয়ায়, রাজা মেণ্ডবিলুর উত্তরাধিকারী মেওরেবয়রা পুগান সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন । তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লেট্যামেঙ্ক পুগান রাজের সাহায্যে পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার রাজধানী পীরণ নগরে স্থাপিত হয় ।

ইহার পর আরাকান রাজ, হিন্দু, পর্তুগীজ এবং ব্রহ্ম-রাজের সহিত অনেকবার আহবে লিপ্ত হইয়াছেন । সেই সকল বিস্তৃত কাহিনী এ স্থলে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে ।

আরাকানের মঘগণ কিছুকাল দস্যুবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে গুরুতর অশান্তির উৎপাদন করিয়াছিল। লুণ্ঠন, নরহত্যা এবং মনুষ্য চুরি ইত্যাদি অত্যাচারে বঙ্গের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে, এ স্থলে সুন্দরবনের নাম সর্ববাঞ্চে উল্লেখযোগ্য। পর্তুগীজ জলদস্যুগণ সময় সময় ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিত।

ত্রিপুরেশ্বর ধনুমাণিক্য চট্টগ্রামের সমরক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহকে পরাজিত করিয়া রসায় আক্রমণ করেন। এ যাত্রায় তিনি রাঙ্গু, চত্রশিক প্রভৃতি থানা অধিকার করিয়া, রসায়ের (আরাকানের) কিয়দংশ হস্তগত করেন। সেই স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটি সেনানিবাস স্থাপিত ও পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নিয়োজিত ত্রিপুর সেনাপতি “রসায়মর্দন নারায়ণ” উপাধি লাভ করেন।

রাঙ্গ রঙ্গ ;—(২০ পৃঃ—১৪ পংক্তি)। ইহা লুসাই পর্বতের অন্তর্গত কুকি জাতির বসতি স্থান। এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বৈশ্যতা অস্বীকার করায় মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসন কালে, সেনাপতি রায় কাচাগ এই প্রদেশ পুনর্ব্বার বশবর্তী করিয়াছিলেন।

রাঙ্গামাটি ;—(৩ পৃঃ—১৫ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাঙ্গু ;—(২৪ পৃঃ—১৬ পংক্তি)। ইহা কক্স বাজারের প্রাচীন নাম। বর্তমানকালে কক্স বাজারের কিয়দংশ ‘রাঙ্গু’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে একটি থানা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গোপসাগরের বক্ষে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ; আদিনাথ হইতে রেঙ্গুন যাইবার পথ পার্শ্বে অবস্থিত।

রামুতে রামসীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায়, স্থানটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহে এই স্থান ‘রামক্ষেত্র’ নামে পরিচিত। সাধু সন্ন্যাসীগণ ‘রামটেক’ বা ‘রামকোট’ বলিয়া থাকেন। এই ‘রামক্ষেত্র’ কিরাত দেশের সীমান্ত বলিয়া শাস্ত্র বাক্যে পাওয়া যায়, যথা :—

“তপ্ত কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রাস্তকং শিবে।

কিরাত দেশো দেবেশি বিদ্যাতৈলেহবতিষ্ঠতে ॥”

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।

মঘ রাজত্ব সময়ে রাঙ্গু (রামু) চট্টগ্রামের Subsidiary head quarter ছিল। মহারাজ ধনুমাণিক্য আরাকান অভিযান কালে এই স্থান হস্তগত করিয়াছিলেন।

লাক্ষা ;—(৫৫ পৃঃ—১৫ পংক্তি)। ইহা একটি নদী। এই নদী লক্ষ্যা বা শীতললক্ষ্যা নামে পরিচিত। ইহার উত্তরাংশ বানার নাম লাভ করিয়াছে। এই নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখা বিশেষ। লাখপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া পলাস, মুড়াপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়া নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযান কালে এই নদী পথে গমন করিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়া ‘লাক্ষ্মী স্নায়ি’ উল্লেখে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত মুদ্রাদ্বারা জানা যায়, ইহা ১৪৮০ শকের (১৫৫৮ খৃঃ) ঘটনা।

লক্ষ্মীপুর ;—(৪৩ পৃঃ—১২ পংক্তি) । এই স্থান উদয়পুর সহরের সন্নিহিত গোমতী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই স্থান পরবর্তী কালে তিনটী নামে বিভক্ত হইয়াছে, (১) লক্ষ্মীপতি (গোমতীর উত্তর পাড়ে), (২) হীরাপুর ও (৩) মহারাণী (গোমতীর দক্ষিণ পাড়ে) । এই স্থানে অনেক দীঘি পুষ্করিণী এবং মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে।

মহারাজ বিজয়, এই স্থানে রাজ-মহিষী লক্ষ্মী মহাদেবীকে বনবাস দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম লক্ষ্মীপুর হইয়াছিল, উদয়মাণিক্যের রাণী সেই নামের পরিবর্তে ‘হীরাপুর’ নাম করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“হীরাপুর নাম পূর্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।

উদয়মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, উদয়মাণিক্যের মহিষীর নাম হীরাবতী, তিনি নিজ নামানুসারে লক্ষ্মীপুরের নাম হীরাপুর করেন।

লঙ্গলা ;—(১৩ পৃঃ—৫ পংক্তি) । ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটা পরগণা। লংলাই সম্প্রদায়ের কুকিগণের বাসভূমি বলিয়া স্থানের নাম লংলা বা লঙ্গলা হইয়াছে। মহারাজ আদিধর্ম্য ফা-এর যজ্ঞকালে উক্ত স্থান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পঞ্চককে দান করায়, কুকিগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া পর্বতভ্যন্তরে চলিয়া যায়। তদবধি লঙ্গলা ব্রাহ্মণের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

কালক্রমে উক্ত স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হয়, এই সময় পারসিক রাজ পরিবারস্থ জনৈক ব্যক্তি সংসারত্যাগী অবস্থায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি দিল্লী নগরীতে উপনীত হইলে, তদানীন্তন লোদিবংশীয় সম্রাট তাঁহার পরিচয় ও অবস্থাদি অবগত হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। সম্রাটের অকাটা অনুরোধে পরিত্রাজক, বিস্তীর্ণ ভূভাগ জায়গীর গ্রহণ করিয়া লঙ্গলা পরগণার অন্তর্গত পৃথিমপাশা গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান নির্বাচন করেন। তিনি হিন্দুর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হইতে পৃথিমপাশার বর্তমান জমিদার বংশ চলিয়া আসিতেছে। এই বংশের স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত মৌলবী আলী আমজাদ খাঁ সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালে উক্ত খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী হায়দার খাঁ ও শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী আসগর খাঁ লঙ্গলা জমিদারীর অধিকারী হইয়াছেন।

লক্ষ্মী প্রদেশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার পর ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালের কুটিল আবর্তনে তাহা পুনর্ববার মুসলমানের এবং পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূত হইয়াছে ।

লোহিত্য ;—(৫৪ পৃঃ—২০ পংক্তি) । ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের নামান্তর । মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযান কালে এখানে স্নানদানাদি পুণ্য কার্য করিয়াছিলেন ।

শ্রীহট্ট ;—(৪৩ পৃঃ—২৬ পংক্তি) । শ্রীহট্ট নাম বহু প্রাচীন । এই নামোৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । দেবীপুরাণে ‘শ্রীহটে হট্ট বাসিনী’র উল্লেখ পাওয়া যায় । তন্ত্র গ্রন্থে শিবের শত নামের মধ্যে “শ্রীহটে হাটকেশ্বরঃ” নামের উল্লেখ আছে । ভাটেরার তাম্রশাসনে “শ্রীহট্ট নাথ” নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে । এতদ্বারা শ্রীহট্ট নামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । স্মৃহৃদ্বর শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে, দেব-দেবীর নামানুসারে শ্রীহট্ট নগরীর নাম হওয়া সম্ভবপর, পরবর্তী কালে সমগ্র জেলা সেই নামে আখ্যাত হইয়াছে । * শব্দ শ্যামলা শ্রীহট্ট প্রদেশ লক্ষ্মীর হাট, এই অর্থে স্থানের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে । খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিয়েন্সাঙ্ “শিলিচটল” নামের উল্লেখ করিয়াছেন । কোন কোন ব্যক্তি বলেন, এই নামদ্বারা শ্রীহট্টকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা চট্টগ্রামের নামান্তর । এই মত বৈষম্যের সমাধান করা কঠিন ব্যাপার ।

এই প্রদেশ পূর্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল । এই ভূভাগ (১) গোড় বা শ্রীহট্ট, (২) লাউর, (৩) জয়ন্তিয়া এই তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজ মध्ये গণ্য ছিলেন । মুসলমান শাসনকালে এই প্রদেশ কখনও মুসলমানগণের এবং কখনও ত্রিপুরার হস্তগত হইতে থাকে । মহারাজ বিজয়মাণিক্য এতদঞ্চল হস্তগত করিয়া শ্রীহটে এক সেনানিবাস (খানা) সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; সেনাপতি কালানাজিরকে এই খানার অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয় ।

সরাইল ;—(২৫ পৃঃ—৮ পংক্তি) । বর্তমানকালে এই স্থান ত্রিপুরা জেলার একটা পরগণায় পরিণত হইয়াছে । পূর্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল । হোসেন শাহের সৈন্যদল সরাইলের পথ ধরিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল । ইহা মহারাজ ধনুমাণিক্যের শাসনকালের কথা । মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তাহার পুত্র রাজধর দেব দ্বারা এই স্থান প্রথম আবাদ হয় । অতঃপর ত্রিপুরার সামন্ত ঈশা খাঁ মসনদ্ আলী এই প্রদেশ শাসনের অধিকার লাভ করেন । সম্রাট আকবরের শাসনকালে সরাইলের কিয়দংশ “সতর খণ্ডল” নামকরণে সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত হইয়াছিল, অবশিষ্টাংশ ত্রিপুরার শাসনাধীন থাকিয়া যায় ।

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—উত্তরাংশ, তৃতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড ।

পরবর্তীকালে তাহার সমগ্র ভাগ ক্রমশঃ মোগল শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে ।
তৎকালেও ঈশা খাঁ মসনদ্ আলীর বংশধরগণ এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন ।

প্রথমে সরাইল পরগণা শ্রীহট্ট চাকলার অধীন থাকিলেও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের
শাসন সময়ে বাঙ্গালার নবাব সাইস্তা খাঁ কর্তৃক এই অঞ্চল ঢাকা নেজামতের অধীন
এবং নাওরা মহাল ভুক্ত হয় । * তিতাস নদীর পূর্ব দিকস্থ ভূখণ্ড তখনও
ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত ছিল, এই স্থান মহারাজ ধর্মমাণিক্য (২য়), দেওয়ান
মুরমহামুদের পুত্র দেওয়ান নাছিরমহামুদকে দান করেন । এই দান উপলক্ষে
ত্রিপুরেশ্বরের যে অলৌকিক ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পরবর্তী লহরে বিবৃত
হইবে ।

অতঃপর এই পরগণা উত্তরোত্তর নানা ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া, বর্তমানকালে
তাহার অধিকাংশ স্বর্গীয় আশুতোষনাথ রায় মহাশয়ের বংশধরগণের হস্তে পতিত
হইয়াছে ।

সাম্বুল ;—(২০ পৃঃ—১২ পংক্তি) । এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম
লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে ।

সুবড়াইখুঙ্গ ;—(৪৩ পৃঃ—২ পংক্তি) । ইহা ঊনকোটা তীরের নামান্তর ।
মহারাজ সুবড়াই (ত্রিলোচন) কর্তৃক এই স্থানে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া
তাহার নাম 'সুবড়াইখুঙ্গ' হইয়াছে । রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয় ॥
কিরাত আলে আছে ছাম্বুল নগর ।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর ॥
সুবড়াইখুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান ।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান ॥”

রাজমালা—১ম লহর, ৪২-৪৩ পৃঃ ।

সংস্কৃত রাজমালায়ও এই স্থানের উল্লেখ আছে ;—

“কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরাস্তরে ।
শিবলিঙ্গং সমাদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে ॥” ইত্যাদি ।

সুবর্ণগ্রাম ;—(৪৪ পৃঃ—১৭ পংক্তি) । নামান্তর সোণার গাঁও । বর্তমান
সময়ে এই স্থান পানাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রবাদ অনুসারে, কোনও
ত্রিপুরেশ্বর এই স্থানে বিস্তর স্বর্ণ দান (সুবর্ণ বৃষ্টি) করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম
সুবর্ণগ্রাম হইয়াছে । স্থানটী অন্ধপুত্রের প্রাচীন খাত হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী ।

* নাওরা মহাল—দ্বিতীয় আলমগীর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মঘ ও পর্তুগীজ
জলদস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গের শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ খিজিরপুরে (নারায়ণ গঞ্জের
উত্তরাংশে) 'নাওরা' বিভাগ সংস্থাপন করেন । এই সময়তরী বিভাগের ব্যয় নির্বাহার্থ ১১২টি
মহালের রাজস্ব "উমলে নাওরা" নামে নির্ধারিত হয় । তৎকালে সরাইলের জমিদার ৪০ খানা
কোষ নৌকা সংগ্রামকালে প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন ।

এখানে প্রথমতঃ হিন্দুরাজগণের, পরে পাঠানদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরীকে তৎকালে নানা উপায়ে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।

সুবর্ণগ্রাম এককালে সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে বিস্তর ধর্মবান, সাধু, বিদ্বান, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রসিদ্ধ লোকের বাস ছিল। শিল্প এবং বাণিজ্যের নিমিত্ত সে কালে সুবর্ণগ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশীয় পরিব্রাজক ইবন বতুতা এখানকার বন্দরে যাবাদীপের বাণিজ্যতরী দেখিয়াছিলেন। * এতদ্বারা এই স্থানের বাণিজ্য-বিভবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুবর্ণগ্রামের উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের বিষয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক রালফ্‌ফিচ্ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নবাব জাফর আলী খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র বার্ষিক উপঢৌকন প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে সাদা মসলিন ১০০ খানা ও সাদা সরবন্দ ২০ খানা সোণার গাঁও আরং হইতে প্রতি বৎসর সরবরাহ করা হইত। ইহার প্রত্যেকখানা মসলিনের মূল্য ২০০ টাকা ও সরবন্দ প্রতিখানার মূল্য ৮০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। † কৃষি সম্পদেও সুবর্ণগ্রাম বিশেষ সম্পন্ন ছিল। এখানকার ধান ও চাউল ভারতের বাহিরে নানা স্থানে রপ্তানী হইত।

এই স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমানগণের করগত হইবার পর মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে, সমসের গাজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য (নামাস্তুর লবঙ্গ ঠাকুর) রাজ্যভ্রষ্ট ও বিভাড়িত হইয়া সুবর্ণগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার অধ্যাসিত ভূমি অতাপি রাজবাড়ী নামে পরিচিত হইতেছে।

সোণামুড়া ;—(২৩ পৃঃ—৫ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্বদিকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী গোমতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরেশ্বরের একটা সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। এই সেনানিবাসের নাম ছিল সাভারমুড়াগড়। ‡ এই স্থান উদয়পুর রাজধানীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বর্তমানকালে এখানে ত্রিপুর রাজ্যের বিভাগীয় কার্যালয়, জেইল, ডাক্তারখানা, উচ্চ ইংরেজী স্কুল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। সোণামুড়া নগরীর পশ্চিম পার্শ্বে একটা উচ্চ ও সুদীর্ঘ মৃত্তিকার আইল ও তাহার বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ পরিখা বিদ্যমান আছে, তাহার নাম ‘গাজির কোট’। শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

* Ibn Batuta,—Translation, P. P. 194-195.

† ঢাকার ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

‡ মহারাজ নরেন্দ্রমাণিক্য মুসলমানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় চিন্তিত হওয়ার, মন্ত্রীগণ তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে পরামর্শ দিয়াছিলেন ;—

“সংরাইসের গড় ধরিবা সাবধানে।

রাজনগর সাভাড় মুড়া রাখিবা ষতনে ॥”

চম্পক বিজয়।

সোণামুড়ার বনকর ঘাট অতাপি ‘সাভারমুড়া ঘাট’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহারাজ ধনুমাণিক্য সোণামুড়ার সন্নিহিত গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া ক্রমাশয়ে দুইবার পাঠান বাহিনীকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে ।

হীরাপুর ;—(৩৯ পৃঃ—২ পংক্তি) । এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্বে সেনাপতিগণ তাঁহাকে এই স্থানে অপরুদ্দাবস্থায় রাখিয়াছিল । বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া, স্বীয় মহিষী লক্ষ্মী মহাদেবীকে এই স্থানে বনবাসে রাখিয়াছিলেন । এই স্থান উদয়পুরের পূর্ব দিকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ।

হেড়ম্ব ;—(১৭ পৃঃ—১১ পংক্তি) । এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে ।

হোমনাবাদ ;—(৩৯ পৃঃ—১০ পংক্তি) । ইহা ত্রিপুরা জেলার একটা পরগণা । বর্তমানকালে এই পরগণার কিয়দংশ নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । এতদঞ্চল ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা কালে, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের মহিষী মহারাণী পুণ্যবতী হোমনাবাদের বিস্তর ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন । এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“বিজয়মাণিক্য নাম হৈল নরপতি ।
তাঁহার মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী ॥
* * * * *
হোমনাবাদে দ্বিজে দিল বহুতর গ্রাম ।
ত্রিধিনাতে দিল গ্রাম ব্রাহ্মণ অনুপাম ॥”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড ।

হোমনাবাদ ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল । তৎকালে কায়স্থ জাতীয় দে বংশীয়গণ এই পরগণার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা “রাজা” উপাধি গ্রহণ করিতেন । এই প্রদেশ দে বংশের দৌহিত্রসূত্রে দাস বংশীয়গণের হস্তগত হয় ।

মুসলমান শাসনকালে দাস বংশীয়গণের স্থলে এখানে মুসলমান পরিবারের আধিপত্য স্থাপিত হয় । গোগল সম্রাট শাহ আলমের (বাহাদুর শাহ) সময়ে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছে । তৎকালে কররাণি বংশীয় আমির মির্জা আক্র খাঁ এই পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন । পরবর্তী অধিকারীগণের মধ্যে নবাব সাহেব ফয়জম্বেছা চৌধুরাণী, নবাব ইউছফ আলী চৌধুরী, ছৈয়দ বসরত আলী চৌধুরী, চৌহান ক্ষত্রিয় বংশীয় তিলকচন্দ্র সিংহ ও সাহা জাতীয় ভজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । এই স্থান এখনও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণের হস্তে আছে ।

অনুক্রমণিকা ।

(অ)

অক্রুর সংবাদ—১৫৪
 অগ্নিপুৰাণ—৫৪, ২১৯
 অগ্নিরা—২০৩, ২১২
 অচ্যুতচরণ চৌধুরী—৩১৫
 অজিনী জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬
 অজ্ঞান জাতীয় হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭
 অজনা—২২৩, ২২৪, ২২৫
 অদ্বৈত প্রকাশ—২২৫
 অধীর জাতীয় হস্তী—২২২, ২২৩
 অনন্য—৬১, ৬২, ২৫০
 অনন্তমাণিকা—৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৮৮, ৮৯,
 ৯০, ৯১, ১০২, ১১৯, ১৩২, ১৪৯, ১৬৮,
 ১৭০, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২০৩,
 ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৬০, ২৭৮
 অনুমতি—২০৫
 অনুরথ—৩১২
 অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৮
 অন্নপূর্ণা—৩৪
 অন্নপূর্ণা বিগ্রহ—২৯৯
 আবাকু দূত—৫৫
 অভিচার—২৩, ১০৩, ১৪৩
 অভিযান—১২৪, ১২৭, ১৩৬, ১৫১, ১৬০,
 ৩১৪, ৩১৫
 অমঙ্গলসূচক চিহ্ন—৭০, ১৩৩
 অমরকোট—২৫১
 অমরহস্ত নায়ায়ণ—১২১
 অমরপুর—২৭৭, ২৭৯, ৩১০
 অমরমাণিকা—১, ৩৩, ৬৯, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮১,
 ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ১০৩,
 ১০৭, ১২১, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ২৫০,
 ২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫,
 ২৭২, ২৭৯, ৩০৬, ৩১৫
 অমরসাগর—৮৩
 অমরাবতী মহাদেবী—১২১

অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ—১১৩
 অরিভীম নায়ায়ণ—৬৮, ৬৯, ৭২, ১২১, ১৩৩,
 ২৫১, ২৫৩
 অর্জুন—৫৩, ১৬১
 অখারোহী—৪৭, ১০৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮,
 ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৬
 অষ্টদিগ্গজ—২২০, ২৩৭
 অষ্টমঙ্গল হস্তী—২২২, ২২৩
 অষ্টাঙ্গ মৈথুন—২০৫
 অহোম জাতি—১৬১, ২৬৭, ২৬৯
 অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৩০৮

(আ)

আইন—১৫৮
 আইন-ই-আকবরী—১১৭, ১২১, ১৮০, ২৪৯,
 ৩০০
 আইন-ই-তিরহুত—২৮৫
 আইন ব্যবসায়ী—১৫৮
 আকবর নামা—৩০৩
 আকবর বাদশাহ—৫৩, ১১৭, ১২১, ১৩২,
 ১৮০, ২০৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ২৬০,
 ২৮৬, ৩০০, ৩১৫
 আকামাদেক—২৭৭
 আগরতলা—১৮৪, ২৭১, ২৭৯, ৩০৩, ৩১১
 আশুয়ান নায়ায়ণ—৬৯, ১২১, ১৩৩, ২৫১,
 আশ্বেস্তা—১২৩, ১২৪
 আচক নায়ায়ণ—২৮৩, ২৮৪
 আজিম ওসমান—৩০০
 আঠারমুড়া পর্কত—১১৫, ২৭৭
 আড়িমাও—২৬৮
 আতরের ব্যবহার—১৬৯
 আতল্ছি খোজা—২৪৯
 আআরাম—৪৩, ২৬৭
 আদালত—১৫৮
 আদিধর্ম পা—২৮৮, ৩১৪

আদিনাথ তীর্থ—৩১৩
 আদিশূর—১৮৯, ২৭৩, ৩০৫
 আনন্দনাথ রায়—৩০৭
 আনন্দনারায়ণ রায়—২৭০
 আফ্রিকা—৩১৭
 আবিহুই—২০৭
 আবুতোরাপ—৩০৮
 আবুলফজল—১১৭, ১২১, ১৮০, ২৪৯
 আক্রমণ—৩১৮
 আমিরদীন দারোগা—৩০০
 আমীর—১২২
 আমানী—২৪০, ২৪১
 আরাকান—১১২, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ২৬৩,
 ২৮০, ২৯৭, ৩১২
 আলঙ্কার—২২৭
 আলমগীর (২য়)—৩০০, ৩১৬
 আলানন্দী—৩০১
 আলী আমজাদ খাঁ—৩১৪
 আলীআসগর খাঁ—৩১৪
 আলীহায়দর খাঁ—৩১৪
 আশুতোষ রায়—৩১৬
 আসরকপুর—২২০
 আসরকপুরের তাম্রশাসন—১৮৮, ১৯০
 আসাম—২৪, ১০৮, ১১৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯,
 ২৮৭, ৩০৪

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে—১১৫

(ই)

ইংরেজ বণিক—২৬৯
 ইউরোপ—২০৭
 ইউসফ আলী চৌধুরী—৩১৮
 ইক্কাম নোজনাবাদ—১২৮
 ইজিট—৭৪, ৯১, ১৪৩, ১৭০, ১৭১, ২৬৩
 ইছামতী—৫২, ৫৫, ১৩১, ২৬৯, ৩১১
 ইটা—৫৭, ৮৪, ১০৭, ২৬১, ২৭০, ২৭১
 ইদিলপুর—১৯০, ২৯১, ৩০২
 ইদিলপুর লিপি—২৯২
 ইম্মানগর—২৭০

ইন্দোখর—২৭০
 ইন্দ্র—২৩৭
 ইন্দ্রমণিক্য—৩৭, ৩৮, ৮৭, ৮৯, ১১৯, ১৪১,
 ১৪৯, ১৫২, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮১
 ২৫১, ২৫৬, ২৬০, ২৬৪, ২৭৫
 ইবন বতুতা—৩১৭
 ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—১৬৯, ২৭৭
 ইকু নদী—২৬৯

(ঈ)

ঈশা খাঁ—২৭১, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
 ঈশান দেবের তাম্রশাসন—১৯১

(উ)

উইলসন্—২০৭
 উইলিয়ম বেটিক—২০৮
 উজীর—৪৫, ৪৬, ১৪৩, ১৫৭, ১৬৬, ১৮৪
 ২৫৮, ২৫৯
 উজ্জয়িনী—৩০২
 উৎকল—৩৯, ১৯১, ২৭১
 উৎকল খণ্ড (পাঁচালী)—২৯, ৯১, ২৫৭
 উৎকল হস্তীর সংগ্রহ—২২২
 উড়িয়া রাজা—২৬১
 উড়িয়া নারায়ণ—৬৯, ৭১, ১২১, ১২৩, ১৩৩
 ২৫০, ২৬০
 উড়িয়া—৪৬, ৬১, ৬২, ১২৯, ২৫৫, ২৫৬,
 ২৬০
 উদয়পুর—৬৮, ৯২, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৬,
 ১০৭, ১২২, ১২৭, ১৩৫, ১৪৯, ১৫১,
 ১৭০, ১৯১, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬,
 ২৫৮, ২৬৩, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৯,
 ২৮১, ২৮২, ৩০১, ৩১০, ৩১১, ৩১৪,
 ৩১৭
 উদয়মণিক্য—৪৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৮, ৯০,
 ৯৯, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৩,
 ১৩৪, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৭০, ১৭৯, ১৮২,
 ১৮৩, ১৮৪, ২০২, ২৫০, ২৫১, ২৫৩,
 ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৬০, ২৬৩, ২৬৫,
 ২৭১, ২৭৮, ২৮৮, ৩১৪
 উদয়মণিক্য—(ভূমুখা)—৩০৬
 উদাস হস্তী—২২০

উপনিষদ—১০৮

(ক)

উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ—২৯১

উবাকের—২১

উমলে নাওরা—৩১৬

উমাকান্ত দাস—২০৯

উদ্বাপাত—৭০, ১৩৩

কচুরা ছড়া—৭৫, ২৭২

কঙ্কগিরি—২৬৭

কড়িমুদ্রা—৫০, ১৬৫

কণ্ণমুনি—৭৮

কথাসরিৎসার—৩০২

কদ্বা—১৭১, ১৭২

কনকরচিত পত্র—৫২

কনোগিজ—২৭৩

কন্দর্প নারায়ণ—৩০৭

কন্যাপণ—১৭১

কন্যা-যৌতুক প্রথা—২৯৫

কল্পবাজার—৩১৩

কপিল (মহর্ষি)—১০৮, ১০৯, ১১৫

কপিল তীর্থ—১০৮, ১০৯

কপিল-লিঙ্গ শিব—১১৪

কপিলাশ্রম—১০৮, ১০৯, ১১৫

কপিলি নদী—২৬৮

কবরা উপাধি—২৫৮

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম—৮৬

কবি কল্পলতিকা—২১৯

কবি চন্দ্র গাঁ—৩০৬

কমলপুর—২৮০

কমলাকনগর—২৯৪

কমলা—৯, ৩৪

কমলা কুণ্ড—১১৫, ১১৬

কমলাক রাজ্য—২৯৬

কমলা মহাদেবী—৮, ৯, ১৭, ২৯, ৩৩, ৮৬, ৮৭, ৯১, ১০১, ২০৩, ২৫২, ২৭৫

কমলালেবু—২৭৭

কমলাসাগর—৯, ১০১, ২৫২, ২৭৫

কমিং সাহেব—৮৩, ১৩২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩

কমলার ধনি—১৫৫, ২৭৪

করতোয়া—২৬৭, ২৬৮

করমসুন্দর—২৯০

করলীয়া টিলা—২৩৯

(উ)

উনকোটা ছড়া—১১৪

উনকোটা তীর্থ—৫৯, ৮৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ২৭২, ২৭৪, ৩০৯, ৩১৬

উনকোটা তীর্থ মাহাত্মা—১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ২৭৪, ৩০৯

উনকোটা পর্বত—১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২

উনকোটাশ্বর শিব—৫৯, ১১১, ১১২

(ঋ)

ঋগ্বেদ—১৫৪

(ঊ)

এওলাতলী—২৭০

একাব্বর—৫৩, ২৫১,

একাব্বরী মোহর—৫৩

এল্ফিন্ স্টোন—২০৭

(ঋ)

ঐরাবত হস্তী—২২০, ২৩৭, ২৩৮

(ঋ)

ঐরাই—১৬৩

ঐথার নৌকা—১১৮

ঐডরিক সাহেব—২৭০

ঐমরাহ—১২১

ঐয়াইজ সাহেব—২০৬, ৩০৫

ঐয়াটস্ সাহেব—৩০২

ঐয়াথলং—১৭২

ঐলদাজ—১৩৭, ২৭৯

(ঊ)

ঊরুজ্জৈব—২৬৯, ৩০০, ৩১৬, ৩১৭

- করা খাঁ—২৪, ২৮, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ২৫২, ২৬৬
কর্ণাল—৬৪
কর্দম মুনি—১০৮
কলমীগড়—৭৩, ২৭৩
কলাকোপা—১৩১, ১৪৪
কলাহাওর—২৭৪
কলিমা—৫১
কলিন্দবর্ষা—২৬৮
কলিনিপুত্র—২৭৩
কল্যাণমানিকা—৮২, ১০০, ১০১, ২৭১
কল্প তরু—৫৯, ১০২, ২০৪
কসবা—৯, ৯২, ১০১, ১২৭, ১২৮, ২৫২, ২৭৫
কাংশ বনিক—১৫৩
কাকচাঁদ—১৫২, ২৭৪
কাক জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬
কান্ধলাই পর্বত—২৭৫
কাঁচলি—১৫৩, ১৫৪
কাছাড়—৯৮, ১০৯, ১৬১, ১৮০, ২৬৮
কাছুরা কুণ্ড—১১৫, ১১৬
কাঠিছোঁয়া—১৬, ১৪৬
কাতাল—১৫২
কানিংহাম সাহেব—৩০২
কান্ঠকুজ (কনোজ)—৩, ৯২, ২৫২, ২৭২, ২৭৩
কাফির—৫১
কাফুরী খোজা—২৪৯
কামতারপুর—২৬৬, ২৬৯
কামরূপ—১২৬, ২৬২, ২৬৭
কামরূপবুরুজী—২৬৮
কামাখ্যা—৩৪, ২৬৭
কামাখ্যা দেবীর মন্দির—২৬৮
কামান—১২৩, ১২৪
কামাল খাঁ—২৭১
কামেশ্বর বাঁ—২৮৬
কারাদণ্ড—১৫৮
কার্তবীৰ্য্যার্জুন—২৬১
কার্পাস—১৫৩, ২৭৪
- কালভৈরব—১১১
কালভৈরবের মন্দির—২৯৯
কালী খাঁ—৪, ১৫৬, ১৫৭, ২৫২
কালানাজির—৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২৯, ১৩০, ২৫২, ২৫৩
কালাপাহাড়—১১২
কালিকা—২৯, ৩০, ৭৬, ১০৫
কালিকাপুর—২৩৯, ২৪১
কালিকা পুরাণ—১০৩, ১০৪, ২১৯, ৩০৪
কালিয়াজুড়ি—২৫২
কালী—৩৪
কালী নদী—২৭২
কালীবিলাস তন্ত্র—৩৪
কালুয়া ছড়া—৭৭, ২৭২
কাশী খণ্ড—২৪৮
কাশীরাম দাস—৮৬
কিংলাক সাহেব—১৬৯
কিন্নর—৩৬
কিরাত—২০, ৩২, ১৫৫, ১৬২
কিরাত দেশ—১১৩
কিরাতভূবন—২০, ৩১
কিশোরী ভজন—২৪০
কীৰ্ত্তিনাশা—১৩১, ২৮৯
কীৰ্ত্তিপুর—১৬১
কুকি—১৭, ২০, ২১, ৩১, ৩২, ১১৫, ১১৮, ১২৫, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ২১৫, ২৪৮, ২৭৪
কুন্‌কী হস্তী—২১৮
কুন্তি—২০৩
কুমার—১০৭
কুমিল্লা—৫, ৯২, ১২৬, ১৮৯, ২৪২, ২৫২, ২৫৭, ২৫৯, ২৭১, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬, ২৯৯, ৩১৭
কুমুদ জাতীয় হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭
কুরুক্ষেত্র—২৬৮
কুর্ষ পুরাণ—৩০৪
কুলচুরি বংশ—২৭৩
কুশ—২৭৩

কুশনাত—২৭৩
 কুশপুত্রল—১০৫
 কুশিয়ারা নদী—৩০৯
 কুটনীতি—১৫৯, ১৬০
 কুতি (রাজা)—২৮৫
 কুন্তিবাস—১৫৪
 কুন্তিবাসী রামায়ণ—১৫৪
 কৃষ্ণকর্ণামৃত—৮৬
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—৮৬
 কৃষ্ণমণি যুবরাজ—২৪৩, ২৭৫
 কৃষ্ণনাগিক্য— ১৬৯, ২১৭, ২৪৩, ২৭১, ২৭৫
 কৃষ্ণমালা—১৬৯, ২৭৫
 কেওলিনেব খনি—১৫৫
 কেদার রায়—১৩১, ২৮৯, ৩০৩
 কেরোসিনের খনি—১৫৫
 কেশরলাল—১৬৮
 কেশব সেন—১২২
 কেশব সেনের তাম্র-শাসন—১২০, ১২১,
 কৈলা (কৈলাসহব)—১৩, ১০৭, ১০৯, ১১৩,
 ১১৪, ১২৫, ১৫২, ১৫৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৪,
 ২৮০, ৩০৯
 কৈলাগড়—৫, ২৫, ৫৭, ৯২, ১২৭, ১২৮, ১৩১,
 ২৭৫
 কৈলাসচন্দ্র সিংহ—৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২১, ১২৮,
 ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৬১, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮,
 ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২৮৯,
 ৩০১, ৬০৬
 কৈলাস বাবুর রাজমালা—১২১, ১২৮, ১২৯,
 ১৩২, ১৬১, ১৮২, ২৮৯, ২৯৫, ৩০১
 কোচ—২৪, ২৬৯, ২৭৫
 কোচবিহার—২৬৭
 কোন্দা নৌকা—১১৭
 কোমি সিংহ—৩১২
 কোল জাতি—২৪৮
 কোষ নৌকা—১১৭, ৩০০, ৩১৬
 কোতুক ব্রাহ্মণ—৩, ৪, ৫, ৯২, ৯৩, ২৫২
 কোতুক ব্রাহ্মকর—৩০৭
 ক্রমদীপ্তর—২২৮
 ক্রীতদাস—২৪৯

(খ)

খঞ্জরাজ খাঁ—১২৮
 খড়গ— ১২২, ১২৩, ১২৪, ২৬৫
 খড়গবাজ—২৯০
 খড়গরায়—২৫, ১২৭, ২৫২
 খড়গ বংশ—২৯০
 খড়গোত্তম—২৯০
 খণ্ডল—১৩, ১৪, ১৫, ৭০, ১২৫, ১৩৩, ১৫০,
 ১৫৭, ১৫৯, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৩, ২৭৬,
 ২৭৮, ২৮২
 খনিজ পদার্থ—১৫৫
 খরজাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫
 খচ্ছুং (খছুং)—২০, ২৭৫
 খসজাতি—১৬১
 'খাঁ' উপাধি— ১২০, ১৫৬, ১৫৭, ৩০৬
 খাজুড়িয়া—২৪১
 খাজে আলীমিঞা—৩০০
 খাটি পুষ্করিণী—৭৫
 খাড়াইত—৫৮, ১২২, ২০০, ২৬৫
 খামাচেব—২০, ২৭৭
 খামাবাছল—২০, ২৭৭, ২৮০
 খাস আপীল আদালত—১৭২
 খাসিয়া—৪৩, ৪৪, ৪৫, ১২৯, ১৫০, ১৬০,
 ১৬১, ২৬৭, ২৭৭
 খ্যানসিস্—২৯৭
 খিজিরপুর—৩১৬
 খিতং—৫১
 খুচুং কুকি—২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৭৫, ২৭৬
 খুচুংদর্প নারায়ণ—২৭৬
 খুলনা—১১৭
 খোইশিব—৩০৯
 খোজা—২৩, ২৪৮, ২৪৯
 খোদা—৫১, ৫৪
 খোয়াই—২৮২
 খোয়াজ মোল্লা—২৪১
 (গ)
 গগন খাঁ—৪, ২৫, ১২৭, ১৫৬, ১৫৭, ২৫২,
 ২৫৩

- গঙ্গা—১৩১, ১৫১, ২৬০, ২৭২, ৩১০
 গঙ্গানগর—২৫, ২৭৫, ২৮৭
 গঙ্গামণ্ডল—১৩, ১২৫, ১৫০, ২৫০, ২৫৬,
 ২৭৭
 গঙ্গদত্ত—২১, ১৬৪, ২১৫, ২১৮
 গঙ্গদত্তের পাটী—১৫৩
 গঙ্গমুক্তা—২১৯, ২২০, ২২২
 গঙ্গভীম—৪৮, ৫৩, ৬৯, ১২১, ১২৩, ১৩৩,
 ২৫৩
 গঙ্গুকী নদী—২৮৫
 গঙ্গাভীম—৬৫, ৬৬, ৯০, ১৬৮, ২৫৩, ২৬০
 গঙ্গপতি বিগ্রহ—১১১
 গঙ্গপতি রায়—৩০৬
 গঙ্গীরবেদী হস্তী—২২৩
 গঙ্গুধ্বজ—৬৮, ৬৯, ১২১, ১২২, ২৫৩
 গঙ্গু পুরাণ—২১৯, ২৯৯
 গবয়—১৯, ২১, ১৬২
 গাজিনামা—২
 গাজির কোট—৩১৮
 গাধি (রাজা)—২৭৩
 গাধিপূর—২৭৩
 গার্গ্য—২২২, ২২৭
 গার্গ্য সংহিতা—২১৯
 গিয়াসউদ্দীন—২৮৬
 গুণ্ডা হস্তী—২১৫
 গুণৈনছা—২০
 গুণ্ডচর—৫৫
 গুণ্ডবংশ—২৭৩
 গেইট সাহেব—১৬০, ১৬১, ২৪৯
 গোধিকা—১৮, ১৯
 গোপীপ্রসাদ নারায়ণ—৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭,
 ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১৯,
 ১২১, ১৩২, ১৬৮, ১৭০, ১৮১, ১৮২,
 ২০২, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫,
 ২৬০, ২৭৮
 গোমতী—২২, ২৩, ২৭, ২৯, ৬১, ১০৫, ১১৫,
 ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ২৪২,
 ২৫৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৬,
 ২৮৭, ৩০৯, ৩১০
 গোয়ালপাড়া—৩০৪
 গোয়ালন্দ—২৮৯, ৩১১
 গোলন্দাজ—১১৬, ১৩০
 গোলাম আলী জমিদার—৩০১
 গোবর্দ্ধন কবরা—২৭৬
 গোবিন্দচন্দ্র (হেড়ম্বেশ্বর)—১৫৮
 গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচাঁদ রাজা)—২৬১, ২৯৬,
 ২৯৮, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭
 গোবিন্দচন্দ্রের গান—২৯২, ২৯৩
 গোবিন্দ দাস—৮৬
 গোবিন্দমাণিক্য—২৯৯
 গোবিন্দমাণিক্য (ভুলুয়া)—৩০৬
 গো-বীজ টিকা—১৫২
 গো হত্যা—২৮৩
 গোড়—১৩, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৫২,
 ৬৯, ১০৫, ১২২, ১২৬, ২৭৮, ২৯২, ২৯৩,
 ২৯৪, ২৯৫,
 গোড়গোবিন্দ—২৮৩
 গোড়মল্লিক—২২, ২৩, ২৪, ১২৬, ১৩৫, ২৪৮,
 ২৪৯, ২৫৪
 গোড়েশ্বর—১২, ১৩, ১৪, ২২, ২৮, ৪৬, ৫০,
 ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬৯, ৭১, ১২৪, ১২৫, ১২৬,
 ১২৯, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০,
 ১৮২, ২৪৮, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৬,
 ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩১১
 গোরলেখমালা—২৯১
 গৌরা কামার—২৬৯, ২৪০, ২৪১
 গৌরীচরণ—১৬৮
 গৌরীনাথ সিংহ—২৬৯
 গৌহাটী—২৬৮, ৩০৪
 গ্যাসপারো—২০৭
 গ্রাম্য গীতি—৩২, ২৭৪
 গ্রাম্যছড়া—২৩৮
 গ্রীয়ারসন্ সাহেব—২৯২, ২৯৬
 গ্রীশ—২০৭
 (ঘ)
 ঘটককারিকা—৩১২
 ঘাটলা—৭০, ২৭৮

শুভাচি অঙ্গরা—২৭৩

যোদ্ধা—২১

শোভা—২১

(চ)

চক্র—৩৫, ১০৩

চট্টল—২২, ৩০, ৪৪, ৭০, ৭১, ১২৬

চট্টলের তাম্রশাসন—১২১, ১২৩

চট্টেশ্বরী—৩০

চডিলাম—২৭২

চণ্ডাল বলি—২৪

চণ্ডিগড়—২৩, ১২৬, ১৭০, ২৭৮

চণ্ডীকাব্য—৮৬

চণ্ডীমুড়া—২২০

চতুর্দশ দেবতা (চৌদ্দ দেবতা)—২০, ২৮, ২৯,
৩১, ৪৬, ৫০, ৫১, ৮৭, ১০৫, ১৩০, ১৩৭,
১৪৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৮৭, ৩১১

চতুর্দাল—৩৮, ৬৪, ৭৩

চস্তাই—৩৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৬১, ৮৭, ১৭২,
২৫৬

চক্র—১, ১১১, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০

চন্দ্রকান্ত বসু—৯৮

চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ—৬৮, ১০২, ২৭৮

চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য—২২৮

চন্দ্রদর্শি নারায়ণ—৬৯, ১৩৩, ২৫৪

চন্দ্রদ্বীপ—২৯১, ৩০৭

চন্দ্রনাথের মন্দির—২২৯

চন্দ্রপুত্র—৬৮, ১৭০, ২৫৫, ২৭৮

চন্দ্রপ্রকাশ—৩০২

চন্দ্রবিভাগ—২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৬

চন্দ্র রাজবংশ—২৭৩

চন্দ্রেশ্বর বিগ্রহ (চন্দ্রনাথ)—২২৮, ৩০৫, ৩০৭

চন্দ্রশেখর পঞ্চ—১১৩

চন্দ্রসেন—৬৮, ১০২, ২৭৮, ২৭৯

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ—৬৯, ১২১, ১৩৩, ২৫৪

চন্দ্রসুর্গা রাজা—৩১২

চন্দ্রোদয় বিগ্রহবিনোদ—৯৮, ১১২

চন্দ্রক রায়—১৬৮

চন্দ্রক বিজয়—১৬৯

চন্দ্রপারগা—২৮৫

চন্দ্রখা—১৮, ১৩৮

চন্দ্রাল কুন্কা—২১৫

চন্দ্র (ঢাল)—১২২, ১২৩, ১২৪, ২৬৫

চন্দ্রিশ পরগণা—১১৭

চন্দ্রলে রোশনানাদ—৮৩

চন্দ্রমা—২১৫

চাটি—২৭২

চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম)—২২, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৩,
৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৬৯, ৭০, ৭৭, ৯৫,
১১৮, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০,
১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৪,
১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৭,
১৮১, ১৯৩, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪,
২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৩,
২৬৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৪,
২৯৯, ৩০১, ৩০৭, ৩১১, ৩১৫

চাণ্ডাল নদী—২৪৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৮,

চাঁদপুত্র—২২০

চাঁদ রায়—১৩১, ২৮৯, ৩০৩

চাঁদাসহব—৩১২

চাপলেন্ সাহেব—২০৬

চাপিয়া খাঁ—১৫৭, ২৫২

চামুণ্ডা ঙ্গ—৩৪

চিতাগাও—২৭২

চীন দেশ—১৫৪, ১৫৫, ২০৭

চৈতন্য চরিতামৃত—৮৬

চৈতন্য ভাগবত—৮৬

চৈতন্য মঙ্গল—৮৬

চৈতন্য—৩০২

চৌবগঙ্গা—২৬২

চৌদ্দগ্রাম—২৩৮, ২৮৩

‘চৌধুরী’ উপাধি—২২৭

চৌমাল্লিশ—৫৮, ২৬৫, ২৭০, ২৭৯

চৌহাটিয়া—৭৪, ৭৫, ২৭৯

(ছ)

ছবিয়া গড়—২৫, ১২৭, ১৩৬, ২৫২, ২৫৩,
২৮০

ছকডিয়া ঘাট—২৮, ২৭৯

ছত্রশিক—২৪, ১২২, ২৮০
 ছনগাঙ্গ—২৬, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৯
 ছয়ঘরিয়া বাড়ী—২৭৯
 ছয়চিরি—২৭০
 ছাইবেম্—২০, ২৮০
 ছাইমা জাতি—২৮৬
 ছাইমা নদী—১১৫, ২৭৭
 ছাইমার—২০, ২৮০
 ছাকাচেব—২০, ২৮০
 ছাকারাজল—২০, ২৮০
 ছাগ—২১
 ছাগলনাইয়া—২৪১
 ছাতাচূড়া পর্বত—২৭৭, ২৮০
 ছান্দলী খোজা—২৪৯
 ছামথুম্ খাঁ—৪, ১৫৬, ২৫৪
 ছাম্বুলনগর—২০, ২১, ১১৩, ১১৪, ১৫৭, ২৭২,
 ২৭৪, ২৮০, ৩১৬
 ছিন্নমস্তা—৩৪
 ছুটি খাঁ—১২৮
 ছুটি খানের মহাভারত—১২৮
 ছুটিয়া জাতি—২৬৮
 ছেংথুম্ ফা—১৪৫
 'ছেকাল্'—২৪৬
 ছেদযোগ—৬১, ২৫৫, ২৬২
 ছৈয়দ নাসির উদ্দিন—২৮৩

(জ)

'জগদীশ্বরী' উপাধি—১০০
 জগন্নাথ (বিগ্রহ)—৩৯, ৬২, ১৫১, ১৯১
 জগন্নাথ দীঘী—২৮৪
 জটিল জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬
 'জনক' উপাধি—২৮৫
 জনার্দন সেনাপতি—২৭৬
 জব্বীপ—২০৭
 জমদগ্নি—২৬১
 জয়চন্দ্র—২৭৩
 জয়ন্ত চত্বাই—২৪৩

জয়ন্ত্যা (জয়ন্তিয়া)—৪৪, ৪৫, ১১৯, ১২৯,
 ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৮০, ২৫৭, ২৮০,
 ৩১৫
 জয়ধ্বজ সিংহ—২৬৯
 জয়মানিক্য—১, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮৮,
 ৯০, ৯৯, ১০৩, ১১৯, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১,
 ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ১৮৪, ২৫০, ২৫৪,
 ২৬৩, ২৬৫
 জয়া মহাদেবী (জয়াবতী)—৬৭, ৮৮, ২০৩, ২৫৪
 জয়প (মুদ্রা)—৩১, ৫৫, ১৫৫, ১৬৪, ১৬৫,
 ৩১৪
 জলদস্যু—৩১৩, ৩১৬
 জলপাইগুড়ি—২৬৭
 জলপ্রপাত—১১৫, ১১৬
 জহর ব্রত—২০৬
 জাজিনগর—১২৮
 জাঠা—১২২, ১২৩, ১২৪
 জাত খজা—২৯০
 জাফর আলী খাঁ (নবাব)—৩১৭
 জামাল খাঁ—২৭১
 জামাল খাঁ পল্লি—৭১, ৭২, ১৩৪, ২৫৫, ২৫৮
 জানির খাঁ গড়—২৫, ১২৭, ১৩৬, ১৫৭, ২৫২,
 ২৫৩, ২৮০
 জায়গীর—১৭০
 জায়জ জাতীয় হস্তী—২১৯
 জাহাঙ্গীর—২৪৯
 জাহ্নবা মহাদেবী—২৯৫
 জাহ্নবী—৫৫, ১৩১, ১৫১, ২৮১
 জিনারপুর—৫৭, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৪
 জেনিজারি সৈন্য—১৪৪
 জৈমিনী ভারত—১৬১
 জোঙ্গল বলহ—২৬৮
 জোয়ানসাহী—২৮৩
 জোঙ্গ সাহেব—২০৮
 জ্যোতিস্তম্ভ—২৯৯

(ট)

টলেমি—২৭৩
 টেভার্নিয়ার—১৫৫, ৩১১

(ঠ)

ঠাকুর' উপাধি—৩৫৮

(ড)

ডগব — ৪৪, ৪৫, ১১৯, ১৬০

ডবা নাম—৬৯, ২৮২

ডাইন—৩৬, ৩৭, ২৪৬, ২৫৯, ২৬০

ডাক্তর ফা— ১৭, ৫৯, ২৫৫, ২৮২

ডিক্রগড়— ৩০৪

ডুকু তীর্থ— ৬১, ১০৬, ১১৫, ২৮৩

ডুকুর ফা— ৬১, ৬২, ১১৫, ২৫০, ২৫৫, ২৬২

ডুমবি ফল— ১১৫

ডুয়া - ৬১, ১০৬, ১১৫, ২৭৭, ২৮৩

ডোমবাউ— ২৫, ১২৭, ১৩৩, ২৮২, ২৮৭

(ঢ)

ঢাকা - ৮৩, ১০৩, ১০৭, ১৩৭, ১৬৯, ২১১,

২৮৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩

ঢাকার ইতিহাস— ২১১, ২১২, ৩০৩

ঢাকা মাঠি বা পাঠক— ২১৩

ঢাপা— ৪৬, ১০৪

ঢোম— ৪৫, ১১৯

(ড)

ডাক্তর - ৩৫

ডাক্তার - ৩৪

ডাক্তার - ১৯, ২১৩

ডাক্তার - ৫৭, ৮৩, ৮৫, ১৮৩, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৪

ডাক্তারের ইতিহাস— ২৮৩

ডাক্তার - ৩৪

ডাক্তার - ২৮২

ডাক্তার - ৫, ৬, ৩৯, ৫৯, ৬০, ৮১, ৯২, ১৮১, ২৯০, ২৯১

ডাক্তার - ৬১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১৭৫, ১৮৫, ১৯০, ২৮৯, ২৯১, ২৯২

ডাক্তার - ১৮২

ডাক্তার - ১৮৪

ডাক্তার - ১৮৭

ডাক্তার - ১৯১

ডাক্তার - ১৯১

ডাক্তার - ১৮৪

ডাক্তার - ১৮৪

ডাক্তার - ২১

ডাক্তার - ৩৪

ডাক্তার - ১৫

ডাক্তার - ৩০৩, ৩১৬

ডাক্তার - ৫

ডাক্তার - ৯২

ডাক্তার - ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫

ডাক্তার - ১১৮

ডাক্তার - ৩৯, ২৫৮, ২৮৩, ২৮৪

ডাক্তার - ৫৪, ১১৬, ১১৭, ১৩৩

ডাক্তার - ৮৩

ডাক্তার - ১০৬

ডাক্তার - ১১২

ডাক্তার - ২৬, ১৩৬

ডাক্তার - ১৮৪

ডাক্তার - ২১৯

ডাক্তার - ২৯

ডাক্তার - ৫৯, ৭৩, ১০২

ডাক্তার - ৩০৪

ডাক্তার - ২৬, ২৭

ডাক্তার - ১১৩

ডাক্তার - ২৭৮

ডাক্তার - ৩৭০

ডাক্তার - ১, ২৩১, ২৩০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০

ডাক্তার - ১০১, ১০৩, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২৫৫, ২৬৮

ডাক্তার - ৩, ১৭, ২৪, ২৬, ২৮, ৫২, ৮৫, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৫৬, ২৪৮, ২৭৫

ডাক্তার - ২৭১

ডাক্তার - ৫৭, ২৮২, ২৮৪

ত্রিপুরার জাঙ্গাল—৫৭, ২৮২, ২৮৪
 ত্রিপুরার পুরী—১৯
 ত্রিপুরাসুন্দরী (বিগ্রহ)—৩০, ৯৫, ১০৩, ১০৫,
 ২৫৭, ২৭১
 ত্রিপুরাসুন্দরী (রাণী)—১৪৫
 ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির—৩০, ৭৬, ৯৫, ১৭৭,
 ২৫৭, ২৬৩
 ত্রিলোচন—১০, ৮৮, ১১৩, ১১৪, ১৫৪, ২৫৫
 ত্রিহত—২৯, ৮৯, ২৫৭, ২৮৫, ২৮৬
 ত্রেতাযুগ—১৮৫
 ত্রৈলোক্যচক্র—২৯২, ২৯৩

(খ)

খাংচাক্র—৩২, ১৫৫
 খাংচাচেপ—১৬২
 খানা—১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩,
 ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ১২৯, ১৩৭, ১৪৪,
 ১৪৫, ১৫৫, ১৬৫, ২৬৬
 খানাদার—১৯, ১৪৫
 খানাংচি—১৭, ১৮, ১৯, ২০, ১২৫, ১৩৫,
 ১৩৭, ১৫০, ১৬৫, ২২৯, ২৬৪, ২৮৬
 খুনাই—৭৫, ২৮৬
 খেপ—২০৭

(ঙ)

ঈরঙ্গ—২৬৯
 ঈরবারের বিশেষ নিয়ম—১৫৯, ১৬৯
 ঈশ মহাবিদ্যা—১১২
 ঈশ সেনাপতি—৪, ৭, ৯, ১২
 ঈক্ষিণ বাজু—৪৩, ৪৭, ২৮৭, ৩০১
 ঈক্ষিণ শিক—২৩৮
 ঈড়রা—৬৯, ২৭৮, ২৮২
 ঈনকেলী—১৫৪
 ঈনসাগর গ্রন্থ—৫৯
 ঈনোদর দেব—৬০, ১৯৩
 ঈনোদর দেবের তাম্র-শাসন—১৯১
 ঈয়ুদ শাহ—৫৩, ১৩০, ১৩২, ১৫১, ১৮১,
 ২৫৫, ২৫৬, ২৬১
 ঈয়ুগা কুকি—২৭৫

ঈথিজয় প্রকাশ—৩০২
 ঈব্যচক্র—৩৫
 ঈব্যভাব—৩৪
 ঈল্লী—৫২, ৫৩, ১৩২, ২৭১
 ঈক্ষু নদী—২৬৭
 ঈঘী নালা—২৮৭
 ঈন জাতীয় হস্তী—২২৪
 ঈনেশচক্র সেন—২৯৬
 ঈধ-পুষ্করিণী—২৭৩
 ঈন্দুভি—৬৪
 ঈবড়া—১৫৩
 ঈরাশা—৩৩
 ঈর্গ—১৪৪, ১৪৫
 ঈর্গসমূহের নাম—১৪৪
 ঈর্গামঙ্গল—৫৩
 ঈর্গামাণিক্য—১০০
 ঈর্গোৎসব—১৯, ১৪৮
 ঈর্গোৎসব তত্ত্ব—১০৪
 ঈর্জয় দেব—১৬৮
 ঈর্ভিক্ষ—৭২, ১৫১, ১৫২
 ঈর্ঘোধান—২৬৮
 ঈর্ভ চম্ভাই—৫০, ৬১, ২৫৫, ২৬০
 ঈর্ভ নারায়ণ—৪০, ১৪১, ২৫৬
 ঈর্ভ মল্লিক—২৯২, ২৯৩, ২৯৫
 ঈর্ভ রায়—৩০৬
 ঈলাঙ্গী গ্রাম—৮৪, ১০৭
 ঈষ্ট হস্তী—২০৪, ২২৮
 ঈয়ন্ত—৭৮
 ঈওয়ান উপাধি—২৫৮
 ঈওয়ান নাছির মাহামুদ—৩১৬
 ঈওয়ান সুরমাহামুদ—৩১৬
 ঈওড়াই—৫০, ৫১
 ঈবথড়া—১৮৮, ১৯০, ২৯০
 ঈবথড়ার তাম্র-শাসন—১৯০, ২৯০
 ঈবদারু—২১
 ঈবধার—২৬, ২৮৬, ২৮৭
 ঈব প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব—৯৪

দেবমণিকা—২৫, ৩৩, ৬০, ৭৭, ৭৮, ৮৭,
৮৯, ৯১, ১০১, ১০৩, ১০৬, ১২৯, ১৪১,
১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৭৮,
১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ২০৩, ২৫০, ২৫১,
২৫৬, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ৩০৭

দেবশক্তি বংশ—২৭৩

দেবছতি—১০৮

দেবতা প্রতিষ্ঠা—৯৪, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৩,
২৫৭

দেবতামুড়া—২৮৭, ৩০৯, ৩১০

দেবানন্দ খাঁ—৩০৬

দেবী ভাগবত—২৮৯

দেবী পুরাণ—৩১৫

দেবী যুদ্ধ—১৫৪

দেবেশ্বর—২৬৮

দেয়াঙ্গ—২৬১

দৈত্য—৮১

দৈত্যনারায়ণ—৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২,
৮৬, ৮৮, ১১৯, ১২১, ১৪১, ১৪৪, ১৫১,
১৫৮, ১৬৬, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২,
২৬৪, ২৬৫, ৩০৮

দৈবজ্ঞ—৬১

দোলা—৪০

দৌচাপাথর (দোয়াপাথর)—২৯, ১০৫, ২২৯,
২৩০, ২৮৭

দৌল বাড়ী (দেউল বাড়ী)—২৯০

ছাদশ বাঙ্গালা—২৫, ৭১, ১৩৬

ছাদশ ভৌমিক—১৩১

ছারকানাথ ঠাকুর—২০৮

ছারবঙ্গ—২৮৬

দ্বিজ বংশীদাস—৮৬, ১৫৪

দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র—১৭৬

দ্বিজ হরিরাম—৮৬

(ধ)

ধনঞ্জয় ঠাকুর—১১১, ২৭৪

ধনীরাম পাটারী—২৪০, ২৪২

ধনুর্কাণ—১২৩, ১২৪

ধনুর্মাণিকা—৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭,
১৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩,
৬০, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫,
৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৬, ১১৯,
১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮,
১২৯, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫,
১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৭৬,
১৭৭, ১৭৮, ১৮৪, ২০৩, ২৩৮, ২৪৬,
২৪৮, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯,
২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৭৫, ২৮০, ২৮৬,
২৮৭, ২৯৮, ১৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩১৩

ধনুসাগর—১৫, ১৬, ৫৮, ১০১, ১২২, ১৪৫,
১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৫, ১৬৭, ২৬৫

ধনুস্তরী নারায়ণ—৬৩, ২৫৬, ২৬২

ধর্ম্মনগর—৫৯, ৯৮, ২৮৮

ধর্ম্মপাল—২৬৯

ধর্ম্মপুর—৬২, ২৮৮

ধর্ম্মভীকৃতার নিদর্শন—১৮৯

ধর্ম্মমত—৯১, ১০৩, ১০৬

ধর্ম্মমাণিকা—২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮১, ৮২, ৮৬,
৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ১২৪, ১৩৮, ১৩৯,
১৪৯, ১৫২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭,
১৭৮, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ২৫২, ২৫৫,
২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ৩১৬

ধর্ম্মমাণিক্যের তান্ত্র-শাসন—১৮৯

ধর্ম্মরাজের গীতি—১৫৪

ধর্ম্ম ও শৌর্য্য—১৯০

ধর্ম্মসাগর—৫, ৯২, ৯৪, ১৮৯, ২৫২, ২৫৭,
২৬০,

ধর্ম্মেশ্বরী নদী—১৩০, ২৬৯, ৩০২

ধাত্রী—৭, ১৩৯

ধানুকী—৪৬, ১২৪

ধারিচন্দ্র—২৯২, ২৯৩

ধুবড়ী—৩০৪

ধূমাবতী—৩৪

ধূম্র জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬

ধ্বজঘাট—৫৫, ৬০, ১৫৩, ১৬৫, ২৮৮, ২৮৯

ধ্বজ জাতীয় হস্তী—২২২, ২২৩

ধ্বজনগর—৬০, ১৫৩, ২৮৮

ধ্বজ বজ্রাকুশ চিহ্ন—৬৩

ধ্বজমাণিক্য—১৪৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ২৮০

ধ্বজ রোপণ—৫৪, ২৮৮

ধূপক জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫

(ন)

নওগাঁও—২৬৮, ৩০৪

নন্দিপুত্রাণ—২১৯

নবীগঞ্জ—৩১৩

নবীনকিশোর দেবদর্শী—২৯৯

নব্যভারত (মাসিক)—১৬৩

নরক—৪১

নরকাসুর—২৬৮

নরবলি—২৪, ২৯, ৩০, ৫১, ১০৪, ১০৫, ১৩০,
১৩৭, ২২৯, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ২৮৭, ৩১১

নরসিং দেব—১৯১, ২৮৬

নরসিং মাণিক্য (ভুবুয়া)—৩০৯

নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য—২৬১, ২৯০, ২৯১,
২৯৩, ২৯৪,

নসিরাবাদ—১৩১, ১৪৫

নাওরা মহাল—৩০০, ৩১৬

নাগাঙ্গ—২৬৮

‘নাজির’ উপাধি—৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২০,
১৫৭, ২০২, ২৫৮

নাজির খাঁ—৩০৪

নাথদেব—২৮৫

‘নারায়ণ’ উপাধি—৪৫, ৫৩, ৬৩, ১২০, ১২১,
১২২, ১৯৮, ২৫০, ২৫৬

নারায়ণগঞ্জ—৩১৬

নারায়ণ দেব—২৬৮

নিগমানন্দ স্বামী—২৯৬

নিত্যানন্দ প্রভু—২৯৫

নিধিপতি—২৭০

নিমি রাজা—২৮৫

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—২৯০

নির্ভয় নারায়ণ—৪৫, ১৬০, ১৬১, ১৮০, ২৫৭,
২৭৭

নিশ্চিন্তপুর—২৯৬

নিঃস্ব জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৮

নীরাঙ্গন—২৮৮

নীলা—৩৪

নূর উদ্দীন কাজি—২৮৩

নৃত্য গীত শিক্ষা—২৯

নেজামত বিভাগ—৩০০

নেপাল রাজ্য—২৮৫

নোয়াখালী—৮৫, ২৩৯, ২৭৬, ২৮২, ৩০৫,
৩১৮

নৌ বছর—১১৬, ১১৭, ১২৬, ১৩৫

নৌ সেনা—৩১১

(প)

পঞ্চাশত্ত—৫৭, ২৮৮

পঞ্চ গোবিন্দ—৫৩

পঞ্চদ্রাণী (পাঁচদ্রাণী)—৫৩, ১০২, ২৮৮, ২৮৯

পঞ্চমুখ শিব—১১১

পত্র কোমুদী—৫২, ৭৫

পদার্থিক—৫৪, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১২৯,
১৩০, ১৩৬

পদ্মিনী—২৯৩, ২৯৪, ২৯৫

পদ্মনাথ বিজ্ঞানিন্দ—২৪৯

পদ্মা—৫২, ৫৫, ১৩০, ১৩১, ১৪৪, ১৫১,
২৮৯, ৩০২, ৩১১

পরশুরাম—২৬১, ২৮৮

পরশুরাম কুণ্ড—৩০৪

পরশুর—২২২

পরশুর সংহিতা—২১৯, ২২৮, ২৩৭

পরীবন্ধ—১৫৩

পর্ভু গীতা—২৭৯, ৩১৩, ৩১৬,

পর্বতপুর—২৭০

পর্বত রায়—১৬১

পলাশ—৩১৩

পশুচক্র—৩৫

পাইক—৪৯, ৫৮, ৬৭, ৭৬

পাগড়িয়াটিলা—২৭০

পাঁচালী—২৯, ৭৪, ৯০, ১৪৩, ১৭০

পাছুড়ি—১৫৩

পাটারী—২৩৯

পাটিকারা—১৩, ১২৫, ১৫০, ২৬১, ২৮৯,
২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭

পাটিকানগর—২৯৪

পাঠান—২৩, ২৫, ২৮, ৩৫, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮,
৪৯, ৫৩, ৫৪, ৭০, ৭১, ১০৩, ১০৫, ১১৭,
১১৮, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯,
১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮,
১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬৬, ২৪৮,
২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯,
২৬৩, ২৬৪, ২৭১, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৩

পাঠান সৈন্যের বিপদ—২৮

পাত্র— ৪

পাদপীঠ নির্মাণ—২৯০, ২৯১

পান প্রদান—৬৬, ১৬৮, ১৬৯

পানসী-নৌকা—১১৭

পাণ্ডুরাজা—২০৩

পাবনা—২৮৯

পারিবারিক কথা—৮৬, ৯১

পার্কী—৯

পার্কী চট্টগ্রাম—২৮৩

পালনাই—২১৫

পালবংশ—২৭৩, ২৮৯, ২৯১, ৩০২

পাষণে মূর্তি খোদাই—২৬

পিকদানী—২১

পিংসা নগর—৩১২

পীরোজ গাঁ আলি—৭১, ১৩৪, ২৫৮

পুগান দেশ—৩১২

পুণাবতী—৩৯, ৮৭, ২৫৮, ৩১৮

পুণ্ডরীক হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭

পুনশ্চরন—৩৪

পুরন্দর সিংহ—২৬৯

পুরস্কার—২২

পুরীধাম—১০২

পুরোহিত—৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩৯, ১৪০

পুষ্পদন্ত হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭

পুতনা বধ—১১২

পূর্ণচন্দ্র—২৯২, ২৯৩

পূর্বকুল—২০, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৭, ২৯৮

পৃথিবীপাশা—৩১৪

পেণ্ডুরাজ্য—৩১২

পোর্টগ্রেগু—১৩২

প্রকৃতিদুর্ভাগ্য প্রাসাদ— ৪

প্রচণ্ড উজীর—৪৫, ১১৮, ২৫৮, ২৫৯

প্রচলিত কিংবদন্তী—২০৯

প্রতাপ নারায়ণ (সোলাপতি)—৪৫, ২৫৮

প্রতাপ নারায়ণ (ভেড়েশ্বর)—১৬১

প্রতাপমাণিক্য—৬, ৮৬, ৮৯, ১২৪, ১২৫,
১৩৯, ১৪৯, ১৭৬, ১৮৪, ২৫৭, ২৫৯

প্রতাপ রায়—১৩, ২৫৮, ৩০০

প্রতাপ সিংহ—১৩১

প্রতাপিণী—২৪

প্রত্যাদেশ—৩০, ৯৫, ২৪০

প্রতাপসিংহ—১১৭

প্রভাকর বন্দন—২৭৩

প্রভাবতী (রাণী)—২৯০

প্রনীলা—১৬১

প্রয়াগ—৩১০

প্রাক্ জ্যোতিষ—২৬৭

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ—১৫১

প্রাচীন রাজনালা—৮৩, ১৪৭, ১৮০

প্রাচীন সংস্কার—৪৬

প্রতি চতুর্দশী গান—৮, ৯, ৯১, ২৬৩

(ক)

ফতে খাঁ—২৭২

ফয়জমেনসা চৌধুরাণী—৩১৮

ফরখাবাদ—২৭২

ফরিদপুর—১১৭, ২৮৯, ৩০২

ফরিদপুরের ইতিহাস—৩০৭

ফলমতীশ্বর তীর্থ—৩১, ৩৩, ১৬৫, ২৯৮

ফার্ডিনান্দ সাহেব—৩০২

ফুরাই—১৭২

ফুসকুমারী—১৬

ফেণী মহকুমা—২৩৯, ২৮২

(ব)

বগলা—৩৪

বগসারি—১৩, ১২৫, ১৫০, ১৯০, ২৯৯

বঙ্গদেশ (বঙ্গালা)—১২, ১৩, ২২, ৪৪, ৪৬,
৫৪, ৫৮, ১১৭, ১২৫, ১২৯, ২৬০, ২৬৭,
২৬৯, ২৭১, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১,
২৯৬, ২৯৯, ৩০০

বঙ্গপাড়া—২৭৫

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—১৫৯

বঙ্গাভিধান—১১৬, ১১৭, ১২২, ১৩০, ১৫১,
২৬৫, ২৭০

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৮৮

বঙ্গোপসাগর—২৮৯, ৩১৩

বড় গোসাঞি—১৬১, ১৬২

বড় কামতা—২৯০

বড়ুয়া—১২, ২১, ৬৩, ১২০, ১৯৮, ২৫৮

বদরপুর—১০৮

বনবাস দণ্ড—৪৩, ৮৭, ৮৮, ৯১, ২৫৮, ২৬৫,
৩১৪

বন্দুক—১১৭, ১২৩, ১২৪

বন্য ঘোটক—১৫৬, ১৬৪

বন্য হস্তী—১৫৬

বয়ন শিল্প—১৫৩, ১৫৪

বয়শেশু—২০৭

বরদাখাত—১৩, ১০১, ১২৫, ১৫০, ২৫৯,
২৭৭, ৩০০

বরদেখরী বিগ্রহ—৩০১

বরবক্র (বরাক) নদী—১০৮, ১১০, ২৭৫,
২৭৭, ২৮৪

বরমচাল—২৭০

বরকুচি—৫২

বরাহ মিহির—২২২

বরারোহ জাতীয় হস্তী—২২৩

বরুয়া পাহাড়—২৭০

বর্ষ—১২৪

বলদেব—২৫৫

বলভদ্র—৩৯

বলরাম রায়—৩০৬

বলাগমা—২৬, ২৭, ২৪৬, ২৫৯

বলি—৮, ৩০, ১০৩, ১০৪

বলিভীম নারায়ণ—৯৮, ১৬৮, ১৬৯

বলি রাজা—২৯৯

বল্লাল সেন—১৮৮, ৩০০

বসন্তরাজ শাকুন—২১৯

বসন্ত আলী চৌধুরী—৩১৮

বসিক—১৪, ১৫, ১৫৯, ১৬০, ২৭৬

বসুধা দেবী—২৯৫

বহু বিবাহ—৪৩, ৬৮, ৮৮, ২৫১, ২৯৪

বাইশ কোদালীয়া—২৮৯

বাকনাগু সাহেব—২০৬, ২০৭

বাথরগঞ্জ—১১৭

বাগুবাদিনা—৩৪

বাঘাউড়া—২৯১

বাঘাউড়ার বিষ্ণু মূর্তি—২৯১

বঙ্গালী উপনিবেশ—১৫৩

বঙ্গালী সৈন্য—৪৫, ১১৮

বাছার (বাছাল)—৫৩, ৬২, ২৬৫

বাণা—৪৪

বাণিজ্য—১৫৪, ৩১৭

বাণিজ্য তরী—৩১৭

বাণেশ্বর—৫, ৮১, ৯২, ২৬০

বাদামী খোজা—২৪৯

বাংমা—২৮০

বামবাজু—৪৩, ৪৭, ২৮৭, ৩০১

বামন হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭

বায়ুপুরাণ—১০৯, ১১০, ১১১, ৩০৯

বারুণা—৫১

বারবঙ্গালা—২২

বারভূঞা—১৩৬

বারাণসী—২, ৩, ৯২, ২৫২, ৩০১

বারাহী বিগ্রহ—৩০৫

বারাহী তন্ত্র—১১০, ২৯৮

বালা—৩৪

বাগিশিরা—৫৯, ২৭০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩

বালাঘাট—২৮২

- বাসলী—৩৪
 বাসব—১৪৩
 বাসুদেব—১১১
 বাসুয়া—৩৫
 বাহাহুর খাঁ—১৬৮
 বিকল জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫
 বিক্রমপুর—৫৬, ১৩১, ১৮২, ২৮২, ২৯১,
 ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩০২, ৩০৩,
 ৩০৪
 বিক্রমাদিত্য—৩০২
 বিক্রম সেন—৩০২
 বিখ্যাত বিজয় গ্রন্থ—৩০৭
 বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—২৫৬
 বিচার প্রণালী—১৫৮
 বিজয়—৩৬, ৩৭
 বিজয়কুমার সেন—২৭৮
 বিজয়জুল্লাহ নারায়ণ—৬১, ১২১, ২৬০
 বিজয় নদী—৫৭, ১২৮, ৩০৩
 বিজয়পুর—৫২, ৩০২, ৩০৩
 বিজয়মাণিক (জয়স্তা)—১৬২, ১৮০
 বিজয়মাণিক্য—৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৩,
 ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৩,
 ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ১০২, ১০৪, ১০৭,
 ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২২,
 ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৮,
 ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০,
 ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০,
 ১৬১, ১৬২, ১৬৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১,
 ১৮৪, ১৯১, ২০৩, ২৫০, ২৫১, ২৫২,
 ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯,
 ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭,
 ২৭০, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮৪,
 ২৮৮, ২৮৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫,
 ৩১১, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭
 বিজয়মাণিক্যের তাম্র-শাসন—১৯১
 বিজয়মাণিক্যের ধাতুশাসন—১৬২
 বিজয় সেন—১৯০
 বিজয়সাগর—১০২, ৩১১
 বিজয়া দশমী—১৪৬, ১৪৮, ১৪৯
 বিদেহ—২৮৫
 বিদ্যাপতি—২৮৬
 বিদ্যোদ্ভাদ তরঙ্গিনী—৩০২
 বিনন্দিয়া সৈন্য—১২১, ১৭২
 বিদ্যা শৈল—১০৮
 বিপ্রকল্প লতিকা—৩০২
 বিবাদ দর্পণ—১৫৯
 বিমদ জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫
 বিমার—১০৭
 বিক্রপ জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫
 বিলনৌয়া—২৩৯, ২৭৬
 বিশর্গাও—১৪৫, ৩০১
 বিশালগড়—২৫, ১২৭, ১৪৫, ১৫৩, ২৮১,
 ২৮৮, ৩০৩
 বিশু—২
 বিশ্বস্তর সুর—৩০৫, ৩০৬
 নিশ্বাস—৫২
 নিশ্বাস উপাধি—৫২
 বিষম জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৫
 বিষলতা—২৬, ১৩৬, ২৪২, ২৪৩, ২৭৬
 বিষ্ণাজুড়ি— ১৩, ১২৫, ২৫০, ৩০৪
 বিষ্ণু—৯, ২০৩, ২১২, ২৬৮
 বিষ্ণু ধর্মোত্তর—২১৯
 বিষ্ণুপদ—১১১
 বিহার প্রদেশ—১৩২
 বীচক্র—৩৫
 বীরচন্দ্র মাণিক্য—১৭২
 বীর জাতীয় হস্তী—২২২, ২২৩
 বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য—১০৭
 বীর ভাব—৩৫, ১০৩
 বীরমর্দন নারায়ণ—৬৬, ২৫৩, ২৬০
 বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য—২৭২, ২৯৯, ৩১২
 বুড়া দীঘি—৭৩, ২৬৩
 বুড়া পর্কতরায়—১৬১
 বুগার সাহেব—২৯০
 বৃটিশ গবর্নমেন্ট— ১২৩
 বৃটিশ রাজ্য— ২৬৯
 বৃন্দাবন দাস—৮৬

বৃহৎ সংহিতা— ৭০, ২১৯, ২৯৯

বৃহৎস্ময় পুরাণ— ১৮৮

বৃহৎস্ময় পুরাণ— ২০৪

বৃহৎস্ময়— ১০৫

বৃহৎস্ময়— ১০, ২০৩, ২১৩

বৃহৎস্ময় সংহিতা— ৫০, ২০৩, ২১৯

বৈষ্ণব— ১৩, ১২৫, ১৫০, ১৬৪

বেভিচার— ২১, ৩৭, ৪০, ৬৮, ৮৮

বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্তী— ২৯০

বৈকুণ্ঠপুর— ৬৪, ২০৪

বৈদিক কাল— ১৫৪, ২০৩

বৈবাহিক বিবাহ— ৮৬

বৈষ্ণব জাতীয় হস্তা— ২১৯

বৈষ্ণব ত্রিবিধ— ৩০

বৌদ্ধ ধর্ম— ২৯১

বৌদ্ধ ধর্ম রাজক— ৩১০

বৌদ্ধ বিহার— ৩০২

বৌদ্ধমত— ১৯০

বাস— ২০৩, ২১২

বাসুকুণ্ড— ২৯৯

ব্রহ্মবোগিনী— ৩০২

ব্রহ্মকণ্ড— ১০৬, ২৬১

ব্রহ্মচর্যা— ২০৫, ২১৭

ব্রহ্মদেশ— ১৩৬, ২২৯, ২৩৭, ২৬৯, ২৯৭

ব্রহ্মপুত্র— ৫৪, ৫৫, ১০২, ১৩৬, ১৩১, ১৬৫, ২৬১, ২৬৭, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৯, ৩০৪, ৩১১, ৩১৫, ৩১৭

ব্রহ্মপুত্র বংশ— ২৬৮

ব্রহ্মপুরাণ— ১৮৮, ২০৫, ২১৯

ব্রহ্মবন— ৩৮

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ— ২৮১, ২৮৯

ব্রহ্মা— ৩২

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ— ২৮৯, ৩১৩

ব্রহ্মাণ্ড জাতীয় হস্তা— ২২০

(ভ)

ভগদত্ত— ২৬৮

ভগবতী— ৩০

ভজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী— ৩১৮

ভট্ট (ভোটা)— ৫৫, ৫৬

ভদ্র হস্তা— ২২২

ভদ্র সিংহ— ২৮৫, ২৮৬

ভবানী দাস— ২৬১, ২৯৩, ২৯৭

ভবিষ্য পুরাণ— ১১৪, ২০৪, ২৮৫

ভরত— ৭৮

ভাঙ্গিল ফা— ৭১, ১২১, ১২৩, ২৫০, ২৬১

ভাটী প্রদেশ— ১১৭, ১২১

ভাটবান শ্রম শাসন— ১৯১, ৩১৫

ভাণ্ড গাছ— ১৩, ১২৫, ১৫০, ২৭০, ৩০৫

ভাষ্করাপায়ণ— ৫৭, ২৬১, ২৭০

ভাবগণ— ৭৮, ১৫৪, ২০৮

ভার্গব— ৮, ২৬১

ভাষ্করাপায়ণ হস্তা— ১১৭, ১২৭

ভাষ্করাপায়ণ— ২১৮

ভাষ্করাপায়ণ— ১১০

ভিন্দু সে জা— ১০৭

ভিন্দু চর্চা— ১৭৮

ভীম জাতীয় হস্তা— ২১১, ৩০৩

ভীম সে— ১০১

ভীম সে— ১১৩

ভীম সে— ১২৯, ১৪৩, ১৪৫, ১০৩

ভীম সে— ১৩, ৮৩, ১২৯, ১৪০, ১০৫, ১০৬

ভূতৈলস— ২০৯

ভূতৈলস— ৩৯, ১১১, ১৫১

ভূমিদান— ৫, ১৭, ৩৯, ৫৪, ৮৭, ৯২, ৯৩, ১০২, ১১৫, ১৮১, ১৮৫, ১৯১, ২৫২, ২৫৮, ২৬০, ২৯৯

ভূমি পরিমাপ— ৯৩

ভূমি— ৪১, ১৪১, ১৫৭, ১০৭, ১০৮

ভূমি হস্তা— ৩০৮

ভূগুপ্ত— ৫৪, ২৬১

ভূগুপ্ত রায়— ৮২

ভেট— ২০, ২১

ভেষজ— ৫১

ভৈরব বিষ্ণু— ১০১, ১০৩

ভৈরবী—৩৪

ভৈরবী চক্র—৩৫

ভোজবর্ষা দেব—১৮৮

ভোজরাজ—২২২, ২২৮

(ম)

মক্কা হস্তী—২১৮

মগদ—৬৫

মঘ—৩৫, ৯৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৪৭, ১৫০,
১৯৩, ২১৫, ২৪৮, ৩১৬

মঘের উপদ্রব—৩১২

মজঃফর শাহ—২৬৬

মৎস্য পুরাণ—১০, ১১, ৬৯, ৭২, ২৯৯

মণিপুরী—১৫৩, ১৫৬

মণ্ডল—২৭৬

মণ্ডলী জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬

মণ্ডলেশ্বর—৩৭৬

মদনগঞ্জ—২৬৯, ৩১৩

মন্সসা মঙ্গল—৮৬

মস্তুল—২৭০

মস্তুর নদী—৩১, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪,
২৭৪, ৩০৯

মস্তুর—৩০৯

মস্তুর হস্তী—১১৩

মস্তুর - ৩৩, ৬৪, ১১০

মমরক খাঁ—৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২,
১০৫, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮,
২৫৩, ২৫৬, ২৬০, ৩১১

ময়নামতী—২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬

ময়নামতীর কোট—২৯৩

ময়নামতীর গান—১৬৬, ২৬১, ২৯৩, ২৯৪

ময়নামতী পাহাড়—২৮৯, ২৯৫

ময়মনসিংহ—৩০৪, ৩১১

ময়ূরধ্বজ—২৫৩

মরকোষ নৌকা—১১৮

মল্লবিছা—১০, ১১, ১২, ৬৫, ৭৬, ৯০, ১৬৮,
২৫৩, ২৬৩

মসলিন—৩১৭

মহম্মদ খাঁ—৪৬, ১২৯, ২৬১

মহম্মদ—৫০, ৬৩, ৬৭

মহর্ষি মনু—১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫

মহাচক্র—৩৫

মহা দুর্গা—৩৪

মহাপীঠ—১০৬

মহাবিছা—১০, ১১, ১২, ৩৪, ৬৫, ৭৬, ৯০,
১৬৮, ২৫৩, ২৬৩

মহাবিশুব—৫, ৯২

মহাবৃক্ষ ঋষি—২৭৩

মহাভয় জাতীয় হস্তী—২২৫, ২২৬

মহাভারত—১০, ৮৬, ৯০, ১৬১, ২০৩, ২০৪

মহামাণিক্য—১, ৩, ৫, ৮০, ৯২, ৯৩, ১৩৮,
২৫৭, ২৬২

মহামারী—৭২, ১৫১, ১৫২

মহামুল্লী—৬৩

মহারাজোয়ান—২৯৭

মহারানী (গ্রাম)—৩১৪

মহাশিল—৩৭

মহিলা মাহাত্মা—৮৮, ১৬৯, ২৫৫

মহীপাল—২৯১

মহীরজ—২৬৮

মহেশনারায়ণ রায়—৩০০

মহেশ্বরদী—১০২, ২৮৮

মাইবঙ্গ—১৬১

মাছিছড়া—২৬, ২৮৭, ৩০৯, ৩১০

মাছি ছা—২৭, ২৮৭, ৩০৯, ৩১০

মাঝ গোসাঞি—১৬১

মানিক গাঙ্গুলী—৮৬

মানিকচন্দ্র—২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬,
২৯৭

‘মানিক্য’ উপাধি—৩০৬

মাতঙ্গী—৩৪

মাজি—২০৩

মাধব—৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ১৪১, ১৫৭, ১৬৬,
২৫৬, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫, ৩০০

মাধবতলা—৪০, ৩১০

মাধবাচার্য্য—৫৩, ৮৬

মার্কোপলো—২০৭
 মাছিল—২০, ৩১০
 মিত্র—৪
 মিথি রাজা—২৮৫
 মিথিলা—৩৪, ৩৭, ৮৯, ১০৩, ১১৯, ১৪১,
 ১৭৯, ২৫১, ২৫৬, ২৬৪, ২৮৫, ২৮৬
 মিয়ানা হস্তী—২১৮
 মিয়ানী হস্তী—২১৮
 মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিম—৩০০
 মির্জা হোশন আলী—৩০০
 মিশ্র জাতীর হস্তী—২২২
 মিসমি জাতি—৩০৪
 মীর জুমলা—২৬৯
 মুকুন্দ (উড়িষ্যা রাজ)—৬১, ২৬২
 মুকুন্দরাম রায়—৮২
 মুক্তিশীলা—৬৪
 মুড়াপাড়া—৩১৩
 মুনারেম খাঁ—২৫৫
 'মুন্সী' উপাধি—২৫৮
 মুরছুম জাতি—২৭৯
 মুরশিদাবাদ—৩০৮
 মুঘলী হস্তী—২২৪, ২২৭
 মৃগ জাতীর হস্তী—২০২
 মেওরে বয়রা—৩১২
 মেকেঞ্জি সাহেব—১৪০, ২৬৪
 নেয়া নদী—১১৪, ১১৭, ১৩০, ১৩১, ২৮৯,
 ২৯০, ৩০২, ৩০৪, ৩১২
 মেণ্ড বিলু—৩১২
 মেলা—১১১
 মেলাগড়—১৭০, ২৭৮
 মেহেরকুল—১৩, ২২, ৪৫, ৭১, ৭৩, ১০৫,
 ১২৬, ১৩৫, ১৪৫, ১৫০, ১৬৬, ২৫৯,
 ২৬১, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫,
 ২৯৬, ২৯৭, ৩১০
 মৈছিলী (মছলু)—১০৪
 মৈথিল যোদ্ধা—৩৭, ১১৯, ১৪১
 মোগল—২২, ৪৭, ৫৪, ১১৭, ১২১, ১২৪,
 ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ১৫১, ২৫৫, ৩০৩,
 ৩১৫

মোহর (মুদ্রা)—৩৩, ১২৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩,
 ২৮৮
 মৌলবীবাজার—২৮১

(য)

যজ্ঞ—১৮৯, ২৭৪, ২৮৮, ৩১৪
 যত্নন্দন দাস—৮৬
 যমুনা—৫৫, ১৩১, ১৫১, ২৮৯, ৩১০, ৩১১
 যশপুর—২৫, ৫৯, ৩১১
 যশোধর শর্মা—১৮৯
 যশোহর—১১৭
 যক্ষ—৩৬
 যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—১৮৫
 যাত্রাপুর—৫২, ৫৫, ১৩১, ৩১১
 যাত্রারত্নাকর নিধি—২৯, ৯১
 যাত্র বৈদ্য—৬৩, ৬৪, ২৫৬, ২৬২
 যাবাদীপ—৩১৭
 যুক্তি কল্প তরু—২১৯, ২৭২
 যুঝার ফা—২৭১
 যুঝার সিংহ—১০১
 যুদ্ধ কোশল—১৯, ২৭, ৪৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৬,
 ২৪৮
 যুদ্ধবান—১২৪
 যুদ্ধান্ত—৪৭, ৮৮, ৫৮, ১২৩
 যুদ্ধাধিকার—১৬১, ২৫৫
 'যুবরাজ' উপাধি—৯৮, ১৬৮
 যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—২৯৯
 যোগিনী তন্ত্র—১০৯, ২৬৭, ৩০৯
 যোগিনী হৃদয়—৩৪
 যোধপুর—২০৮

(র)

রঘুনাথ ছোটরা—২৬২
 রঘুবংশ—২৯৯
 রঙ্গপুর—২৬৭, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৪
 রণচতুর নারায়ণ—১, ৩৩, ৬৯, ৭৭, ৭৮, ৮১,
 ৮২, ১২১, ২৬২, ২৬৪
 রণত্রী—৫৪, ১১৭, ১৩০

- স্বর্ণাগণ নারায়ণ (রঙ্গনারায়ণ)—৬৯, ৭০, ৭১,
 ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯০, ৯১, ৯২,
 ১০০, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৩৩,
 ১৪৩, ১৫১, ১৬৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৪,
 ২৬৩, ২৬৫
 রত্নপুর—৩১, ৫০, ৩১১, ৩১২
 রত্নমঞ্জরী মহাদেবী—২৯৯
 রত্নমাণিকা—১৫৭, ১৬২, ১৬৮, ২৮৩
 রমা জাতীয় হস্তী—২২২, ২২৩
 রসাক্ষ—৩৪, ১১২, ১২৬, ২৬৩, ৩১২, ৩১৩
 রসাক্ষমর্দিন নারায়ণ—২৪, ৩০, ৭৭, ১২০, ১২১,
 ১২২, ১২৬, ২৬৩, ২৬৬, ৩১৩
 রাইমা নদী—১১৫, ২৭৭
 রাজাল কুকি—১৭৭
 রাজরঙ্গ—২০, ৩১৩
 রাজ্যমাটী—৩, ৬, ২৩, ২৪, ২৫, ৪৬, ৫৯, ৬৮,
 ১২৭, ১৩১, ১৩৫, ১৪৯, ২৫১, ২৫৪
 ২৬২, ২৭১, ২৮৭, ৩১৩
 রাজকর—১৪৯, ১৬৪
 রাজকরের বিনিময়ে কার্য সম্পাদন—১৬৪
 রাজগণের কাল নির্ণয়—১৭৪
 রাজচক্র—৩৫
 রাজটিকা—৩০৬
 রাজদণ্ড (দণ্ডবিধি)—১৪, ৩২, ৪৩, ৬৮, ১২৫,
 ১৫৮, ২৮৩
 রাজভল্লভ নারায়ণ (রাজবল্লভ)—১২১, ২৬৩,
 ২৬৫
 রাজধর দেব—৮৪, ১০৭, ১২১, ৩১৫
 রাজধানীর অবস্থা—১৪৯
 রাজনগর—২৭০
 রাজ নির্ঘণ্ট—২১৯
 রাজনীতি—১০
 রাজপণ্ডিত—৯২
 রাজপুরোহিত—৯২
 রাজবল্লভ নারায়ণ—৭৬, ৭৭, ৯০, ১২১
 রাজবল্লভ রায়—৩০৬
 রাজবল্লভ সেন—১৩১, ২৮৯, ৩০৩
 রাজভক্ত—১৬৩
 রাজভট্ট—২৯০
 রাজমাণিকা (ভুলুয়া)—৩০৬
 রাজমালা—৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬,
 ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১০৬,
 ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯,
 ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৮,
 ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৪৫, ১৪৬,
 ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০,
 ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০,
 ১৮১, ১৮৩, ১৮৫, ২০৩, ২১৫, ২৩৭,
 ২৪৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২,
 ২৬৯, ২৭৩, ২৮২, ৩০৩
 রাজযোগ—৬১, ৭২
 রাজ্যজ্ঞা—১৭৩
 রাজ্য নবকৃষ্ণ—২৭৭
 রাজ্য বধ—১০, ৩৬, ৩৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১২৫,
 ১৩৮, ১৪১, ১৫৬, ১৭০, ১৭৯, ২৫৪,
 ২৫৬, ২৫৯, ২৬০
 রাজ্যবলী—২, ৩৯
 রাজ্যবাড়ীর মঠ—১৩১, ৩০৩
 রাজ্য বাবু—৮২, ৮৩, ৮৪, ১৮০
 রাজ্য রামগতি—১৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১
 রাজ্যর দেউড়ী—৮২
 রাজ্যর যুদ্ধযাত্রা—২২, ২৪, ৩৩, ৪৫, ৫৪, ১৩৪
 রাজ্যের চোল—২৯৭
 রাজ্য বিস্তার—১৫০
 রাজ্যের অবস্থা—১৪৯
 রাজ্যের বিশেষত্ব—১৫৫
 রাণী কুণ্ড—১১৫, ১১৬
 রাধাকান্ত ঠাকুর—২৩৯, ২৪০
 রাধাকিশোরপুর—২৭২, ৩১২
 রাধাকিশোর মাণিকা—১০১, ১০৭, ১১১, ২৯৯
 রাধাগোবিন্দ বসাক—২৯০, ২৯১, ২৯২
 রাবণ—১৯০
 রাবণ মূর্তি—১১১
 রাম-কবি—৯, ২৬৩
 রামকলা—২৭৪
 রামকোট—৩১৩
 রামগঙ্গামাণিকা—৩০১
 রামটেক—৩১৩

রামদাস—৭৮, ২৫০, ২৬৪

রামপাল—৩০৩

রামপাল লিপি—২৯২

রামপুর—২৯০

রামমাণিক্য—৯৮, ৯৯, ১০০

রামমোহন রায়—২০৮

রাম রাবণের যুদ্ধ—১১২, ১৫৪

রামরী—৩১২

রাম ও লক্ষ্মণ মূর্তি—১১১

রামহরি বিশ্বাস—৩০১

রামকেন্দ্র—৩১৩

রামাবতী—৩১২

রামায়ণ—২৬৩, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩

রাধু—২৪, ১২২, ১৩১, ১৩২, ২৬১, ২৮০,
৩১৩

‘রায়’ উপাধি—১৫৭

রায় কছম—২২, ২৪, ১২৬, ১৩৭, ১৫৭, ২৬৪

রায় কাচাগ—১৪, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪,
১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭,
১৩৮, ১৪০, ১৪৫, ১৫৭, ২৬৪, ২৮০, ৩১০

রায়বার—২৪

রালফ্ ফিছ—১৩১, ১৩২, ৩১৭

রাষ্ট্রহা জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৭

রাসলীলা—১৫৪

রাক্ষস মূর্তি—১১১

রাক্ষিয়াং—১৩১, ১৩২

রিয়া (কাঁচলি)—১৫৩, ১৫৪

রিয়াং—১৫৭, ২৫২, ২৫৪, ২৬৪, ৩১০

রুকুন উদ্দীন—৩১১

রুদ্র ষামল—৩৫

রুফনী নদী—২৯৭

রূপরাম (কবি)—১৫৪

রেক্টিং সাহেব—২৯২

রেন্ডুন—৩১৩

রেনেক সাহেব—২৬৯

রেশমের কারখানা—১৫৪, ১৬৪

রোম—২০৭

রোশনাবাদ—৭৫, ২৮৩

(ল)

লংত্রাই পর্বত—১১৫, ২৭৭

লংলাই কুকি—৩১৪

লঙ্ সাহেব—৮৩, ৮৪, ৯৪, ১০৪, ১১৭, ১৩৩,
১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৬, ১৭৪, ১৭৫,
১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৩

লক্ষা বিজয়—১৫৩

লক্ষ্মা—১৩, ৫৯, ১২৫, ১৫০, ৩১৪, ৩১৫

লক্ষ্মাই উপত্যকা—২৭৭

লচ্ছিমা দেবী—২৮৬

লবণের খনি—১৫৫

লম্বক দ্বীপ—২০৭

লম্বর—১৩, ২১, ৪১, ১২৪, ১৪১, ১৫৭, ১৫৮,
৩০৮

লক্ষ্মা—৫৫, ১৩০, ১৩১, ২৬৭, ৩০৪, ৩১৩

লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া)—৩০৬, ৩০৭

লক্ষ্মণমাণিক্য—৩১৭

লক্ষ্মণ সেন—১৮৮, ১৯১, ১৯২

লক্ষ্মণ সেনের তাম্র-শাসন—১৮৯

লক্ষ্মীনারায়ণ—৩৪, ৩৭, ৪০, ৮৯, ১০১, ১০৩,
১০৬, ১১৯, ১৪১, ১৭৯, ২৫১, ২৫৬,
২৬০, ২৬৪

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র—১০১, ১০৩

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির—৩১২

লক্ষ্মীপতি—৩১৪

লক্ষ্মীপুর—৪৩, ৮৮, ৩১৪

লক্ষ্মী মহাদেবী (লক্ষ্মীবালা)—৪২, ৪৩, ৮৭,
৮৮, ২৫৮, ২৬৪, ৩১৪

লক্ষ্মী মূর্তি—১১১

লাউর—৩১৫

লাখাই নোকা—১১৮

লামপাড়া—৭৫, ২৮৬

লায়েল সাহেব—২০৯

লালময়ী (লালমতী)—২৯৫, ২৯৬

লালমাই পাহাড়—২৯৬

লিকা—৫১, ২৭১

লিডন্—১৩৭

লুণ্ডন—১২, ১৫, ১৯, ৪৯, ৫৮, ১৩০, ১৩৪, ১৪৮

লুসাই জাতি—২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ৩১৩
 লুসাই পর্বত—২৭৫, ২৮০
 লেট্যামেঙ্—৩১২
 লোকতর ফা—৮৮, ১০৩, ২৬৫
 লোকনাথ—২৯০
 লোকনাথের তাম্র-শাসন—২৮৯
 লোচন দাস—৮৬
 লোহিতা—৫৪, ৫৫, ১৩১, ১৫১, ৩২৫
 লৌহ খনি—১৫৫
 লৌহ পিঞ্জর—৪৯, ৫০, ১৩৭

(শ)

শকুন্তলা—৭৮
 শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—২৯৯, ৩১৩
 শক্র দমন—১৬০, ১৬১
 শক্র বলি—১০৫
 শত্ননাথের মন্দির—২৯৯
 শ্মশান সাধন—৩৫, ১০১, ১০৩, ২৬৪
 শহরী পরগণা—২৬৮
 শাকদ্বীপ—২০৭
 শান বংশ—৩১২
 শারদীয় পূজা—১৪৮
 শালগ্রাম—৬৩
 শাসন তন্ত্র—১৫৭
 শাসন প্রণালী—১৫৭
 শাসন বাক্য—১৬৩
 শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি বিশ্বাস—১৮৮
 শাহ আলম—৩১৮
 শাহ জালাল—২৮৩
 শাহ জাহান—১২৪
 শিকার—৫৮, ২৭৯
 শিব—৯, ৩১
 শিব লিঙ্গ—৩১
 শিব সিংহ (রাজা)—২৮৬
 শিবা—৭০, ১৩৩
 শিবের বিহার—৩১
 শিমরাওন গড়—২৮৫
 শিলাদিত্য—২৭৩

শিলালিপি—৩১. ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০,
 ১০১, ১২৮, ১৭৭, ১৯২, ২৮৫
 শিল্প চর্চা—৮৮, ১৫৩, ১৫৪, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৭
 শিক্ষা—৮৯
 শীতল পাটী—৩০৮
 শীতলা (বসন্ত রোগ)—৩, ৬, ৩৩, ৬৩, ১৫২,
 ২৮০, ২৬০, ২৬২
 শুক্র—১০
 শুক্র নীতি—১০
 শুক্রেশ্বর—৮১, ২৬০
 শুভ্র জাতীয় হস্তী—২১৯
 শুভ্র হস্তী—২১৯
 শুদ্ধিতত্ত্ব—২০৪, ২১৯
 শুভরায়—২৪৩
 শূর বংশ—২৮৯
 শূর জাতীয় হস্তী—২১৯, ২২২, ২২৩
 শূল—৩৮, ১২৪, ১৫৮, ২৬৫
 শের শাহ—২৫১
 শৈলবাসিনী—৩৪
 শোভাবাজার—২৭৭
 শ্রামগ্রাম—৩০০, ৩০১
 শ্রাম দেশ—২৩৭
 শ্রামল বর্মা—১৮৮, ১৮৯
 শ্রামল বর্মার তাম্র-শাসন—১৮৯
 শ্রীকর নন্দী—১২৮
 শ্রীচন্দ্র দেব—৬১, ৯৩, ১৯০, ২৯১, ২৯২,
 ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬
 শ্রীমদ্ভাগবত—৮, ১০৮
 শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—১০৮
 শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ—১১২
 শ্রীরামচন্দ্র—১৫৩, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০
 শ্রীরামচন্দ্রের তাম্র-শাসন—১৮৪, ১৮৫, ১৮৭
 শ্রীহট্ট—৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৭, ৮৩, ৮৪, ৮৫,
 ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬০,
 ২৪৯, ২৬১, ২৬৫, ২৭০, ২৭১, ২৭৪,
 ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪,
 ২৮৮, ২৯৪, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৪, ৩১৫
 শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—১৬১, ১৬২, ২৮৮, ৩০১

শ্রেণীমালা—৮৭, ১৭৮, ২৫৮
 খিত্রী জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬
 খেত হস্তী—১৭, ১২৫, ২১৫, ২২৯, ২৩০,
 ২৩৭, ২৩৮, ২৮৮
 খেতাস্বর—১০৮

(ষ)

ষোড়শ দান—১৬
 ষোড়শী—৩৪
 ষ্টয়ার্ট সাহেব—৩০৮

(স)

সংখলং পর্বত—৩০৯
 সংস্কৃত রাজমালা—৯২, ১০৯, ১১৩, ৩১৬
 সগর—১৮৫
 সগরদ্বীপ—১০৮
 সগর বংশ—১০৮
 সঙ্গীত চর্চা—৮৯, ৯০, ২৫৭
 সঞ্চয় জাতীয় হস্তী—২২২
 সতর খণ্ডল—২৮৩, ৩১৫
 সতীদাহ (সহমরণ)—৩৩, ৩৬, ৬৪, ৬৭, ৯১,
 ১০৬, ১৬৯, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮
 সতীর লক্ষণ—২০৪
 সত্য নিবন্ধ—৭, ২০, ২১, ৪১, ৪২, ৫১, ৫৬,
 ১৩৯, ১৬২
 সমতট—২৯০, ২৯১, ৩০২
 সমরজিৎ নারায়ণ—৭৫, ১২১, ২৬৫
 সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মান—২৯১
 সমসের গাজি—২৮২, ৩১৭
 সমাজ তত্ত্ব—১৬৫
 সমুদ্র—৩৩, ১২৯, ১৫০
 সরঙ্গা নৌকা—১১৮
 সরদার—১২, ১৬, ১২০, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯,
 ১৯৭
 সরবন্দ—৩১৭
 সরস্বতী নদী—৫৫, ১৩১, ১৫১
 সরাইল—২৫, ১২৭, ২৮৩, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
 সর্পের ফণা—২
 সর্কতোভদ্র হস্তী—২২২

সহমরণ পদ্ধতি—২০৫
 সাইস্তা খাঁ—৩১১, ৩১৬
 সাখাচেপ—১৬২
 সাঙ্কেতিক চিহ্ন—৪২, ১৭০, ১৭১
 সাঙ্খ্য দর্শন—১০৮
 সাগরসঙ্গম—১০৮
 সাতইর—৩০৮
 সাতগাঁও—১৩১, ২৭০, ৩০১, ৩০২
 সাতডম্বর—১১৬
 সাততালী—১১৬
 সাদিয়া—৩০৪
 সাভায়—২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
 সাভারমুড়া গড়—৩১৭
 সামরিকবল ও সমর—১১৬
 সার্কভৌম জাতীয় হস্তী—২২০, ২২১, ২৩৭
 সাহস নারায়ণ—৭৬, ১২৩, ২৬৫
 সাহিত্য চর্চা—৮৯
 সাহিত্য পত্রিকা (মাসিক)—৯৩
 সাহিত্য সেবা—৯০
 সাহেবগঞ্জ—২৬৯
 সিংহাসন—১, ৪, ৮, ১৪, ২২, ৩৯, ৮১, ৮৩,
 ১২৪, ১২৫, ১৩০, ১৩২, ১৩৮, ১৪৩,
 ১৫১, ১৫৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭,
 ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ২৫৫, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০
 সিংটেঙ্গ—১৬১
 সিদ্ধি সিংহা—৩৪
 সিদ্ধেশ্বর শিব—১০৮, ১১৪
 সিসিরো—২০৭
 সীতা—১৫৩
 সীতাকুণ্ড—২৯৮, ২৯৯
 সীতারাম রায়—৩০৭, ৩০৮
 সীবনশিল্প—১৫৪
 সুন্দর জাতীয় হস্তী—২২২
 সুন্দরবন—৩১৩
 সুপ্রতিক জাতীয় হস্তী—২২০, ২২২, ২৩৭
 সুবড়াই—১১৩, ১১৪, ৩১৬
 সুবড়াই খুন্স—২০, ৩১৬
 সুবর্ণ কুম্ভাণ্ড—৪৯, ৫০, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭

সুবর্ণ খনি—২৫, ১২৭, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
 সুবর্ণচক্র—২২২, ২২৩
 সুবর্ণগ্রাম (সোণারগাঁও)—৪৪, ৫৬, ১২৮,
 ১৩০, ১৩১, ১৫১, ২৮৮, ৩০৪, ৩০৫,
 ৩১৬, ৩১৭
 সুবর্ণদ্বার—৫০
 সুবা—২৫৮
 সুবিদ নারায়ণ—২৭০
 সুভদ্রা—৩২
 সুমিত্রা জগদীশ্বরী—১০০
 সুরা কাণা—২৩২
 সুরার প্রভাব—১৭, ১৮, ১৯, ৩২, ৪২, ৪৪,
 ৪৬, ৪৯, ৭৪, ১৪৯, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬,
 ১৬৭, ২৬৬
 সুরার মূণ্ডা—১৬৭
 সুস্মা নদী—২৭৭
 সুলতান সুলেমান—৪৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২,
 ১৫০, ২৫৫, ৩১১
 সুসঙ্গ—১৪৫
 সূতা কাটা—১৫৪
 সূর্য্যখাড়াইত—৫৮, ২৬৫
 সূর্য্যদাস—২২৫
 সূর্য্য মূর্ত্তি - ১১১
 সেক শুভোদয়—১৮৯
 সেগুন্স সাহেব—৮৩, ৮৪, ১৩২, ১৭৫, ১৭৭,
 ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
 সেন বংশীয় রাজা—২২৭
 'সেনা' উপাধি—১২৪
 সেনাপতি—১২৫
 সেনাপতির উচ্ছ্ৰ জালতা—১৩৮, ১৫৬
 সেনাপতির দণ্ড—৪৭, ১৩০, ১৩৭
 সেনাপতির পুরস্কার—১৩৭
 সেনাপতিগণের প্রাধিকার—৪, ৬, ৭, ১০, ৩৮,
 ৩৯, ৪০, ৬৫, ৬৭, ৭৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০,
 ১৪১, ১৪৩
 সেনাপতি বধ—১২, ৩৫, ৪২, ৫১, ৭৫, ৮৯,
 ১০৬, ১৩০, ১৪০, ১৪৪, ২৫৮, ১৫৯,
 ১৬৬, ২৫৬
 সোণাই নদী—৫৯

সোণার ভাটা—১৬৬
 সোণামুড়া—২৩, ১৭০, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৮, ৩১৭
 সৈনিকদল গঠন—১১৬
 সৈনিকের উপাধি—১২৪
 সৈনিকের দণ্ড—১৮, ৪৭, ১৩৭
 সৈনিকের ভোজ—১৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮
 সৈয়দ আব্বাছ—৩০৪
 সৈয়দ মিকায়েল—৩০৪
 স্মার হালিডে—২০৬, ২০৭
 স্কন্দ পুরাণ—১৮৫, ৩০৪
 স্ত্রী বধ—৩৮
 স্ত্রী শিক্ষা—৭৩, ৯০, ১৪৩, ১৭০
 স্থির জাতীয় হস্তী—২২২
 স্মান বাট—২৮৪
 স্বধর্ম পা—২৭০

(হ)

হজরৎ মহম্মদ—২৬৬
 হতাবর্ত্ত জাতীয় হস্তী—২২৪, ২২৬
 হুম্মান মূর্ত্তি - ১১১
 হরবৎ মহম্মদ খাঁ—৩০০
 হব গৌরী—৫৯, ১১১, ১১৯
 হরিন্দার—১০৮
 হরিশ—৬৩, ৭৩
 হরিশর্ম দেব—১৮৮
 হরিশর্মি যুবরাজ—১৬৯
 হরিরায় - ২৫৫
 হরিশচন্দ্র—২৯৩
 হর্ষবর্কন—২৭৩
 হলায়ুধ শিশু- ১৮৯
 হমন—৯, ১৪৭
 হসম ভোজন—১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯
 হস্তী—৪৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৮,
 ২১৫
 হস্তী খেদা—১২৩, ১৫৬, ১৬৪, ২৭৪
 হস্তীর পরমানু - ২২৮
 হস্তী বিজ্ঞান—২১৫, ২৩৭
 হস্তীর শ্রেণী বিভাগ—২১৯

ହାକୁଧୁମ୍—୧୫୪	ହଗଲୀ—୨୦୬
ହାଜରା—୧୧, ୧୪, ୧୨୦, ୨୫୪, ୨୬୫, ୨୬୬	ହଗଲୀ ନଦୀ—୧୧୧
ହାଜାରୀ—୧୨, ୧୨୦, ୧୨୪	ହମାୟୁନ—୨୫୩
ହାଜି ଖାଁ—୨୧୧	ହେଡ଼ସ୍—୧୧, ୫୫, ୨୫୧, ୩୧୪
ହାଜିଗଞ୍ଜ—୩୧୩	ହେଡ଼ସ୍ ରାଜା—୧୫୪, ୧୬୦, ୨୧୬
ହାନ୍ଟାର ସାହେବ—୩୦୫	ହେଡ଼ସ୍‌ର ନୃସିଂହ—୧୫୪
ହାଡ଼ି ମୈତ୍ର—୫୫, ୫୫, ୧୧୩, ୧୬୦, ୧୬୧, ୧୬୨, ୨୫୧	ହେଡ଼ସ୍‌ସ୍ୱର—୧୬୦, ୧୬୨, ୨୧୧
ହାରୀତ—୨୦୩, ୨୧୨	ହେମକୁମାର ଚୌଧୁରୀ—୧୦୧
ହାଲୀମ—୧୫୧, ୧୫୪, ୧୫୩, ୧୬୨, ୨୪୦	ହେମଚନ୍ଦ୍ର—୨୨୨
ହାଲିଗାକାଲି—୩୩	ହେରୋଦୋଡ଼ସ୍—୨୦୧
ହିଉୟେନ୍ ସିୟାଂ (ହିୟେନ ସାଂ)—୨୬୪, ୨୧୩, ୩୧୫	ହୈତନ ଖାଁ—୨୫, ୨୫, ୨୬, ୨୪, ୧୨୧, ୧୩୬, ୧୩୭, ୨୫୨, ୨୫୬, ୨୫୨, ୨୫୩, ୨୫୩, ୨୬୬, ୨୧୫, ୨୪୬, ୨୪୧, ୩୦୩, ୩୧୩, ୩୧୫
ହିନ୍ଦୀ ଛାଡ଼ା—୨୧୧, ୨୪୦	ହେଲିମ ଉଲ୍ଲୀନ—୨୪୩
ହିମତି—୨୧୧	ହୋପାକଲାଡ଼ି—୩୧, ୩୨, ୧୫୫, ୧୬୫, ୨୬୬
ହିମାଳୟ—୩୦୫	ହୋସେନ ଶାହ—୨୨, ୨୫, ୨୧, ୧୨୫, ୧୨୬, ୧୨୧, ୧୨୪, ୧୨୩, ୧୩୫, ୧୩୬, ୧୫୦, ୨୫୪, ୨୫୨, ୨୫୫, ୨୫୧, ୨୬୬, ୨୧୫
ହିରା ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହ—୬୦, ୧୦୨, ୧୪୧	
ହିରାପୁର—୩୧, ୫୩, ୬୦, ୧୬, ୪୧, ୪୪, ୧୦୨, ୧୫୧, ୩୧୪	
ହିଲୀଲ ଗାଜି—୨୫୧, ୨୫୨	(କ)
ହିରାବତୀ—୪୪	କାନ୍ଦିସ ଜାତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରୀ—୨୧୩
ହିରାବନ୍ଧ—୨୩୧	କାନ୍ଦିସ ଜାତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରୀ—୨୨୫

ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ।

ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ପୃଷ୍ଠାର ୧୫୩ ପଂକ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରିତ “ଚତୁର୍ଭୁଜା” ବାକ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ “ଅକ୍ଷତ୍ତ୍ୱଜା” ହେବ ।

রাজমালা প্রথম লহর সম্বন্ধীয় কতিপয় অভিমত ।

আনন্দবাজার পত্রিকা ।

২৪শে শ্রাবণ—১৩৩৫ ।

শ্রীরাজমালা—(ত্রিপুরার রাজশুভর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বিরচিত । শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিজ্ঞাতৃষণ কর্তৃক সম্পাদিত । আগরতলা রাজমালা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । ৩১৬ পৃষ্ঠা ।

প্রথমেই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, কাগজ, ছাপা, বাঁধাইয়ের প্রশংসা করিতে হয় । এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বই বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই আছে । ত্রিপুরার রাজ-সরকারের ব্যয়ে রাজবাটী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ যেমন সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত হওয়া উচিত, তেমনই হইয়াছে । কতকগুলি দুর্লভ ও প্রাচীন চিত্র এবং মানচিত্র প্রভৃতিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । সেকালে এ দেশে আধুনিক ধরণে ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না । তবু কয়েকটা রাজ-বংশ হইতে ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিনী', মহীশূরের 'রাজাবলী কথা', ত্রিপুরার 'রাজরত্নাকর,' 'রাজমালা' প্রভৃতি বিখ্যাত । আলোচ্য গ্রন্থ ত্রিপুরার 'রাজমালা' বাঙ্গালা পণ্ডে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । উহাতে ত্রিপুরার রাজগণের ইতিবৃত্ত আছে । ইহা ত্রিপুরার ধারাবাহিক ইতিহাস না হইলেও প্রাচীন ত্রিপুরা তথা প্রাচীন বাঙ্গালার বহু ঐতিহাসিক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায় । সুতরাং এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে খুবই বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য । 'রাজমালা' সর্বশুদ্ধ ছয় খণ্ডে বা লহরে বিভক্ত । তন্মধ্যে বর্তমান গ্রন্থে প্রথম লহর মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে । আশা করি, অন্যান্য লহরও কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্পাদনে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিবে ।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই গ্রন্থ সম্পাদনে যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বহি পড়িলেই বুঝা যায় । ত্রিপুরার রাজা এবং রাজ-কর্মচারীগণও এই গ্রন্থ সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই গ্রন্থ সম্পাদনে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক স্তীতি অবলম্বন করিয়াছেন । তিনি গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত-মতের সমালোচনা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । সমসাময়িক ইতিহাস ও নিরীক্ষণ প্রভৃতি হইতেও তিনি প্রভূত সাহায্য লইয়াছেন । পণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থের পান্ডিত্যের প্রাচীন শব্দাদি এবং তাহার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । তার পর 'সহ-মণি' নামে সম্পাদকের বিস্তৃত টীকা । এই টীকার

(আ)

ত্রিপুরার প্রাচীন ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই বহুমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

FORWARD.

Sunday—Dec. 25, 1927.

SHREE RAJAMALA (VOL. I.)—Edited by Sj. Kaliprasanna Sen Vidyabhusan, Published by the "Rajmala Karjyalaya," Agartala, Tripura State. PP. 316.

The illustrious, royal family of Tripura is to be congratulated on the splendid publication under royal auspices which has come to our hands—the first volume of the Rajmala or the chronicle of the princes of Tripura. Regeneration of our nation would have been much easier if we could call back the old traditions so rudely shattered by foreign despoilers, but without which, all that we build is built on sand. These traditions—the vehicle of our Indian culture—may be rescued only if the history of our country can be restored. It is a great pleasure therefore to see that under the enlightened patronage of the Royal family of Tripura Mr. Kali Prasanna Sen Vidyabhusan has edited the first section of the ancient chronicle which contains the history of this family during the last five centuries. The printing and make-up of the book leaves nothing to be desired. The book is elegantly and artistically bound and profusely illustrated. The author's extent of knowledge is simply astounding; he has handled the multifarious facts with astonishing adroitness but there is a serious drawback which considerably diminishes the value of his work; his historical sanity is sorely at a discount. The first and foremost duty of a historian is to keep an open mind. This our author has not been able to do. A superstitious awe of the *Shastras* has overshadowed his commonsense and some of his arguments are extremely fantastic and puerile. He argues that persons mentioned in the Rigveda need not have lived previously to the time of the composition of this work because it is direct revelation and therefore preceded all men and matter. He has implicit faith in the Puranas and does not shrink even from a Kalpantara theory to synchronise the conflicting data in them and most disconcerting of all is his pious indignation at the unbelievers who have the impudence to question the correctness of the statement of the *Shastras* that people in the Golden Age used to enjoy a deathless life of millions of years. Yet all this deplorable narrowness of vision hardly affects the intrinsic merit of the work. Coming to the historical period our author is master of himself. Here he is seen at his best criticising with critical acumen the absurd theories of Indian and English

writers supplementing the "chronicle of kings" with various data gleaned from multifarious sources which help the reader to visualise a state of real happiness and glory and with rare industry collecting facts and figures to prove or disprove a theory. It may reasonably be hoped that the other volumes too would be on a par with the present one and perhaps without the needless speculations on the Puranas which even though correct can accomplish but little. Lastly we have to say that the language of the chronicle does not justify the age assigned to it by the learned author—the beginning of the fifteenth century. The Bengali language of that time as known to us from other sources is quite different. Perhaps a complete rifacimento took place not very long ago.

THE STATESMAN ;—Sunday, July 8, 1928.

SIREE RAJAMALA PART I.

Edited by Kali Prasanna Sen Vidyabhusan, and published under the authority of the Tripura State.

This is a history of the kings of Tripura State as originally written by Pundit Baneshwar and Shukreshwar. The present editor has resened the original text by collating five different old Mss. found at Tipperah and he has enhanced the value of the book by giving the modern meaning of many of the obsolete Bengali words found in the text. The most valuable portion of the book, however, is his own forward. The result of the extensive research there embodied will enable readers to form a complete idea about the Government of an Indian State in ancient times. Several maps and a number of illustrations add to the book's merits ; it is well produced, and is a valuable contribution to the history of ancient India. The original text is an interesting specimen of old Bengali Poetry.

মানসী ও মর্ষবাণী ।

বৈশাখ—১৩৩৫ ।

শ্রীরাজমালা

(ত্রিপুর-রাজশব্দের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, সটীক ও সচিত্র । পণ্ডিত-প্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেস্বর বিরচিত ও শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত । ত্রিপুর রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্যের উল্লেখ নাই, বোধ হয় বিক্রয়ের জন্য নহে । রয়েল সাইজ । ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার । সম্পাদকীয় নিবেদন ৬ পৃষ্ঠা, প্রমাণ-পঞ্জী

চুট প্রকাশ।

ভাদ্র—১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীরাজমালা প্রথম লহর—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ও স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থ রাজমালা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন, সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ পট বন্ধন—সর্ব বিষয়েই রাজসিক ভাব সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান, শ্রম সংকোচ বা ব্যয় সংকোচ নিবন্ধন কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ঘটিতে পারে নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থখানা আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার মত দেশবিশ্রুত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান নিরত পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের সমালোচনার সুযোগ লাভ করা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। মূল রাজমালা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। রাজ রত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজ বংশের আর একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই দুই গ্রন্থের সার সংগ্রহ ক্রমে পণ্ডিত প্রবর শুক্রেণ্ডর ও বাণেশ্বর শর্মা এবং চন্ডাই দুর্লভেন্দ্র নারায়ণ পয়ার ছন্দে বাংলা রাজমালা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাজমালায় তাহাই উদ্ধার করা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঁচখানা পুরাতন পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজমালার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যে সকল স্থলে পাঠান্তর পাইয়াছেন তাহা পাদটীকায় সন্নিবেশ পূর্বক তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্বাৰীত বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ মূলের পশ্চাত্বেৰ্তী টীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানাকে প্রকৃত পক্ষে একটী রত্নখনিতে পরিণত করিয়াছেন। রাজ রত্নাকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয়, গাজিনামা প্রভৃতি বহু হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্র শাসন ও বিভিন্ন যুগের মুদ্রাদির সাহায্যে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি কি রকম কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশ্বস্তির অতল তলে নিমজ্জিত, তদুপরি শ্রমকুণ্ঠ সৌখীন গবেষণাকারিগণ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই এমন বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তৎ সমুদয়ের উপর ভিত্তি স্থাপন করা চলে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রমাণ ও যুক্তিবলে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ক্রমে প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজমালা প্রধান ভাবে ত্রিপুর রাজগণের বিবরণ; প্রসঙ্গ ক্রমে রাজ্যের ইতিবৃত্তমূলক যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় সমস্তই অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই ইতিবৃত্ত হিসাবেও ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলা রাজমালা ৬ বারে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটীকে এক একটী লহর বলা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রথম লহর প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি পণ্ডিত মহাশয় যথাসম্ভব সঙ্কর বক্রী পাঁচ লহর প্রকাশ করিয়া

বহুদিনের অভাব পূর্ণ করিবেন। এই সম্পাদনের অনুর্তান স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আমলেই আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু কার্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপর ৩মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ও ৩বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়েও এ সম্বন্ধে বহু চেষ্টা চরিত্র ও অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্ব স্ব তৎসুসঙ্কিতসার আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন পূর্বক স্বর্গীয় মহারাজাদিগকে বিমোহিত করিয়া কেবল রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এমন নহে, নানাভাবে কার্যের বিঘ্নও ঘটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। এই রাজমালা পাওয়ার জন্য বহু কাল যাবৎ দেশবাসী উৎকণ্ঠিত ছিল, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। দেশবাসীর শুভাশীর্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে চির যশস্বী করিয় তুলুক।

এই বিরাট গ্রন্থের কোনও মূল্য লেখা নাই। দানশীল ত্রিপুরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ; কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রন্থখানা বিনামূল্যে পাওয়ার কি উপায় আছে সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। আমরা জানি শত শত ত্রিপুরাবাসী রাজমালা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে চরিতার্থ হইবে ?
